ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী

মো: সোলায়মান আলী সরকার

ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী

মোঃ সোলায়মান আলী সরকার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৯১
জুন, ১৯৮৪

বা/এ : ১৪৪০
মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
মোঃ বদরুজ্জামান
আদর্শ মুদ্রায়ণ
৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : হাশেম খান

মূল্য : ষাট টাকা (ছয় মার্কিন ডলার) মাত্র

Ibnul Arabi O Jalaluddin Rumi by Md. Solaiman Ali Sarker. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition June 1984. Price taka 60·00 (Six U. S. Dollar).

সূচীপত্র

সূফী মতবাদ ও তার ক্রমবিকাশ

সূফীবাদের মূল গ্রন্থ আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মূল সূফী গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে সূফী মতবাদের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই দুই ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের সূফীতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা ধারণা দান করেন। এই বিষয়ে অধ্যাপক রোনাল্ড এলীন নিকলসন, ই. এইচ. হুইনফিল্ড, ই. জি. ব্রাউন, এ. জে. আরবারী, মারগারেট স্মিথ, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিকলসন প্রধান প্রধান সূফী-সাধকের অনেক মূল গ্রন্থ বিশেষ করে ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমীর কয়েকখানা গ্রন্থ এবং তাঁদের অনেক মূল্যবান উক্তির অনুবাদ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সূফী মতবাদ ও দর্শনের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করে সূফী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তিনি এবং হুইনফিল্ড, সি. ই. উইলসন, জালালউদ্দীন রুমীর বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবীর অনুবাদ করে তার সাথে অতি বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী যোগ করেন। ফরাসী পণ্ডিত এল. মেসিগনন মনসুর হাল্লাজের অজ্ঞাত জীবনী, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ করে তার অনুবাদ করেন ও অনেক টীকা-টিপ্পনী তার সাথে যোগ করে ফরাসী ভাষায় দুইখানা বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নিকলসন এসব গ্রন্থের অনেকাংশের ইংরেজী অনুবাদ করে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহার করেন এবং হাল্লাজের জীবন দর্শন ও সূফী সাধনা সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞানপিপাসুদের নিকট উপস্থাপিত করেন। এ ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থে অল্প-বিস্তর সূফী মতবাদ, দর্শন, সাধনা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইসব আলোচনাকারীর মধ্যে খলিফা আবদুল হাকিম, এ. ই. আফিফি, মীর ওয়ালিউদ্দীন, এ. এম. এ. শুস্তারী, বুরহান আহমেদ ফারুকী, মুহম্মদ ইকবাল, রোম ল্যাণ্ডু, এম. এম. শরীফ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ প্রধান। তাঁদের নানা গ্রন্থ ও অনুবাদ অবলম্বনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষান্তর করে সংক্ষেপে সূফী মতবাদ এবং ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমীর সূফী দর্শন সম্বন্ধে এখানে একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী সূফীকুলের শিরোমণি। খ্রীস্টীয় নবম

শতাব্দী হতে শুরু করে ইসলামে ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত মতবাদসমূহ তাঁদের সূফী দর্শনে যুক্তি তর্ক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁদের দার্শনিক মতবাদসমূহ সহজ ও স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে সাধারণভাবে সূফী মতবাদ ও তার ক্রমবিকাশের জ্ঞান অপরিহার্য। এখানে অতি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো।

সূফীদের অনেকেরই মত এই যে, 'সূফী' শব্দটি আরবী শব্দ 'সফা' হতে উৎপন্ন হয়েছে। 'সফা' শব্দের অর্থ পবিত্রতা। যাঁরা সাংসারিক নানা পাপ হতে মুক্ত এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তাঁরাই সূফী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। অবশ্য একটি মত অনুসারে 'সফ' শব্দ হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'সফ' শব্দের অর্থ শ্রেণী। যাঁরা ঐশী প্রেম, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করেন, তাঁরাই সূফী। সূফী মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনাকারী অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'সূফী' শব্দটি 'সূফ' শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। 'সূফ' শব্দের অর্থ পশম। পশমী কাপড় ধর্ম প্রচারক ও সাধু ব্যক্তিদের প্রিয় পরিচ্ছদ। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সময় এবং বিশেষ করে ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে দরিদ্র সাধারণ লোক ও সংসারত্যাগী সাধু ব্যক্তিরা মোটা কর্কশ পশমী বস্ত্র ব্যবহার করতেন। সংসার-ত্যাগী ব্যক্তিদের অনেক সময় 'পুশ-মীনা-পুশ' বা পশমী বস্ত্রধারী বলা হতো। পরবর্তীকালে সাংসারিক ভোগ-লালসা, কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সাধু জীবন যাপন করলে তাঁকে বলা হতো সূফী' বা পশমী বস্ত্র পরিধানকারী। তারপর যখন এইরূপ আপাতিক সুখে বিরাগী, পবিত্র, সাধু উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তখন তাঁরা 'সূফী' নামে পরিচিত হয়। 'সূফ' অর্থাৎ পশম হতে যে 'সূফী' নামের উদ্ভব হয়েছে, এই কথা বর্তমান পণ্ডিতগণ মনে করেন। সূফীরা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অন্তরের পবিত্রতা এবং সাংসারিক ভোগ সুখ অপেক্ষা দরিদ্রভাবে বৈরাগ্যময় সাধু জীবন যাপনই অধিকতর কাম্য মনে করেন। পশমী বস্ত্র পরিধানকারী হলেই সূফী হয় না, অন্তরের পবিত্রতা সূফী নামের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়।

সূফী মতবাদকে ইসলামী মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়। ধর্মীয় দিক হতে আল্লাহ্‌র সাথে পরিপূর্ণ মিলনেই মানব জীবনের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এই মিলন বা একাত্মবোধ জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত, এই মিলন কোন জ্ঞানপ্রসূত

বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়, এই মিলন একান্তভাবে হৃদয়াবেগ-প্রসূত। এই মিলনে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা রূপান্তরিত হয়ে ঐশী সত্তার গুণ লাভ করে। ঐশী ঐক্য লাভই সূফীদের চরম লক্ষ্য। মানুষের ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' বা অহং-জ্ঞানের বিনাশ ও আল্লাহ্‌র সত্তায় পুনর্জীবন লাভ সূফীদের শিক্ষার মূল কথা।

শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর হীরা পর্বতের নির্জন আরাধনা, ভোগ-বিলাসহীন সহজ সরল জীবন যাপন, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সূফীবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মা ও পরমাত্মা, বিশ্ব জগৎ ও পরম সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মুহম্মদের উক্তি ও দৃষ্টিভংগী সূফীবাদের মূলভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। 'সূফী' শব্দটি তৎকালে প্রচলিত না থাকলেও সূফীবাদের আচার-অনুষ্ঠান হযরত মুহম্মদের জীবনে পালিত হয়েছে।

হযরত মুহম্মদের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে 'সূফী' নামটি মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়। এই প্রাচীন 'সূফী' মতে কোন দার্শনিক তত্ত্ব, আল্লাহ্-তত্ত্ব, আত্মা বা আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। আল্লাহ্ ও মানুষের যে উন্মাদনাময় প্রেম মিলন 'সূফী' মতবাদের ভিত্তি, সে বিষয়ে কোন আলোচনাও সূফীবাদের মধ্যে ছিল না। সূফীবাদের মধ্যে মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদের পরিবর্তে নীতি-তত্ত্বেরই প্রভাব বেশী দেখা যায়। এই প্রাচীন সূফী মতের দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রধান, একটি সংসার ত্যাগবাদ, বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ, অপরটি নিষ্ক্রিয়বাদ বা আল্লাহ্‌র কর্মহীন আত্মসমর্পণ। এই সম্প্রদায়ের সাধক আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান, বিচারকর্তা ও দণ্ডবিধানকর্তা মনে করতেন এবং পাপ ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতেন। পাপের অনিবার্য ফল দোজখের শাস্তি আর এই শাস্তি হতে মুক্তি লাভের আশায় তাঁরা পার্থিব সুখ ও ভোগ পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী উদাসীনের মতো জীবন যাপন করতেন। প্রথমে সূফীরা এই সংসারত্যাগী সম্প্রদায়ের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, পরে তাঁরা পৃথক হন। সংসারত্যাগী সাধু ব্যক্তিরা বেহেস্তের সুখ লাভের আশায় ইহলোকের সুখ পরিত্যাগ করেন কিন্তু সূফীরা সংসার বিমুখতা ও দারিদ্র্যকে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উপায় হিসাবে গ্রহণ করছেন। পরে কিছু সংখ্যক সূফী বাহ্য-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে

আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন এবং প্রগাঢ় ভক্তি দেখান। এই প্রাচীন যুগের সূফীরা কোরআন ও হাদীসের বাণীকে অকাট্য বলে মনে করতেন এবং শরীয়ত-নির্দিষ্ট আচার-আচরণও পালন করতেন। পরে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের প্রেম, ভালবাসা ও ভক্তিকে সূফীবাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই যুগের স্বনামধন্যা সূফী তাপসী রাবেয়ার (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) সময় হতে সূফী মতবাদের নবযুগের সূচনা হয়। তাপসী রাবেয়ার মোনাজাত বিভিন্ন সূফীগ্রন্থে উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। রাবেয়া বলতেন "হে প্রভু, যদি আমি কেবল দোজখ-যন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার উপাসনা করে থাকি, তবে আমাকে দোজখ-অগ্নিতে দগ্ধ কর। যদি আমি কেবল বেহেস্তের সুখ লাভের আশাতে তোমার উপাসনা করে থাকি, তবে আমাকে স্বর্গ-সুখ হতে বঞ্চিত কর। কিন্তু আমি যদি কেবল তোমারই জন্য তোমার উপাসনা করে থাকি, তবে আমার নিকট তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকটিত কর।" রাবেয়ার হৃদয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও স্থান ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমার দোজখের ভয় নাই, স্বর্গেরও আশা নাই, আমি নবীকেও ভালবাসতে পারি না —কারণ আল্লাহ্‌র প্রেমে আমার হৃদয় এমনভাবে পূর্ণ যে আর কারও প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা এখানে স্থান পায় না।

সূফী মতবাদের নতুন যুগ আরম্ভ হয় খ্রীস্টিয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই নতুন সূফীমত ক্রমে ইসলাম বহির্ভূত অনেক মতবাদ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন, নব্য প্লেটোবাদী দর্শন, বিশেষ করে প্লটিনাসের মতবাদ, খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ নস্টিক মতবাদ, পারসিক ভাবধারা প্রভৃতি প্রভাবের সম্মিলিত ফল বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। তবে কোরানের একত্ববাদের প্রভাব যে এদের মূলে ছিল এবং কোরআন ও হাদীসই যে মূল উৎস একথাও স্বীকার করেছেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এই নতুন সূফী মতবাদের উদ্ভবের পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক কারণ বর্তমান ছিল। উমাইয়া যুগের রাষ্ট্রীয় অন্তর্বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা, আব্বাসীয় যুগের সন্দেহবাদ, বুদ্ধিবাদ ও শুষ্ক-যুক্তিবাদ, ধর্মতত্ত্ববিদগণের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানপ্রিয়তা প্রভৃতিতে এই খোদাবাদ, সরল ধর্ম বিশ্বাস ও আবেগ প্রধান মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। যা হোক, নতুন সূফীবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌ একমাত্র সত্য ও তিনি অনন্ত প্রেমময়

সত্তা। আল্লাহ্‌র প্রেম লাভ করা মানব জীবনের প্রধান কাম্য। আল্লাহ্‌কে ভালবাসার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমের মাঝে মিলনের পূর্ণ আনন্দ অনুভব করা। আল্লাহ্‌র সাথে এই প্রেম-সম্বন্ধ ও মিলনজাত আনন্দানুভূতি নতুন সূফীমতের বৈশিষ্ট্য। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার প্রভেদ দূর হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী এক পরম সত্তা আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আল্লাহ্ একমাত্র সত্তা, যিনি সৃষ্টির মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। প্রেমের আনন্দে সূফী সাধক ব্যক্তিগত মানবীয় সত্তার বিলোপ সাধন করে বা রূপান্তরিত করে ঐশী সত্তায় মিশে যেতে পারে। এই মতবাদ কোরআনের মতবাদ নয়, এটা অনেকাংশে ইসলাম বহির্ভূত মতবাদ।

কোরআনের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ্ স্রষ্টা ও মানুষ সৃষ্ট জীব, আল্লাহ্ ও মানুষ সমান নয়। কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন, নব্য প্লেটোবাদী দর্শন, খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ, নস্টিক মতবাদ, পারসিক মরমী দর্শন ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সূফীরা কোরআনের আয়াত ও নবীর হাদীস হতে পরমাত্মা ও মানবাত্মার অভিন্নতা বিষয়ক মতবাদ বের করতে চেষ্টা করেন। আদম সৃষ্টি ও তার দেহে প্রাণ সঞ্চারের পরে আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের যখন আদমকে সেজদা করতে আদেশ দেন তখন আজাজীল ব্যতীত সকল ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন। সূফীরা বিশ্বাস করেন যে, আদমের আত্মা যদি পরমাত্মা হতে আগত চিরন্তন সত্তা না হতো তবে আল্লাহ্ কখনো ফেরেস্তাদের সেজদা করতে আদেশ দিতেন না। ফেরেস্তারা সেজদা করতো না এবং সেজদা করলে অমার্জনীয় পাপ হতো। পুনরায় হযরত মুহম্মদের বদরের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে যে যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন 'আপনি নিক্ষেপ করেন নাই, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন এবং আপনি নিধন করেন নাই, আল্লাহ্ নিধন করেছেন।' এক হাদীসে বলা হয়েছে যে হযরত মুহম্মদকে ভালবাসে সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ধরনের কোরআনের আয়াত ও নবীর হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইসলাম বহির্ভূত কতকগুলো মতবাদ, যেমন, অবতারবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সূফীরা মানুষ ও আল্লাহ্‌র সত্তার অভিন্নতা ঘোষণা করেছেন। সেইজন্য বলা হয় নব সূফীবাদ কোরআনের একত্ববাদ হতে উদ্ভব হলেও এর উপর ইসলাম বহির্ভূত মতবাদের প্রভাব পড়েছে, একথা ঠিক।

নব সূফীবাদ যিনি প্রথমে বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত করেন, তাঁর নাম যুননুন মিসরী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীস্টাব্দে)। "যুননুন মিসরের অধিবাসী, সৎপথ প্রদর্শকদের অগ্রণী, মহাবিচারের দিনের প্রদীপ, তত্ত্ব-জ্ঞানের সূক্ষ্মদর্শী বাদশাহ, দরিদ্রের বন্ধু, বিপদে পথ প্রদর্শক এবং সাধনায়ও একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।" সূফীগণ তাঁকে তাঁদের সম্প্রদায়ের আদি মুর্শীদ বা আদি গুরু বলেন। তাঁর প্রসঙ্গে সূফী কবি জামী বলেন, "তিনিই আমাদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক। অন্যান্য সূফী তাঁরই বংশধর, তাঁরই আত্মীয় মাত্র।" যুননুন মিসরীর মতে বিরহীর সম্মুখে ভয়ের আগুন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত এক ফোটা পানিরই মতো। প্রেমিকের সাথে বিচ্ছেদ অপেক্ষা হৃদয়বিদারক কোন বস্তু নাই। প্রকৃত সূফী ঐ ব্যক্তি, যিনি অবস্থা অনুসারে কথা বলেন। এমন কথা তিনি বলেন না, যা তাঁর মধ্যে নাই। যখন তিনি চুপ করে থাকেন, তখন তাঁর কাজসমূহ তাঁরই অবস্থা প্রকাশ করে। সৃষ্টি হতে বিচ্ছেদই তাঁর আসল অবস্থার প্রকাশ। তত্ত্বজ্ঞানী সব সময় খোদার ভয়ে ভীত। তিনি সব সময়ই খোদার নিকট হাযির। আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টির মধ্যে বাস করেও সৃষ্টি হতে পৃথক থাকেন অর্থাৎ তিনি জনসমাজে বাস করেও তাঁর অন্তঃকরণ সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত থাকে। তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান বলতে এটা বোঝায় না যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, এই জ্ঞান সাধারণ মুসলমানের বা সকল ধর্ম বিশ্বাসীর আছে। দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ ও যুক্তি তর্কাদি দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তার পূর্ণজ্ঞান বা প্রকৃতজ্ঞান প্রকৃত-খোদা-প্রেমিক ওলীগণ বা সাধুগণেরই লভ্য। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌কে সন্দর্শন করেন, আল্লাহ্ তাঁদের অন্তরে এমন মারেফাতের তত্ত্বসমূহ ও পূর্ণ সত্তা প্রকাশ করেন যা তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকাশ করেন না। মারেফাতের আসল বস্তু আল্লাহ্‌র গোপন তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া, যার কারণে নূরের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ও সূর্যের আলো দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়। মিথ্যাবাদী কখনো তত্ত্বজ্ঞানী হতে পারে না। প্রকৃত আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞান-চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি বা অন্তরচক্ষু দ্বারা গোপন তত্ত্বের গুণ সন্দর্শন করেন। আরিফ আল্লাহ্‌র নিকটে এমন কি তাঁর সাথে মিলিত থাকেন। তাঁর পরিবর্তন আল্লাহ্‌রই পরিবর্তন। আল্লাহ্‌র কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়, তাঁর চক্ষু খোদারই চক্ষু, যা তাঁর বাইরের দৃষ্টি দ্বারা

দর্শন করে। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি যখন আমার বান্দাকে ভালবাসি, তখন প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁর কর্ণ হই, সে আমার দ্বারা শ্রবণ করে ; আমি তাঁর জিহ্বা হই, সে আমার দ্বারা কথা বলে ; আমি তার হস্ত হই, সে আমার দ্বারা গ্রহণ করে।" যাহেদ (খোদা প্রেমিক ও লোভত্যাগী) আখেরাতের বাদশাহ, আরিফ (খোদাতত্ত্ববিদ) যাহেদের বাদশাহ। খোদাপ্রেমের চিহ্ন এই যা খোদা হতে দূরে রাখে, তা ত্যাগ করা, শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ও খোদার নির্দেশিত কার্যমাত্র বাকী থাকে। জ্ঞানের সাথে সাথে কার্য করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। আবার কার্যের সাথে ঐকান্তিকতা (এখলাস) থাকা কর্তব্য এবং প্রেমের সাথে সততার প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র স্মরণ আরিফের প্রাণের খাদ্য, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা আরিফের প্রাণের পানীয়, আল্লাহ্‌কে লজ্জা করা তাঁর প্রাণের পরিধান স্বরূপ।

"তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিদিন ধীরে ধীরে নম্র ও অবনত হয়, কারণ প্রতি মুহূর্তে সে আল্লাহ্‌র নিকট হতে নিকটতর হয়।" "অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকের মাধ্যমেই আল্লাহ্ আমাদের অন্তরের অন্তরালে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।"

হুজভিরীর 'কাশফ উল মহজুব' বা রহস্য উন্মোচন এবং ফরিদউদ্দীন আত্তারের 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' বা আওলিয়াদের জীবনী গ্রন্থে যুনয়ুনকে উপলক্ষ করে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

যুনয়ুনের সূফী-মতবাদে যিনি অনুপ্রেরণা দেন, তিনি বায়েজিদ বোস্তামী (মৃত্যু খ্রীস্টপূর্ব ৮৭৪—৮৭৫)। বায়েজীদ বোস্তামী সর্বেশ্বরবাদের প্রতি ইংগিত দেন এবং তিনিই প্রথমে 'ফানাবাদ' প্রবর্তন করেন। তারপর মনসুর হাল্লাজের নাম (খ্রীস্টাব্দ ৮৫৪—৯২২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাল্লাজ আল্লাহ্ ও মানবের একাত্মতার প্রথম প্রচারক। তাঁর মতে যখন ঐশী সত্তার সাথে মানব সত্তা মিশে যায়, তখন সেই সাধু বা ওলী আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত দ্রষ্টা পরিণত হয় এবং বলে 'আনাল হক' আমি সৃষ্টিশীল সত্য। হাল্লাজ নিজে বলেছেন 'আনাল হক' তাঁর এই উক্তি ইসলাম বিরোধী মনে হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং আট বৎসর বাগদাদে কারাবাস ভোগ করেন। তারপর সাত মাস ধরে বিচারের পর তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয় এবং বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁকে হত্যা করা হয়।

হাল্লাজের মতানুসারে আল্লাহ্‌র সত্তার সারবস্তু প্রেম। সৃষ্টির পূর্বে তিনি

নিজেকেই নিজে ভালবাসতেন এবং প্রেমে নিজের স্বরূপ নিজের কাছে প্রকাশ করতেন। তারপর বাইরে সে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখার জন্য তিনি তাঁর একটি প্রতিরূপ সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে তাঁর সমস্ত গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টি বা প্রকাশই আদম। এই আদমের মধ্য দিয়ে এবং আদমের দ্বারাই আল্লাহ্‌ অভিব্যক্ত, আল্লাহ্‌ আদমে রূপায়িত। জালালউদ্দীন রুমী হাল্লাজের এই মতবাদ সত্য বলে গ্রহণ করেন। হাল্লাজ মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্পর্কে বলেন যে আল্লাহ্‌র সাথে মানবের প্রেম মিলনের ফলে মানুষের সত্তা একেবারে বিলোপ হয় না। মানবের জড় সত্তা (নাসুত) কেবল ঐশী সত্তায় (লাহুত) রূপান্তরিত হয়। মানব ও আল্লাহ্‌ এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার মিলন একেবারে এক হওয়ায় মিলন বা একে অন্যে নিঃশেষে পরিবর্তিত হওয়ার মিলন নয়। 'নাসুত' ও 'লাহুতের' মিলন হাল্লাজের মতে মদ ও পানির মিলনের মতো। কিন্তু মদ মদই, আর পানি পানিই, কেবল একত্র মিশ্রিত হয়ে এক রূপত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেম মিলনে উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একে অন্যে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্‌ যে মানবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাই মানুষের এই পরম গৌরব।

হাল্লাজের পর স্পেন দেশীয় বিখ্যাত যুক্তিবাদী সূফী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (১১৬৫—১২৪০ খ্রীস্টাব্দ) সূফী মতবাদকে পূর্ণ তত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হাল্লাজের কাছে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। মুতাজিলা, আশারিয়া, কারমাথিয়া, 'ইখায়াহুস সাফা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত। এরিস্টটল ও প্লেটোর দর্শন মুসলিম দার্শনিকদের হাতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও ইসলামী রঙে রঞ্জিত হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে। তাঁর উপর প্লটিনাস ও স্টোয়িকদের প্রভাবও কম নয়। অনেকের মতে জোরোস্ট্রিয়ান ও ম্যানিসিয়ান প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত। স্পেন দেশীয় সূফী ইবনে মাসরারা ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রভাবেও তিনি প্রভাবিত হন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের কাছ থেকে তাঁর দর্শনের উপকরণ সংগ্রহ করে কোরআন ও হাদীসের আলোকে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ গড়ে তোলেন। তাঁর মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ, বিশ্বাত্মাবাদ ও ইংরেজীতে 'প্যানথেইজম' বলা হয়। সর্বেশ্বরবাদ এক ধরনের উন্নতরূপ জড় মতবাদ। তাই কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাঁকে একত্ববাদী বলে উল্লেখ করেন। রোম লাণ্ডুর মতে তাঁকে একত্ববাদী না বলে

অদ্বৈতবাদী বলা অধিক সংগত। কারণ, তিনি আল্লাহ্ ও বিশ্বের অদ্বৈতবাদ প্রমাণের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে উপযুক্ত অর্থ প্রকাশকারী শব্দের অভাবে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' শব্দকে সর্বেশ্বরবাদ, বিশ্বাত্মাবাদ, অদ্বৈতবাদ, প্যান-থেইজম' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ সহজ। কিন্তু তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং শব্দ ও রূপক ব্যবহার করেছেন তার অর্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে উদ্ধার করা ও সম্যকরূপে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর মতবাদ কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশিত হয়নি বলে তাঁর 'ফুতুহাত' 'ফুসুস' ইত্যাদি গ্রন্থ হতে উপাদান সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট শিরোনামায় প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই কারণেই তাঁর মতবাদের যথেষ্ট সমালোচনা করা যায় না। তিনি কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছেন যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে একজন দেবতাবাদী, অবতারবাদী ইত্যাদি বলে মনে হয়। তিনি সব সময়ে তাঁর নিজস্ব 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ গঠনের অনুকূলে কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য দার্শনিকের শব্দ পরিভাষা ও উক্তি ব্যাখ্যা করেছেন।

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্ বিশ্ব মাঝে ব্যাপ্ত আছেন। এই বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্-সত্তাময়। আল্লাহ্ ও বিশ্বে কোন ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্ব জগতই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্ব জগৎ। এই মতবাদ দর্শনে সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত এবং দার্শনিক স্পিনোজা এই মতবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন। সূফী মতবাদ বা ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজীয় সর্বেশ্বরবাদ নয়। আল্লাহ্ বিশ্বজগতে এবং বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র অবস্থিত বটে এবং সমস্ত বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্ বটে, কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ নয়। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের অতিরিক্ত ও বহির্ভূত সত্তাও বটে। বিশ্বজগৎ ধারণা হিসাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞান সত্তার মাঝে বর্তমান। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন, আল্লাহ্ এই বিশ্বজগতের অন্তর্যামী সত্তা হিসাবে মিশে থাকলেও আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগত নয়, তিনি বিশ্বজগতের অতিরিক্ত সত্তা।

সাধারণভাবে ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ বলা হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ হতে তাঁর মতবাদ একটু ভিন্ন ধরনের। এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে।

তাঁর মতবাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কয়েকটি রূপ—(ক) শুদ্ধ স্বরূপ বা অদৃশ্য আল্লাহ্‌ (খ) আকার প্রাপ্ত শুদ্ধ স্বরূপ বা 'হকিকতে মুহম্মদী', 'নূরে মুহম্মদী', 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞা রূপ; (গ) আয়ান আস সাবিতা বা মূল আদর্শ আকার বা প্লেটোর ধারণারূপ, (ঘ) 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা বিশ্বজগৎ রূপ, বিশ্বজগতই আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌ই বিশ্বজগৎ এবং 'ইনসানুল কামিল' বা 'পূর্ণমানব রূপ'। পূর্ণ মানব রূপেই আল্লাহ্‌র সমগ্র পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌র সমগ্র গুণাবলী অবস্থিত। পূর্ণমানব ও আল্লাহ্‌ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইবনুল আরাবী বলেন যে, প্রকৃত সূফী আল্লাহ্‌র অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা উভয়েই বিশ্বাস করেন। তা ছাড়া তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' উন্নতরূপী জড়বাদ বা নিরীশ্বরবাদ নয়। আর এই দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করলে তাঁর মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশ্বাত্মবাদ ইত্যাদি না বলে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা ইসলামী সর্বেশ্বরবাদ, ইসলামী অদ্বৈতবাদ, ইসলামী একত্ববাদ বলা যায়। তবে তিনি ধর্মীয় আল্লাহ্‌ ও সূফীদের অসীম আল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্‌কে বিভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে বা আল্লাহ্‌ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু একজন সূফী বা অতীন্দ্রিয়বাদী তাঁকে সকল রূপের মধ্যে দেখতে পান। ধর্মের মধ্যে আল্লাহ্‌ মানুষের পাপ পুণ্যের বিচারক হিসাবে চিত্রিত হয় কিন্তু একজন সূফীর অন্তরে পরম প্রেমিকরূপে প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ্‌ সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর সত্তা, সকল অস্তিত্বের মূল অস্তিত্ব। মানুষের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রয়োজন, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পূর্ণরূপে প্রকাশের জন্য মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজন। আল্লাহ নিজেকে পূর্ণ মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ইবনে আল জীলি (১৩৬৫—১৪০৬ খ্রীস্টাব্দ) এই পূর্ণমানব মতবাদের উৎকর্ষ সাধন করেন।

আদি অবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তা-সার সকল প্রকার গুণ ও নাম হতে মুক্ত। এই সত্তা অসৃষ্ট, অবিভক্ত, অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়, অব্যক্ত, অপ্রকাশ্য, অবোধগম্য, বর্ণনাতীত, অচিন্তনীয়, অকথনীয়, অনির্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত, অশেষ, অক্ষয়, অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার। প্রেমের মাধ্যমে ঐ স্বপ্ন অবস্থার নিজেকে যখন নিজের মাঝে, নিজের কাছে, নিজের সত্তায় অথবা মানুষ অথবা বিশ্বের মধ্যে প্রকাশ করেন তখনই তিনি তাঁর সত্তা ও গুণ, গুণ ও নাম ইত্যাদি দ্বারা গুণান্বিত হন, কারণ সকল সৃষ্ট সত্তা ও বস্তু তাঁরই গুণাবলী মাত্র। এই প্রথম নির্ধারিত অবস্থায় ঐশী

সত্তা ও গুণাবলী এবং আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন, আল্লাহ্র সত্তা হতে গুণাবলী ভিন্ন—এরূপ চিন্তা করলে গুণগুলো অলীক বলে মনে হয়। যেহেতু বিশ্বও তাঁর মধ্যে অবস্থিত, সবকিছু আল্লাহ্র সত্তা ও গুণের প্রকাশ, সেহেতু গুণগুলো আল্লাহ্র সত্তার উপর নির্ভরশীল ও আপেক্ষিক, আল্লাহ্ একমাত্র নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ বা পরম সত্তা নিজের মধ্যে অবস্থিত সব কিছু জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বিভাগ নাই, সত্তা ও গুণের দ্বৈতভাব নাই। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পরম সত্তা স্বয়ং একাধারে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তু, এখানে সব কিছু মিলে এক।

ইবনুল আরাবীর মতে চিরন্তন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কাজ অবিরত চলছে। আশারীয় সম্প্রদায়ের পরমাণুবাদীদের সাথে একমত হয়ে তিনি বলেন যে, এই চিরন্তন প্রবাহ ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রবাহ, এখানে ধ্বংসের অর্থ নিয়ত পরিবর্তন, প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর সাধন।[১] হেরাক্লিটাসের মতো তিনি বলেন যে, পূর্বমুহূর্তে যা ছিল পরমুহূর্তে তার পরিবর্তন হয়, এক বস্তু এক রকম থাকে না। পূর্ব মুহূর্তের বস্তুর পরিবর্তন হয় বলে এটাকে আর সেই পূর্বেকার বস্তু বলা যায় না। পরিবর্তন হওয়ার অর্থ পূর্ব অস্তিত্ব লোপ পাওয়া। একরূপ অবস্থা হতে পরিবর্তিত হয়ে অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম সৃষ্টি বা নতুনের উৎপত্তি। সব সত্তা ও বস্তুর সত্তা আল্লাহ্র সত্তার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বিশ্ব অতীতে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ্ এখনও নিজেকে বিশ্বজগতের নতুন নতুন বস্তু ও সত্তার মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন এবং বিশ্বের সৃষ্টির প্রবাহ এখনও চলছে, বিশ্ব স্রষ্টার ঐশী অস্তিত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং বিশ্ব একটা চিরন্তন সৃষ্টি প্রবাহ।

ইবনুল আরাবী বলেন যে, আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করেন না, আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন, যা কিছু সুপ্ত ও অব্যক্ত অবস্থায় আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে আছে তা ব্যক্ত হচ্ছে বা আত্মপ্রকাশ করছে এবং মূর্তরূপ লাভ করছে। যা পূর্বে ছিল না তা সৃষ্টি হয় না, বস্তু ও সত্তাগুলো ধারণারূপে আল্লাহ্র জ্ঞানের

১ Rom Landau: The Philosophy of Ibn Arabi, p. 29 George Allen and Unwin, London, 1959.

মাঝে পূর্ব হতে ছিল. বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে সেগুলো অবিরত প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর এই কথা অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের কথার মতো। কিন্তু আল-গাজ্জালী বলেন যে, প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এমন কি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-গত অভিজ্ঞতা অন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে শূন্য হতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেন। আল্লাহ কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেও তা নির্ভর করে সেই বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকৃতির উপর আর আল্লাহ সেই বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা।

কিভাবে সৃষ্টির অব্যক্ত বা সুপ্ত সম্ভাবনা ব্যক্ত হয় বা প্রকাশ হয়, সম্ভাব্য অস্তিত্ব কিভাবে বাস্তবায়িত হয়? অব্যক্ত কিভাবে ব্যক্ত হয় এবং বিশ্বজগতে উৎপত্তি হয় বা কেন প্রকাশ পায়? অন্যান্য দার্শনিকের মতো ইবনুল আরাবীর দর্শনেরও বিশ্ব সৃষ্টি সমস্যা একটা বড় সমস্যা। তিনি সৃষ্টির মাঝে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র সত্তাসারকে ঐশী নাম ও ঐশী গুণ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ঐশী নাম ঐশী সত্তা প্রকাশের পূর্ব অবস্থার একটি নির্দিষ্ট বা সীমিত আকার, অন্য কথায়, ঐশী নাম ঐশী গুণ প্রকাশের পূর্ব-আকার। ঐশী নাম ঐশী সত্তার মাঝে সৃষ্টিধর্মী ও সক্রিয় আকার, যার মধ্যে ঐশী গুণ প্রকাশ পায় বা বাহ্যিক জগতের বস্তুরূপে প্রকাশ পায়। বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্যমান বাহ্যিক জগতে আল্লাহ্‌র সত্তার প্রকাশিত অবস্থার নাম ঐশী গুণ। ঐশী গুণ যদিও কোন জড় বস্তু নয় তবুও তা জড়ের উৎস এবং মানবীয় চিন্তা বাহ্যিক রূপে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ঐশী সত্তারূপে বিদ্যমান থাকে, ঐশী নামের অবস্থায় থাকে। ঐশী গুণ ঐশী নামেরই বাহ্যিক প্রকাশ, অতএব ঐশী গুণ পরিবর্তনশীল এবং এর প্রকাশের মধ্যে নিষ্ক্রিয় লক্ষণ বর্তমান, ঐশী সত্তা অনন্ত চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, অধ্বংসশীল ও সর্বব্যাপী হওয়ায় এর মাঝে সম্ভাবনারূপে ঐশী নামের অবভাসিক ও অনবভাসিক দুইটি রূপ বা দিক আছে। এইটি প্লেটোর ধারণার চেয়ে উচ্চমানের, কারণ প্লেটোর ধারণা অবভাসিক বস্তুর অন্তরালে আধ্যাত্মিক বস্তুর প্রতি ইংগিত দেয় ও অবভাসিক বস্তুকে আধ্যাত্মিক ধারণার মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করা হয়। প্লেটোর মতে প্রকাশ্য বস্তু কেবল ছায়া বা অলীক মাত্র। ইবনুল আরাবী মূর্ত বস্তুকে পরম সত্তার বিশেষ একটি দিক বা প্রকাশ বলে উল্লেখ করেন।

ইবনুল আরাবী অন্যভাবে ঐ একই বিষয় বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে

ঐশী চেতনা 'আদর্শ সত্তার বা মূল আদর্শের সকল বোধগম্য আকার' বা 'আয়ান'কে ঘিরে আছে এবং এই 'আয়ান' বা 'লগস' বা নূরে মুহম্মদী অভিন্ন। ঐশী সত্তা মূল আদর্শের সকল অব্যক্ত সত্তাকে বা ঐশী নামকে ঘিরে আছে। তিনি সেগুলোকে 'অব্যক্ত সত্তা' বা 'আয়ান আস সাবিতা' নাম দেন। তিনি প্রত্যেকটির সত্তাকে আল্লাহ্‌র এক একটি রূপ বা প্রত্যংশ বলে উল্লেখ করেন এবং সত্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ সেগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে সচেতন হন।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, একদিকে ইবনুল আরাবী আল্লাহ্ ও বাহ্যিক জগতের বহুত্বকে এককভাবে স্বীকার করেছেন, আবার অন্যদিকে তিনি আল্লাহ্‌র ঐক্য ও বাহ্যিক জগতের বহুত্বকে স্বীকার করেছেন।

যে সকল সূফী সাধক ও লেখকগণ ইসলামের সাথে সূফী মতের সামঞ্জস্য সাধন করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হুজ্জতিরি বিশেষ করে আল-গাজ্জালীর (১০৫৮—১১১১ খ্রীস্টাব্দ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল-গাজ্জালীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শরীয়তপন্থী মুসলমানরা সূফীদের খাঁটি মুসলমান বলে স্বীকার করতেন না। কারণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় অনেক সময় তাঁরা শরীয়ত বিরোধী অনেক কথা প্রকাশ করতেন। আল-গাজ্জালী বলেন, যে শরীয়ত বিধানের উপর নিষ্ঠাবান থেকে সূফীদের মারেফাত সাধন করতে হয়। তিনি সূফীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দান করে শরীয়ত ও মারেফাত অর্থাৎ শাস্ত্রপন্থী মুসলমান ও সূফীদের মধ্যকার বিরোধ দূর করে ইসলামী সাধনার পূর্ণতা সাধন করেন। সূফীমতবাদ যে ইসলাম ধর্ম-সম্মত মতবাদ, তিনি তা প্রমাণ করেন। তাঁর 'এহিয়া-উল-উলুম', 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর সর্বমুখী প্রতিভা ও সর্বশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মোটকথা শরীয়তের সাথে মারেফাতের সার্থক সমন্বয় সাধনের জন্য আল-গাজ্জালীর নাম চিরস্মরণীয় এবং তখন হতে কামেল সূফীরা প্রত্যেক মুসলমানের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

এরপর সূফী জগতের প্রাণ তাপসগুরু ও কবিশ্রেষ্ঠ ফরিদউদ্দিন আত্তারের নাম (৫১২ হিজরী, ১১১৮—১২২৯ খ্রীস্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' বা 'সাধু পুরুষের জীবনী' এবং 'মস্তাকুত্ তায়ের' বা পাখীদের কথোপকথন সূফী দর্শনের দিক থেকে অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

ফরিদউদ্দিন আত্তার তাঁর 'মন্তাকুত্‌ তায়ের' গ্রন্থে রূপকের ভিতর দিয়ে মানবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাতকার বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থের গল্প নিম্নরূপ :

বনের সকল পাখী এক হয়ে সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ 'হুদহুদ' পাখীর সভাপতিত্বে আলোচনা শুরু করে। পাখীরা একবাক্যে তাদের একজন বাদশাহ নির্বাচনের কথা প্রকাশ করে। এর উত্তরে 'হুদহুদ' পাখী জানায় যে, সকল পাখীর শ্রেষ্ঠ 'সী-মোরগ' আছে এবং সে 'কাফ' নামক সপ্ত উপত্যকার পরপারে অবস্থান করে। উত্তর শুনে পাখীরা সী-মোরগকে দেখার অভিলাষ জানালে 'হুদহুদ' বলে যে সেখানে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। আলোচনা শেষে পাখীরা 'হুদ হুদ'কে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে সী-মোরগের কাছে যাবার কথা বলে। যাত্রার সময় উপস্থিত হলে প্রায় সকল পাখীর মুখ গম্ভীর হয়। বুলবুলী পাখী গোলাপ বাগান ছেড়ে যেতে চায় না, তোতা পাখী অপরূপ দেহ নিয়ে বিদেশে যেতে নারাজ, হাঁস জল-পথ চায়, পেঁচা চায় ভাংগা বাড়ী ও রাত্রির অন্ধকার। বাজপাখী দক্ষ শিকারী পাখী, সে রাজার অতি প্রিয় বলে তাঁর সংগ ছাড়তে চায় না। 'হুদহুদ' যুক্তি দিয়ে পাখীদের সকল আপত্তি খণ্ডন করে যাত্রা সম্ভব বলে উল্লেখ করে।

তারপর হাজার হাজার পাখী যাত্রা শুরু করে। তাদের সম্মুখে সাতটি উপত্যকা আছে এবং উপত্যকাগুলো যথাক্রমে সন্ধান, প্রেম, জ্ঞান, নির্লিপ্ততা, একত্ব, বিস্ময় ও আত্মবিনাশ নামে পরিচিত। প্রথম উপত্যকার নাম সন্ধান। এখানে সঠিক পথ নির্বাচন করার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়, জড় জগতের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হয়। অনেক পাখী জড় জগতের মোহ ত্যাগ করতে না পেরে এবং নিয়ম মেনে চলতে না পেরে 'সন্ধান' নামক প্রথম উপত্যকায় বাদ পড়ে যায়। যারা সক্ষম তারাই প্রেম নামক দ্বিতীয় উপত্যকায় যেতে পারে। প্রথম উপত্যকা অপেক্ষা দ্বিতীয় উপত্যকা আরও কঠিন উপত্যকা। কারণ এখানে প্রেমিকের ধৈর্য, সহনশীলতা, দারিদ্র্য, বিশ্বাস ইত্যাদির অগ্নিপরীক্ষা হয়। বুদ্ধি এখানে কোন সাহায্য করতে পারে না, প্রেম বুদ্ধির অতীত এবং প্রেম কোন ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলে না। অন্য কথায় যেখানে প্রেম আছে সেখানে প্রজ্ঞা থাকে না। এই উপত্যকায় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করে, অনেকে সম্মুখে যেতে অস্বীকার করে। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তিই প্রেমিকার সন্ধানেস সম্মুখের

দিকে অগ্রসর হয়। প্রেম ভক্তি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এবং প্রেমিককে জ্ঞান নামক তৃতীয় উপত্যকায় নিয়ে যায়। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতামূলক অথবা প্রজ্ঞামূলক জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান প্রেমিকের প্রতি প্রেমাস্পদের দান, আদি অন্তহীন ঐশী আলোক, এই জ্ঞানের মধ্যে হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আত্মা পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ করে, প্রেমিক পরম প্রেমাস্পদের বর্ণনাতীত অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে বেহুশ হয়ে পড়ে, আর যে-আত্মা যে-পরিমাণে উন্নত সে তেমন মাত্রায় এই আলোক দর্শন করে, তার দেহের অণুপরমাণুতে এই আলোকের ঐশীচ্ছটা অনুপ্রবেশ করে। তবে সকলে এই আলোকের জ্যোতিঃ বহনের ক্ষমতা লাভ করতে পারে না এবং সম্মুখের পানে আর অগ্রসর হতে পারে না। সক্ষম জনই 'নির্লিপ্ততা' নামক চতুর্থ স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এই স্তরে উন্নীত হলে পথিক সকল দৈহিক প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব, লোভ, মোহ ইত্যাদি হতে মুক্ত হয়। মোট কথা, নর-দেহের সকল প্রয়োজন হতে স্বাধীন হয় এবং সুখ ও দুঃখ সমানরূপে দেখা দেয়। এই স্তরে পার্থিব জগতের সকল প্রকার আকর্ষণ হতে মুক্ত হয়ে পথিক একত্বের পঞ্চম স্তরে উন্নীত হয় এবং সকল বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে পরম ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে। পরিমাণ ও গুণ, সাদা ও কালো, উঁচু ও নীচু, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সকল বহুত্ব একত্বের মধ্যে মিশে যায়। একত্বের পঞ্চম স্তর অতিক্রম করে পথিক 'বিস্ময়' নামক ষষ্ঠ উপত্যকায় পৌঁছায় এবং 'আমি' 'তুমি' 'এক' ও 'বহু' ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারে না। পথিক বা পথিকেরা নিজেরা বেঁচে আছে একথা জানে না, তাদের প্রেমিকাকে তারা চিনে না, কেন তারা ভালবাসে সে কথা জানে না কেন তারা এ পথ অবলম্বন করে তাও তারা বোঝে না, তাদের ধর্ম কি সে কথার উত্তর তাদের কাছে পাওয়া যায় না। তাদের আত্মা ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত এবং আলোকের জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ, কিন্তু পার্থিব সকল আশা-আকাঙ্ক্ষামুক্ত। তারপর সপ্তম স্তর 'আত্ম বিলোপনের 'উপত্যকায়' উপস্থিত হয়ে সকল আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলে কালা, বোবা, নির্বাক, নিঃসাড় হয়, প্রেমিক ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদে 'ফানা' হয়ে যায়। এই অবস্থায় নরদেহের স্বাভাবিক গুণাবলী উধাও হয়ে সেখানে একমাত্র অমর গুণাবলী ফুটে উঠে। প্রেমিক প্রেমাস্পদ এক ও অভিন্ন হয়। যাত্রার শেষে সপ্তম উপত্যকায় মাত্র

ত্রিশটি পাখী যেতে সক্ষম হয় এবং সম্মুখে লক্ষ্য করে একমাত্র সী-মোরগকে দেখতে পায়। এই স্তর 'ফানা-ফিল্লাহ্'র স্তর। নিষ্কাম জগতে সী-মোরগকে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত অবস্থায় দেখতে পায়। এই দৃশ্য অবলোকন করে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা যে পাখীর দিকে তাকায় তাকেই সী-মোরগরূপে দেখতে পায়। দ্রষ্টা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখে সে নিজেও একটা সী-মোরগ। প্রত্যেক পাখী বিস্ময়ে চিন্তা করে প্রকৃত সী-মোরগ কে, এখানে দ্রষ্টা ও দৃষ্টি, আগত পাখী ও সী-মোরগ আমিত্ব ও তুমিত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। পাখীর দল রহস্যভেদে অসমর্থ হলে ভাষাহীন এক ঐশী বাণী শুনতে পায়—হে সত্যান্বেষী পথিক, তোমরা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখছ, আমি দর্পণ, সত্য সী-মোরগ তোমাদের অন্তরে। দৃষ্টিভ্রমে তোমরা 'এক'কে 'বহু' রূপে দেখছ। পরম সত্য এক।

সপ্তম স্তরে বা আত্মবিনাশের স্তরে হাজার হাজার পাখীর মধ্যে কেবলমাত্র ত্রিশটি পাখী বাদশাহ্ সী-মোরগের দয়ালাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বাদশাহ্‌র সন্দর্শন লাভ করে। ত্রিশটি পাখীই বিরাট বাদশাহ্ পাখী সী-মোরগে পরিণত হয়। তারপর তারা লক্ষ্য করে দেখে যে তারা আর ত্রিশ নয় মাত্র একটি—একমাত্র সী-মোরগ। ঐশী বাণীতে তারা শুনতে পায় যে "আমি দর্পণ। আমার মধ্য দিয়ে যে দেখে সে নিজেকেই দেখে। তুমি তোমাকে সী-মোরগ রূপে দেখ কিন্তু আমি সী-মোরগের অন্তর্নিহিত সারসত্তা। যদি তুমি আমার মধ্যে আত্মবিলোপ সাধন কর, তুমি আমারই মাঝে বাস কর। পরম সূর্যের আলোকে ছায়া উধাও হয়ে যায়।" তারপর তারা নিজেদেরকে সী-মোরগ হতে স্বতন্ত্র দেখতে পায় এবং অস্তিত্ব আমিত্ব ও তুমিত্বের সকল সমস্যার সমাধান হয়।

এই রূপক মিশ্রিত গল্পের সাতটি উপত্যকা লক্ষ্য করে জালালউদ্দীন রুমী বলেন, "আত্তার সাধনার সাতটি রাজ্য ভ্রমণ করেছেন। আর আমি এখনও আঁধারের গলিতে ঘুরে মরছি।"

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আত্তার নিজেকে সম্বোধন করে বলেন—"আসলে তুমিই সমগ্র জগতের প্রাণ, তুমিই উভয় জগতে। তোমার আত্মাই 'লাওহে মাহফুজ' যেখানে আল্লাহ্‌র বাণী লেখা থাকে। তুমি যা চাও, তা তুমি তোমার আত্মা হতেই পাবে। আসলে তুমিই পবিত্র কোরআন। তুমি নিজে নিজের মধ্যে নিজ প্রকাশ ভংগী লক্ষ্য কর। তুমিই পরম সত্তার প্রতিরূপ ও বস্তুর আসল স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞাতা।"

আত্তারের মতে প্রেম বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করে, পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন ঘটায়।

আত্তারের যুগে শরীয়তপন্থী মৌলানা তাঁকে ও তাঁর রচনাকে সম্যকরূপে বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনেন। তার ফলে তাঁর সবকিছু লুণ্ঠিত হয়, গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়, তিনি নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রতিভা স্বদেশে অনাদৃত ছিল। তাঁর দেহত্যাগের অর্ধশতাব্দী পর হতে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁর ও তাঁর রচনার মর্যাদা বুঝতে আরম্ভ করেন। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক জালালউদ্দীন রুমীকে আত্তারের ললিত ভাষায় সানায়ীর তত্ত্বজ্ঞান মিশ্রিত করে সূফী-কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। আর তারই ফলে রচিত হয় বিশ্ববিশ্রুত 'মসনবী' বা ফার্সী ভাষার কোরআন। রুমীর মসনবীতে পরমাত্মার আকুল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। মসনবীর মর্মকথা প্রেম আর বিরহ। মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যকার শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এই ক্ষেত্রে তিনি আত্তার ও সানায়ীর ভাবধারা অনুসরণ করেন এবং তাঁর মসনবীতে উভয়ের চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। রুমী বলেন, "আত্তার সূফী শিক্ষার প্রাণ ও সানায়ী তাঁর দুটি চোখ, আমি তাঁদের অনুসরণ করেছি মাত্র।"

গজনবীর আবুল মজদ মজদুদ বিন আদম সানায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর যৌবনের প্রথম ভাগে গজনবীর রাজদরবারে যোগদান করেন এবং অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেন। কিছুদিন পর তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হন এবং খোরাসান প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণকালে অনেক দরবেশ ও সূফীর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তাঁদের সান্নিধ্য, আলাপ-আলোচনা ও উপদেশের ফলে তাঁর মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। সূফীদের প্রভাব তাঁর উপর এত বেশী পড়েছিল যে তিনি নির্জনে বসবাস শুরু করেন এবং অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন যার ফলে শেষ জীবনে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সূফী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'হাদিকাতুল হকিকত', 'দীওয়ান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'হাদিকাতুল হকিকত' একটি মসনবী কাব্য। এই কাব্যখানি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ও ১০ হাজার বয়াত-এর সমষ্টি। এর মধ্যে সুফীতত্ত্ব গল্প ও উপদেশের মধ্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ব নবী ও আউলিয়াদের প্রশংসা বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ ও আধ্যাত্মিক রহস্যের প্রতি প্রেরণা ও আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা আছে।

ই. জি. ব্রাউন-এর মতে 'হাদিকাতুল হকিকত' একটি নিরস কবিতা যদিও আমরা দেখতে পাই যে এর মধ্যে অনেক সুফীতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবি ও দার্শনিক রুমী তাঁর বিখ্যাত মসনবীতে সানায়ী সম্বন্ধে লিখেছেন যে 'আমাদের লেখনী হতে প্রেমোন্মাদনা প্রকাশ পায়নি, গজনীর মহান পুরুষ (অর্থাৎ সানায়ী) এর লেখনীতে সেইরূপ সার্থক হয়েছে। হাকিম সানায়ী বলেন: এক নির্বোধ একটি উটকে মাঠে চরতে দেখে বলে: "তোমার আকৃতি বাঁকা কেন?" উট উত্তর দেয়, "আমার এই বাহ্যিক আকৃতিতে স্রষ্টার দোষ দেখছ, সাবধান। আমার বাঁকা দেহের প্রতি কটূক্তি করো না। তুমি আমার নিকটে সোজা পথ চলার উপায় জানতে চেষ্টা কর।" সানায়ীর কথার অর্থ এই যে বাহ্যিক আকৃতি, চাল চলন ও ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করে (কারণ সকলই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি) সোজা পথে চলে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা উচিত। আর এর জন্য সৎকার্য অপরিহার্য। অন্যত্র সানায়ী বলেন, "রাতদিন আলাপ আলোচনাতেই মেতে আছ কিন্তু এর অনর্থকতা বুঝতে পারছ না। ভাল মন্দ আলোচনা নিয়ে বেশী ব্যস্ত না থেকে যা শুনছ তা কর্মে পরিণত করো। কার্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তোমার এই জ্ঞান, তোমার শরীর বা নীচু প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করার জন্য তোমার এই জ্ঞানরূপ অস্ত্র। কর্ম-মিশ্রিত জ্ঞানই ফলদায়ক, কর্মহীন হলে জ্ঞান বন্ধনের কারণ হয়।"

'হাদিকাতুল হকিকত'-এর তুলনায় তাঁর 'দীওয়ান' সরস ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এবং এর মধ্যে বর্তমানে প্রায় বারো হাজার বয়াত আছে। কিন্তু কথিত আছে যে, এর মধ্যে প্রথমে প্রায় ত্রিশ হাজার বয়াত ছিল। এই দীওয়ানের মধ্যে বিভিন্ন রকম জ্ঞানগর্ভ কবিতা রয়েছে। তবে দীওয়ানের সুফীতত্ত্ব আলোচনা হতে যথার্থভাবে সানায়ীকে জালালউদ্দীন রুমীর ভাষায় বলা যায় যে

সানায়ী সুফীতত্ত্বের দুই চক্ষু। তিনি অনেক আরব কবি ও ফার্সী কবির প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন এবং এই সকল কবিতার মধ্যে তাঁর নিজস্ব সুফীতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন 'আমার বিমোহন ভাব ফারুকীর ভাষায় প্রকাশ করব এবং তাঁর 'বুল ফতুহ' কবিতার উপর প্রেম নৃত্য করবে।" 'হে প্রভু, সানায়ীকে তোমার জ্ঞানের আলো এমনভাবে দান কর যেন ইবনে সিনা পর্যন্ত হিংসা করে।" "যদিও আমার প্রকৃতি শক্ত ইস্পাতের তৈরী, আমি ভালবাসার আগুনে নরম হয়ে গিয়েছি। যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব, ভালবাসার দাস হয়ে থাকব। যদিও আমাদের প্রকৃতি হতে আমি সকল সময় মুক্ত, আমি এটা ভাল ওটা মন্দ এমন বিচার হতে মুক্ত, খোদা এ অনুগ্রহ আমাকে দান করেছেন। যে অবস্থা ও বিপর্যয়ই আমার সামনে আসুক না কেন খোদা আমার স্মৃতি পথে সকল অবস্থায় সচেতন আছেন। আমি কারো কাছে ভাল কি সুখ কামনা করি না এবং সেই জন্য আমি অন্যান্য জীব হতে ভিন্ন।"

মোটকথা, সানায়ীর রচনা সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে নানা প্রকার গল্পের সাহায্যে সুফীতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক নীতিমূলক উপদেশও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন গল্প ও রূপকের বর্ণনা স্থান পেয়েছে তবুও এর মধ্য হতে সুচিন্তিত ভাবধারায় অপূর্ব রস ব্যঞ্জনার সাথে খোদা প্রেমের উৎকর্ষ ও বিকাশধারা দার্শনিক তত্ত্ব ও সাথে সাথে নৈতিক কর্তব্যের আচরণ বিষয়ক বর্ণনাও আহরণ করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সানায়ীর প্রভাব রুমীর উপর অসাধারণ।

আত্তার ও সানায়ীর পর পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি, সুফী ও দার্শনিক জালালউদ্দীন রুমীর (১২০৭—১২৭৩ খ্রীস্টাব্দ) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি তাঁর মসনবী কাব্যের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দীওয়ান-ই-শামস তাবরীজ' ও 'রুবাইয়াত' সুপ্রসিদ্ধ। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী হতে শুরু করে ইসলামী জগতে যে সকল সুফী সাধক দার্শনিক সুফীমতবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার বা গ্রন্থাদি রচনা করেন, তিনি তাঁদের ভাবধারা গ্রহণ করে তার উপর বুদ্ধি, সৃজনশীল কল্পনা ও সুগভীর আবেগ প্রয়োগ করে সুফীমতবাদ ও দর্শনের নবরূপ দান করেন। তাঁর মুক্তবুদ্ধির চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার ব্যবহার মুসলিম চিন্তাবিদদের চিন্তার ক্ষেত্রে পুরোপুরি যুক্তিবাদী না হলেও

অনেকখানি গোঁড়ামীশূন্য হতে সাহায্য করেছে। তাঁর সার্বজনীন প্রেমনীতি একদিকে দর্শনের মূলকথা প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

এই যুগের পারস্যের সিরাজ নগরের শেখ মোসলেহউদ্দীন সাদী ওরফে কবি হাফিজ শেখ সাদী (১১৭৫—১২৯৫ খ্রীস্টাব্দ), শামসুউদ্দীন হাফিজ ওরফে কবি হাফিজ (আনুমানিক ১৩১৫—১৩৯১ খ্রীস্টাব্দ), খোরাসান প্রদেশের খারদাদ' গ্রামের প্রসিদ্ধ জাম-এর কবি নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামী ওরফে মোল্লা জামী (১৪১৪—১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ) প্রমুখ সূফী-দার্শনিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাদউদ্দীন মাহমুদ শাবিস্তারী তাবরিজী একজন বিখ্যাত সূফী লেখক। তাঁর 'গুলশান ই-রাজ' বা 'আধ্যাত্মিক গোলাপ বাগান' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত। ইবনে আল-জীলীও (১৩৬৫—১৪০৬ খ্রীস্টাব্দ) একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।

এই বিখ্যাত সূফীদের মতবাদের মূলধারা অবলম্বন করে সূফী মতবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়।

সূফীবাদের মূলতত্ত্ব আল্লাহ্র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। অবশ্য এই তত্ত্বের বীজ কোরআনেই নিহিত। অধিকাংশ সূফীই কোরআনের মতকে তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে কোরআনের দুই অর্থ আছে—এক জাহির বা ব্যক্ত অর্থ বা আক্ষরিক অর্থ। এটা সাধারণের জন্য। অপরটি 'বাতিন' বা গুপ্ত অর্থ। এটা সূফী সাধক বা প্রকৃত অধিকারীদের বা বেলায়েত লাভকারীদের জন্য। সূফীরা এই 'বাতিন'-এর নির্দেশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্র একত্ব ও সর্বময়ত্বের ধারণা কোরআনে প্রচুর। এর মধ্যে সূফীবাদের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের বীজ নিহিত। সূফীতত্ত্বে আল্লাহ্ অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিময়। এগুলোই তাঁর একমাত্র স্বরূপ নয়। তাঁর বিশের রূপ আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়, প্রেমময়। আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। সুতরাং আনন্দস্বরূপ আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রেমস্বরূপ। এই প্রেমস্বরূপতাই তাঁর মূল স্বরূপ। এই স্বরূপই সূফীদের কাছে প্রকটিত। এই সৃষ্টির মূলে প্রেমের প্রেরণা, মানবের সাথে আল্লাহ্র সম্বন্ধ প্রেমের এবং সাধনার পথও এই প্রেম মিলনের পথ। সূফী আল্লাহ্র প্রেমলাভের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সকলকে ভালবেসে, সকলকে আপনার করে তবেই সে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেম

লাভ করে। সূফীমতবাদ এক অভিনব ঐশী প্রেমের দর্শন উপস্থাপিত করে। ইবনুল আরাবী ও রুমীর দর্শনে তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকাংশ সূফীর মতে আল্লাহ্ বিশ্বলীন ও বিশ্ব বহির্ভূত দুই-ই। আল্লাহ্ বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই বিশ্ব আল্লাহ্-সত্তাময়। আল্লাহ্ ও জগতে কোন ভেদ নাই। সমগ্র জগৎ আল্লাহ্ এবং সমগ্র আল্লাহ্ জগৎ। এই মতবাদকে পাশ্চাত্য দর্শনে সর্বেশ্বরবাদ বা 'প্যানথেইজম' বলে। কিন্তু সূফী মতবাদ ঠিক সর্বেশ্বরবাদ নয়। আল্লাহ্ জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তারূপে এবং জগৎ আল্লাহ্র সত্তার মাঝে ধারণারূপে অবস্থিত এবং সমগ্র জগতে আল্লাহ্ বটে, কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্ জগৎ নয়। আল্লাহ্ জগতের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত বটে। তাই সাধারণ ভাবে সূফীবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বা 'প্যানথেইজম' বলা হয়। ইবনুল আরাবীর দর্শনকে ইসলামী সর্বেশ্বরবাদ বলা হলেও সেখানে অতিবর্তী খোদাবাদের ধারণাও দেখা যায়। রুমীর মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ না বলে সর্বধরেশ্বরবাদী মতবাদ বলা হয়। তাঁর মতে আল্লাহ সৃষ্টিতে লীন, না সৃষ্টির বহির্ভূত, কি এই দুইটির মধ্যাবস্থা এসব কিছুই নয়। এসব বিষয় বুদ্ধি, বিচার ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। এসব দিয়ে আল্লাহ্র পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না। ইবনুল আরাবীর দর্শনে জ্ঞানের পথের কথা বলা হলেও পরে জ্ঞানের পথ ত্যাগ করে প্রেমের পথই অবলম্বন করা হয়েছে। রুমীও বলেছেন যে, প্রেমের দ্বারাই আল্লাহ্র সাক্ষাৎ মিলন বা উপলব্ধি সম্ভব হয়। সূফীবাদ মূলতঃ একান্তভাবে ঐশী প্রেমের মতবাদ, হৃদয়াবেগমূলক মতবাদ। ইবনুল আরাবী ও রুমীর বিশ্বপ্রেম সকলের কাছে পরিচিত। সূফী মতবাদের মধ্যে কোন জ্ঞান, যুক্তি, তর্কের প্রকৃত স্থান নেই। শেষ যুগের রুমী, সাদী, জামী, 'হাফিজ প্রমুখ সূফী দার্শনিকগণ তাঁদের কাব্যে এই অভিনব প্রেমের মতবাদ প্রচার করেছেন।

মানবকে সূফী মতবাদে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানব এবং মানবের চরমোৎকর্ষ পূর্ণ মানব। পূর্ণ মানব মানবদেহে আল্লাহ্। তাঁর মধ্যেই আল্লাহ্র পূর্ণ অভিব্যক্তি। আল্লাহ্ কেমন করে নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং মানুষের সাথে তার কি সম্বন্ধ, ইবনুল আরাবী তা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুসুস উল হিকাম'-এর প্রথম অধ্যায় 'আদমের জ্ঞান' নামক শিরোনামায় ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রত্যেক মানবের পরিপূর্ণতা রয়েছে। মানুষ সাধনার দ্বারা, আত্মোপলব্ধির

দ্বারা স্বীয় পূর্ণস্বরূপকে বিকশিত করতে পারে। যিনি সাধনায় যে পরিমাণ সিদ্ধকাম, তিনি সেই পরিমাণ সিদ্ধ পুরুষ বা পূর্ণমানব। ইবনুল আরাবী, রুমী ও অন্যান্য সূফী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমানব বলে স্বীকার করেছেন। পূর্ণমানব সাধারণ মানব ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মিলন সেতু। তিনি সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক। তিনি প্রকৃত সিদ্ধ-তাপস, সিদ্ধ মুরশীদ। ওলী, সাধু ধর্ম প্রবর্তকগণও পূর্ণমানব কারণ তাঁরা প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। কোন কোন সূফী যারা ইসলাম ধর্মের সাথে সূফী মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করতে চান, তাঁরা ধর্মপ্রবর্তক, নবী, রসূল বা পয়গম্বর এবং ওলী বা সাধু ও পীরগণের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁরা বলেন, নবীগণের মধ্যে হযরত মুহাম্মদই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর পরে সাক্ষাৎ আল্লাহ্‌ হতে বাণী লাভ করেন নাই। সুতরাং পরবর্তী সকলেই ধর্ম-প্রচারক মাত্র, ধর্মপ্রবর্তক নয়। একমাত্র ধর্মপ্রবর্তকই আল্লাহ্‌র নবী, ওলী বা সাধু নয়। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পূর্ণ মানব হতেও উচ্চ—তিনি দিব্য মানব, অন্যান্য পূর্ণমানব, সাধু বা ওলী মুহাম্মদের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু কোন কোন সূফী লেখক বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ সাধনার দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাক্ষাৎ বাণী লাভ করতে পারেন। ইবনুল আরাবীর মতে ধর্মপ্রচারকগণ অপেক্ষা ওলী বা সাধুগণ শ্রেষ্ঠ। ধর্মপ্রচারকগণ কোন ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হন, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান অনুসারে ঐশী বিষয়গুলো লোককে জ্ঞাত করান, কিন্তু ওলী বা সাধু আল্লাহ্‌র কাছে বাস করেন। তাঁদের বাণী চিরন্তন, ধর্মপ্রচারক যদি সাধু হন, তবেই তিনি ঐশ্বরিক জ্ঞান বা ঐশী জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন। রুমী ধর্মপ্রবর্তক ও ওলী বা সাধুর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। যিনি সাধনার দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে একত্ব অনুভব করেন এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী লাভ করেন, তিনি সাধুও হতে পারেন, ধর্ম প্রবর্তকও হতে পারেন। উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, মূলে তাঁরা এক।

যে অর্থে 'অবতার' শব্দটি পাশ্চাত্য দর্শনে ও হিন্দু ধর্মে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মানব দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, অধিকাংশ সূফী সেইরূপ অবতারে বিশ্বাস করেন না, যদিও তাদের রচনার মধ্যে 'অবতার' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অবতারবাদে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে একটা প্রভেদ সূচিত হয়। অবতার অর্থে আল্লাহ্‌ মানুষরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সূফীদের

মতে বিশেষ এক অবস্থায় মানুষই স্বয়ং আল্লাহ্। হাল্লাজ মনসুরের 'আনাল হক' মানুষ অবতার মাত্র নয়। মানুষ সাধনার দ্বারা ঐশী সত্তার সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে, তখন মানবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত বা পরিবর্তিত হয়। তবে মূল দুইটি সত্তার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। সূফীরা সাধনার সময়ে সাধু, মুরশীদ, পীর, ধর্মপ্রবর্তকগণকে আল্লাহ্ হতে অভিন্ন বা এক অর্থে তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত বা তাঁরই প্রতিমূর্তি বা অবতার স্বরূপ বলে মনে করেন। ইবনুল আরাবী ও রুমীর মধ্যেও অনেক সময় প্রায় একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সূফী সাধনার লক্ষ্য মানব সত্তার বিলয় বা ধ্বংস এবং পরম সত্তায় অবস্থিত মানব সত্তার বিলয়কে 'ফানা' এবং পরম সত্তার অবস্থিতিকে 'বাকা' বা 'স্থিতি' বলা হয়।

হুজভিরী, আল গাজ্জালী প্রমুখ সূফী লেখকগণ যাঁরা ইসলাম ধর্মের সাথে সূফী মতবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন, তাঁরা বলেন যে, 'ফানা'র অর্থ আমিত্ব, অহংকার, সাংসারিক কামনা বাসনা ত্যাগ, এবং 'বাকার' অর্থ আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর আজ্ঞাধীনে দাসরূপে অবস্থান। মানব ও আল্লাহ্ চিরকালই স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ভিন্ন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সূফী-দার্শনিক ইবনুল আরাবীর মতে আল্লাহ্ ও মানব অভিন্ন এবং মানব আল্লাহ্র গুণে পরিণত হয়। সূফী-দার্শনিক জীলীও একই মতে বিশ্বাসী। জীলী মানব বা সৃষ্ট জগতের সাথে আল্লাহ্র সম্বন্ধ বরফ ও পানির সম্বন্ধের অনুরূপ বলে মনে করেন। আল্লাহ্ পানি, জগত বরফ—এই দুই রূপে ভিন্ন। যেমন পানি বরফের উপাদান কারণ, সেইরূপ আল্লাহ্ জগতের উপাদান কারণ। অবশ্য জীলীর মতে মানবই আল্লাহ্ এবং জগৎ, মানব প্রকৃতি আল্লাহ্র বাহ্যরূপ—দর্পণস্বরূপ। জীলীর মতে আল্লাহ্ ও বিশ্ব অভিন্ন হলেও বিশ্ব সত্য মায়া মাত্র নয়। 'গুলশান-ই রাজ' নামক বিখ্যাত সূফী গ্রন্থের লেখক শাবিস্তারীর মত এই যে পরম সত্তা অ-সত্তায় প্রতিবিম্বিত হয়ে বিশ্বরূপে প্রতিভাত হয়। দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ; মানবের ব্যক্তিত্ব মরীচিকা মাত্র, আল্লাহ্ই একমাত্র সত্য। ইবনুল আরাবী, জীলী, শাবিস্তারী প্রমুখের মতবাদে দেখা যায় আল্লাহ্ ও মানব গুণতঃ ও স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং তাঁদের মতে 'ফানার' অর্থ মানবোচিত গুণের ধ্বংস এবং 'বাকা'র অর্থ আল্লাহ্র স্বরূপে ও গুণে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি। রুমীর মতে আল্লাহ্ ও মানব গুণতঃ অভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ ভিন্ন। আল্লাহ্ ক্রমান্বয়ে

মানবরূপ স্বীয় সত্তা অভিব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে 'ফানা'র অর্থ মানবীয় গুণের ধ্বংস এবং 'বাকা'র অর্থ স্বতন্ত্র স্বরূপ বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট হয়েই আল্লাহ্‌র স্বরূপে অবস্থিতি। এই অবস্থা বুঝানোর জন্য রুমী অংশ ও অংশীর, দীপশিখা ও সূর্যের, অগ্নি ও লৌহের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন।

রুমীর মসনবী পাঠে বোঝা যায় যে সাধু বা পূর্ণ মানব (ইনসানুল কামেল) আল্লাহ্ হতে স্বরূপতঃ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। তাঁর কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি সাধনায় দুই প্রকার উপলব্ধির ইংগিত দিয়েছেন। প্রথমতঃ সাধক উপলব্ধি করেন যে, মানবীয় গুণাবলী ধ্বংস হয়েছে, 'নাসুত' অংশের বিলোপ সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ 'তিনি' আল্লাহ্‌র গুণাবলী লাভ করেছেন, সমগ্র জগৎ এবং সমগ্র প্রাণী 'তিনি' ছাড়া আর কিছুই নয়, 'তিনি' ও জগৎ এক। ইবনুল আরাবী ও রুমীর মতে সাধক জগতের সাথে ভেদ ও একত্ব উভয়ই উপলব্ধি করেন। রুমী বলেছেন, "দেখ আমার নিজের স্বরূপ আমি জানি না, আমি কি করব? আমি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী নই, ইসলাম ধর্মাবলম্বীও নই, আমি নাস্তিকও নই, ইহুদীও নই। পূর্ব পশ্চিম জল-স্থল কোন স্থানেরই অধিবাসী আমি নই। ফেরেস্তা অথবা অপদেবতা কারও সাথে আমার আত্মীয়তা নাই। আগুন বা ফেনা কিছু হতেই আমি উৎপন্ন নই, ধুলা বা শিশির কিছুর দ্বারাই আমি গঠিত নই, আমি সুদূর চীন, সাকসিন, বুলগার, পঞ্চনদী সমন্বিত ভারত, ইরাক বা খোরাসান কোন স্থানেই জন্মগ্রহণ করি নাই, আমি ইহলোক বা পরলোকে, বেহেস্তে বা দোজখে কোন স্থানেই বাস করি না। আমি ইডেন উদ্যান ও বেহেস্ত হতে পতিত হই নাই, আমি আদমেরও বংশধর নই। সকল স্থানের ঊর্ধ্বে চিহ্নিত ও উদ্দেশ্যবিহীন দেশে, দেহ ও আত্মাকে অতিক্রম করে আমি আমার বন্ধুর বুকে চিরনবীন বেশে বাস করি।"[১] একই প্রকার ভাব তিনি আরও কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন, "পৃথিবীতে প্রেমিক যদি কেউ থাকে সে আমি। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, সাধু যদি কেউ থাকে, তবে সে আমি। সাকী বা মদ্য-পানপাত্র-বাহক, গায়ক, বীণা, দীপ, প্রিয়া, মদ্য, আনন্দ, সবই আমি—মৃত্তিকা, বায়ু, জল, অগ্নি দেহ, আত্মা সকলই আমি।—আমি চোরের চৌর্য, রোগীর রোগ"—ইত্যাদি। ঐশী সত্তায় এই

১. দিওয়ানে শামস তাবরীজ, কবিতা সংখ্যা—৩১; এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ইরানের কবি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৩২৭।

মহাস্নপান্তরের বা মহাপ্রেম মিলনের অনুভূতি তিনি আর একটি কবিতায় অতি চমৎকাররূপে প্রকাশ করেছেন। "কী আনন্দ সেই মুহূর্তগুলো, যখন তুমি আর আমি বসি এই প্রাসাদে। দুইটি আকৃতি, দুইটি দেহ, কিন্তু আত্মা আমাদের এক। কুঞ্জের রং আর পাখীর কণ্ঠস্বর আসবে নিয়ে চিরঅমরতা আমাদের সেই মিলন মেলায়—যখন আমরা আসব বাগানে। আকাশ হতে তারা আসবে আমাদের দেখতে, আর আমাদের মাঝে তারা দেখবে চাঁদকে। তুমি আর আমি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নই—দু'জনের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছল মিলন হাল্কা কথার গুঞ্জরণ আর উজ্জ্বল কলধ্বনির ঊর্ধ্বে। আকাশে উজ্জ্বল পাখা পাখীর হৃদয়ে জমে উঠবে ঈর্ষার বীজ, আমরা এমনই মধুর হাসির কলতান তুলব সেই প্রাসাদে। কিন্তু সবার চেয়ে বিস্ময় যদিও মিলন আমাদের এই নিভৃত, তবুও ব্যস্ত আমরা একই মুহূর্তে—ইরাকে কি খোরাসানে।"[১]

নবম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে যে সমস্ত সূফী ভাবুক, সাধক ও দার্শনিক সূফী মতবাদ সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার বা গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁদের শেষ পরিণতি জালালউদ্দীন রুমী। রুমীর ভাব কল্পনায় মতবাদ যে রূপ লাভ করে তাই সূফী মতবাদের শেষ পরিণত রূপ বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অবশ্য, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সূফীদের মতবাদ গ্রহণ করে তাঁরই উপর বুদ্ধি সৃজনশীল কল্পনা ও ঘনগূঢ় আবেগ প্রয়োগ করে সূফী মতবাদকে এই নবরূপ দান করেন।

বায়েজিদ, হাল্লাজ, মনসুর এবং বিশেষ করে ইবনুল আরাবীর মতবাদ পাঠ করলে মনে হয় যেন তাঁরা আল্লাহ্ ও মানবের একত্ব প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানব ও আল্লাহ্‌র সর্বাংগীন একাত্মতা সমর্থন করেন নাই। আল্লাহ্‌র সাথে মিলনে মানবের সত্তার বিলোপ হয় না, আল্লাহ্ ও মানবের সত্তার স্বরূপও এক নয়। মানব তাঁর গুণাবলীর চরম পরিণতিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী লাভ করে আল্লাহ্‌ময় হয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে মানবের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ হয় না। আল্লাহ্‌র সাথে মানবের গুণাবলীর সাদৃশ্য আছে কিন্তু স্বরূপের সাদৃশ্য নাই। সকল সর্বেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী, বা একত্ববাদী সূফীই আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের ব্যক্তিগত প্রেমময় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ চিরন্তন প্রেমময়,

---

১. (ক) দীওয়ানে শামস তাবরীজ, কবিতা সংখ্যা ৩৮। (খ) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ইরানের কবি, পৃঃ ৩৪১।

মানবের সাথে তাঁর সম্বন্ধ প্রেম সম্বন্ধ। এই প্রেমেই আল্লাহ্‌র সাথে মানবের সর্ব-বিস্ময়কারী মহামিলন ঘটে। সুতরাং সূফী মতবাদ দার্শনিক যুক্তিমূলক জ্ঞানবাদ নয়। এটা সাক্ষাৎ অনুভূতিমূলক ও ভাবাবেগময় মতবাদ। এর স্থান মস্তিষ্কে নয়, দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক বা বিচারে নয়, এর স্থান হৃদয়ে, অন্তরের অন্তঃস্থলে, গভীর অনুভূতির মধ্যে। তাই এই মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করেছে রুমীর মত দার্শনিকের হাতে তাঁর 'দীওয়ান' ও মসনবীর মধ্যে সূফী মতবাদের যে রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে, তাই সূফী মতবাদের শেষ রূপ বলে বিশ্বাস করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

সমস্ত অস্তিত্বের মূলে একটি সত্য সত্তা আছে। এই মূল সত্য সত্তা শুদ্ধ ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বর, নিরাকার খোদা, অদৃশ্য আল্লাহ্‌ হতে পারেন, কিংবা এই সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত মূল সত্তার রূপ বিশেষও হতে পারেন।

সৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট সময় হতে আরম্ভ হয়নি। আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি চিরন্তন ও নিত্য বর্তমান। যখন বিশ্বের রূপের পরিবর্তন হয় বা বিলয় হয়, তখনই তা পূর্ণ হয়। মূলতঃ এটা আল্লাহ্‌র সত্তার মতই চিরন্তন। সব সময়েই পূর্ণ সৃষ্টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

আল্লাহ্‌ বিশ্বের সকল বস্তুকে ঘিরে আছেন। এক অর্থে তিনি বিশ্বের মাঝে সীমাবদ্ধ আবার আর এক অর্থে তিনি বিশ্বের বাইরে। বিশ্বের প্রত্যেক রূপের ঊর্ধ্বে ও বাইরে তিনিই একমাত্র সত্য। অর্থাৎ তিনি বিশ্বের অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী সত্তা।

আল্লাহ্‌র স্বরূপ অজ্ঞেয়। কোরআনে নাম ও বিশেষণে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেই নাম ও বিশেষণে তিনি মানুষের কাছে পরিচিত। মানুষের দিক হতে এদের মধ্যে ঐক্য দেখা গেলেও আল্লাহ্‌র গুণ বহু প্রকারের এবং পরস্পর ভিন্নধর্মী ও বিপরীতধর্মী। গুণের এই পার্থক্যই এই দৃশ্যমান জগৎ, এই ছাড়া মানুষ ভাল মন্দের পার্থক্য দেখতে পেত না এবং পরম মঙ্গল কি তা বুঝতে পারত না। আল্লাহ্‌র মধ্যে মন্দ বলে কিছুই নাই। আল্লাহ্‌ গুপ্তধন। নিজেকে জানাবার জন্য তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সমস্ত জ্ঞান এই বিশ্বে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে রূপায়িত। যে ঐশী জ্ঞান সৃষ্টিতে প্রকটিত, তা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান বা আলোক পূর্ব হতেই বর্তমান এবং তা আদম হতে আরম্ভ করে সমস্ত ধর্ম

প্রবর্তকগণের মধ্যেই বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং তাঁদের পর মুসলমান সাধুগণের মধ্যেও এই নূর বা আলোক সঞ্চালিত হয়েছে। সেই আলোকের পরিপূর্ণ প্রকাশ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমানব মুহম্মদের মধ্যে। নবী মুহম্মদের পরবর্তী কালের মুসলমান সাধুগণ মুহম্মদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। ধর্মপ্রবর্তকই হন, আর সাধুই হন, পূর্ণ মানব আল্লাহ্‌র সাথে একত্ব উপলব্ধি করেছেন। এই পূর্ণ মানব ধর্ম প্রবর্তকও হতে পারেন, সাধুও হতে পারেন। তিনি আল্লাহ্‌র পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, পূর্ণ প্রতিরূপ, তিনি সৃষ্টির শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এবং তাঁর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।

ইবনুল আরাবীর জীবনী ও গ্রন্থপরিচয়

ইবনুল আরাবী স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সূফী দার্শনিক। তাঁর পুরা নাম শায়খুল আকবর[১] মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী ওরফে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মোহাম্মদ আল আরাবী ইবনে আহামদ ইবনে আবদুল্লা। অনেক সময় তাঁকে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আলী মহীউদ্দীন আল হাতেমী আল আন্দালুসী ওরফে ইবনে আরাবী[২] বলা হয়। পাশ্চাত্য জগতে তিনি ইবনুল আরাবী এবং স্পেনে ইবনে সুরাকা[৩] নামে পরিচিত। তিনি ২৯শে জুলাই ১১৬৫ খ্রীস্টাব্দে/৫৬০ হিজরীতে সূফী মতবাদে অনুধ্যান পরায়ণ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৩ খ্রীস্টাব্দে/৬৩৮ হিজরীর ২৮শে রবিউস্সানি জুমারাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদ-দেশে 'আল কিবরিত আল আহমার' নামক স্থানে সমাহিত হয়। এই স্থানটি সূফীদের নিকট অতি পবিত্র। তাঁর পিতা একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি তাঁর পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অসাধারণ মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য সেভীলে গমন করেন এবং আরবী ভাষা, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্, ইলমুল-কালাম, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বহু কবিতা রচনা করে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। সূফী প্রভাবের ফলে বাল্যকাল হতে তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সত্যানুসন্ধানী ও ঐশী জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভের পর হতে তাঁর মনে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রবল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিশোর অবস্থা হতে তাঁর মধ্যে পয়গম্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাঁর কাছে স্বপ্নে 'ইসমে আযম' বা শ্রেষ্ঠ নাম-এর প্রকাশ পায়। ৫৭৯ হিজরীতে তিনি কিউটা

১. (I) R. A. Nicholson: A Literary History of the Arabs, pp 399-404, London, 1907.
(II) Idries Shah: The Sufis, p. 137, Newyork, 1964.

২. Rom Landau: The Philosoply of Ibn Arabi, p. 15, London, 1959.
(II) Seyedur Rahman: An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, p. 183, 3rd edn. Dacca, 1963.

৩. S. A. Q. Husaini: Ibu al Arabi, p. 1, Madras, 1931.

গমন করেন এবং সেখানে অবস্থান কালে একটি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নে তিনি সকল নক্ষত্র ও চন্দ্রকে বিয়ে করেন। একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গণক ব্যক্তি তাঁর এই স্বপ্নের কথা শুনে বলেন যে স্বপ্নদ্রষ্টা অসামান্য সৌভাগ্যবান, সকল জ্ঞানের জ্ঞানী ও সর্বশ্রেষ্ঠ অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংসার বিরাগী সূফী-জীবন অবলম্বন করে জন্মভূমি স্পেন ত্যাগ করে হজব্রত পালন ও দেশ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি আর কখনো মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন নি।

স্পেন ত্যাগের পর তিনি মিসরে যান এবং সেখানে এক বছর অবস্থানকালে আপন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর নিষ্কলংক চরিত্র, মধুর সুমার্জিত ব্যবহার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা ও বক্তৃতার ফলে অসংখ্য শিষ্য জোটে। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গোঁড়া আলেম সমাজের ঈর্ষায় পড়েন এবং তৎকালীন শাসকের আদেশে কারাবরণ করেন। কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর তিনি বাগদাদে যান। সেখানকার সত্যানুসন্ধানীরা তাঁর অসীম জ্ঞান-গরিমায় ও সাধনা-মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিন্দাপীর বা জাগ্রত পীর বলে আখ্যায়িত করেন। বাগদাদ হতে তিনি হজ্ব পালনে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে সাত বৎসর জ্ঞান সাধনায় ও রচনায় ব্যস্ত থাকেন। এই সময় তিনি জ্ঞানী মকিনউদ্দীনের অপরূপ সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা 'নিজাম' ওরফে 'আয়নুশ শামস্‌ ওয়াল বাহা'র সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সৌন্দর্য ও গুণের স্তুতিবাদে একটি মনোজ্ঞ সুদীর্ঘ কবিতা 'তারজুমান আল আশায়াক'[১] বা প্রেম উপাখ্যান রচনা করেন। কিন্তু কবিতার শব্দ ও ভাষা নয় প্রেমের প্রতি ইংগিত দেয় বলে আলেম সমাজ এটাকে যৌন প্রেমের অভিব্যক্তি বলে উপহাস করেন। তারপর তাঁর বন্ধু আল-মাসুদ আবু মোহাম্মদ বদর বিন আবদুল্লা আল হাবাশী আল খাদিম এবং ওয়ালাদ আরবার শামসুদ্দীনের অনুরোধে তিনি কবিতাটির সুন্দর মরমী ভাষ্য লিখেন[২] যা শুনে তাঁর সমালোচকদের সমালোচনা বন্ধ হয়।

১২৪১ সালে মক্কা ত্যাগ করে আলেপ্পোয় গমন করেন। তথাকার খ্রীস্টান শাসক তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে বসবাসের জন্য একটি বৃহৎ প্রাসাদ[৩]

১. Tarjuman al Ashwaq : Trans. by R. A. Nicholson, London, 1911.
২. S. A. Q. Hussini, Ibid, p. 22, Rom Landau, Ibid, pp. 91-121.
৩. Ibid, p. 24.

দান করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ দান ও ত্যাগবীর হাতেমতাই[১] -এর মতো তিনি এ প্রাসাদটি একজন ভিক্ষুককে দান করে দেশ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি মসুল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের পর দামেস্কে গমন করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সংকল্প করেন। দামেস্কে অবস্থান কালে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গ্রন্থ রচনা, উপদেশ দান, সাধনায় ও আরাধনায় ব্যস্ত থাকেন। সূফী সাধনায় তিনি এত উন্নত হন যে তাঁর ভক্তেরা তাঁকে 'শায়খুল আকবর' বা শ্রেষ্ঠ শায়খ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুইশত উননব্বই বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর মধ্যে দেড় শত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল ফতুহাতুল মক্কীয়া' বা মক্কার প্রত্যাদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ।[২] এই গ্রন্থখানি বর্তমানে চারটি সুবৃহৎ খণ্ডে ও পাঁচশত ষাটটি অধ্যায়ে[৩] বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ তিনি অলৌকিকভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন[৪] এবং তার মধ্যে ঐশী-বাণী ছাড়া অন্য কিছুই নাই। 'ফতুহাত' রচনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি যদি 'ফতুহাত' রচনা না করতেন তবে তিনি ঐশী অগ্নিতে ভস্মীভূত হতেন। তিনি বলেন যে মক্কায় অবস্থানকালে তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ)-কে ফেরেস্তাগণ, নবীগণ ও আউলিয়াসহ আলমে মাসুরে তখতে উপবিষ্ট দেখেন এবং তাঁর দ্বারা ঐশী রহস্য উদ্ঘাটনের আদেশ প্রাপ্ত হন। এক সময়ে কাবা ঘর প্রদক্ষিণের সময় এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও লাবণ্যপূর্ণ যুবককে তাঁর সাথে কাবা প্রদক্ষিণ করতে দেখেন এবং এই যুবকই তাঁকে দৃশ্যাতীত রহস্যময় চির অনন্ত পরম সত্তা আল্লাহুর আরশ দেখান এবং এই দৃশ্য অবলোকন করে তিনি মূর্ছা যান। মূর্ছা ভংগের পর ঐশী রহস্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের আদেশ তিনি লাভ করেন। মোট কথা তাঁর 'ফতুহাত' ঐশী প্রত্যাদেশের 'ফল'। এই মূল্যবান গ্রন্থে তিনি আল্লাহ্ তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মা তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব, নবী তত্ত্ব, পূর্ণমানব তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, পাপ-পুণ্য, বেহেশত-দোজখ, শাস্তি-পুরস্কারতত্ত্ব, কোরআনের উৎপত্তি তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সূফী ভাবধারায় নিমজ্জিত এই শায়খুল আকবর কোরআনের শব্দের ও নবীর

---

১. Ibid, p. 25.
২. Ibid, p. 31.
৩. Ibid, p. 31.
৪. Ibid, p. 31.

হাদীসের অনেক নতুন ব্যাখ্যা দান করে ইসলামের প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতি-বিমুখ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে অজ্ঞানতার গাঢ় অমানিশা দূর করে দর্শন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ সুগম করেন। মুসলিম মনন শক্তির বিকাশের মূলে গ্রীক প্রভাব বর্তমান। মুসলিম চিন্তাবিদরা পিথাগোরাস, এমপেডোকস, পারমেনেডিস, প্লেটো, এরিস্টটল ও পরবর্তী নব্য প্লেটোবাদী দর্শনের প্রধান দার্শনিক প্লটিনাসের দর্শন হতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ও আল-ফারাবী, আল কিন্দি, ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের মতো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা দর্শন, প্রাকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রীক ও ইসলামের সাফল্যজনক সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। প্রকৃতিবাদের ধর্মসম্মত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর হাতে অতীন্দ্রিয়বাদ ইসলামী-সুফীবাদ হিসাবে উচ্চতম পর্যায়ে রূপায়িত হয়েছে। তিনি যুক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং তর্ক শাস্ত্রের বিধান মেনে চলে প্রত্যেক সমস্যার সব রকম সম্ভাব্য অনুমান চিন্তা করে কোরআনের শব্দ ও বাক্যের বিভিন্ন অর্থ দেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও বৈচিত্র্য অতি ব্যাপক, সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানবতার প্রতি সংবেদনশীল মনের গভীর মমতা, সৃষ্টলোকের ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জন্ম অসীম করুণা এবং নানা ধর্ম ও মতবাদের বিতর্কের ঊর্ধ্বে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন উদার দৃষ্টি। তাঁর মনস্বিতা ও কল্পনার ঐশ্বর্য ছিল যেমন অসাধারণ, শব্দার্থের, প্রকৃত তত্ত্বের মূল্যবোধ, বাক্য ব্যবহারের সময় সংগত যুক্তি শৃঙ্খলার অনুসরণ ছিল অপূর্ব। তিনি ফরিদউদ্দীন আত্তার, সোহরাওয়ার্দী, নিজামউদ্দীন রাজী, জালালউদ্দীন রুমীর মতো প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিকদের সমসাময়িক ও সমমর্যাদা সম্পন্ন সুফীদার্শনিক ছিলেন। তাঁর যুগকে সুফীবাদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ফুসুস-উল-হিকাম'।[১] এই গ্রন্থখানি ২৭টি অধ্যায়ে লিখিত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একজন নবীর নামের শিরোনামায় উল্লেখিত।[২] এই গ্রন্থে সুফীবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩] তাঁর

১. S. A. Q. Husaini, Ibid, p. 33.
২. Ibid, p. 33.
৩. R. A. Nicholson : Studies in Islamic Mysticism, 'Some notes on the Fususul Hikam,' pp. 149—161, Cambridge, Reprinted, 1967.

রচনার পদ্ধতি, ভাষা, উপমা, ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য হওয়ার ফলে অনেকে তাঁর রচনার অর্থ বুঝতে পারেন নি, এবং তাঁর মতো একজন মুক্তবুদ্ধি, গোঁড়ামীশূন্য, উদারমনা, প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের বাহ্যিক অর্থের সমালোচক ইবনে তাইমীয়া, আল-তাফতাযানী ও ইব্রাহিম আল বিকায় প্রমুখ চিন্তাবিদ 'যিন্দিক' বা কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। যাঁরা তাঁর মতবাদ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা তাঁকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী, 'শায়খুল আকবর' বা শ্রেষ্ঠ শায়খুল, 'হাকায়েক' বা সত্যতার সমুদ্র বলে উল্লেখ করেছেন। জামালউদ্দীনের মতে তিনি জ্ঞানীকুলের শিরোমণি এবং আল্লাহ্ তাঁকে সব রকম জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর 'ফুসুস উল হিকাম'-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ[১] :

প্রথম অধ্যায়ের নাম 'আদমের জ্ঞান'। আদম বিশ্ব জগতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। মানুষ হিসাবে আদমের উচ্চ স্থানের কথা বলা হয়েছে। মানুষ সকল ঐশীগুণ সমন্বিত ক্ষুদ্র বিশ্ব এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কারণ, আল্লাহ্র পূর্ণ প্রকাশ, পূর্ণ-মানব, পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্র শক্তি, আল্লাহ্র নাম ও গুণে প্রকাশ, তাঁদের জ্ঞান নাম ও গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্ব জগৎ আত্মসচেতন নয়। বাইরের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, ভিতরের দিক দিয়ে আলোচনা করলে বলতে হয় যে, এটা আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। দৈহিক বহুত্বের জন্য সত্তাকে বহু বলা যায় না। মানবসত্তাও মূলতঃ এক। সব কিছুর মূলে এক।[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'শীস নবীর জ্ঞান'। এখানে আল্লাহ্র সন্দর্শন বা প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।[*] প্রত্যক্ষণ দুই প্রকার, সত্তা-সারের প্রত্যক্ষণ ও নামের প্রত্যক্ষণ। সত্তা-সারের প্রত্যক্ষণ হলো আল্লাহ্র জ্যোতিঃ বা আলোকের প্রত্যক্ষণ এবং সাধকের প্রত্যক্ষণের শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁর নিজের আকারের মাধ্যমে আল্লাহ্-রূপ-দর্পণে সম্ভব হয়। দর্পণের প্রতি লক্ষ্য করলে দর্পণ অদৃশ্য হয় এবং সেখানে নিজের আকার প্রতিফলিত দেখা যায়। 'আপনি আপনাকে জানবেন এই হেতু আল্লাহ্ আপনার দর্পণ হন। এবং তাঁর গুণাবলী

---

১. A. M. A. Shustery : Outlines of Islamic Culture, Second Edition 1954, p. 382.

২. S. A. Q. Husaini, Ilu al Arabi, pp. 53, 51—75, Madras, 1931.

* Ibid. pp. 53—55.

আপন জীবনে প্রকাশ করে আপনি তাঁর দর্পণ হন।' আল্লাহ্‌র নাম অসংখ্য এবং তাঁর নামগুলো সত্তাসার ও তাঁর বিভিন্ন গুণ বা দিকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভের সহায়ক হয়। বাহ্যিক জগতে এক একটি নাম এক একটি স্বতন্ত্র বস্তুকে বুঝায় কিন্তু ঐশী জগতে একই বস্তুকে নির্দেশ করে।

"যে ব্যক্তি নিজেকে জানে সে তার প্রভুকে জানে।" ঐশী জ্ঞানই আল্লাহ্‌র বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান দান করতে পারে যা এই জগতে সম্ভব হয়। এই জগতে যদি এই জ্ঞান লাভ করতে না পারে তবে পরজগতে এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এখানে যে অন্ধ, পরকালেও সে অন্ধ হবে, সঠিক পথ থেকে সে বহু দূরে থাকবে।'

মরমী সাধক বা অতীন্দ্রিয়বাদী সন্দর্শন করেন যে আল্লাহ্ এক। দৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুর অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। এক আল্লাহ্ বহুরূপে প্রকাশিত হয়, যে ব্যক্তি 'বহু'-এর জ্ঞানলাভ করে সে 'এক'-এর জ্ঞান লাভ করে। অদৃশ্য ও অতুলনীয় পরম সত্তা 'বহু' আকারের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। যদিও 'এক' ও 'বহু'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে, তবুও স্রষ্টাই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই স্রষ্টা এবং 'সার্বিক সত্তাসার' হতে বহু 'বিশেষ সত্তাসারের' উৎপত্তি হওয়ার ফলে এমন মনে হয়, বাহ্যিক জগতের বস্তুর 'বহু' আকার এক পরম দর্পণে প্রতিফলিত হয়, অন্যভাবে বললে, বহু-রূপ দর্পণে এক আকারই প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করার ফলে অনেক সময় আশ্চর্য হতে হয়, কিন্তু যারা জ্ঞানবান বা 'সত্তাকে অনুধাবন করতে সক্ষম', তাঁরা আশ্চর্য হয় না।

শীস নবীর জ্ঞানের অধ্যায়ে ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানলাভের কথা বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রার্থনার অর্থ জ্ঞানলাভ করা এবং জ্ঞান লাভের অর্থই আল্লাহ্‌কে সন্দর্শন করা।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'নূহ নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে আল্লাহ্‌কে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী সত্তা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১] অন্তর্ব্যাপীতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে মূর্ত বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে অথবা আল্লাহ্‌র গুণকে আল্লাহ্‌র সত্তা

১. Ibid. p. 55.

হতে ভিন্ন বলা হয়েছে। ইবনুল আরাবীর মতে নূহ নবী আল্লাহ্‌র অতিবর্তীতার সন্ধান জানতেন কিন্তু হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী সত্তা উভয়রূপে উপলব্ধি করেছেন। অতএব মধ্য পথই উত্তম পথ অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী এই দুইটার মাঝামাঝি একটা পথ। আল্লাহ্‌ বিশ্বজগৎ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয় আবার সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়। আল্লাহ্‌ বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবার সকল সম্পর্কের অতীত। বিশ্বজগৎ বাহ্যিক দৃশ্য বা দেহ এবং আল্লাহ্‌ পরম সত্তা বা দেহের প্রাণ। মানুষের দেহ যেমন তার বাহ্যিক দিক এবং আত্মা তার ভিতরের সত্তা তেমনি বিশ্ব যেন একটি বৃহৎ দেহ এবং আল্লাহ্‌ তার আত্মা। স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটি সম্পূর্ণ এক নয়, দুইটির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং প্রভেদের মধ্যে অভিন্নতা এবং অভিন্নতার মধ্যে প্রভেদ আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ইনোক বা 'ইদরিছ নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। সাধনার দ্বারা মানুষ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে। অবশ্য সাধনা দ্বারা মানুষ কখনো আল্লাহ্‌ হয় না বা আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে মিশে যায় না। আল্লাহ্‌ সকল বস্তুর সত্তাসার বা নির্যাস।[১] তাঁর নামের বাহ্যিক প্রকাশই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ও বহুত্ব অভিন্ন কিন্তু সকল বহুত্ব ও বৈচিত্র্য মিলে মূল ঐক্য। আবু সায়িদ খাররাজ বলেন, আল্লাহ্‌কে তাঁর বিপরীত বস্তু দ্বারা জানা যায়, কিন্তু এর অর্থ একত্বের ধ্বংস নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, আদি ও অন্ত। আল্লাহ্‌ বিশ্বরূপ দর্শনের মাধ্যমে নিজেকে দর্শন করেন। বিশ্বজগতের কোন বস্তুর সাথে আল্লাহ্‌র তুলনা করা যায় না। তিনি 'এক' ও বহুর কারণ। যেমন 'এক' এর পুনরাবৃত্তির ফলে বহুর উৎপত্তি হয় তেমনি 'এক' আল্লাহ্‌ হতে 'বহু' উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবিগুলো এক পরম সত্তারই প্রতিচ্ছবি। মানুষ কার্য ও সাধনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্তা ও স্বরূপের দিক দিয়ে পূর্ণ সত্তা।

পঞ্চম অধ্যায় হযরত ইব্রাহিম নবীর দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে। হযরত ইব্রাহিম নবী যেমন অতিথিকে খাদ্য দান করতেন, আল্লাহ্‌ তেমনি সমগ্র বিশ্বজগতকে খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্টি সাধন করেন। আল্লাহ্‌ প্রেমিক ও প্রেমিকা, গুপ্ত ও ব্যক্ত উভয়ই। মানুষ যদি নিজেকে

১. Ibid, pp. 56-57.

জানতে পারে তবে সে তার প্রভুকে জানতে পারে। নিজ আত্মা ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা করলে সে স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। আল্লাহ্ একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা, বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে অবস্থিত এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র গুণাবলী প্রকাশের জন্য মানুষের প্রয়োজন, আবার আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশের জন্য মানুষের কাছে আল্লাহ্র প্রয়োজন। এই ধারণা হযরত ইব্রাহিম নবীর কাহিনী দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। পরকে খাইয়ে যেমন হযরত ইব্রাহিম তাদের প্রতি নিজের ভালবাসা প্রকাশ করতেন তেমনি তারা দান গ্রহণ করে বদান্যতা বা মহানুভবতা প্রকাশ করতো। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্কে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী সত্তারূপে প্রত্যক্ষণ করেন। কোরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ্র দিকে মনোনিয়োগ করি।" (কোরআন ৬:৮০)

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'ইসাক বা ইসাহাক নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে 'আলম-উল-মিছাল' প্রতিরূপের বা ধারণার জগৎ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঘুমের সময়ে মানুষের কল্পনা শক্তি সক্রিয় হয়। অনেক সময় স্বপ্নে 'বাস্তব আকার বা আকৃতি দেখা যায়, অন্য সময় 'অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত আকার' এবং অন্য সময় 'কাল্পনিক আকার' দেখা যায়। বাস্তব আকারকে কোন ভিন্ন অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন হযরত ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি পুত্রকে কোরবানি করছেন। পরদিন তিনি নিজ পুত্রকে কোরবানি করতে উদ্যত হন। মানুষের সৃষ্ট আকার কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টি আকার বাস্তব ও সত্য।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম 'নবী ইসমাইলের জ্ঞান'। এখানে ঐশী নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রত্যেকটি নাম ঐশী সত্তার এক একটি দিক বা রূপ এবং সত্তার মধ্যে এগুলো এক একটি অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ্র নাম দ্বারা যা প্রকাশ পায় না তেমন কিছু বিশ্বজগতে নাই, ভাল ও মন্দ, এমন কি শয়তানও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সকল কিছুই তাঁর মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়ে জাকোব বা 'ইয়াকুব নবীর জ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সকল শ্রেষ্ঠ নবীর প্রচারিত ধর্মকে ইসলাম ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অর্থ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ। সকল নবীই মানুষকে আল্লাহ্র

কাছে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে এবং মানুষ সে-ধর্ম অনুসারে চলে এবং কার্য সম্পাদন করে। ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলার ফলে মানুষ আত্মজ্ঞান, আত্ম-শৃংখলা ও আত্ম-উন্নতি শিক্ষা করে। মানুষ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মকে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করেছে—যেমন সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগী জীবন। পরম সত্তা কর্তৃক হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হওয়াই ধর্মীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। যেমন একজন ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে ও পরিবেশ ও অন্যান্য অবস্থার প্রেক্ষিতে ঔষধ দেয়, তেমনি একজন নবী বা ধর্মীয় শিক্ষক আল্লাহ্‌র আইন-কানুন প্রভৃতি সেই যুগের প্রেক্ষিতে প্রচার ও কার্যকরী করেন।

নবম অধ্যায় 'জোসেফ' বা 'ইউসুফ নবীর জ্ঞান' নামে অভিহিত। এই অধ্যায়ে সার্বিক অস্তিত্বের অবাস্তবতার কথা বলা হয়েছে। জীবন স্বপ্নের মতো এবং স্বপ্নও হাজার হাজার স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন অর্থাৎ অলীক। স্বপ্ন হতে জেগে উঠার পর কোন একটি স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে, কিন্তু এটাও স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। যেমন একদিন ইউসুফ নবী স্বপ্ন দেখেন যে আকাশের নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে সেজদা করেছে, এই স্বপ্নের অর্থ তিনি মিসরের মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত হবেন এবং তাঁর পিতা-মাতা ও সকল ভাই তাঁকে সালাম জানাবেন। শেষ নবী মুহম্মদ (দঃ) এই বিশ্বজগতকে স্বপ্ন, মায়া ও অলীক বলে উল্লেখ করেন। পরম সত্তার সাথে তুলনা করলে এই বিশ্বজগতকে একটি ছায়ার জগৎ, প্রতিফলনের জগৎ বা স্বপ্নের জগৎ বলে মনে হয়। মানুষ যেন স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় আছে, পরজগতে তাদের স্বপ্ন ভেংগে যাবে। 'আয়ান' বা নির্দিষ্ট আদর্শ ধারণা বা কোন জিনিসের মূল সত্তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত অথবা অনস্তিত্বের পূর্ণ অন্ধকার বা গাঢ় অমানিশার মধ্যে অবস্থিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রকাশ, ব্যক্ত ও আলোকিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা শূন্যতারই নামান্তর। কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমার প্রভুর কার্য কি লক্ষ্য কর না, কিভাবে তিনি ছায়াকে বৃদ্ধি করেন; তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে অপরিবর্তনীয় ও স্থির করতে পারতেন; এবং তারপর আমরা সূর্য সৃষ্টি করেছি এর একটি ইংগিত হিসাবে" (কোরআন ২৫:৪৫)। ছায়া কখনো আসল বস্তু নয়, কিন্তু আবার আসল বস্তু হতে ভিন্ন নয়। বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌রই ছায়া বা প্রতিফলন আর সে হিসাবে এটাকে ভিন্ন বলা যায় কিন্তু অন্য দিক হতে লক্ষ্য

করলে এটা ভিন্ন নয় কারণ এটা আল্লাহ্‌রই প্রতিফলন। ছায়া বা প্রতিফলন হিসাবে বিশ্বজগতের কোন স্বতন্ত্র বাস্তবতা বা অস্তিত্ব নাই। জীবন মায়া বা স্বপ্ন।

দশম অধ্যায়ের নাম 'হুদ নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র নামের 'বহুত্ব' ও 'একত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সমস্ত বিশ্বজগৎ এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌রই প্রকাশ। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বা শক্তি হতে সব কিছুর উৎপত্তি হয়। মানুষ পাপ কার্য করে যে অসন্তুষ্টি অর্জন করে তা স্থায়ী নয়। আল্লাহ্‌র দয়ার ফলে সব কিছুই ক্ষমা-লাভ করে তার পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকার অর্থ দোজখ এবং এমন ক্ষেত্রেও মানুষ আল্লার শক্তি বা ক্ষমতার বাইরে নয় এবং সে দিক দিয়ে সে আল্লাহ্‌র নিকটে এবং তাঁর বাণীও লাভ করতে পারে। কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ্ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকের, যে দিকেই তাকাও না কেন আল্লাহ্‌র অবস্থিতি দেখতে পাবে (কোরআন ১১:১১৫)। পাপ কার্য ভুল কার্যের নামান্তর এবং ভুল সংশোধন হয়ে জ্ঞানালোকে না আসা পর্যন্ত পাপী শাস্তি ভোগ করে। যেমন কোন ব্যক্তির অসুখ হলে ঔষধ পত্রের ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করে তেমনি কোন ব্যক্তি পাপ কার্য করলে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পাপমুক্ত হতে পারে। ভাল ও মন্দ সব কিছুকেই জীবনে অতিক্রম করতে হয় এবং মন্দ অতিক্রম করতে সময় লাগে। বিভিন্ন ঐশী নামকে প্রাচীন কালের জাতিরা বিভিন্ন ঈশ্বর বলে মনে করতো, সেগুলোর মধ্যে বাহ্যিক জগতের বস্তু প্রকাশের ক্ষমতা বা শক্তি আছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম 'সালেহ নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে ঐশী একত্বের মধ্যে ত্রিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐশী সত্তার তিনটি রূপ আছে— সত্তা, ইচ্ছা ও আদেশ। নরদেহধারী জীব মানুষের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে— শ্রবণ, আত্মসমর্পণ ও প্রার্থনা। মানুষ ঐশী সত্তার উপর নির্ভরশীল।

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম 'শোয়েব নবীর জ্ঞান'। এখানে বলা হয়েছে যে জ্ঞানীর হৃদয় আল্লাহ্‌র আরশ। এই অবস্থা ঐশী দানের চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক। হৃদয় 'আধারে' আল্লাহ্ 'আধেয়' রূপে বর্তমান থাকায় মানুষ আল্লাহ্‌ময় হয় এবং তার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করা তখন সংগত হয় না। বায়েজিদ বুস্তামী বলেন যে, সুফীর হৃদয় এত বেশী প্রশস্ত হয় যে আল্লাহ্‌র আরশ ও তার নীচে অবস্থিত সকল কিছু হৃদয়ের মাঝে স্থাপন

করলে হৃদয়ের এক কোণায় পড়ে থাকে। যেহেতু ঐশী প্রকাশ অসংখ্য ভাবে হয়, সেহেতু সুফীর হৃদয় বিভিন্ন অবস্থার সংকোচন ও প্রসারণ অবস্থার আকার অনুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এটা যেন একটি আংটি মুক্তা বা মণি ধারণকারী আধারের মতো অর্থাৎ হৃদয় যেন 'আধার' এবং আল্লাহ্ যেন 'মণি'। সুফীর হৃদয় বিস্তার লাভ করে ব্যাপক হয়, সেখানে আল্লাহ্কে আধেয়রূপে ধারণ করার ক্ষমতা হৃদয় লাভ করে এবং ঐশী আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়। যে হৃদয় যেমন উন্নত হয় সে হৃদয় তেমন মাত্রায় ঐশী আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়। ঐশী আলোক দুই প্রকার—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বা ব্যক্ত ও গুপ্ত। আভ্যন্তরীণ আলোককে ফয়েজ-ই আকদাস বলে যা হৃদয়কে ঐশী আলোক গ্রহণ করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলে এবং গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে ঐশী আলোক গ্রহণ করতে সাহায্য করে। তেমন উন্নত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিই প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ও ধ্যানী ব্যক্তি। পরম সত্তাই হৃদয়ের রূপ ধারণ করে ও ব্যাপক হয়। ঐশী প্রতিফলন বা জীবন প্রবাহ অসীম অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক। ফানা বা আত্মবিলোপন একটি প্রতিফলনের পরিবর্তন হয়ে আর একটি প্রতিফলনের আবির্ভাব বা 'বাকা' বা স্থায়ী অবস্থায় উদয়। হৃদয় নিম্ন অবস্থা ও উচ্চ অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা অথবা বাহ্যিক জগত ও আভ্যন্তরীণ জগতের মধ্যবর্তী সত্তা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনামা 'লুত নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে 'হিম্মত' বা ইচ্ছাশক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মানুষের জীবনে তিনটি স্তর আছে—দুর্বলতা, শক্তি ও পুনরায় দুর্বলতা। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের পথে এই তিনটি স্তর গুরুত্বপূর্ণ। অজ্ঞানতা, জ্ঞানলাভ দ্বারা আত্মস্বীকৃতি এবং নিজেকে পরম স্রষ্টার সৃষ্টির নগণ্য জীব হিসাবে জানতে পেয়ে নম্রতা ও ভদ্রতা এই স্তর তিনটি দ্বারা প্রকাশ পায়। তৃতীয় স্তরে মানব ইচ্ছাকে ঐশী ইচ্ছার উপর সমর্পণ করা হয় এবং তাঁর ইচ্ছার মাঝে মানব ইচ্ছা জীবিত থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'পূর্ব ও পশ্চিমের আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নাই, সুতরাং আল্লাহ্কে তোমার অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর। (কোরআন ৮৩:৯)। অন্যত্র হযরত মুহম্মদকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, (বল মুহম্মদ) আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে, আমি তাই অনুসরণ করি (কোরআন ৪৬:৯)। নবীর কাজ আল্লাহ্র বাণীকে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া এবং তাদেরকে

সে-মতে কাজ করতে দেওয়া। যাদের হৃদয় উন্নত হয়েছে এবং ঐশী আলোক গ্রহণ করার স্বাদ লাভ করেছে তারা কোন যুক্তিতর্ক বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে দাবী না করে প্রত্যক্ষভাবে ঐশী জ্ঞান লাভ করে। কোরআনে উল্লেখ আছে, 'আপনি আপনার ইচ্ছা মতো তাদের পরিচালনা করতে পারেন না, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছামতো তাঁদের পরিচালনা করেন (কোরআন ২৮:২৫৬)। মানুষ মূলতঃ দুর্বল, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শক্তি লাভ করে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে এজরা নবীর জ্ঞান শিরোনামায় 'কাজা' বা ঐশী আদেশ এবং 'কদর', বা শক্তি বা নিয়ন্ত্রণকে ব্যাখ্যা করা হইয়েছে। জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—(ক) বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান এবং (খ) স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান বা ঐশী আলোকে হৃদয় আলোকিত হওয়া জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান নৈতিক গুণ অর্জনের মাধ্যমে লাভ হয়। ইবনুল আরাবীর মতে 'কাজা' মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী আল্লাহ্‌র আদেশ এবং 'কদর' ফল লাভ বা বাস্তবায়িত হওয়ার সময়। এজরা নবী পুনরুত্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু পুনরুত্থানের বিষয় যুক্তিতর্কের অতীত। উত্তরে আল্লাহ্ তাকে দেহত্যাগ করান এবং একশত বছর পরে পুনরায় নতুন জীবন দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অর্থ উপলব্ধি করান। ইবনুল আরাবীর এই গল্প অবতারণার মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চান যে অতীন্দ্রিয় সত্তা ও সত্যকে যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে জানা যায় না। সেগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। অনুভূতি বা অনুভব শক্তি আল্লাহ্‌র দান এবং তন্ময় অবস্থায় আল্লাহ্ সূফী ও নবীদের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁরা তাঁর জ্ঞান লাভ করেন। মানুষ লোভ, লালসা, কাম ক্রোধ মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি মুক্ত হয়ে ঐশী আলোক পাবার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মাত্রা অনুসারে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতা লাভের দুইটি স্তর আছে একটি 'ওয়ালীয়াত বা বেলায়েত' অন্যটি 'রিসালাত' অর্থাৎ সাধু অবস্থা ও নবী অবস্থা। বেলায়েত লাভকারী ওলী আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব অবস্থা এবং রিসালাত বা নবী হওয়া অবস্থা। প্রত্যেক নবীই এক একজন ওলী বা সাধু কিন্তু প্রত্যেক ওলী বা সাধুই এক একজন নবী নয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঈসা নবীর জ্ঞান' শীর্ষক আলোচনায় জড় পদার্থ, আধ্যাত্মিক পদার্থ, আত্মা এবং ঐশত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে ইবনুল

আরাবী হযরত ঈসা নবীর জন্ম, তাঁর মানবীয় দিক এবং ঐশী দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, আত্মা বা শক্তির গুণ আকার-প্রাপ্ত কোন বস্তুকে জীবন্ত করতে পারে যদি সে বস্তুর সে-গুণ গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। সাধারণতঃ অতি শ্লথ গতিতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জড় বস্তুর প্রাণ দান করা হয়, কিন্তু ঈসা নবীর ক্ষেত্রে এটা অতি দ্রুত, প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক ছিল। জিব্রাইল একজন যুবকের রূপ ধারণ করে হযরত মরিয়মের নিকট আসেন এবং তাঁর আত্মায় ঐশী আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটান। তারপর ঈসা নবী জন্মলাভ করেন। কোরআনে ঈসা নবীকে আল্লাহ্‌র বাণী ও আল্লাহ্‌র আত্মা বলা হয়েছে। হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্ম ধারণ করায় তিনি জড় দেহধারী জীব, জিব্রাইলের অনুপ্রবিষ্ট আত্মা হিসাবে তিনি আধ্যাত্মিক আত্মা এবং তিনি ঐশী আত্মা। মানব সন্তান হিসাবে তিনি অতিশয় নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং এক গালে আঘাত পাওয়ার পর অন্য গাল এগিয়ে দিয়ে পুনরায় আঘাত করতে আহ্বান করতেন। 'জিব্রাইল কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট আত্মা' হিসাবে তিনি মৃত ব্যক্তি বা জীবের জীবন দান করতে সক্ষম ছিলেন। 'আল্লাহ্‌র বাণী' হিসাবে তিনি স্বয়ং ঐশী সত্তা বা ঈশ্বর। আল্লাহ্‌র বাণী কেবলমাত্র হযরত ঈসা নবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু ও জীবই আল্লাহ্‌র এক একটি বাণী। কোরআনে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ 'কুন' বা হও বললেন তখন সব কিছু সৃষ্টি হয়ে গেল। এই হিসাবে সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্‌র-বাণীর মাঝেও বাণী দ্বারা অস্তিত্বশীল থাকে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের নাম 'হযরত সোলায়মান-এর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে দুই প্রকার ঐশী মহানুভবতা বা বদান্যতার কথা বলা হয়েছে। একটি সাধারণ যা দিয়ে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ অস্তিত্বশীল হয়। অন্যটি বিশেষ ধরনের যা দিয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়ে হযরত 'দাউদ এর জ্ঞান' শিরোনামায় 'নবুয়ত' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ যার উপর সন্তুষ্ট হন তাঁকে 'নবুয়ত' দান করেন। আল্লাহ্ জগতের প্রতি আসক্তিহীন ও তাঁর প্রতি আসক্তিপূর্ণ প্রেমিক ব্যক্তিদের নবী নিযুক্ত করেন। নবীদের মধ্যে দাউদ নবীকে আল্লাহ্ এত সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বাণীর অধিকারী করেন যে তাঁর প্রার্থনার সময়ে সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর সাথে সমবেত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শিরোনামা 'ইউনুস নবীর জ্ঞান'। এখানে মানুষ সমগ্র সৃষ্ট জীবের সাথে কেমন ব্যবহার করবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ আত্মার অধিকারী, দেহ ও আত্মার সমষ্টি। তাঁর মূল-আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ এবং ঐটাকে সম্মান করা উচিত। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিরা অতিশয় দুর্বল কারণ আল্লাহ্ যে জিনিস জীবিত রাখতে চান তা তারা ধ্বংস করে। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে দয়ার চোখে দেখা উচিত। এমন কি ধর্ম প্রচারের সময়ও লক্ষ্য রাখা উচিত যে অনিচ্ছা প্রকাশকারী ব্যক্তির উপর তা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

দাউদ নবী একটি মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করলে তা বারবার ধ্বংস হয়। আল্লাহ্‌র কাছে এর কারণ জানতে চাইলে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি হাজার হাজার লোক ধ্বংস করেছে সে মসজিদ গঠন করতে পারে না। দাউদ নবী ধর্ম প্রচারের সময় বহু শত্রুকে নিহত করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র নামে সত্য প্রচারের জন্য তিনি শত্রুদের হত্যা করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলেন যে, তবুও হত্যা করা ঠিক হয়নি কারণ তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং পরে দাউদ নবীর পুত্র সোলায়মান মসজিদ তৈরী করতে সক্ষম হন। সকল জীবে দয়া প্রদর্শন করা মানুষের কর্তব্য।

ঊনবিংশ অধ্যায়ের নাম 'আইয়ুব নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতার কথা বলা হয়েছে। বিপদআপদ সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র নামে ধৈর্যধারণ করা মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া কঠিন পরীক্ষা। জাগতিক বিপদ-আপদ মানুষের অসহায়তার কথা প্রমাণ করে, বিপদে মানুষকে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হয় এবং তাঁরই কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাতে হয়।

বিংশ অধ্যায়ের শিরোনামা 'জন বা ইয়াহিয়া নবীর জ্ঞান'। এখানে হযরত ইয়াহিয়াকে জাগতিক সুখ ত্যাগী, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও 'ইলমে লদুন্নী' বা স্বজ্ঞামূলক ঐশী জ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়ে 'হযরত জাকারিয়ার জ্ঞানের' কথা বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সকল জীবের প্রতি তাঁর দয়া বর্ষিত হয়। বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁর দয়া লাভ করে বেঁচে থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমার দয়া সর্বব্যাপী' (কোরআন ৭ : ১৫৬)।

আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হলে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে এই দয়া ও দানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের নাম 'ইলিয়া বা ইলিয়াস নবীর জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপী ও সর্বব্যাপী সত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের সকল বস্তুর, সকল আকারের মধ্যে বর্তমান। 'নূহ নবীর জ্ঞান' নামক অধ্যায়ে ইবনুল আরাবী বিশ্বজগতের বস্তুর সাথে আল্লার অনুরূপতার কথা বলেন। এই অধ্যায়ে তিনি অপর চরম প্রান্তে গিয়ে গুণহীন পরম সত্তার কথা বলেন। আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপিতা ও অতিবর্তীতার কথা কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন, শুনেন ইত্যাদি এবং গুণহীন পরম সত্তা সম্পর্কে বলা হয় যে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কেউ নাই কোন গুণ নাই, কোন কিছু তাঁর সাথে তুলনা করা যায় না। যারা আল্লাহ্‌র অতিবর্তীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ সকল তুলনার উর্ধ্বে, সকল ধারণার অতীত। ইবনুল আরাবীর মতে আল্লাহ্ অমিলের মিল, মিলের অমিল, অদৃশ্যের দৃশ্য এবং দৃশ্যের অদৃশ্য, ঐক্যের বহুত্ব এবং বহুত্বের ঐক্য। একজন সূফী আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়রূপে দেখতে পান। এই ধারণা ইলিয়াস নবীর কাছে অতি স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। তিনি আল্লাহ্‌কে সকল আকার তথা জীব ও বস্তুর মধ্যে অবস্থিত ঐক্য সত্তা হিসাবে দেখতে পান। নবী বলেছেন, আমি সাহস ভালবাসি, সে সাহস যদি সাপ মারার সাহস হয় তবুও। মানুষের পাশবিক শক্তি সাপের মতো, এটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করেও যদি দমন করে রাখা যায়, নিয়ন্ত্রণের অধীনে সংযত করে রাখা যায়, তবে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠতে সক্ষম হয় সেইভাবে যেভাবে ইলিয়াস নবী স্বর্গে আরোহণ করেন এবং মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালনা করার জন্য পুনরায় এই জগতে অবতরণ করেন। মানুষের আত্মশুদ্ধি উর্ধ্বগমনের প্রথম স্তর এবং আত্মশুদ্ধি দ্বারা মানুষ শুদ্ধ বুদ্ধির জগতে উন্নীত হতে পারে এবং সে স্তর হতে অবতরণ করে মানবজাতিকে পরিচালনা করতে পারে। জ্ঞান দুই প্রকার—বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান এবং আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান। প্রথম প্রকার জ্ঞান গ্রন্থ পাঠ ও প্রকৃতির বস্তু প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে লাভ হয়। আর এই কারণে সূফীবাদে এই প্রকার জ্ঞানকে 'ইলমে সফিনা' বলে। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আত্মশুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ের মাধ্যমে লাভ হয়। এই জ্ঞান স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান।

এই জ্ঞান সূফী পরিভাষায় 'ইলমে লাদুনী', 'ইলমে সিনা', 'দিব্যজ্ঞান' ইত্যাদি নামে পরিচিত। ইবনুল আরাবী বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান দান করেছেন, হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত করে পরমাত্মার রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানী করেছেন। এই জ্ঞান তন্ময় অবস্থার মধ্যে লাভ হয় বলে সে সময় সূফী একটি কথাও বলতে পারেন না। তিনি পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে সন্তুষ্ট হন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে 'লোকমান নবীর জ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে 'তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন এবং যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে শ্রেষ্ঠ বস্তু দান করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এর মূল্য বুঝতে পারে না। (কোরআন ২ঃ২৬৯), জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, (১) কথায় বা বাক্যে প্রকাশিত জ্ঞান (২) নিশ্চুপ অবস্থা বা বাক্য-হীন মৌন স্থির অবস্থার জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান প্রথম প্রকার জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দুইটি সত্তা ও অস্তিত্বে বিশ্বাস করা দেবতাবাদের নামান্তর। সত্তা বা অস্তিত্ব কেবলমাত্র একটি।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ে 'হারুন নবীর জ্ঞান' শীর্ষক আলোচনায় দেবতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্কে একটি গুণ বা একাধিক গুণের সাথে অভিন্ন বলে মনে করাই দেবতাবাদ। ইবনুল আরাবী দার্শনিক লিবনিজের মতো বলেন যে, দুইটি জিনিস হুবহু এক নয়, একটির অস্তিত্ব অন্যটির অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে বা একটি অপরটির পরিপূরক হতে পারে। যেমন বাদশাহ্ ও প্রজা, নবী ও তাঁর অনুসারীগণ। উভয়েই একে অন্যের জন্য বিভিন্ন মাত্রায় নিজ সাধ্য অনুসারে কাজ করে। এমনকি আল্লাহ্ বিভিন্ন জীবের প্রাণ দান করেন এবং সৃষ্ট জীব প্রার্থনা ও মোনাজাতের মধ্যে আল্লাহ্র মহিমার গুণগান প্রকাশ করে। কোরআনে বলা হয়, 'প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্ নতুন অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করেন' (কোরআন ৫৫ : ২৭)। উপাসনার প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্র গুণ বা তারই প্রকাশ। এই বস্তুটি একটি পাথর, একটি গাছ বা অন্য কিছু হতে পারে। বিশেষ একটি গাছ বা পাথরকে পূজা করলে উপাস্য বস্তুকে সীমিত করা হয়, তাঁর বিশেষ গুণ অথবা বিশেষ দিককে পূজা করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সামগ্রিক এককভাবে দেখে, অখণ্ড একক সত্তার কাছে প্রার্থনা করতে হয়। ইসলাম-পূর্ব সেমিটিক আরবরা আল্লাহ্র বিভিন্ন

গুণ বিভিন্ন আকারে পূজা করত এবং আল্লাহ্‌র অখণ্ড সত্তাকে অস্বীকার করত। তাই হযরত মুহম্মদ (দঃ) যখন বিভিন্ন আকারের অন্তরালে যে এক পরম সত্য আছে সেই আল্লাহ্‌র কাছে যখন আরবদের প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন তখন তারা বলে "কি সব দেবতা মিলে এক আল্লাহ্? এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার" (কোরআন ৩৮:৫)। দেবতাবাদে একক সত্তাকে বিভিন্ন গুণের বাইরের কোন অস্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের নাম 'মূসা নবীর জ্ঞান'। এখানে বলা হয়েছে ক্ষুদ্র গুণকে বা আত্মাকে মহৎ গুণ বা শ্রেষ্ঠ আত্মার খাতিরে উৎসর্গ করতে হয় যেমন হযরত মূসার জন্য হাজার হাজার শিশু প্রাণ দান করেছে। মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউন নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পায়। ইবনুল আরাবী ও অন্যান্য সূফীদের মতে ফেরাউন রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস যে সে রক্ষা পায়নি। কাজের মাধ্যমে মুক্তি লাভ ঘটে, কোন আত্মাই শুধু দেহের সাহায্যে দেহের উন্নতি সাধন করতে পারে না। মূসা নবীর আত্মাকে একটি বাক্সের (দেহের) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে (জ্ঞান) সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় এবং তিনি ফেরাউন (আত্মস্বীকৃতি) ও তার স্ত্রী দ্বারা লালিত-পালিত হন। দৈহিক কামনার ধ্বংসের উপর আত্মার মুক্তি নির্ভর করে।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ের নামকরণ ইয়েমেনের প্রাক-ইসলামিক যুগের সাধু সিনানের পুত্র খালেদের নাম অনুসারে 'খালেদের জ্ঞান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সৎ ইচ্ছা ও সত্য জ্ঞান লাভ এক সমান নয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের নাম 'হযরত মুহম্মদের জ্ঞান'। এই অধ্যায়ে স্ত্রীলোক, সুগন্ধ ও নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্ত্রীলোক, সুগন্ধ ও নামাজ হযরত মুহম্মদের প্রাণের প্রিয় বস্তু। ইবনুল আরাবী বলেন যে, মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিরূপ সৃষ্টি এবং স্ত্রীলোক মানুষের প্রতিরূপে সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্পর্ক আল্লাহ্ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মতো, পুরুষ মানুষ যদি স্ত্রীলোককে এই অর্থে ভালবাসে তবে সে প্রেম নিশ্চয় ঐশী-প্রেম। আল্লাহ্ প্রকৃতির মধ্যে আপন প্রাণ-বায়ুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র 'প্রাণ বায়ু' বা 'নিশ্বাস' সুগন্ধযুক্ত, তেমনিভাবে স্ত্রীলোকও পুরুষের সুগন্ধ মাত্র। মানুষ যেমন আপন স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনিভাবে

আল্লাহ্‌র সুগন্ধ-সত্তা প্রকৃতির প্রতিও আকৃষ্ট হওয়া উচিত। হযরত মুহম্মদের প্রিয় বস্তু নামাজ মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী মুহূর্ত, এই মুহূর্ত অতি মূল্যবান মুহূর্ত। আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা ও তাঁর আদেশ শ্রবণ করার মুহূর্তের মত আনন্দদায়ক শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত আর নাই। নামাজ পরম সত্তার সন্দর্শন লাভের এবং একজন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। নামাজ তিন প্রকার ভংগিতে সম্পন্ন করা হয়—দাঁড়িয়ে, রুকুতে বাঁকা হয়ে এবং সেজদা দিয়ে। এই তিন অবস্থাকে ইবনুল আরাবী মানব, পশু ও উদ্ভিদের সাথে তুলনা করেছেন কিন্তু স্পষ্টরূপে এর অর্থ প্রকাশ করেননি।

অতি সংক্ষেপে 'ফুসুস উল-হিকামের' ঘটনাবলী এই-ই। যদিও হুবহু আক্ষরিক-ভাবে অনুবাদ করা হয়নি, তবুও এখানে তাঁর মতবাদের একটা সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইবনুল আরাবী সুফীমতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ, অধ্যাপক আফিফি সাহেবকে অনুসরণ করে[১] নিম্নলিখিত অধ্যায়ের আলোচনা করা যায়। (১) ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' তত্ত্ব, (২) 'লগস' বা প্রজ্ঞাতত্ত্ব (৩) জ্ঞানতত্ত্ব এবং (৪) ধর্মতত্ত্ব। মূল ঐক্যনীতি সত্তার ঐক্য, সত্তা ও অসত্তা, এক ও বহু, অন্তর্ব্যাপিতা ও অতিবর্তিতা, কার্যকারণ সম্পর্ক, সত্তাসার, নাম ও গুণ ইত্যাদি প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'লগস' বা প্রজ্ঞাতত্ত্বের অধীনে 'লগস' এর বিভিন্ন অর্থ, উৎস, পূর্ণ মানব, ওয়ালিয়াত বা 'বেলায়েত' 'নবুয়ত' 'রিসালাত' ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানবিদ্যা ও মনোবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সার্বজনীন ইসলাম ধর্ম মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা, ভাল-মন্দ, পরকাল, বেহেস্ত-দোজখ, বিচার, পুরস্কার, শাস্তি, পরম সৌন্দর্য ঐশী প্রেম ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

---

১. Dr. A. E. Affifi: The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan (no date), first edition, Cambridge, 1938.

প্রথম অধ্যায়

ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ
(সত্তার ঐক্য বা সর্বেশ্বরবাদ)[১]

শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবীর সমগ্র চিন্তা তথা ধর্মীয়, দার্শনিক ও সূফী চিন্তার মূল কথা 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'। 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' শব্দের অর্থ ধর্মীয় দর্শনের ভাষায় সত্তার ঐক্য', 'ঐক্য নীতি' অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ অনুসারে সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মূল সত্তা একটি। এই সত্তা ধর্মীয় ভাষায় আল্লাহ্। আল্লাহ্ একমাত্র পরম সত্তা,[২] তিনি বিশ্ব মাঝে ব্যাপ্ত আছেন। এই বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্ সত্তাময়, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের প্রকাশ, আল্লাহ্ ও বিশ্বজগৎ অভিন্ন। এই মতবাদ 'দার্শনিক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্য' পরাতাত্ত্বিক পরম সত্তা ও আল্লাহ্, একত্ব ও বহুত্ব, অন্তর্ব্যাপিতা অতিবর্তিতা, কার্য ও কারণ, সত্তাসার ও গুণাবলী ইত্যাদি সমস্যার আলোচনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত এবং সে সবের সুষ্ঠু আলোচনার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাঁর দর্শনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা সত্তার ঐক্য। আল্লাহ্ একমাত্র পরাতাত্ত্বিক সত্তা, বিশ্বজগৎ তাঁরই নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ মাত্র। পরম সত্তা ও তার নাম ও গুণাবলী এক সমান, সত্তার দিক দিয়ে পরম সত্তা একটি কিন্তু নামের দিক দিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বহু। তাঁর মতে সত্তা ও গুণ, দ্রব্য ও গুণ, আল্লাহ্ ও বিশ্ব জগৎ, এক ও বহু, কার্য ও কারণ, পরম সত্তা ও 'আয়ান আস সাবিতা' ইত্যাদি সমস্যার আলোচনা যে দিক দিয়েই করা হোক না কেন তা 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদে' পৌছায়।

'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদকে সাধারণভাবে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ্ ও বিশ্বে যেন কোন ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগতই যেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগৎ। পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদ

---

১. (i) Ibid, p. 54. (ii) Ibnul Arabi, Futuhat I, p. 884. and Futuhat II, p. 531.
২. Ibid, p. 54,

সর্বেশ্বরবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন। ইবনুল আরাবীর ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজীয় সর্বেশ্বরবাদের নয়। তাঁর মতে আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতে এবং বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌য় অবস্থিত, সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌ কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্‌ বিশ্বজগৎ নয়। তাঁর মতবাদ যে দৃষ্টিভংগী হতে গড়ে উঠেছে, তা স্পিনোজীয় দৃষ্টিভংগী হতে অনেকাংশে ভিন্ন ধরনের।

মানুষ প্রজ্ঞাবান জীব। সে তার অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে কোন না কোন দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখে আর এই ধরনের বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর নাম বিভিন্ন প্রকার চেতনা। 'দার্শনিক চেতনা' এমনি ধরনের একটি চেতনা, যা দিয়ে একজন দার্শনিক পরম সত্তা ও বিশ্বজগতের বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং জ্ঞানবিদ্যা এই প্রকার চেতনার প্রকৃতি বিচার করে। 'নৈতিক চেতনা' দ্বারা একজন নীতিবিদ মানুষের নৈতিক কার্যকলাপ বিচার করে এবং নীতিবিদ্যা বা নীতি দর্শন নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রের সকল নিয়ম-কানুন ও সেগুলোর প্রকৃতি আলোচনা করে। আবার 'ধর্মীয় চেতনা' দ্বারা একজন ধর্মতত্ত্ববিদ পরম সত্তার প্রকৃতি বিচার করে এবং খোদাবাদী দর্শন বা ধর্মীয় দর্শন ধর্মীয় চেতনার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন প্রকার চেতনার একটি নির্দিষ্ট সীমা পরিসর আছে এবং আপন আপন সীমার মধ্যে প্রত্যক্ষ চেতনাই সত্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক প্রকার চেতনা আপন সীমা অতিক্রম করে অন্য চেতনার সীমায় প্রবেশ করে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় অথবা বিরোধ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চেতনা-গুলোকে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হতে বা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা হতে মুক্ত রাখার জন্য দর্শন শাস্ত্র বিভিন্ন প্রকার চেতনার প্রকৃতি, অর্থ, পরিসর ইত্যাদি বিচার করে তার বৈধতা, সত্যতা ও ভ্রান্তি উল্লেখ করে।

দার্শনিক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যনীতি

বিশ্বজগতের 'মূল ঐক্যনীতি' বা পরম সত্তাতত্ত্বের চেতনা এক ধরনের চেতনা, যেখানে 'দার্শনিক চেতনা' বা 'জ্ঞানমূলক চেতনা' ও 'ধর্মীয় চেতনার' সংমিশ্রণ ঘটে। ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' সত্তার ঐক্য মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের ধারণা জ্ঞানমূলক ও ধর্মীয় চেতনার মিশ্রণজাত মতবাদ। এ কারণে তা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল মতবাদ।

'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ বুঝতে হলে প্রথমে দার্শনিক চেতনার 'মূল

ঐক্যনীতি' ও ধর্মীয় চেতনার 'পরম সত্তা' বা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি বুঝতে হয়। দার্শনিক চেতনা বা জ্ঞানমূলক চেতনা মানুষের জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভংগী। এই চেতনার একটি আদর্শ আছে এবং এই চেতনা সেই আদর্শে পৌঁছাতে চায়। বিশ্বজগতের সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাই এই আদর্শ। দার্শনিক চেতনা এমন একটি 'ঐক্যনীতি' খুঁজে পেতে চায় যা হতে জাগতিক বৈচিত্র্য ও বহুত্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে আজ পর্যন্ত প্রায় সকল দার্শনিক এই প্রকার ঐক্যের সন্ধান করেছেন।[১] এই প্রচেষ্টা এত গভীর ও ব্যাপক যে দার্শনিকগণ এমন একটি ঐক্যের অস্তিত্ব স্বীকার, তার সত্তাসারের প্রকৃতি জানতে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিন্তাবিদের বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের মূলনীতিও বিভিন্নরূপে ধরা পড়েছে। মানুষ জড়দেহ ও চেতনাসম্পন্ন জীব। আবার মানুষের অন্তরে চেতনার স্পন্দন আর বাইরে প্রকৃতির স্পর্শ। এ দুইয়ের বাইরে যেতে পারে না বলে মানুষের অনুসন্ধানের এক ক্ষেত্র তার অন্তর আর এক ক্ষেত্র 'প্রকৃতি'। আদি মানব প্রকৃতি হতেই আলোচনা শুরু করেন ও দৃশ্যমান জগতের কোন একটি বস্তুকে এই নীতি হিসাবে গ্রহণ করে তা হতে বিশ্বজগৎ ও তার সকল বস্তুর উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন।

যতদূর জানা যায়, খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে থেলিস (খ্রীস্টপূর্ব ৬২৪–৫৪৮) নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত প্রকৃতির মধ্যে পরম ঐক্যনীতি বা পরম একত্বের সন্ধানে আত্মশক্তি নিয়োজিত করেন।[২] তিনি দেখতে পান যে, বিশ্বজগতের সকল বস্তু একে অন্য হতে উদ্ভূত। যাকে একবার কারণ বলে মনে হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা প্রকৃত কারণ নয়, তার পশ্চাতে অন্য এক কারণ আছে। এইভাবে কারণ পরম্পরা শৃঙ্খলের ন্যায় প্রসারিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছে। থেলিস এই সকল কারণের মূলে কি রয়েছে তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানের দ্বারা, পরীক্ষার দ্বারা তিনি যতদূর বুঝেছেন, তাতে প্রত্যক্ষের অতীত কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে তাঁর

১. Dr. Buhan Ahmad Faruqi: The Mujaddid's Conception of Tawhid, Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar; Lahore, Pakistan, Reprinted August, 1970, p. 29.

২. W. T. Stace: A Critical History of Greek Philosophy, p. 20, New York, 1967.

প্রবৃত্তি হয়নি। বিশ্বের 'কারণ' অনুসন্ধান করে মূলের দিকে গিয়ে দেখতে পান যে, কারণের সংখ্যা ক্রমে অল্প হয়ে আসে। তাঁর বিশ্বাস, ক্রমেই যখন কারণ পদার্থের সংখ্যা অল্পতর হয়ে আসে, তখন মূলে হয়ত একটি মাত্র কারণ হতে সকল বস্তুর উৎপত্তি আরম্ভ হয়েছে। তিনি পানিকেই এই 'মূল কারণ' বলে নির্দেশ করেন। তাঁর মতে পানি জগতের মূল কারণ, পানি হতে বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি এবং পানিতেই শেষে মিশে যায়। তিনি পানির মধ্যেই পরম ঐক্যনীতির সন্ধান পান। একা থেলিস নয়, তাঁর মত এনাক্সিমাণ্ডার[১] (খ্রীস্টপূর্ব ৬১১—৫৪৭) ও এনাক্সিমেনিস[২] (খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৮—৫২৪) প্রমুখ পণ্ডিতেরা সকলেই বিশ্বজগতের 'আদি কারণ' সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করেন। এনাক্সিমাণ্ডার বলেন 'অসীম অনির্দিষ্ট কিছু একটা'[৩] এবং এনাক্সিমেনিস বলেন জগতের মূল উপাদান 'বায়ু'।[৪] পিথাগোরাসের মতে 'সংখ্যা'[৫] এম্পেডোক-লসের মতে 'মাটি পানি, বাতাস ও আগুন'[৬] এই চারিটি। ডেমোক্রিটাস ও অন্যান্য পরমাণুবাদীরা অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য ও অবিভাজ্য 'পরমাণুর'[৭] মধ্যে পরম ঐক্যের সন্ধান পান। অভিজ্ঞতাবাদী বৃটিশ দার্শনিক লক[৮] বার্কলে[৯] ও হিউম[১০] 'ধারণা ও সংবেদনের' মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পান। তাঁদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে ধারণা ও সংবেদনই জগতের মূলবস্তু। এখন এই সকল ধারণা ও সংবেদনকে ঐক্যনীতি হিসাবে গ্রহণ করলে তা ধারণার অধিক কিছু হতে পারে না। কারণ প্রতিক্ষেত্রের ঐক্য বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের বাইরে কোন অস্তিত্বশীল ঐক্য নয়, এই ঐক্য সাধারণ ধারণা, সম্প্রত্যয় বা 'প্রত্যয়' হিসাবে সত্য এবং এমনি ধরনের মূল ঐক্য হতে তাঁরা জাগতিক বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন।

১. Ibid, p. 27.
২. Ibid, p. 24.
৩. Ibid, p. 24.
৪. Ibid, p. 28.
৫. Ibid, p. 34.
৬. Ibid, p. 83.
৭. Ibid, p. 89.
৮. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ পৃঃ ২৭৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০
১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা চিন্তা ও সত্তাকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁদের মতে চিন্তা ও সত্তা একই জিনিস অথবা চিন্তা সত্তারই মূল তত্ত্ব। তাঁরা ঐক্য-নীতিকে ধারণা বা সমষ্টির মধ্যে অনুসন্ধান করেন। যেমন, প্লেটো[১] 'ধারণা' বা 'কল্যাণের ধারণার' মধ্যে, এরিস্টটল[২] 'বিশুদ্ধ আকারের মধ্যে স্পিনোজা[৩] 'পরম দ্রব্যের মধ্যে হেগেল 'পরম ব্রহ্মের' মধ্যে দেখতে পান। এইভাবে কেউ বা পানি, কেউ বা বাতাস, কেউ আগুন, কেউ বা নানাবিধ উপাদান সম্বলিত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মিশ্র পদার্থ, আবার কেউ বা সংবেদন কেউ বা ধারণা, প্রত্যয় ইত্যাদিকে জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বা জগতের কারণ সত্তা বলে উল্লেখ করেন। অভিজ্ঞতাবাদী, প্রকৃতিবাদী ও বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদরা সকলেই একটি ঐক্যনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং সকল বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে ঐক্যনীতি হতে উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেন।

অপরপক্ষে, পরম সত্তার ঐক্য ধর্মীয় চেতনার মূল কথা। পরম সত্তা, পরম সত্তার সাথে বিশ্বজগৎ ও মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আছে। মানুষ পরম সত্তার সাথে সংযোগ ও ঐক্য স্থাপন করতে চায়, পূর্ণতা অর্জন করে সুখী হতে চায়, জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হতে চায় এবং সৌন্দর্য উপভোগ করে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু সে নিজ প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক অন্যান্য বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে সহজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মোটকথা, প্রকৃতির মধ্যে সে নিজেকে অসহায়রূপে দেখে। সুতরাং সে এমন একটি পরম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় যে সর্বশক্তিমান প্রভু[৪] দয়ালু, দাতা, সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা। তিনি মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করেন, বিপদে সাহায্য করেন এবং অসহায়ের একমাত্র সহায়ক হন। তিনি সর্বজ্ঞানী, গুপ্ত ও ব্যক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। তিনি একমাত্র উপাস্য, একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা যায় এবং

---

১. W. T. Stace, Ibid, p.201,

২. I bid, p. 277.

৩. Will Durant, The Story of Philosophy, 8th Printing, 1960. p. 171, U. S. A, (II) John Caird Spinoza, London, MDCCCLXXXVIII. P. 141,

৪. কোরআন ১:২ ; ৬:১৬৪ ; ১০:৩২ ; ৭:৪৪ ; ১১:১৬ ; ২:২৪৭ ; ৩:১৪০ ; ৬:৭১ ; ৯৩:৭ F ইত্যাদি ইত্যাদি

তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। পরম সত্তা কেবল মাত্র একটি, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সয়ম্ভু। ধর্মীয় চেতনা মানুষের সাথে পরম সত্তা বা আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরম সত্তা বা পরম ঐক্যের এই সব গুণ স্বীকার করে এবং এই সব গুণের মাধ্যমে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু স্বগতরূপে অর্থাৎ সত্তাসারের দিক দিয়ে পরম সত্তা বা আল্লাহ্‌ মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, কোন জ্ঞান দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, কোন উপমা দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। কারণ তিনি অতুলনীয়, তাঁর মতো কোন কিছুই নাই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এই ধরনের সদর্থক ও নঞর্থক ধারণা নিয়েই ধর্মীয় চেতনা সন্তুষ্ট থাকে।

এখন দার্শনিক চেতনা বা জ্ঞানমূলক চেতনা ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা যায় : (১) জ্ঞানমূলক ঐক্য একটি অনির্দিষ্ট ঐক্য কিন্তু ধর্মীয় ঐক্য একটি নির্দিষ্ট ঐক্য, এটা নিশ্চিতরূপে সত্য এবং এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। প্রকৃতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা এই ঐক্যকে পানি, অনির্দিষ্ট জড় পদার্থ, বাতাস, মাটি, আগুন, পরমাণু, ধারণা সংবেদন ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে সন্ধান করেন। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা এই ঐক্যকে সত্তা, কল্যাণের ধারণা, আকার, দ্রব্য, পরম ধারণা, পরম সত্তা 'পর ব্রহ্ম' ইত্যাদি ধারণার মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করেন। আবার বিচারবাদী দার্শনিক অমূর্ত নিয়মের ধারণার মধ্যে এই ঐক্যের সন্ধান পান। আর এ হতে বোঝা যায় যে জ্ঞানমূলক চেতনা ঐক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে খুব সচেতন নয় অথবা উদাসীন। সামগ্রিক জ্ঞানলাভ হলেই জ্ঞানমূলক চেতনা সন্তুষ্ট হয়। পরম ঐক্য পানি, বাতাস, আগুন, পরমাণু, জড়বস্তু, মন, চেতন সত্তা, দ্রব্য, গুণ, পরব্রহ্ম, ধারণা ইত্যাদি যাই হোক না কেন তাতে এর কিছু আসে যায় না। পরম ঐক্য হতে যদি বিশ্ব জগতের বহুত্বের উৎপত্তি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তা'হলেই এটা সত্য। জ্ঞানমূলক চেতনার ক্ষেত্রে পরম সত্তা যে একই হবে এমন কথা নয়, এটা একাধিকও হতে পারে।

ধর্মীয় চেতনা পরম ঐক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে খুব সজাগ। এই পরম ঐক্য অবশ্যই আল্লাহ্‌, তিনিই প্রভু, দয়ালু, দাতা, পরিচালক, সর্বজ্ঞানী, স্রষ্টা ও পবিত্র এক সত্তা। তিনিই একমাত্র উপাস্য।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমূলক ঐক্য অবশ্যই এক অন্তর্ব্যাপী সত্তা কারণ জাগতিক বস্তুর বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নাই। পানি, বাতাস আগুন, মাটি, অনির্দিষ্ট পদার্থ। পরমাণু ইত্যাদির যে ঐক্য তা ধারণার বা প্রত্যয় ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং অস্তিত্বশীল বস্তুর বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নাই। আবার পরম সত্তা লকের 'সংবেদন' এবং প্লেটোর 'ধারণা' এরিস্টটলের 'আকার', মুরের সংবেদোপাত্ত উপাত্ত,[১] রাসেলের 'যৌক্তিক সত্তা' ইত্যাদি ধারণাগত সত্তা বা যৌক্তিক সত্তা মাত্র। এগুলোর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। এমন কি কান্টের 'নিয়ন্ত্রণমূলক ধারণা' রূপী ঐক্যও একটি ধারণাগত ঐক্যনীতি মাত্র। আর সেই হিসাবে এই ঐক্য অমূর্ত এবং এর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ অস্তিত্বহীন, প্রয়োগের মধ্যেই এটা অস্তিত্বশীল। সুতরাং তিন প্রকার জ্ঞানমূলক ঐক্যই অমূর্ত ধারণার ঐক্য ব্যতীত কিছু নয়—এই ঐক্য কোন অস্তিত্বশীল বাস্তব বস্তুর ঐক্য নয়। জ্ঞানমূলক ঐক্য অন্তর্ব্যাপী ধারণা রূপে বর্তমান, বাস্তব বস্তু হিসাবে নয়।

ধর্মীয় চেতনায় এই পরম ঐক্য সকল জাগতিক বস্তু এমনকি মানুষের মনেরও অতীত। পরম ঐক্য বা সত্তা কোন জাগতিক বস্তু বা মানুষের মত হলে সেও মানুষের মত প্রকৃতির মধ্যে অসহায় হবে এবং তেমন হলে মানুষ বিপদের সময় প্রকৃতপক্ষে কোন সাহায্য পাবে না। সেইজন্য ধর্মীয় চেতনা জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক পরম সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয়।

তৃতীয়তঃ জ্ঞানমূলক চেতনা একত্ববাদী বা অদ্বৈতবাদী এবং ধর্মীয় চেতনা দ্বৈতবাদী। জ্ঞানমূলক ঐক্যের জাগতিক বহুত্বের ঊর্ধ্বে স্থান নাই। আর এটাই অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ অনুসারে, একত্ব ও বহুত্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, আর একত্বই একমাত্র সত্য, 'বহুত্ব' মায়া, অলীক বা অস্তিত্বহীন, বহুত্ব একত্বেরই প্রকাশ মাত্র। এই পর্যন্ত জ্ঞানমূলক ঐক্য ও গুণগত অদ্বৈতবাদ ও পরিমাণগত বা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ একই রকম। কিন্তু জ্ঞানমূলক ঐক্য পরিমাণগত অদ্বৈত-বাদের ধারণার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। আর সে মতে পরম সত্তা সংখ্যার দিক দিয়ে অবশ্যই একটি হতে হবে। আর এই অবস্থায় এই ঐক্যকে "একটি

১. (i) 'Moore's Theory of Sense Data', The Philosophy of G.E. Moore p.p. 203-221 (ii) A.T. Ayer Professor G.E. Moore's Conception of A Sense datum Philosophical Essays, London 1965, p.p. 66.

সমগ্র" অথবা 'একটি দ্রব্য' অথবা 'একটি আধ্যাত্মিক সত্তা' বা 'আত্মা' হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু এই 'সমগ্র' 'একক' 'স্বতন্ত্র' ঐক্যের বিভিন্ন অংশের ঊর্ধ্বে অস্তিত্বহীন। এই ঐক্য বিভিন্ন অংশের সংগঠনের ঐক্য, স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল কোন কিছু নয়। আর এটা অন্তর্ব্যাপিতা ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং ঐক্যকে দ্রব্যের স্তরে উন্নীত করতে হয়। কিন্তু ঐক্যকে দ্রব্য মনে করলেও বিভিন্ন অংশকে দ্রব্যের প্রত্যংশ বা বিভিন্ন আকার প্রকার বলতে হয়। একই দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকাশ বলে স্বীকার করতে হয়। সেগুলোর স্বতন্ত্র বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যখন ঐক্যকে কেবলমাত্র দ্রব্য না বলে দ্রব্য ও আধ্যাত্মিক সত্তা মন বা আত্মা বলা হয় তখন তাকে অসীম আত্মা বা পরম আত্মা বলতে হয় এবং বিভিন্ন অসীম আত্মাকে পরমাত্মা হতে অভিন্ন বলে স্বীকার করতে হয়। সেগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব নাই, জড় জগৎ হয় মিথ্যা না হয় সসীম আত্মা সহকারে সেগুলো পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র। ধর্মীয় চেতনা সত্তার দ্বৈততায় রক্ষা করে। মানুষ অসহায় জীব হিসাবে জগতের ঊর্ধ্বে এক শ্রেণী সত্তার অস্তিত্ব ধরে নেয়। আল্লাহ্ জগৎ ও মানুষের বহু ঊর্ধ্বে—এখানে একদিকে আল্লাহ্ ও অন্যদিকে সৃষ্ট জগৎ ও মানুষ। আল্লাহ্ পূর্ণ, জগৎ ও মানুষ অপূর্ণ। এখানে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। একটি অন্যটি হতে ভিন্ন। ধর্মীয় ঐক্য কেবলমাত্র অতিবর্তী সত্তাই নয় অন্তর্যামী সত্তাও বটে।

ধর্মীয় চেতনা পরম ঐক্যকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সত্তা বলে স্বীকার করে কিন্তু জ্ঞানমূলক চেতনার ঐক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ব্যক্তিত্বের সাথে 'চেতনা' এমনকি 'আত্মচেতনা' সম্পর্কযুক্ত পরম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সত্তা অবশ্যই আত্ম-চেতনা সম্পন্ন জীব, স্বাধীন, সৎ বিচারক, দয়ালু ও দাতা। ধর্মীয় চেতনা পরম ঐক্যকে এই সকল গুণ সম্পন্ন পরম ঐক্য বলে স্বীকার করে। অপরদিকে জ্ঞানমূলক চেতনা পরম ঐক্যের ব্যক্তিত্বের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করে না, ঐক্য হলেই এর যথেষ্ট—এ ঐক্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা নৈর্ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক হোক না কেন, তাতে এর কিছু ক্ষতি হয় না। যেমন—শেলিং এর পরম ঐক্য সচেতন সত্তা নয়, আধ্যাত্মিক সত্তা বা আত্মা হিসাবে আপাত দৃষ্টিতে একে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা বলে মনে হয়। এখানে ধর্মীয় চেতনা মনে তেমন অনুভূতি জাগায়। এখানে সত্তার ঐক্যের ধারণা কেবল নাম মাত্র। এটা খুব বেশী কাজে আসে না, কারণ পরম ঐক্য জগতের অন্তর্যামী সত্তা মাত্র।

পরমাত্মাও বিশ্ব জগৎ হতে ভিন্ন নয় এবং বিশ্বজগৎও পরমাত্মা হতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। আর এই ধারণাই মনে সন্দেহ জাগায় যে, হয়ত বা পরম ঐক্য সত্তার 'ব্যক্তিত্ব' নাই। আর এই কারণে ভাববাদী দার্শনিকরা পরম সত্তায় 'ব্যক্তিত্ব' আরোপ করেন না। আবার পরম ঐক্যের স্বাধীন ইচ্ছার স্বাতন্ত্র স্বীকার করা হয় না, আর করলেও তা নিয়ন্ত্রণবাদ হতে অভিন্ন নয় কারণ একমাত্র নিয়ন্ত্রণই জ্ঞানমূলক চেতনার দাবী পূর্ণ করে। অল্প কথায় বলতে হয় যে এটা কেবলমাত্র ঐক্য ও নিয়ন্ত্রণের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। নিয়ন্ত্রণবাদের অধীনে 'দান' করার কোন প্রশ্ন উঠে না। অতএব জ্ঞানমূলক চেতনার মধ্যে পরম ঐক্যের ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্য পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা হয়।

পক্ষান্তঃ ধর্মীয় ঐক্য অবশ্যই স্বাধীন বা সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা এবং এই সত্তা মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে কিন্তু জ্ঞানগত ঐক্য স্বয়ং নিজে কিংবা মানুষকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে।

স্বাধীনতা সদর্থকভাবে, কার্য সমাধান শক্তি এবং এর নঞর্থক ভাবে, বাহ্যিক প্রভাব মুক্ত বুঝায়। ধর্মীয় চেতনার পরম ঐক্যকে পূর্ণ সত্তা মনে করে। সুতরাং এই ঐক্য অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ দয়ালু দাতা এবং নৈতিক পূর্ণতা আছে। স্বাধীনতা নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব, নৈতিক পূর্ণতা পূর্ণ ঐশী সত্তা অবশ্যই পূর্ণরূপে স্বাধীন ঐশী সত্তা দয়ালু ও দাতা। মানুষ তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পায়। এই সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এই সত্তার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। মোটকথা, ধর্মীয় চেতনার ঐক্য বা আল্লাহ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচেতন স্বাধীন সত্তা, এখানে মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় এবং স্বাধীনতার বলে মানুষ নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করে তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য লাভ করতে চেষ্টা করে।

জ্ঞানমূলক ঐক্য নিয়ন্ত্রণবাদের পক্ষে রায় দেয়, এটা কেবল মাত্র একটি ঐক্যে বিশ্বাস করে যা হতে নিয়মিতভাবে 'বহুত্ব' উৎপত্তি হয়। অতএব এই 'ঐক্য' ও 'বহুত্ব' কোনটির মধ্যেই স্বাধীনতা নাই। জড়বাদের মধ্যে অস্তিত্বশীল জড়বস্তু হিসাবে যখন ঐক্যকে স্বীকার করা হয় তখন তা একটি 'কারণ' হিসাবে ধরা হয় এবং এই কারণ হতে বিশ্বজগৎ ও তন্মধ্যস্থ সকল কিছু যান্ত্রিক নিয়মে উৎপত্তি হয়। যখন ঐক্যকে স্পিনোজার মতবাদের মধ্যে

প্রজ্ঞামূলক ধারণার মতো মনে করা হয়, তখন জ্যামিতিক নিয়মে ঐক্য হতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। এই ধরনের জ্যামিতিক নিয়ম নিয়ন্ত্রণবাদের একটি রূপ মাত্র। আবার যখন ঐক্যকে মন বা আত্মা বলা হয়, তখন আপাত-দৃষ্টিতে মানুষও এই মন বা আত্মার স্বাধীনতা আছে বলে মনে হলেও তা আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণবাদেরই শামিল।

ষষ্ঠতঃ ধর্মীয় চেতনার সাথে ঐক্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানমূলক ঐক্যের সাথে ধরাবাঁধা সম্পর্ক নাই। ধর্মীয় চেতনা মানুষের অপূর্ণতা দূর করে সেখানে পূর্ণতা অর্জনের কথা বলে পরমাত্মার অমরতা ও অস্তিত্ব, মানবাত্মার অমরতা ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ সত্তারূপে গ্রহণ করে। জ্ঞানমূলক ঐক্যের মধ্যে এমন কথা স্বীকার করা হয় না। এই ঐক্য মানুষের আত্মার অমরতা অস্বীকার করে। এখানে একমাত্র ঐক্যকে স্বীকার করা হয় যা হতে যৌক্তিক নিয়মে বহুত্বের উৎপত্তি হয়। যদি এই ঐক্য গুণগত ঐক্য হয় তখনও মানবাত্মার পরমাত্মা প্রত্যংশ ছাড়া কিছু নয়। এমন কি ভাববাদের মধ্যে আত্মার স্বনির্ভরশীলতার কথা ও মৃত্যুর পরে অমরতা লাভের কথা বা অস্তিত্বশীল হওয়ার কথা বলা হয় সেখানেও আল্লাহ্‌র মাঝে তার স্মৃতি বা ধারণার পুনরুত্থানের বা সকল আত্মার মধ্যে সাধারণ ধারণার পুনরুত্থানের কথা বলা হয় এবং প্রতিক্ষেত্রেই তা আল্লাহ্‌র সত্তার মাঝে হারিয়ে যায়।

সপ্তমতঃ জ্ঞানমূলক ঐক্য জ্ঞেয় সত্তা, এই সত্তাকে জানা যায়। অভিজ্ঞতা-বাদী চিন্তাবিদরা জড়, জড়ীয় ও পার্থিবরূপে ঐক্যকে ধারণা করে এবং ঐ ঐক্যকে প্রত্যক্ষণের বস্তু হিসাবে স্বীকার করে অথবা অন্তর্দর্শনের বিষয়বস্তু সংবেদন ধারণা, আত্মগত ধারণা উপাত্ত যৌক্তিক সত্তা ইত্যাদি রূপে স্বীকার করে এবং যে বিশ্বচিত্র গঠন করে তা হয় জড়বাদ বা আত্মগত ভাববাদ বা যৌক্তিক সত্তাবাদ উপাত্তবাদে পরিণত হয়। ধর্মীয় ঐক্য আংশিক জ্ঞেয় এবং আংশিক অজ্ঞেয় সত্তা। মানুষ অসহায় জীব হিসাবে পরম অজ্ঞেয় সত্তার কাছ থেকে সাহায্য চায় এবং সে সাহায্য পায়। মানুষের সকল শক্তি দিয়ে তাঁকে জানতে চেষ্টা করে এবং বিশ্বের মাঝে তাঁর চিহ্নগুলো দেখে তার অস্তিত্ব, শক্তি, সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু একথাও সে স্বীকার করে যে আল্লাহ্‌কে একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ পূর্ণভাবে জানে না।

অষ্টমতঃ এই দুই ধরনের ঐক্য দুই প্রকার জীবন পদ্ধতির উৎপত্তি করে।

জ্ঞানমূলক ঐক্য ধ্যান, অনুধ্যান, নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেয় আর ধর্মীয় চেতনা প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সক্রিয়তার উৎস। জ্ঞানমূলক ঐক্যকে একবার পূর্ণরূপে জানতে পারলে সব প্রচেষ্টার শেষ হয়। আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভের সাথে মানুষও পূর্ণতা লাভ করে। স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ধর্মীয় চেতনার মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য বা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, নিজের কামনা বাসনা ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র সাথে মিশিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায় ও সর্বশেষে শান্তি লাভ করে।

উপরে উল্লেখিত জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্থক্যগুলো মনে না রাখলে জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্য একে অপরের সীমা অতিক্রম করে অংগাংগিভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে বহু অসংগতির উৎপত্তি হয়।

ইবনুল আরাবীর পরাতাত্ত্বিক সত্তা

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ এই ধরনের মতবাদ যা জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যের পার্থক্য রক্ষা না করে উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে।[১] তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'-এর মধ্যে দার্শনিক ঐক্য বা জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যকে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে। অবশ্য এই প্রকার অভিনব মতবাদ সৃষ্টির জন্য অতীন্দ্রিয়বাদী, মরমী সাধক ও সূফী এবং দার্শনিকরা অনেকাংশে দায়ী। 'সত্তা' বা 'পরম সত্তা' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২]

(১) ধারণাগত সত্তা হিসাবে ও (২) অস্তিত্বশীল বাস্তব সত্তা হিসাবে। ইবনুল আরাবী উভয় অর্থেই সত্তা শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পরাতাত্ত্বিক সত্তার ধারণার সৃষ্টি করেছেন। পরম সত্তা বলতে তিনি আল্লাহ্‌কে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'পরম' শব্দ কম পক্ষে চার প্রকার অর্থ প্রকাশ করে—(১) কোন নির্দিষ্ট আকারে সীমাবদ্ধ সকল আকারের সাধারণ বস্তু হিসাবে (২) সকল আকারের উর্ধ্বে ও সকল আকারের সাধারণ বস্তু হিসাবে না হয়ে, (৩) কোন কিছুর নিকটতম কারণ হিসাবে না হয়ে অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা হিসাবে এবং (৪) সত্তার

১. Br Burhan Ahmad Faruqi : Ibid p. 50
২. Dr. A. E. Affifi : Ibid p. 1

সত্তা হিসাবে। অধিকন্তু তিনি পরম সত্তাকে 'আল আমা' বা "আদি অন্ধকার বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু" ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন।

সত্তা একটি এবং সত্তা পরম ঐক্য এই কথা বলতে ইবনুল আরাবী কি বুঝেছেন? ইবনুল আরাবী উপরে উল্লেখিত সকল অর্থেই 'সত্তা' ও 'পরম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। একই শব্দ দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার ফলে তাঁর মতবাদ সম্পর্কে সঠিক উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন। আফিফি সাহেব মনে করেন যে আপাতদৃষ্টিতে ইবনুল আরাবী ইশরাকী দার্শনিকদের অনুসরণ করার ফলেই এই ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে।[১] ইশরাকীদের অনুসরণ করে ইবনুল আরাবী বলেন যে চিন্তার মধ্যে অস্তিত্বশীল বস্তু হতে অস্তিত্বকে পৃথক করে তাকে জ্ঞানের মধ্যে জানতে চায় ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়। তাঁর চেতনায় জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্য সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। উভয় প্রকার ঐক্য 'একই পরাতাত্ত্বিক পরম সত্তার' ব্যাখ্যা দান করে। পরাতাত্ত্বিক পরম সত্তাকে প্রজ্ঞা অথবা সত্তা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে জানতে পারা যায়। প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করলে দার্শনিক ঐক্য বা জ্ঞানমূলক ঐক্য পাওয়া যায় এবং স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে জানতে চেষ্টা করলে ধর্মীয় ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। অনেক সময় অজ্ঞাতে এক প্রকার ঐক্যের সাথে অন্য আর এক প্রকার ঐক্য সংযুক্ত হয়ে দুই প্রকার ঐক্যের মিশ্রণ ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্পিনোজার 'পরম দ্রব্য' হেগেলের 'পরম ব্রহ্ম' ধর্মীয় ঐক্যের গুণে গুণান্বিত হয়েছে এবং প্লটিনাসের ঈশ্বরের ধারণা, জামী ও ইবনুল আরাবীর আল্লাহর ধারণা দার্শনিক বা জ্ঞানমূলক ঐক্য বা বিশুদ্ধ সত্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এখন তাঁর দর্শনে 'সত্তা' ও আল্লাহ্ একমাত্র 'পরম সত্তা' বলতে কি বুঝায় তা দেখা যাক। এই জ্ঞান তাঁর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' মতবাদ স্পষ্টরূপে বুঝতে সাহায্য করবে। তাঁর তত্ত্ববিদ্যায় 'সত্তা' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (১) একটি ধারণা হিসাবে ও (২) অস্তিত্বশীল বাস্তব সত্তা হিসাবে। 'পরম সত্তা' শব্দটি তিনি উপরোক্ত দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। পরাতাত্ত্বিক পরম সত্তা সকল সত্তার মূল সত্তা। পরম সত্তা ও পরম অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন। অন্য কথায়, সত্তার অমূর্ত ধারণা ও তার বস্তুর অস্তিত্ব এক সমান। ইশরাকীদের অনুসরণ করে

১. Ibid, p. 5

তিনি বলেন যে চিন্তার মাঝে অস্তিত্বশীল বস্তু হতে অস্তিত্বকে পৃথক করা যায় অর্থাৎ ধারণা হিসাবে অস্তিত্বকে ভিন্নরূপে দেখা যায়।

'পরম' শব্দ নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:[১]

(১) একটি সত্তা 'পরম' এই অর্থে যে এটা কোন নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা সকল আকারের মধ্যেই বর্তমান, (২) এটা সকল আকারের অতীত, কোন আকারের মধ্যেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, (৩) এটা কোন কিছুর প্রত্যক্ষ 'কারণ' নয় এবং এই অর্থে তিনি পরম সত্তাকে স্বনির্ভরশীল ও পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বলেন, (৪) অনেক সময় 'পরম' শব্দ দ্বারা সত্তার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া পরম সত্তা শব্দ অনেক সময় অদ্বৈত বা 'আল আমা' এবং বৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দুর সাথে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। এই কথা বলে তিনি 'ধারণাগত সত্তা' ও 'অস্তিত্বশীল সত্তা' অভিন্ন মনে করেন। অর্থাৎ দার্শনিক ঐক্য বা ধারণাগত সত্তার সাথে ধর্মীয় ঐক্য বা অস্তিত্বশীল সত্তার সংমিশ্রণের ফলে 'ধারণাগত অস্তিত্ব' ও বাস্তব অস্তিত্ব' এর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখানো হয়নি। সত্তা একটি, কেবলমাত্র একটি ঐক্য এবং অস্তিত্ব একটি, কেবলমাত্র একটি ঐক্য—একই জিনিস বুঝায়। যখন তিনি বলেন যে পরম অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের উৎস ও কারণ তখন তিনি বুঝেন যে, পরম সত্তা সকল সত্তার উৎস ও কারণ। তিনি পরম সত্তা ও পরম অস্তিত্ব বলতে ধারণাগত সত্তা ও বাস্তব সত্তা উভয়কে বুঝেছেন। তাঁর মতে পরম সত্তাই সকল সত্তার মূল উৎস এবং এই পরম সত্তার সত্তাসার ও অস্তিত্ব অভিন্ন। পরম সত্তা আশারীয়দের সার্বিক দ্রব্যের মত। এখন প্রশ্ন: চিন্তার মধ্যে অস্তিত্বকে অস্তিত্ব-শীল বস্তুর সত্তাসার হতে আলাদা করা যায় কি? তিনি ইশরাকীদের অনুসরণ করে এই প্রশ্নের একটি সদর্থক উত্তর দেন।

আফিফি সাহেবের মতে ইশরাকীরা এবং ইবনুল আরাবী নিম্নরূপ ভুল করেন।[২] উভয়ে 'অস্তিত্ব'কে বিধেয়রূপে ব্যবহার করায় সত্তাসার ও অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন হয়েছে। 'ক' হয় অস্তিত্বশীল—এই বাক্য ও 'ক' এর অস্তিত্ব গুণ আছে—এই দ্বিতীয় বাক্য অভিন্ন হয়। অস্তিত্ব 'অ' হলে 'ক' হয় 'অ'—এই বাক্য হয়। 'ক' এর 'অ গুণ আছে এ কথা বলা পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। আবার অস্তিত্ব

১. (i) Dr A. E. Affifi, Ibid, p. 2
(ii) Futuhat I, p 52 1 5 from footnote
২. Dr. A.E. Affifi, Ibid, p. 5

'অ' হলে একটি নঞর্থক বাক্য পাওয়া যায়। অস্তিত্বশীল (কমপক্ষে মনে) 'ক'-এর অস্তিত্ব 'অ' গুণ আছে—আর এ কথা স্ববিরোধী। 'ব' 'ক' এর মূল গুণ হলে 'ক' হয় 'ব'-এর মতো বাক্যের মধ্যে সর্বদা অস্তিত্বমূলক বাক্য 'ক' হয় (হয়—অস্তিত্ব-শীল) থাকে, এবং 'ক' হয়, বাক্যের অর্থ 'ক' এর ব্যক্তার্থের বাইরের কোন গুণ 'ক' এর বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং 'ক হয় অস্তিত্বহীন' বাক্যের অর্থ 'ক' এর ব্যক্তার্থের বাইরে কোন গুণ নাই যা 'ক' এ আরোপ করা যায় বা ক' এর বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যায়। 'ক' এর নির্দিষ্ট ব্যক্তার্থ আছে এবং তা অস্তিত্বশীল।[১]

এই কথা ইবনুল আরাবী অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেন যে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম সত্তা অথবা পরম অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মূল উৎস। আর এখার অর্থ পরম সত্তা পরম অস্তিত্ব হতে অভিন্ন, সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর মূল অস্তিত্ব। তিনি এক সময় সত্তা ও অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করে বলেন যে 'অস্তিত্ব সত্তারই প্রজাতি বা গুণ, 'অস্তিত্ব 'সত্তা' হতে আগত বা উদ্ভূত। অস্তিত্বকে কোন একটি স্তরে প্রকাশিত হলে সে সত্তা অস্তিত্বশীল হয়। অস্তিত্বের চারিটি স্তর আছে[২] (১) দৃশ্যমান বিশ্বজগতের স্তর বা অস্তিত্ব (২) বুদ্ধিগ্রাহ্য বা ধারণাগত অস্তিত্ব, (৩) কথায় প্রকাশিত বা শব্দে উল্লেখিত অস্তিত্ব এবং (৪) গ্রন্থে উল্লেখিত অস্তিত্ব। তাঁর মতে প্রত্যেকটি অস্তিত্বশীল বস্তু উপরোক্ত চার অর্থের যে কোন এক অর্থে অস্তিত্বশীল হয়। কোন বস্তু যদি উপরোক্ত চার অর্থের কোন একটি অর্থে অস্তিত্ব-শীল না হয়, তবে তা বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র অনস্তিত্ব এবং এ সম্পর্কে আর কিছু বলা যায় না।

এই বিশুদ্ধ অনস্তিত্বের আরো একটি অর্থ আছে যা তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। কোন বস্তু উল্লেখিত চারটি স্তরের একটিতেও অস্তিত্ব-শীল না হলে তাকে বিশুদ্ধ অ-সত্তা বলা যায়। স্মরণ রাখতে হয়, বিশুদ্ধ অ সত্তা উপরোক্ত চার অর্থে বা চার স্তরে অস্তিত্বশীল না হয়ে অন্য কোন অর্থে বা অন্য কোন স্তরে অস্তিত্বশীল হতে পারে।

সাধারণভাবে বলা হয় অস্তিত্বের উল্লেখিত চার অর্থে বা অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বশীল না হলে তা অ-সত্তা হয়। ইবনুল আরাবীর মতে চার প্রকার অস্তিত্ব

১. Ibid, p. 6
২. Ibid, p. 7

একই রকম। 'বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব' ও মনে অবস্থিত 'ধারণাগত অস্তিত্ব' একই অর্থে গ্রহণ করে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। এ কথা সত্য যে একটি 'বাস্তব টেবিল' (মূর্ত টেবিল), একটি টেবিলের ধারণা, 'টেবিল' শব্দ এবং 'টে-বি-ল' অক্ষরগুলো একই বস্তু টেবিলকে বুঝায়, কিন্তু জড় জগতে টেবিলের যে 'বাস্তব অস্তিত্ব' আছে তা 'টেবিলের ধারণা' 'টেবিল শব্দ' ও 'টে-বি-ল' হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কথা বলা যায় যে একই সাথে টেবিলের অস্তিত্ব আছে ও টেবিলের অস্তিত্ব নাই। তিনি একই সাথে পরস্পর বিরোধী দুইটি উক্তিকে স্বীকার করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। দার্শনিক বার্কলের মতো তিনি বলেন যে ধারণা হিসাবে একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিন্তু মূর্ত বা বাস্তব বস্তু হিসাবে তার অস্তিত্ব নাই। তিনি ধারণা ও বাস্তবের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা বলা যায় যে বাস্তব টেবিল অস্তিত্বশীল এবং ধারণাগত টেবিল অস্তিত্বশীল।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে তিনি দুই প্রকার অস্তিত্বের কথা বলেন। অস্তিত্বের কেবলমাত্র দুইটি স্তর আছে। (১) বুদ্ধিগ্রাহ্য অস্তিত্ব বা ধারণাগত অস্তিত্ব এবং (২) মূর্ত, প্রকাশিত অস্তিত্ব বা বাস্তব অস্তিত্ব। বস্তুগুলো বাহ্যিক জগতে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে অস্তিত্বশীল ছিল অর্থাৎ ধারণা হিসাবে সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য রকম। বাস্তব জগতে কোন বস্তু অস্তিত্বশীল না হলে আমরা সে বস্তুর সম্পর্কে কোন ধারণা গঠন করতে পারি না।

'ধারণাগত অস্তিত্ব' ও 'বাস্তব অস্তিত্ব' এক ও অভিন্ন—এই ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর সূফী দর্শনের অনেকগুলো মতবাদ যেমন, বিশ্বের নিত্যতা ও অনিত্যতা, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব গড়ে তুলেন। তাঁর মতে এই বিশ্বজগৎ এমন কি মানুষও নিত্য ও অনিত্য, অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল উভয়ই। এই বিশ্বজগৎ নিত্য বা চিরন্তন কেননা আল্লাহ্র চিরন্তন জ্ঞানের মধ্যে এর অস্তিত্ব আছে। পুনরায়, এই বিশ্বজগৎ অনিত্য কেননা এর বাহ্যিক আকার বা আকৃতি আছে। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। সৌভাগ্যের কথা এই যে তিনি বিশ্বজগতের নিত্যতা ও অনিত্যতা এই দুইটি দিক ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

তাঁর মতে সত্তা ও তাঁর প্রজাতি নিয়রূপ। সত্তা দুই প্রকার (১) স্বয়ং সম্পূর্ণ

পরম সত্তা। এই সত্তা নির্গুণ, অনির্দিষ্ট সত্তাসার ও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, (২) সাপেক্ষ সত্তা বা বিশ্বজগৎ। এই জগতে জড় জগতে, এর সাপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তার উপর নির্ভরশীল। সাপেক্ষ সত্তা দুইভাগে বিভক্ত (১) স্বতন্ত্র দ্রব্য এবং (২) নির্ভরশীল গুণ, দেশকালিক সম্বন্ধ। স্বতন্ত্র দ্রব্য দুইভাগে বিভক্ত (১) জড় বস্তু এবং (২) আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা বিশুদ্ধ আত্মা।

সাপেক্ষ সত্তা বাস্তব জগতের অস্তিত্বশীল বস্তুর মতো বাস্তব সত্তা হতে পারে অথবা সুপ্ত অবস্থায় থাকার মতো সম্ভাব্য সত্তা হতে পারে।

অ-সত্তা দুই প্রকার। অস্তিত্বের চারিটি স্তরের সকল স্তরে অস্তিত্বশীল সত্তা এবং অস্তিত্বের যে কোন একটি স্তরে অস্তিত্বশীল কিন্তু অন্যান্য স্তরে অস্তিত্বহীন সত্তা। অস্তিত্বের একটি স্তরে অস্তিত্বশীল সত্তা ধারণাগত সত্তা অথবা সম্ভাব্য সত্তা হতে পারে।

বিশুদ্ধ অ-সত্তা বা অনস্তিত্বের অ-সত্তা চিন্তার বিষয়বস্তু নয়, অন্যান্য অনস্তিত্বের ধারণা চিন্তার বিষয়বস্তু হতে পারে। যৌক্তিক নিয়মে এর বিপরীতের সাহায্যে একে জানা যায়।[১]

সত্তা (১) আবশ্যিক ও অনিবার্য, (২) সম্ভাব্য ও (৩) অসম্ভাব্য হতে পারে। আবশ্যিক সত্তা এমন একটি সত্তা যা স্বয়ম্ভূ, আপনা হতেই অস্তিত্বশীল, আর আল্লাহ্ই একমাত্র আবশ্যিক সত্তা। সম্ভাব্য সত্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই বা এর আবশ্যিক কোন যুক্তি নাই। সম্ভাব্য সত্তা অসত্তা ও সত্তা উভয়ই হতে পারে। অসম্ভব সত্তা এমন একটি সত্তা যার অনস্তিত্ব যুক্তিমূলক প্রজ্ঞা দ্বারা আবশ্যিকরূপে স্বীকৃত হয়। তাঁর মতবাদের মধ্যে সম্ভাব্য সত্তা অস্তিত্বহীন। তাঁর মতে সম্ভাব্য সত্তা বলে কিছু নাই, যদিও 'আয়ান আস সাবিতা' বা প্লেটোর ভাষায় ধারণা বা বস্তুর মূল আদর্শকে অনেক সময় সম্ভাব্য সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সত্তাগুলো আবশ্যিক হয় এই অর্থে যে সেগুলো অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা হলেও তাকে অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হয়। এ বিষয়ে তিনি দার্শনিকদের মতবাদ হতে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন যে সত্তা হয় নিজ হতেই আবশ্যিক হয় অথবা আবশ্যিক সত্তা দ্বারা আবশ্যিক হয়। দার্শনিকদের মতে সত্তা দুই প্রকার—আবশ্যিক সত্তা ও সম্ভাব্য সত্তা। তিনি এই বিভাগকে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন যে সূফী বা জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন 'সম্ভাবনা' শব্দের অর্থ

১. Dr. A. E. Affifi : Ibid, p. 9

কি, সত্তার মাঝে এর স্থান কোথায় এবং কোন অর্থে সম্ভাবনা শব্দকে আবশ্যিক বলা হয়।[১] আফিফি সাহেব এ বিষয়ে সঠিক মন্তব্য করে বলেন ইবনুল আরাবী যা বুঝাতে চান তা দার্শনিকদের মতবাদ হতে ভিন্ন নয়।[২] আবশ্যিক, সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সত্তার এই তিনটি শ্রেণী হতে তিনি আবশ্যিক ও অসম্ভাব্য এই দুইটি শ্রেণীকে স্বীকার করেন এবং সম্ভাব্য শ্রেণীর সত্তাকে অস্বীকার করেন।[৩]

এক ও বহু বা পরম সত্তা ও অবভাস

ইবনুল আরাবীর মতে পরম সত্তা অস্তিত্বশীল। এই সত্তাকে দুই ভাবে বুঝা যায়—এক পরম সত্তা হিসাবে এবং বহু সৃষ্ট বস্তু হিসাবে। পরম সত্তাসারের দিক হতে লক্ষ্য করে এটাকে এক আসল সত্তা এবং দৃশ্যমান বিশ্বজগতের মধ্যে বাস্তবায়িত বা প্রকাশিত সত্তার দিক হতে লক্ষ্য করে এটাকে 'বহু' বলা যায়। বস্তু ও বস্তুরূপ বা মূল সত্তা ও অবভাস পরম সত্তার দুইটি দিক এবং এক ও বহু একই পরম সত্তার দুইটি দিক। সত্তা মূলতঃ এক কিন্তু বাহ্যিক জগতে 'এক' সত্তাকে 'বহু' বলে মনে হয়, অর্থাৎ সত্তা স্বরূপে এক কিন্তু রূপে বহু। এই মূল সত্তার নাম আল্লাহ্। সত্তাসারের দিক হতে লক্ষ্য করলে এক, সত্তার বাহ্যিক দিক হতে লক্ষ্য করলে এর সংখ্যা বহু বলে মনে হয়।[৪] তাঁর এই মতবাদ প্লটিনাসের 'পরম একক সত্তা' সম্পর্কীয় মতবাদের মতো। প্লটিনাসের পরম একক সত্তা সর্বত্র আছে আবার কোথাও নাই। এই অন্তর্ব্যাপিতা ও অতিবর্তিতার দিক হতে সামঞ্জস্য থাকলেও দুই চিন্তাবিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্লটিনাসের সত্তা বিশ্বজগতের স্বতন্ত্র কারণ, কিন্তু ইবনুল আরাবীর পরম সত্তা কোন স্বতন্ত্র কারণ নয়, এ সত্তা বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তা। অবশ্য অন্তর্নিহিত সত্তা হয়েও এক বিশেষ অর্থে স্থান কালের অতীত। তিনি বলেন বিভিন্ন দৃষ্টিভংগির জন্যই এক পরম সত্তাকে বহুরূপে দেখা যায়। আসলে পরম সত্তার কোন বিভাগ নাই। সত্তাসারের বিভাগের ফলে 'বহুত্ব' সৃষ্টি হয়নি, ঐক্যের আত্মপ্রকাশের ফলেই 'বহুত্বের' উৎপত্তি হয়। 'বহুত্ব' একত্বেরই প্রকাশিত অবস্থা মাত্র।[৫]

১. Fusus p. p. 66—67.
২. A. E. Affifi. Ibid, p. 10.
৩. Ibid. p, 10,
৪. Fusus, p, 147
৫. Fusus, p, 417

তাঁর তত্ত্ববিদ্যা এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অনেক সময় জ্ঞানমূলক দিকটা তাত্ত্বিক দিকের সাথে মিশে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্তার দ্বৈততা স্বীকার করেননি। তত্ত্বগতভাবে একমাত্র পরম সত্তাই অস্তিত্বশীল, জ্ঞানগতভাবে মূল সত্তার দুইটি দিক আছে—(১) অবভাসিক জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অতিবর্তী এক পরম সত্তা বা আল্লাহ্‌ এবং (২) বাহ্যিক জগতের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব যার ব্যাখ্যা ও ঐক্য এক পরম সত্তায় নিহিত।[১]

তিনি যৌক্তিক ভিত্তিতে পরম সত্তার এই দুইটি দিকের মধ্যে একটি প্রভেদ রেখা টেনেছেন।[২] বাহ্যিক জগতের বৈচিত্র্যময় বহুত্ব সম্ভাব্য, অনিত্য, পরনির্ভরশীল সত্তা এবং তাদের অস্তিত্বের জন্য সেগুলো এমন একটি সত্তার উপর নির্ভরশীল যা স্বয়ং অস্তিত্বশীল, নিত্য, চিরন্তন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং আবশ্যিক ও অনিবার্য।[৩] এক ও বহুর মধ্যে পার্থক্য সত্তাসার ও গুণ বা দ্রব্য ও গুণের পার্থক্যের সমান।[৪] এক ও বহু বা ঐক্য ও বৈচিত্র্য যুক্তিগতভাবে পৃথক হলেও মূলতঃ এক ও অভিন্ন[৫] —এটা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্কের সমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা অজ্ঞেয়, অনির্বচনীয় ও অনির্ধারিত কিন্তু এটা যখন বহুত্বের মাঝে প্রকাশ পায় তখন এটাকে পরম সত্তার বাহ্যিক প্রকাশরূপে গণ্য করা হয়। এটা তখন জ্ঞানের আওতায় আসে, এটাকে তখন জানা সম্ভব হয়।

সসীম শক্তির অধিকারী মন 'সমগ্র'কে একটি সমগ্ররূপে বুঝতে পারে না বলে এক পরম সত্তাকে বহু সত্তা বলে চিন্তা করে, একটিকে অন্যটি হতে পার্থক্য করার জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য একটি সত্তায় আরোপ করে। তাঁর মতে একজন সূফী বা জ্ঞানী ব্যক্তি তন্ময় অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে বহুত্বের অন্তরালে অবস্থিত এক পরম সত্তার সন্ধান পান এবং বুঝতে পারেন যে এই সত্তা মৌলিক, একক ও অবিভাজ্য। ধর্মীয় ভাষায় এই পরম সত্তাই আল্লাহ্‌ এবং 'বহুত্ব' সৃষ্টজীব ও পার্থিব জগৎ।[৬] 'এক' প্রভু আর বহু সেবক বা বান্দা[৭] এক ঐক্য এবং বহু

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 11
২. Ibid, p. 11
৩. Fusus pp. 27—28, 180
৪. Ibid p. 225
৫. Ibid. p. 101
৬. Fusus ul Hikam, pp. 137—138, 197
৭. Ibid. pp. 196, 272

বৈচিত্র্য[১] ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেক সময় তিনি পরস্পর বিরোধী উক্তি করে বলেন 'স্রষ্টাই সৃষ্টজীব ও বস্তু, আমিই সে এবং সে-ই আমি', 'আমি সে এবং সে নয়', স্রষ্টাই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই স্রষ্টা।[২] একই পরম সত্তার দুইটি দিক হিসাবে তাঁর উক্তির মধ্যে সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তা বিরোধপূর্ণ নয়। তাঁর মতে, এক ও বহু, পরম সত্তা ও বিশ্বজগৎ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি পরস্পর নির্ভরশীল, দুইটি যৌক্তিক সম্পর্কের মতো একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন।[৩]

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন ধরনের জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটেছে৷ (১) আশারীয়দের সাধিক দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদ (২) হাল্লাজের 'লাহুত' (ঐশী সত্তা) ও 'নাসুত' (মানবীয় সত্তা) মতবাদ এবং (৩) নব্য প্লেটোবাদীদের এক সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ। স্বতন্ত্রভাবে তিনটি মতবাদের কোনটির সাথেই তাঁর মতবাদ এক নয়, তাঁর মতবাদ তিনটির সমন্বয়ের সমষ্টি। বিশেষ করে তাঁর 'এক ও বহু' সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে হাল্লাজের 'লাহুত, ও 'নাসুত' মতবাদের প্রভাব খুব বেশী। তিনি অনেক সময় আকার বা 'সুরত' এবং সত্তাসার বা 'জাত' শব্দ দিয়ে হাল্লাজের 'নাসুত' ও 'লাহুত'কে বুঝিয়েছেন ও অনেক সময় 'নাসুত' ও 'লাহুত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদিও হাল্লাজ তাঁর অদ্বৈতবাদী মতবাদের পথ প্রদর্শক। আর হাল্লাজের মাধ্যমেই হেলেনীয়দের বিশ্বের দ্বৈতবাদ তিনি জেনেছেন। এই মতবাদ হাল্লাজের। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগৎ বা জড় জগৎ সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'আলম-উল-আমর,' 'আলম-উল-গায়েব,' 'আলম-উল-আরওয়াহ,' আলম-উল-মায়ানী' হাল্লাজের 'লাহুত' জগৎ এবং তাঁর 'আলম-উল খালক,' 'আলম-উল-তবিয়াহ,' 'আলম উল-আজসাদ' ইত্যাদিই হাল্লাজের জড় জগৎ বা 'নাসুত'।[৪] দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা, কিন্তু হাল্লাজের পরে এই মতবাদের

---

১. Ibid, p. 283

২. (i) ibid, pp. 102, 107, 110, 137, 138, 197, 219. 220, 283
(ii) Futuhat. 1. p. 899

৩. Dr. A. E. Affifi : ibid, p. 13

৪. Ibid, p. 13

৫. Ibid, p. 14

বহু রূপান্তর ঘটেছে। তাঁর ও ইবনুল আরিদের দর্শনের মধ্যে 'লাহুত' ও 'নাসুত'কে একই পরম সত্তার দুইটি দিক হিসাবে দেখা যায়। 'লাহুত' ও 'নাসুত', ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব, সত্তাসার ও আকার একই সত্তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুইটি অবস্থা বা দুইটি দিকের নাম মাত্র, এখানে 'লাহুত' ও নাসুত' আলাদা সত্তা নয়। তাঁর ও ইবনুল আরিদের অদ্বৈতবাদী দর্শনের মধ্যে 'লাহুত' ও 'নাসুত' সমমর্যাদার অধিকারী, একটি অন্যটির সম্পূরক। অনেক সময় হাল্লাজও ইবনুল আরাবীর মতো মত প্রকাশ করেছেন। তবে এই রকম উক্তির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া ঠিক না, কেননা তিনি নিজে দার্শনিকও ছিলেন না কিংবা তিনি কোন দার্শনিক মতামতও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নি। হাল্লাজ বলেছেন যে, স্বরূপ ও রূপ অভিন্ন অথবা মূল সত্তা ও অবভাস এক সমান। মূল সত্তা জাগতিক সত্তার মধ্যে আছে বলেই মূল সত্তা ও জাগতিক সত্তা এক সমান। অন্যত্র বলেছেন, "আমি সত্য কেননা আমি সত্য কর্তৃক কখনও অসত্য বলে বিবেচিত হইনি।"[১] কেবলমাত্র প্রভুত্ব ছাড়া তোমার ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। "সেই-ই আমি এবং আমি-ই সেই, একমাত্র অনিত্যতা ও চিরন্তনতা ছাড়া আমার আমিত্ব ও তোমার তুমিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"[২] মোটকথা, হাল্লাজ সব সময়েই মানুষের মধ্যে দুইটি প্রকৃতির কথা স্বীকার করেছেন—একটি ঐশী এবং অপরটি মানবীয়, তন্ময় অবস্থায় এই দুইটির মিলন ঘটে এবং কেবলমাত্র তখনই মানবীয় বা অবভাসিক সত্তা ঐশী সত্তা বলে দাবী করে। অপরপক্ষে, ইবনুল আরাবী এই অর্থে 'মিলন' অথবা 'লীন হয়ে যাওয়া' অথবা 'অবতারে' বিশ্বাস করেন না। তিনি সব সময়েই একটি মূল সত্তার অথবা একই মূল সত্তার দুইটি দিকের কথা বলেছেন এবং দুইটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা স্পষ্টরূপে মনে রেখেছেন। এক সময় তিনি হাল্লাজের অবতারবাদ খণ্ডন করেছেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, "আমি পরম সত্যের রহস্য, স্বয়ং পরম সত্য নই," এখানে 'রহস্য' বলতে মানবীয় বা অবভাসিক দিক বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে পরম সত্তা লুকিয়ে আছে, দুইটিই এখানে আছে, একটি আর একটিতে রূপান্তরিত হয়—এ কথা বলা যায় না।

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 15, quoted from Hallaj, Massignon, p. 62.
২. Ibid, p. 15; quoted from. Hallaj. Massignon, pp. 59—60.

'এক' ও বহু'র 'সম্পর্ক'

একত্ব ও বহুত্বের সম্পর্ক যৌক্তিক ও ধর্মীয় দিক হতে ব্যাখ্যা করার সময়ে ইবনুল আরাবী অনেক রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই সব রূপক বুঝার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন না করলে এমন ভুল হতে পারে যা হতে তাঁকে একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক মনে না হয়ে একজন দ্বৈতবাদী দার্শনিক বলে মনে হতে পারে। রূপকগুলোর দুই একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

(১) দর্পণ ও প্রতিরূপ রূপক, যা অতি সহজেই বস্তু ও তার ছায়ার কথা বুঝাতে পারে। একক পরম সত্তাকে একটি বস্তু মনে করা হয়েছে যা বিশ্বের বিভিন্ন দর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং দর্পণগুলোর নিজস্ব প্রকৃতি বা নিজস্ব শক্তি অনুসারে পরম সত্তার প্রতিরূপ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন আকার ও রূপ প্রকাশ করেছে। বহুত্ব বা বিশ্বজগৎ দর্পণ-প্রতিরূপ, অতীন্দ্রিয় জগতের পরম সত্তার ছায়া। সমগ্র বিশ্ব একটি ছায়াবাজীর খেলা, বাহ্যিক জগতের বস্তুগুলো যে পর্দায় প্রতিফলিত হয় তা হতে আমরা বহু দূরে আছি এবং বিশ্বাস করি যে আমাদের দেখা পর্দায় প্রতিফলিত ছবিগুলো বাস্তব।[১] তিনি রূপকের ব্যর্থকতা সম্পর্কে খুব সচেতন এবং দ্বৈত আভাষকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ছায়ার মূল উৎস এবং ছায়া এক ও অভিন্ন অর্থাৎ দুইটি মিলে একটি।

(২) দ্রব্য ও গুণের রূপক। তাঁর মতে 'দ্রব্য' 'গুণের' মধ্যে যে ভাবে মিশে থাকে 'বহু'র মধ্যে 'এক' সেইভাবে মিশে আছে। আবার খাদ্য যেমন দেহের সাথে মিশে যায়, 'বহু' তেমনি একের মধ্যে মিশে যায়।[২]

আল্লাহ্ আমাদের অন্তর্নিহিত "আধ্যাত্মিক খাদ্য"[৩] কেননা তিনিই আমাদের সত্তাসার। বিশ্বজগৎ যেন তাঁর (আল্লাহ্‌র) খাদ্য কারণ এই বিশ্বের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর গুণে গুণান্বিত। ইবনুল আরবী ও হাল্লাজ উভয়েই বলেছেন যে সর্বত্র আত্মা জড়কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিচালনা করে, এক সার্বিক দ্রব্য সকল কিছুর মাঝে বর্তমান থেকে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। হাল্লাজের চিন্তাধারার মধ্যে কোন রূপক ব্যবহার হয়নি বললেই চলে, কিন্তু তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল

১. Fusuaul Hikam, pp. 13—14, 49—50, 363—364, 170, 174 177.
২. Futuhatul Makkiyah, 11, p. 89.
৩. Fususu Hikam, p. 174.
৪. Ibid, pp. 114, 117, 126.

ওজুদ' দর্শন রূপকের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং রূপক বাদ দিলে তাঁর দর্শন বলে কিছু থাকবে কি না সন্দেহ আছে।

(৩) 'নৌকা' এবং তার প্রত্যাবর্তন রূপক।[১] এই রূপক দ্বৈত সত্তার প্রতি ইংগিত দেয়। এক পরম সত্তা মূল উৎস যা হতে 'বহু'র উৎপত্তি হয় এবং যেখানে সর্বশেষে ফিরে যায় এবং বহু ও একের মধ্যে সম্পর্ক নৌকা ও তার মধ্যে অবস্থিত বস্তুর সম্পর্কের মতো, অর্থাৎ বহুর মধ্যে এক লুকিয়ে আছে।

(৪) গাণিতিক সংখ্যা 'এক' গাণিতিক 'বিন্দু' ও একটি চক্রের কেন্দ্রবিন্দুর উপমা।[২] গাণিতিক একের উপর যেমন গণিতের অসংখ্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে থাকে তেমনিভাবে একের উপর বহুত্ব দাঁড়িয়ে আছে। 'এক'ই মূলতঃ 'বহু'র ভিত্তি। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও গাণিতিক এককের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক অসংখ্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে আছে, তবুও অসংখ্য সংখ্যাকে এককের প্রকাশ বলা যায় না, যে অর্থে জাগতিক বহুত্বকে পরম একত্বের প্রকাশ বলা যায়। সংখ্যাগুলো একক সংখ্যার সমষ্টি এবং যদি এই উপমাকে আমরা ব্যবহার করি তবে পরম এককও বাহ্যিক বহুত্বের সমষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু ইবনুল আরাবী নিজে এমন অর্থ করতে রাজী নন।

(৫) সজীব দেহ ও তার অংগ-প্রত্যংগের উপমা।[৩] এক পরম সত্তা যেন একটি সজীব দেহ এবং অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের একটি অপরটি হতে ভিন্ন অংশ এবং সমগ্র সজীব দেহের সাথে সম্পর্কহীন বললে অংগ-প্রত্যংগগুলোর নিজস্ব কোন তাৎপর্য থাকে না। পরম এককে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি বলা যায়—পরম একক একটি সাংগঠনিক ঐক্য বলে মনে করা যায় এবং এর মধ্যে একটি সত্তাসার মিশে (অন্তর্নিহিত অবস্থায়) আছে। কোন অদ্বৈতবাদী বা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদে বিশ্বাসী দার্শনিকের পক্ষে এমন উদাহরণ দেওয়া বিস্ময়কর কিছু নয় তবে, একটা প্রশ্ন জাগে যে অবভাসিক জগৎ বা বাইরের জগতের তেমন কোন সত্তার ঐক্য আছে কি? সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য মানুষের মন, সমগ্র বিশ্বের এই ধরনের ঐক্য আছে বলে মনে হয় না। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে 'জড় বস্তু' আর 'জড়' নাই বললেই চলে কেননা সেগুলোকে 'আত্মিক' রূপ দেওয়া হয়েছে, আর

১. Ibid, p. 127.
২. Ibid, pp. 103, 106.
৩. Ibid, p. 363.

মোটের উপর 'সমগ্র বিশ্বকে' একটি 'সার্বিক আত্মা' বলা যায় যার মধ্যে ঐক্যের মাত্রা মানুষের মনের ঐক্য মাত্রার চেয়েও বেশী পরিমাণে আছে বলে মনে হয়।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এইভাবেই তিনি তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' দর্শনের মূল কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে উপমা বা রূপকের সাহায্যে কোন সুষ্ঠু দর্শন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তিনি কখনও বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে তাঁর মতবাদকে পরীক্ষা করার অনুমতি দেননি, এবং বুদ্ধি দিয়ে তাঁর তেমন ঐক্যকে বোঝা যায়নি। অপরপক্ষে তিনি সর্বদা সূফী সাধকের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্য নিয়েছেন পরম এক ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য।

তিনি মূল সত্তা ও বিশ্বজগতের মধ্যে পার্থক্য করতে চান না। যদি আদৌ কোন পার্থক্য করা হয় তবে তা সত্তাসার ও আকার, মূল সত্তা ও বিশ্বের মধ্যে যেভাবে দেখানো হয় সেইভাবে করতে হয়। একটি বিশেষ অর্থে ছাড়া একটি বস্তুর বিধেয়কে অন্য বস্তুতে আরোপ করা যায় না। সব সময়েই মনে রাখতে হয় যে 'সব কিছু মিলে এক'।[১] তাঁর মতে প্রত্যেকটি জিনিস সত্য কিন্তু মূল সত্য বা পরম সত্য নয়। যে দাস বা বান্দা সে বান্দাই এবং যে প্রভু সে প্রভুই,[২] এক পরম সত্তাসার বিভিন্ন রূপ ও আকারের মধ্যে থাকলেও তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। বহুত্বের দুইটি দিক আছে। যৌক্তিক দিক ও বাস্তব দিক। (ক) যৌক্তিক দিক হতে একটি অপরটি হতে ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি পরম সত্তা হতে ভিন্ন, আর এটা পার্থক্য ও প্রভেদের দিক। (খ) বাস্তবিকভাবে একটি অপরটির সমান, একটি অপরটি হতে অভিন্ন এবং প্রত্যেকটি পরম সত্তার সমান। আর এটা ঐক্যের দিক। উপরোক্ত দিকটি তাঁর মতে সম্ভাবনামূলক, দাসত্বমূলক, নিত্যমূলক এবং পরবর্তী দিকটি আবশ্যিক, অনিবার্য, প্রভুত্বমূলক ও চিরন্তন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পায়। এবং আমরা জানি কোন অর্থে একজন বান্দা প্রভু হয়, অবভাস বাস্তব হয়, রূপ স্বরূপ হয়, ছবি আসল হয়। আমরা জানি যে কোন অর্থে তাঁর মতবাদকে ব্যাখ্যা করতে হয়।

ঐক্যের অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা

ইবনুল আরাবীর মতে আল্লাহ্‌ বা পরম সত্তার অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী দুইটি গুণ আছে। পরম সত্তা ও বিশ্বজগতের মধ্যে যে ভাব দেখা যায় তা সত্তার মধ্যে

১. Ibid, p. 272.
২. Ibid, pp. 142, 150.

দ্বৈত নয়। এটাকে প্রভেদকারী গুণাবলীর দ্বৈতভাব বলা যায়। তাঁর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' দর্শনে পরম সত্তার অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতার ব্যাখ্যা স্বারা গড়ে উঠেছে।

'তসবিহ' ও তানজিহ'[১] এই দুইটি আরবী শব্দ প্রথমে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ কর্তৃক সৃষ্ট জীবের সাথে আল্লাহ্‌র তুলনীয় ও অতুলনীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার প্রসংগে ব্যবহার করা হতো। পরে ইবনুল আরাবী শব্দ দুইটির অর্থ পরিবর্তন করেন। তিনি শব্দ দুইটিকে অধিক দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। পূর্বেকার নরারোপবাদী ও দেহারোপবাদী চিন্তাবিদরা মানুষ ও অন্যান্য জীবের গুণাবলীর মতো গুণাবলী আল্লাহ্‌য় আরোপ করতেন। একজন অতিবর্তী খোদাবাদী আল্লাহ্‌কে মানবীয় গুণাবলী হতে মুক্ত রাখতেন। এই অর্থে কোন একজন চিন্তাবিদ নরারোপবাদী ও দেহারোপবাদী চিন্তাবিদ না হয়েও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাবিদ হতে পারেন, আর এখানে মানুষ, অন্যান্য জীব ও জড় বস্তুর গুণাবলীর মতো গুণাবলী আল্লাহ্‌য় আরোপ করা যায় এবং এখানে আল্লাহ্ মানুষ ও অন্যান্য বস্তু বা সমগ্র বিশ্বের সাথে অভিন্ন বা সমান না হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা হতে পারে। তাঁর দর্শনে এই রকম ধারণার স্থান নাই, কেননা অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী 'তানজিহ' ও 'তসবিহ' শব্দ দুইটি এখানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নরারোপবাদী চিন্তাবিদগণের মতে "আল্লাহ্ শুনেন বা আল্লাহ্ দেখেন কেননা আল্লাহ্‌র শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, দর্শন-ইন্দ্রিয়, দেহ, হাত ইত্যাদি আছে। তিনি তাঁদের মতো বিশ্বাস করেন না যে আল্লাহ্‌র শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, দর্শন-ইন্দ্রিয় বা হাত আছে, তাঁর মতে যারা শুনেন, দেখেন বা যাদের হাত আছে তাদের মাঝে অন্তর্নিহিত বা অনুস্যূত সত্তা হিসাবে আল্লাহ্ বর্তমান আছেন।"[২] আল্লাহ্ সকল সত্তার মধ্য থেকে শুনেন এবং দেখেন, আর এর অর্থই যারা শুনেন বা দেখেন তাদের মাঝে অন্তর্নিহিত সত্তা হিসাবে আল্লাহ্ বিরাজমান। অন্যদিকে, আল্লাহ্‌র সত্তাসার কোন একজন ব্যক্তি অথবা একদল ব্যক্তি যারা শুনেন ও দেখেন তাদের মধ্যে সীমিত নয়, সত্তাসার সকল সত্তার মাঝে ও সকল বস্তুর মাঝে বর্তমান। আর এই অর্থে আল্লাহ্ এক অতিবর্তী সত্তা কেননা তিনি সকল সসীমতা ও একক ব্যক্তির সীমাবদ্ধতার বহু উর্ধ্বে। সার্বিক দ্রব্য হিসাবে আল্লাহ্ সকল বস্তুর

১. Dr. Mir Valiuddin : The Quranic Sufism, pp. 44—85. Patna, 1959.
২. Futuhatul Makkiyah II, p. 468.

সত্তাসার। অতএব তাঁর দর্শনে 'অতিবর্তিতা' ও 'অন্তর্ব্যাপিতা' (তানজিহ্ ও তাসবিহ্') 'অসীমতা' ও 'সসীমতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ও শব্দ দুইটি কম বেশী জড়বাদী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ যে অর্থে শব্দ দুইটি ব্যবহার করতেন, তিনি তা হতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। উপরোক্ত অর্থে তিনি নরাত্বরোপবাদ ও দেহাত্বরোপবাদ অস্বীকার করেন। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্-র দুইটি গুণ অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা ব্যাখ্যা করার সময়ে তিনি নরাত্বরোপবাদী ও দেহাত্বরোপবাদী মতবাদ অস্বীকার করে বলেন যে আল্লাহ্-র কোন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত নাই। এই অর্থে আল্লাহ্ শোনেন, দেখেন যে যারা স্বীয় চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা শোনেন বা দেখেন, তিনি তাদের মাঝে বর্তমান। যারা কান দিয়ে শোনেন, হাত দিয়ে কাজ করেন, পা দিয়ে চলেন, আল্লাহ্ তাদের অন্তর্নিহিত সত্তা।[১] চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদি সীমিত আকারে প্রকাশিত হওয়া আল্লাহ্-র অন্তর্ব্যাপিতা বোঝায়, কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্-র পরম সত্তাসার সকল সসীমতার ঊর্ধ্বে আর এটাই তাঁর অতিবর্তিতা। একই রকম যুক্তির ভিত্তিতে তিনি খ্রীস্টান ধর্মের অবতারবাদ অস্বীকার করেন। যদি বলা যায় যে যীশুখ্রীস্ট আল্লাহ্ তবে তা সত্য এই অর্থে যে অন্যান্য সকল কিছুই আল্লাহ্ এবং যখন বলা হয় যে যীশুখ্রীস্ট মরিয়মের পুত্র, একথাও সত্য। কিন্তু যখন বলা হয় যে মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীস্ট আল্লাহ্ তখন তা মিথ্যা ও অসত্য কারণ এই বাক্যের এমন অর্থ হয় যা দিয়ে বোঝায় যে আল্লাহ্ কেবলমাত্র যীশুখ্রীস্ট এবং তিনি অন্য কিছু নন। আল্লাহ্ 'তুমি' 'আমি' এবং এই বিশ্বের অন্যান্য প্রত্যেকটি বস্তু। আল্লাহ্ সকল কিছু, প্রত্যক্ষযোগ্য ও অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু, জড় ও আধ্যাত্মিক বস্তু। আল্লাহ্কে কেবলমাত্র 'আপনি' বা 'আমি' অথবা 'যীশুখ্রীস্ট' বলা অথবা তাঁকে কোন একটি আকারে সীমাবদ্ধ করাই নাস্তিকতা মাত্র, আল্লাহ্ সব কিছুর আকার, এমনকি তিনি ধারণাগত আকারও। যখন কোন মানুষ বলে যে সে আল্লাহ্কে বিশেষ বিশেষ বর্ণে, গঠনে বা আকারে দেখেছে, তখন তিনি যা বলতে চান তার অর্থ আল্লাহ্ তাঁর অসংখ্য আকারের কোন একটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের আকার ও জড়মূর্তি আকারে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা পরম সত্তার দুইটি দিক

১. Ibid, I. pp. 122-123, Fusus, pp. 77-78.

যা আমরা জানতে পারি। এই দুইটির কোন একটি এককভাবে পরম সত্তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাঁর মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে আল্লাহ্‌র উভয় দিকের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নূহ নবীর ধর্ম আল্লাহ্‌র অতিবর্তিতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে কেননা তখন দেবতাবাদ খণ্ডনের জন্য তা প্রয়োজন ছিল।[১] নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইনে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে[২] :

যদি তুমি (শুদ্ধ) অতিবর্তিতার কথা বল তবে তুমি আল্লাহ্‌কে সীমাবদ্ধ কর এবং যদি তুমি (শুদ্ধ) অন্তর্ব্যাপিতার কথা বল তবে তুমি তাঁকে সংজ্ঞায়িত কর। কিন্তু যদি উভয় দুইটিই বল, তবে তুমি সঠিক পথ অনুসরণ কর এবং তুমি একজন ঐশী জ্ঞানের পথ প্রদর্শক এবং দিব্যজ্ঞানের অভ্রান্ত শিক্ষক হও। যে ব্যক্তি দ্বৈততা স্বীকার করে সে একজন দেবতাবাদী এবং যে একত্ব স্বীকার করে সে একত্ববাদী, 'তসবিহ্‌' বা অন্তর্ব্যাপিতা হতে সাবধান হও যদি তুমি আল্লাহ্‌ ও বিশ্বকে দুইটি মনে কর, 'তানজিহ্‌' বা অতিবর্তিতা হতে সাবধান হও যদি তুমি তাঁকে একক মনে কর। তুমি সে নও, বরং তুমি সে এবং তুমি তাঁকে দেখ অসীম ও সসীম বস্তুর সত্তাসার বা আদর্শ সত্তার মধ্যে।

"যে 'হক' বা পরম সত্তার প্রতি অতিবর্তিতা আরোপ করা হয় তাই 'খালক' বা সৃষ্ট জগৎ, তার প্রতি অন্তর্ব্যাপিতা আরোপ করা হয় যদিও যুক্তিগতভাবে স্রষ্টাকে সৃষ্টি হতে পৃথক করা হয়েছে।"[৩]

যদিও অন্তর্ব্যাপী দিক ব্যাখ্যা করার সময় তিনি বলেন যে বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্‌, তবুও উল্টোটা অর্থাৎ অতিবর্তী দিক ব্যাখ্যার সময় খুব সাবধান হন নি। অস্তিত্বশীল সকল বস্তুর সমষ্টি হিসাবে আল্লাহ্‌ সবকিছু। আল্লাহ্‌ বহুত্বের অন্তরালে ঐক্য, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে পরম সত্তা, এটাই আল্লাহ্‌র অতিবর্তী দিক।

সর্বেশ্বরবাদী মতবাদে হয় আল্লাহ্‌ অথবা বিশ্ব, স্রষ্টা অথবা সৃষ্টি এই দুইটির যে কোন একটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। পার্থিব জগৎ মায়ার জগৎ। একমাত্র সত্য বা পরম সত্তা আল্লাহ্‌ অথবা আল্লাহ্‌ মানব মনের সৃষ্ট সত্তা

১. Fusus, pp. 78-82.
২. Ibid, pp. 76-77, 151.
৩. Fusus, p. 106.

বা কল্পিত সত্তা এবং দৃশ্যমান জগতই একমাত্র সত্তা বা পরম সত্তা।[১] তিনি আল্লাহ্‌কে পরম সত্য বলেছেন এবং দৃশ্যমান জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করেছেন। তাঁর ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ 'মতবাদের মধ্যে পরম সত্তার' অতিবর্তিতা স্বীকার করে তিনি স্থূল জড়বাদী দর্শন সৃষ্টির হাত হতে মুক্তি পেয়েছেন। তা ছাড়া জড়বাদী দর্শনের সকল সমালোচনা তাঁর সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে আরোপ করা যেত।

এ ক্ষণ পর্যন্ত এক ধরনের ঐক্য বা অতিবর্তিতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি এর চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে জ্ঞানমূলক ঐক্য বা অতিবর্তিতা আল্লাহ্‌র প্রকৃতিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অসীম সত্তারূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনকি যদি আল্লাহ্‌কে অমূর্ত অতিবর্তি সত্তারূপে কল্পনা করা হয় তবুও তা এক ধরনের সীমাবদ্ধতা[২] হয়ে পড়ে কারণ তা দিয়ে আল্লাহ্‌ ও তাঁর বাইরে অতিবর্তী ধারণা আরোপকারী একজন মানুষের অস্তিত্বের কথা উল্লেখিত হয়। সত্তা সম্পর্কে কোন উক্তি করা সত্তাকে সীমাবদ্ধ করা বোঝায়, সুতরাং আল্লাহ্‌র জ্ঞানমূলক ঐক্য বা অতিবর্তিতাও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। বুদ্ধির সাহায্যে অতিবর্তিতা আল্লাহ্‌য় আরোপ করে পরম সত্তার দুইটি দিক তুলনামূলকভাবে বোঝান যায়, এ দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা বা বর্ণনা করা যায় না। দার্শনিকদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কে পূর্ণ অতিবর্তী ধারণা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মনে করেন যে দার্শনিকরা কেবলমাত্র জ্ঞানমূলক চেতনা বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যে ঐক্য বা অতিবর্তী ধারণা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করেন তা অবরোহমূলক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না আর এই জ্ঞান পরিদৃশ্যমান জগতের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। তিনি এ বিষয়ে হাল্লাজকে অনুসরণ করেন। হাল্লাজ বলেন, "তৌহিদ (যা ইবনুল আরাবীর অতিবর্তী ধারণার সমান) মুয়াহিদদের বা একত্ববাদীদের উক্তি এটা আল্লাহ্‌র কোন বৈশিষ্ট্য নয়; কেননা আল্লাহ্‌ সকল বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে।" আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্‌র আসল অতিবর্তী স্বরূপ বা ঐক্যের কথা জানে না আর এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর্‌ সত্তার মূল ঐক্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সূফী আধ্যাত্মিক ভ্রমণের সময় ঐ ঐক্য কিছুটা আন্দাজ করতে

১. Dr. Burhan Ahmed Faruqi, Ibid, p. 71.
২. Fusus, p. 70:

পারেন।[১] আর তা কোন বুদ্ধি বা দার্শনিক চেতনার সাহায্যে জানা যায় না। জানা যায় তন্ময় অবস্থায় অতি মানসিক সংজ্ঞা বা ধর্মীয় চেতনা বা অতিন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা। সর্বোচ্চ ধরনের অতিবর্তিতা বা পরম ঐক্য সকল প্রকার উক্তির ঊর্ধ্বে। এটা কেবলমাত্র শুদ্ধ সত্তাসারেই আছে আর এই ধরনের অতিবর্তিতার বা ঐক্যের কথাই ইবনুল আরাবী বলেন। ঐশী সত্তাসারই জাত আছে, এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অথবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এখানে সব কিছু মিলে এক ও অভিন্ন। আর এই ধরনের অতিবর্তী ধারণার সাথে আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপী ধারণার তুলনা করা হয় না কারণ এই অন্তর্ব্যাপী ধারণা বুদ্ধি-প্রসূত ধারণা বা জ্ঞানমূলক চেতনার ধারণা আর অতিবর্তিতার ধারণা ধর্মীয় চেতনা বা স্বজ্ঞাপ্রসূত ধারণা। অন্তর্ব্যাপী ধারণার সাথে তুলনা করলে আল্লাহ্‌কে 'হক' বা সত্য, পরিদৃশ্যমান জগতকে 'খালক' বা সৃষ্ট জগৎ বলা হয়। এই ধরনের আপেক্ষিক অতিবর্তী ধারণা বা ঐক্য মনোগত বা আত্মগত। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত প্রথম প্রকারের অতিবর্তিতা অর্থাৎ সর্বোচ্চ অতিবর্তিতা বা ঐক্য বস্তুগত এই অর্থে যে এটা আল্লাহ্‌র 'পাক-জাত' বা পরম সত্তা এবং এর কিছু আভাস পাওয়া যায় ধর্মীয় চেতনা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে। পূর্ববর্তী অতিবর্তিতা ও পরবর্তী অতিবর্তিতার মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথমটি বাস্তব এবং দ্বিতীয়টি আত্মগত, প্রথমটি আল্লাহ্‌র 'পাক-জাত' হতে আসে, আর দ্বিতীয়টি আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানমূলক চেতনার সাহায্যে পাওয়া যায়। প্রথমটি সম্পর্কে জ্ঞান সম্ভব হয় না বললেই চলে কিন্তু দ্বিতীয়টি জ্ঞানমূলক চেতনা বা যুক্তির সাহায্যে জানা যায়। প্রথমটি দিয়ে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, দ্বিতীয়টির সাহায্যে আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী বলে বর্ণনা করা যায়, আর এই বর্ণনার মধ্যে ইবনুল আরাবীর মতে বাস্তব ও সম্ভাব্য পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার সত্তা অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণজ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব আল্লাহ্‌ সম্পর্কে পূর্ণ সংজ্ঞাও অসম্ভব।

একদিকে আল্লাহ্‌ ও বিশ্ব বা 'হক' ও 'খালক' এর মধ্যে পার্থক্য দেখানোর পর এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র আল্লাহ্‌ত্ব এবং ঐশী সত্তাসারের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর পরে এবং আল্লাহ্‌র অতিবর্তিতা এবং ঐশী সত্তাসারের অতিবর্তিতার

---

১. Dr. A. E. Affifi, p. 22.

মধ্যে পার্থক্য দেখানোর পরে ইবনুল আরবী বলেন যে প্রকৃত অতিবর্তিতার জ্ঞান আল্লাহ্‌তেই আরোপ করা যায় বা বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যায়,[১] ঐশী সত্তাসারে নয় কেননা সত্তাসার অমূর্তকরণের ফলে গুণহীন হয়ে পড়ে। পরিদৃশ্যমান জগতের সসীমতা এবং পরম সত্তার অসীমতার মধ্যে অতিবর্তিতার গুণাবলী প্রকাশ পায়। তিনি অনেক সময় ঐশী সত্তাসারের পরিবর্তে 'সে' বা 'তিনি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা তাঁর মতে একমাত্র সত্তাসারই অসীম অদৃশ্য সত্তা।[২]

অতিবর্তিতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি নিম্নরূপ: (১) দুই রকম অতিবর্তিতা আছে (২) জ্ঞানমূলক চেতনার বুদ্ধি সঞ্জাত অতিবর্তিতা, যা অন্তর্ব্যাপিতার সাথে একত্রিত হয়ে উল্লেখিত হয়। এই অতিবর্তিতা নিম্নরূপ হতে পারে:[৩]

(ক) আল্লাহ্‌কে অসীম স্বয়ং সয়ম্ভূ সত্তারূপে অতিবর্তী সত্তা বলা যায়।

(খ) আল্লাহ্‌কে সয়ম্ভূ আবশ্যিক সত্তা হিসাবে অতিবর্তী বলা যায় এবং জগতের প্রকাশ্যমান জাগতিক বস্তুকে সম্ভাব্য, সসীম, অনিত্য ও সৃষ্ট বলা যায়।

(গ) আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী বলা যায় এই অর্থে যে, তিনি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, অদৃশ্য, অপ্রকাশ্য ও অসংযোগ স্থাপনীয় সত্তা এবং সকল প্রকার প্রমাণের উর্ধ্বে।

অন্তর্ব্যাপী ধারণাকে বাদ দিয়ে যদি দ্বিতীয় প্রকারের অতিবর্তী ধারণাকে স্বীকার করা হয় তবে তিনি তা অস্বীকার করেন, কারণ এই সত্তার সামগ্রিক সত্যকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। পরম সত্তার দুইটি দিক আছে— অতিবর্তী দিগ ও অন্তর্ব্যাপী দিক, আল্লাহ্ জগতের উর্ধ্বে এবং জগতের মধ্যে অবস্থিত পরম সত্তা।

কার্যকারণ তত্ত্ব

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ ব্যাখ্যার জন্য কার্যকারণ তত্ত্ব বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে 'কারণ' এমন একটি শক্তি বা বস্তু যা হতে কার্য বা ফল উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন যে কার্যকারণ দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস নয়, এটা একই সত্তার দুইটি দিক মাত্র। সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্‌র

১. Ibid, p. 23.
২. Futuhat II, p. 764.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid.

আত্মোপলব্ধি বা আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত আবশ্যিক ক্রিয়া মাত্র। কার্য এবং কারণ একই পরম সত্তার আত্মপ্রকাশের চিরন্তন প্রবাহ ধারার দুইটি দিক মাত্র। এক সময় ভিতরের দিক হতে পরম সত্তা স্বয়ং স্রষ্টা আবার পরক্ষণই বাইরের দিক হতে সৃষ্ট বিশ্ব জগৎ, তাঁর মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যে শূন্য[১] হতে সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক। কার্য ও কারণ কেবলমাত্র শব্দ, দুইটি আত্মগত ধারণা, কাঠামো বা শ্রেণী। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় এবং সকল অর্থে আল্লাহ্ স্বয়ংই কারণ এবং বিশ্বই ফল বা কার্য হবে এমন কথা নয়। যুক্তিগতভাবে যদি আল্লাহ্ ও বিশ্বকে দুটি সত্তা হিসাবে ধরা যায়[২] তবে একটি অপরটির সাথে কার্যকারণ সম্পর্কের আওতাভুক্ত হয়। তার এই বিশেষ অর্থে তাঁর দর্শনে কার্যকারণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ অর্থে কার্যকারণ বলতে যা বোঝায়, তিনি তা অস্বীকার করেছেন।[৩]

কার্যকারণ তত্ত্ব দুইভাবে ব্যবহৃত হয়:[৪]

(১) সমগ্র বিশ্বের কার্যকারণ তত্ত্ব হিসাবে। এখানে প্রশ্ন উঠে যে বিশ্ব সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিনা, যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সে কারণ কি?

(২) বিশ্বের অংশ বিশেষের কার্যকারণ হিসাবে। এখানে প্রশ্ন উঠে যে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা, সকল অংশের সাথে সামগ্রিক বিশ্বের কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা? তিনি দ্বিতীয় অর্থে কার্যকারণ তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে জাগতিক বস্তুগুলো একে অপরের সাথে কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত আর এ সম্পর্কে অন্তর্ব্যাপী বা আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক নয়। কার্য ও কারণ অথবা 'হেতু' ও 'ফল' একই ঐশী সত্তাসার হতে উদ্ভূত এবং এগুলো একই সত্তার দুইটি দিক, 'লাহুত' বা ঐশী অংশ এবং কার্য বা 'ফলকে' 'নাসুত' বা সৃষ্ট বস্তু বলা যায়। ঐশী বৈশিষ্ট্যই পরিচালিত করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে একই পরম সত্তার ঐশী দিক ও পরিদৃশ্যমান দিক দুইটি কি কি? একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মাঝে তিনি 'বিশেষ কারণগুলো' স্বীকার করেন না কেননা তা, তাঁর মতে, দেবতাবাদের সৃষ্টি করে। পরম সত্তা যদি একটিই হয় এবং এই পরম সত্তার

১. Fususul Hikam, p. 450.
২. Ibid, p. 362.
৩. Dr. A. E. Affifi, p. 25.
৪. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 25.

অভ্যন্তরীণ দিকের নাম 'কারণ' বা 'হেতু' হয় এবং বাহ্যিক দিকের নাম কার্য বা ফল হয় তবে কার্যকারণ একই পরম সত্তার দুইটি দিক এবং একটি অপরটির সমান বা একটি অপরটি হতে অভিন্ন এবং প্রত্যেকটি কারণ তার নিজস্ব কার্যেরই কার্য বা ফলেরই ফল। তিনি বলেন যে বুদ্ধি দিয়ে কোন লোক একথা বুঝতে পারে না। একমাত্র সূফী সাধকই তাঁর কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। সূফী সাধক যা বুঝতে পারেন, তা নিম্নরূপ: প্রত্যেকটি কারণ নিজে একটি সত্তা এবং একটি আকার হওয়ায় নিজেই 'কার্য' ও 'কারণ' হয়, 'কর্তা' ও 'কর্ম' হয়। আবার প্রত্যেকটি 'কার্য' নিজে 'একটি সত্তা' ও 'একটি আকার' হওয়ায় নিজেই কার্য ও কারণ, কর্তা ও কর্ম, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হয়। যেহেতু পরম সত্তার সংখ্যা এক এবং এক দিক হতে দেখার ফলে এটা সত্তাসার এবং অপর দিক হতে দেখার ফলে আকার এবং একটি কারণ। যখন কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় তখন সেই কারণটি একবার কারণ আবার কার্য উভয়ই হয় অর্থাৎ এক সময়ে যেটা কারণ পরবর্তী মুহূর্তে সেটা 'কার্য' আবার তৎপরবর্তী মুহূর্তে সেটাই কারণ হয় এবং ঠিক এইভাবে সমগ্র প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অন্য কথায় একমাত্র আদি কারণ আল্লাহ্ সকল কার্যকারণের মধ্যে অন্তর্নিহিত অবস্থায় বর্তমান থাকেন। তাই কোন 'কারণ'কে কোন 'কার্যের কারণ' অথবা কোন 'কার্যকে' কোন 'কারণের কার্য' বলে না, কেননা তাতে কোন কিছু আসে যায় না। তিনি বলতে পারেন যে, এই ধরনের কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্যে কার্য ও কারণ পরস্পর নির্ভরশীল। একই কার্যকারণ প্রবাহের মধ্যে 'কারণ উপাদানগুলো' 'কার্য উপাদানগুলো' দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয় আর এর অর্থ এই যে একটি কারণ, বিশেষ এক অর্থে তার কার্যের কার্য হয়।

বহু কারণের অসম্ভাব্যতাকে স্বীকার করলে একটি কারণ যে তার ফলের ফল বা কার্যের কার্য হতে পারে না, সে যুক্তি সঠিক হয়। তখন বলা যায় না যে একটি কারণ আর একটি কারণের ফল, কেননা সেখানে আর কিছুই নাই। কিন্তু যদি কার্য ও কারণকে একই জিনিসের দুইটি দিক বলা যায় বা দুইটি অভিন্ন বলা যায়। যদি 'বহুত্বকে' একটি কারণের বিভিন্ন বিশেষ রূপ বা আকৃতি বা প্রত্যংশ মনে করা যায়, তবে কোন বিরোধ ছাড়াই বলা যায় যে 'একটি কারণ' তার 'ফলের ফল' বা 'কার্যের কার্য'।

এই ধরনের কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা তাঁর সমগ্র দর্শনে অতি গুরুত্বপূর্ণ

স্থান দখল করেছে। তাঁর মতে পরিদৃশ্যমান জগতের সকল পরিবর্তনই এক ধরনের সৃষ্টি বা পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের মধ্যে কার্যকারণ, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা পাশাপাশি অবস্থান করে। এই ধরনের কার্যকারণ তত্ত্বে দেখা যায় :[২]

(১) সামগ্রিক সম্পর্কের ধারণা, (২) পরিবর্তনের ধারণা এবং (৩) কার্য উপাদান ও কারণ উপাদানের পরস্পর নির্ভরশীলতা যা বাহ্যিক জগতে প্রকাশ পায়।

সামগ্রিকভাবে বিশ্বের কারণ

এই যদি অবস্থা হয় তবে আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য কি? এটা কি কার্যকারণ সম্পর্ক না কোন শর্ত?' এ দুইটির মধ্যে কি কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে? অর্থাৎ আল্লাহ্ কি বিশ্বের 'কারণ' অথবা কোন 'শর্ত'? তাঁর মধ্যে 'কারণ' ও 'শর্তের' মধ্যে যে পার্থক্য তা বিরোধপূর্ণ। একটি কারণ এমন একটি জিনিস যার অস্তিত্ব অন্য একটির অস্তিত্ব অর্থাৎ এর কার্য বা ফলের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে, কিন্তু শর্ত এমন যে এর অস্তিত্ব এর ফলের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে না, যদিও ফল সৃষ্টির জন্য এর নিজের অস্তিত্ব অপরিহার্য।

অবশ্য তিনি এ কথা বলে শুরু করেছেন যে বিশ্ব অনিত্য, নির্ভরশীল, ক্ষণস্থায়ী এবং আল্লাহ্ নিত্য, আবশ্যিক ও অনিবার্য সত্তা, অতএব বিশ্ব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল, নিজের বাইরে অন্য কিছু আবশ্যিক ও অনিবার্য ও স্বয়ং অস্তিত্বশীল সত্তার উপর নির্ভরশীল, আর এই 'অন্য কিছু' স্বয়ং আল্লাহ্। তিনি আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে শর্ত সম্পর্ক অস্বীকার করে বলেন যে, শর্ত তার ফলের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করে না। অপরপক্ষে একটি আবশ্যিক সত্তা কর্তৃক বিশ্বের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান যে জীয়ন্ত থাকা জ্ঞান সংগ্রহ করার শর্ত, জ্ঞান সংগ্রহ করার অর্থ জীয়ন্ত থাকা, পা থাকা হাঁটতে পারার শর্ত, হাঁটতে পারার শর্ত পা থাকা কিন্তু একজন জীবন্ত হলেই যে জ্ঞান সংগ্রহ করবে বা পা থাকলেই হাঁটবে এমন কথা নয়। অন্য কথায় 'শর্ত' তার 'ফলের' অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে না, যদিও বলা হয় যে ফল থাকলে তার শর্ত নিশ্চয়ই আছে।[৩]

---

৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 27.

৪. Futuhatul Makkiyah, I, p. 341.

তাঁর মতে 'কারণ' 'শর্তের' মত নয়। তার কারণ ফল বা কার্যকে নিশ্চিত করে।[১] এখন আল্লাহ্ ও বিশ্ব কি কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত? তিনি বলেন যে. বিশেষ এক অর্থে এই দুইটি কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাঁর যুক্তি নিম্নরূপ: আশারীয় দার্শনিক সম্প্রদায় ও গ্রীক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে বিশ্বজগৎ কোন একটি অনিবার্য বা আবশ্যিক কারণের ফল। আশারীয় চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, বিশ্বের অস্তিত্ব আবশ্যিক ও অনিবার্য কেননা এ সম্পর্কে আদিকাল হতে আল্লাহ্র জ্ঞান আছে। যেহেতু আল্লাহ্র জ্ঞান অভ্রান্ত ও অনন্ত সেহেতু বিশ্ব অবশ্যই অস্তিত্বশীল। তা না হলে আল্লাহ্র জ্ঞান মিথ্যা হবে। দার্শনিকগণ মনে করেন যে আল্লাহ্র সত্তার প্রকৃতি এমনি যে তা বাহিরের জগতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে আর এই ধারণা হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিশ্বের অস্তিত্ব অবশ্যই আবশ্যিক অনিবার্য হবে। তিনি আশারীয় চিন্তাবিদগণ ও দার্শনিকদের সাথে একমত হন। তিনি বলেন যে, আশারীয়দের আল্লাহ্র ঐশীজ্ঞান ও দার্শনিকদের সত্তাসার বিশ্বের কারণ হতো যদি না এটা হতে বোঝায় যে বিশ্বের এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছিল। কালিক পূর্ববর্তিতার কোন কথা এখানে অবান্তর। আল্লাহ্ বিশ্বের পূর্বে ছিলেন—এমন না বলে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ ও বিশ্ব আবশ্যিক সম্ভাব্য, এক ও বহুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতা একই সত্তার দুইটি দিক মাত্র। যদি বলা হয় যে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তবে এ কথা বোঝায় না যে কোন এক সময় শূন্য হতে উৎপত্তি হয়েছে। শূন্য হতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এ কথা তিনি পুরোপুরি স্বীকার করেন না।

বিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটা এমন নয় যে বিশ্ব পূর্বে ছিল না এখন সৃষ্টি হয়েছে। অপর পক্ষে তাঁর মতে বিশ্ব চিরন্তন, অনন্ত, অসীম কেননা এটা চিরন্তন, অনন্ত ও অসীম এক সত্তার বাহ্যিক প্রকাশ। পরজগৎ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটা সৃষ্টি হয়েছে। ইহজগৎ ও পরজগৎ অবিরত ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে একটা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নামমাত্র।[২] যখন জিনিসের আকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন তারা পরজগতে চলে যায়। যখন তারা নতুন আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তারা এই অবভাসিক বিশ্বে আবার আসে। একটির ক্ষয় অন্যটির 'সৃষ্টি' এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি প্রক্রিয়া চিরন্তন রূপে বিদ্যমান এবং এটা অনন্তকাল ধরে চলছে এবং

১. Dr. A. E. Affifi Ibid, p. 28.
২. Futuhatul Makkiyah, I, p. 339.

চলবে।[১] কালের মধ্যে কোন বিশ্রামকাল নাই, কিন্তু এটা একটা যুক্তিগত পূর্ববর্তিতার কথা ইংগিত করে। কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক অগ্রগামিতা আছে।[২] ইবনে রুশদ ও ইবনুল আরাবী সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনিও একই ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে অবিরাম পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিমুহূর্তে পূর্ববর্তী বস্তুর আকার হতে নতুন আকারের আবির্ভাব ঘটছে। তিনি আল্লাহ্ ও বিশ্ব এই দুইটি সত্তার নিত্যতার কথা বলেছেন, আর ইবনুল আরাবী বলেছেন একটির কথা। ইবনুল আরাবীর মতে চিরন্তন সত্তা একটি আর সেটি স্বয়ং আল্লাহ্ যা বিশ্বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[৩] ইবনে রুশদের মতে আল্লাহ্ কর্তা বা কারণবিহীন চিরন্তন সত্তা 'আর বিশ্ব কর্তাযুক্ত বা 'কারণ সহকারে চিরন্তন'।[৪] ইবনুল আরাবী আল্লাহ্ ও বিশ্বের মাঝে যে পার্থক্য দেখান তা আকারগত পার্থক্য। এই পার্থক্য চিরন্তন আবশ্যিক বা অনিবার্য সত্তা ও নিত্য বিশ্বের মধ্যে। আসলে চিরন্তন আবশ্যিক ও 'নিত্য' রূপ একই সত্তার দুইটি রূপ, নিত্য চিরন্তন ও অনস্তিত্বের সম্পর্কে যোগফল। আর এই অর্থে এই নিত্য জগৎ বিরাট নিত্য সত্তা।[৫] সমগ্র বিশ্ব কিংবা এর মধ্যে অবস্থিত কোন বস্তুই শূন্য হতে সৃষ্টি হয়নি এবং এদের অর্জিত অস্তিত্ব মনের কল্পনা মাত্র।[৬] বস্তু ও সত্তা কেবলমাত্র বাহ্যিক অস্তিত্ব অর্জন করে। এই কথাই ইবনুল আরাবী একটু অন্য ভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেকটি সত্তাই সুপ্ত অবস্থায় চিরন্তন অস্তিত্ব এবং বাহ্যিক অবস্থায় অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী, সুপ্ত অবস্থায় চিরন্তন বলতে তিনি একটি বস্তুর সত্তাসার তার ধারণার কথা বলেছেন। ধারণাগুলো আল্লাহ্র মনে থাকায় তা চিরন্তন। এখানে বস্তুর সত্তাসার বা ধারণা চিরন্তন, বস্তু চিরন্তন নয়। তাঁর মতে সৃষ্টির অর্থ প্রকাশ, নতুনের জন্ম নয়। এ সৃষ্টির ধারণা আমাদের গৃহে আগত অতিথির ধারণার মতো।[৭] আমাদের বাড়ীতে অতিথির আগমনের পূর্বে তার সম্পর্কে যেমন ধারণা ছিল, ঠিক তেমনিভাবে বস্তুর ধারণা বা সত্তাসার আল্লাহ্র মনে ছিল। এই কথাই তিনি আর একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করেন না, সৃষ্টি

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 30.
২. Fususul Hikam, p. 300.
৩. Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics, II, p. 263.
৪. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 30.
৫. Fusus. pp. 100, 101, 109, 118.
৬. Futuhat, II pp. 637-638.
৭. Fusus, pp. 421-422.

বস্তুর নিজস্ব রূপ।[১] একটা বস্তুর আবির্ভাব ঘটার অর্থ এই যে বস্তুটি তার নিজস্ব আকারে প্রকাশ পেল। আল্লাহ্ কেবলমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে বস্তুটির আবির্ভাব হোক। নতুন আবিষ্কারের সময়ে আল্লাহ্ এমন কিছুই ইচ্ছা বা আদেশ করেন না, যা বাস্তব অস্তিত্বের প্রকৃতিতে ছিল না বা ঐ বস্তুর আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়। আল্লাহ্‌র আদেশের সময় একটি বস্তুর সত্তায় যদি তেমন কোন কিছু না থাকতো তবে এটা অস্তিত্বশীল হতো না অর্থাৎ এর আবির্ভাব ঘটতো না। অতএব কোন কিছুই এটাকে প্রকাশ করে না বা অস্তিত্বশীল করে না, এটা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে।

এখন তাহলে বোঝা গেল ইবনুল আরাবী সৃষ্টি ও বিশ্বের কারণ বলতে কি বুঝেছেন। কিন্তু তাঁর এই যৌক্তিক কার্যকারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য তিনি আল্লাহ্ ও বিশ্ব—এই দুইটির একই ধরনের ত্রিত্বের কথা বলেছেন। 'সত্তাসার' 'ইচ্ছা' ও 'বাণী' এই ত্রিত্ব দ্বারা আল্লাহ্‌কে বোঝায়। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 'সত্তাসার' 'বাধ্যতা' ও 'শ্রবণ' দ্বারা বিশ্বকে বোঝায়। তিনি যৌক্তিক অর্থে বলেন যে, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বের একটি কারণ আছে এবং এই অর্থে তিনি এটাকে চিরন্তন ও নিত্য বলেন। তিনি 'আকার প্রাপ্ত বিশ্বের' চিরন্তনতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। বিশ্ব ও আল্লাহ্ সহ-চিরন্তন সত্তা নয়। আল্লাহ্‌র সাথে কেবল আল্লাহ্ই সহ-চিরন্তন বস্তু, অন্য সত্তা নয়। আল্লাহ্ই বিশ্বের সত্তাসার, বিশ্বের আকার চিরন্তন নয়। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ সব কিছুকেই পূর্ব হতে নির্ধারণ করেন কিন্তু সৃষ্টি করেন না।[২] যদি বস্তুর সত্তাগুলো আল্লাহ্‌র সাথে সহ চিরন্তন হয় তবে আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা বলার অর্থ কি? আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা বলতে গিয়ে তিনি বিশ্বকে বলেন উৎপত্তি হওয়া বস্তু, অনিত্য ও অসত্তা। তিনি বলেন যে, এটা এ রকম আছে এবং এ রকমই থাকবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এ সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে স্রষ্টার করবার কিছুই নাই।

বিশ্ব কখন বা কোন সময় সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা।[৩] 'কখন' শব্দ সময়ের প্রতি ইংগিত দেয় এবং মুসলিম চিন্তাবিদরা সময়কে দৃশ্যমান জগতের সৃষ্ট জিনিস বলে উল্লেখ করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যৌক্তিক

১. Ibid, pp. 205-6.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 32.
৩. Ibid, p. 32.

পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে আর সে পূর্বাপর সম্বন্ধ কোন সময়ের বা কালের মধ্যে নয়। গতকাল ও আজকের মধ্যে যে সম্পর্ক, আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে সেই একই সম্পর্ক। সময় বা কালের মধ্যে বিশ্ব অস্তিত্বহীন ছিল একথা বলা যায় না, এ কথাটা অনেকটা নব্য প্লেটোবাদীদের মত। প্লটিনাস বলেছেন এমন কোন একটা কাল ছিল না যখন এই 'সমগ্রটা' ছিল না। পরম সত্তার বিভিন্ন নামের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। আশারীয় চিন্তাবিদরা যেমন 'ঐশী জ্ঞান'কে 'সৃষ্টির কারণ' বলেছেন, ইবনুল আরাবীও আল্লাহ্‌র 'নামকে' 'সৃষ্টির কারণ' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর উক্তি আশারীয়-দের মতবাদের চেয়ে স্পিনোজার মতবাদের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র নামগুলো যেন স্পিনোজার অসীম গুণাবলীর মত।[১] নামের মধ্যে শক্তি লুকিয়ে আছে। ঐশী সত্তাসারের নাম হিসাবে সেগুলো বাইরের জগতে প্রকাশ পায়। জ্ঞাতা জ্ঞেয় কিছু চান, স্রষ্টা সৃষ্টি কিছু চান। নামগুলো যেন সৃষ্টির 'উপাদান কারণ' যা আল্লাহ্ এই বিশ্ব সৃষ্টির সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করেন। ঐসব নামের জ্ঞান, তাদের ক্রমিক স্তরবিন্যাস শ্রেষ্ঠ ও অধীন শ্রেণী হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও পদার্থিক জড় জগতে তাদের প্রকাশের শ্রেণী বোঝার উপায়। নামগুলো আদর্শ সত্তা। প্রত্যেকটি জিনিস যত যৌগিকই হোক না কেন, তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার উৎস এক একটি ঐশী নাম। অন্য কথায়, পরিদৃশ্যমান জগৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলী যা দিয়ে আল্লাহ্‌র বর্ণনা দেওয়া হয়।[২] কিন্তু তিনি সব সময় আল্লাহ্‌র নামগুলোকে বিশ্বের কারণ বলে উল্লেখ করেন না। অনেক সময় তিনি নামগুলোকে 'শর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, আদিতে আল্লাহ্ই ছিলেন, বিশ্ব ছিল না এবং ঐশী গুণাবলী দ্বারা তাঁর নামকরণ করা হয়েছে।[৩] এই উক্তির উপর যদি বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যায় তবে তা তাঁর সর্বেশ্বরবাদী বা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ, দর্শনের পরিপন্থী হয়। বুঝতে হয় যে আল্লাহ্ কালের মধ্যে পূর্ব হতে ছিলেন না, বিশ্ব কোন আকারপ্রাপ্ত বিশ্ব ছিল না, আল্লাহ্‌কে সুপ্তভাবে এই সকল নাম দিয়ে ডাকা হতো।

---

১. Fususul-Hikam, p. 354.
২. Futuhat, I, pp. 128, 421.
৩. Ibid, p. 343.

৬—

তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র সর্বেশ্বরবাদী মতবাদকে ইসলামী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় বিফল হয়ে তিনি পরাতাত্ত্বিক বা বিরোধাভাব ও বিরোধপূর্ণ উক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। এ সময় তিনি বলেন যে, গুণাবলী ও ঐশী নাম দিয়ে আল্লাহ্‌কে বর্ণনা করা হয়, আমরা আল্লাহ্‌কে জানি অতএব আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌ রূপে "সৃষ্টি" করি অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া ঐশী নাম অর্থহীন। আবার তিনি বলেছেন যে, স্বতন্ত্র বিশ্ব সৃষ্টির বহু পূর্ব হতে আল্লাহ্‌কে ঐশী নাম দিয়ে ডাকা হতো।

সত্তাসার গুণ ও নাম

এক পরম সত্তার সত্তাসার গুণ ও নাম আছে। ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌-দাতুল ওজুদ' মতে ঐশী সত্তাসার একটি সার্বিক দ্রব্য। এই দ্রব্যের দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ দিক ও বাহ্যিক দিক। এটা পরম সত্তার সমান। ঐশী সত্তাসারের অসংখ্য দিক আছে, ঐশী নাম তার অসংখ্য দিকের যে কোন একটি। ঐশী নাম ঐশী সত্তাসারের একটি সীমিত ও নির্ধারিত আকার। আর এই আকার যখন বাহ্যিক জগতে প্রকাশ পায় তখন তাকে ঐশী গুণ বলা হয়। ঐশী গুণের বাহ্যিক জগতে প্রকাশকে প্রকাশ্য বস্তুর সমাহার বা পরম দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রার প্রকাশক্ষেত্র বলা হয়, বিশ্বের বৈচিত্র্যকে নাম-প্রাপ্ত বস্তু বলা হয়।

অনির্ধারিত অবস্থায় ঐশী সত্তাসার যেন একটা 'মনাড' বা চিৎপরমাণু, এর কোন গুণ ও সম্পর্ক নাই, এটা সকল অনির্দিষ্টের অনির্দিষ্ট, স্ব-গত-বস্তু।[১] এই সত্তাসার ক্ষয়হীন স্বাধীন এবং অপরিবর্তনীয়।[২] এইটা কোন একটি দ্রব্য নয়, একটি পরম দ্রব্য যার মধ্যে অন্যান্য সকল জড় ও আধ্যাত্মিক দ্রব্য স্থান পায়। অর্থাৎ পরম দ্রব্য অন্যান্য সকল দ্রব্যকে ঘিরে আছে। যা কিছু পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল তা অবাস্তর গুণ, আকার এবং প্রকাশ্য রূপ। তাঁর মতবাদ আশারীয়দের পরমাণু বাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি আশারীয়দের চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন

১. Fusus, p. 375.
২. Futuhat, II, p. 74, Fusus, p. 366.

যে, পরম দ্রব্য ও আল্লাহ্ এক, অভিন্ন। অবশ্য তিনি আশারীয়দের মত হতে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আশারীয়দের মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী এক-দিক দিয়ে সত্তাসারের মধ্যে অবস্থিত এবং ঐশী সত্তাসারের মত নিত্য, অন্য দিক দিয়ে সত্তার বাইরে অবস্থিত। মুতাজিলাদের ঐশী গুণ ও সত্তা অভিন্ন, সত্তার বাইরে কোন গুণ নাই। এখানে আশারীয়দের চেয়ে মুতাজিলাদের সাথে তাঁর মতবাদের অনেক বেশী মিল আছে। তাঁর মতে সত্তার বাইরে বিভিন্ন গুণের অস্তিত্ব নাই। সেগুলো ঐশী সত্তাসারের মধ্যে অবস্থিত নয় কিংবা ঐশী সত্তাসারের বাইরে সেগুলোর কোন অস্তিত নাই, সেগুলো কেবল 'সম্পর্ক' মাত্র। যখন তিনি সেগুলোকে নাম অথবা গুণের সত্তা বলে উল্লেখ করেন তখন তিনি তা রূপক অর্থে ব্যবহার করেন, সেগুলো সত্তার বাইরে অবস্থিত অধিক কোন কিছু নয়। এক অর্থে সেগুলো প্লেটোর বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণার মত, সেগুলো নিজে থেকে কোন বাহিক সত্তা নয় কিন্তু এক অর্থে সেগুলো বাহ্যিক জগতের বিশেষ অস্তিত্বশীল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য অর্থে সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান ও জীবন সার্বিক ধারণা এবং এই দুইটা বিশেষ জ্ঞাতা ও সজীব সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একই সাথে দুইটা ঐশী গুণ যা এক অর্থে আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন ও সমান এবং আল্লাহ্ হতে ভিন্ন নয়। তিনি প্লেটোর ধারণার সীমাবদ্ধতাকে আশারীয়দের ঐশী গুণের সাথে অভিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন কিন্তু এই দুইটা ধারণার সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়।[১]

ঐশী সত্তাসারের আকার ও বিশেষ রূপ হিসাবে সেগুলো বহুত্ব এবং একটি নামের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য অপর আর একটি হতে ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে সে নামগুলো একে অপরের সাথে ও আল্লাহ্‌র সত্তাসারের সাথে এক ও অভিন্ন বা সমান।[২]

মানব জ্ঞানের সাথে পরম সত্তার সম্পর্ক

একক অবিভাজ্য পরম সত্তাকে জ্ঞানের দিক থেকে তিন ভাবে দেখা যায়:

(১) প্রথমতঃ পরম সত্তাকে বাহ্য জগতের প্রকাশিত সত্তা হিসাবে জানা

১. Fusus, p. 151.
২. Ibid, pp. 59-60, 355.

যায়। আর এই অর্থে এটা আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কাছে সীমাবদ্ধ। আমরা এটাকে 'বহু' ও 'অস্তিত্বশীল বস্তু' হিসাবে জানতে পারি এবং এর মধ্যে সকল প্রকার কার্যকারণ ও অন্যান্য সম্পর্ক দেখতে পাই। ইবনুল আরাবীর মতে এই পরম সত্তা পরিদৃশ্যমান জগৎ; প্রতিভাস বা 'রূপ' এবং অসত্তা দৃশ্যতঃ বহু হলেও মূলতঃ এ বিশ্বের একটা মূল ঐক্য আছে, এর প্রত্যেকটি অংশই এক একটি 'সমগ্র' এবং প্রত্যেকটি অংশই সমগ্রের সত্তার মধ্যে প্রতিফলিত করার ক্ষমতার অধীকারী।[১]

(২) দ্বিতীয়তঃ পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। পরিদৃশ্যমান জগতকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়[২], কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। যৌক্তিক নিয়মে প্রজ্ঞার সাহায্যে এটাকে জানার জন্য চেষ্টা করা হয় এবং এর অস্তিত্ব আছে বলে অনুমান করা হয়। এই পরম সত্তাকে অন্তরের অনুভূতি বা মরমী অভিজ্ঞতা বা ধর্মীয় চেতনা দিয়ে জানা যায়।

এই পরম সত্তায় আবশ্যিক সত্তার সকল গুণ আরোপ করা হয় এবং এটাকে ধর্মীয় আল্লাহ্ বলা হয়। এই আল্লাহ্ মানব মনের সৃষ্টি করা, এটা একটা আত্মগত বা মনোগত আল্লাহ্ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে এই আল্লাহ্‌র ধারণা বিভিন্ন রূপ। তাঁর মতে, যদি কোন ধারণা আল্লাহ্‌র অসীম ও সঠিক গুণ স্বীকার করে বা বিশেষ এক বা একাধিক ব্যক্তি বা দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করে ঐক্যের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় তবে তার সত্তার পার্শ্বে ভিন্ন একটি দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তা নিশ্চয় দেবতাবাদী ব্যাখ্যা হয়, একক আল্লাহ্‌র ধর্মীয় ব্যাখ্যা হয় না।[৩] আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার মধ্যে আল্লাহ্‌র দুইটি দিক অর্থাৎ অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ জগতের ঊর্ধ্বে ও ভিতরে বর্তমান রয়েছেন, আর এই ধারণা তাঁর ধর্মীয় দর্শনের মূল কথা।

তাঁর মতে যে সকল গুণ আমরা বিশ্বে আরোপ করি তা যুক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক দাবী করে; সম্ভাব্যতা দাবী করে আবশ্যিকতার, আপেক্ষিকতা দাবী করে সম্পূর্ণতা; সসীমতা চায় অসীমতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল

১. Ibid, p. 295.
২. Dr. A. E. Affifi : Ibid, p. 36.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 37.

যুক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক কেবলমাত্র আমাদের দেখা মূল সত্তায়ই আরোপ করা যায় অর্থাৎ এই সব সম্পর্ক পার্থিব জগতের পরম সত্তার রহস্য বাহ্যিক জগতেই আছে। "পরম প্রভুর রহস্য জগতে প্রযোজ্য। অদৃশ্য তোমার মধ্যেই আছে"।[১] তিনি এই উক্তিটিকে তুসতারীর উক্তি বলে মনে করেন। আর এই আলোকে নিম্নলিখিত হাদীসটির অর্থ বুঝেছেন—"যে নিজকে জানে সে তার প্রভুকে জানে"।

প্রথম অর্থের মূল সত্তা (দৃশ্যমান জগৎ) ও দ্বিতীয় অর্থের মূল সত্তার (অদৃশ্য আল্লাহ্) মধ্যে পার্থক্য এই যে এক ক্ষেত্রে মূল সত্তা জগতের মাঝে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল সত্তা এক অতিবর্তী সত্তা। মোটকথা মূল সত্তাকে জগতের মাঝে ও ঊর্ধ্বে, অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী উভয় প্রকার সত্তা হিসাবে জানা যায় আর কোন প্রকার গুণ মূল সত্তায় আরোপ করা যায় না। এ কথা বলা যায় না যে মূল সত্তা বা আল্লাহ্ 'সবুজ' 'গোলাকার', তিনি দেখেন, শুনেন ইত্যাদি যদিও তার সত্তাসার 'সবুজ' গোলাকারের সত্তাসার এবং যারা শোনেন ও দেখেন তাদের অন্তর্নিহিত মূল সত্তা। আর এইভাবেই পরম সত্তা ও পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে পার্থক্য টেনে বলা যায় যে এ দুইটি একই আল্লাহ্র দুইটি দিক। একটি আল্লাহ্র আল্লাহ্ত্ব বা ঈশ্বরত্ব, অপরটি পার্থিব জগৎ। মানুষ এবং পার্থিব জগৎ সব কিছুই আল্লাহ্র বিভিন্ন গুণ যা দিয়ে আল্লাহ্র বর্ণনা দেওয়া হয় এবং যে সকল নাম বা গুণ দিয়ে আল্লাহ্কে বর্ণনা করা যায়, সেগুলোর অর্থ ও শক্তি বাহ্যিক জগতের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি এইসব কথা বলে বোঝাতে চান যে পার্থিব জগতের অনেক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা দিয়ে দেখানো যায় যে, আল্লাহ্ এই বিশ্বের মধ্যে অন্তর্ব্যাপী সত্তারূপে বর্তমান, আবার অন্যদিকে, আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র সত্তায় আরোপ করা হয় যা দিয়ে বোঝা যায় যে আল্লাহ্ বিশ্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।[২] এক অর্থে আল্লাহ্ বিশ্বের মাঝে অন্তর্ব্যাপী সত্তা, আবার অন্য অর্থে তিনি এক অতিবর্তী সত্তা। সব কিছুর সত্তাসার হিসাবে মূল সত্তার অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী গুণগুলো আরোপ করা যায়। তিনি বলেন যে, মহিমান্বিত ব্যক্তি তিনি, পার্থিব জগতের সকল বস্তুর নাম দিয়ে তাঁকে ডাকা যায়; সমস্ত গৌরব তাঁরই, আল্লাহ্ত্বের ও সৃষ্ট বস্তুর সকল গুণ দিয়ে তাঁকে বুঝানো হয়, মানুষের নামগুলোও তাঁর নাম।

১. Fusus, p. 146.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 37.

(৩) তৃতীয়তঃ মূল সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা বা জানা যায় না, তাঁকে বুদ্ধির সাহায্যে যৌক্তিক নিয়মে জানা যায় যেভাবে গুণাবলী দ্বারা কোন দ্রব্যকে জানা যায়। একমাত্র অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই ঐশী সত্তায় আরোপ করা যায় না, সম্পর্কহীন ও সীমাহীন রূপে এটা অজ্ঞেয় ও অপ্রকাশ্য, এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, এটা সংজ্ঞার অতীত। একটি দ্রব্যের মত এর কিছু গুণাবলী দিয়ে এর বর্ণনা দেওয়া যায়[১], এর প্রকৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই, অসংগতি নাই বা এর কোন তুলনা হয় না তবুও এর নিজের মধ্যে সকল বিরোধ, বিপরীত ও অনুরূপ গুণের ঐক্য দেখা যায়। এর গুণ বা পরিমাণ কিছুই নাই তবুও এটা সকল গুণ ও পরিমাণের উৎস, এটাকে ইশরাকীদের মত 'বিশুদ্ধ আলো' বা 'বিশুদ্ধ মংগল' অথবা 'আল-আমা' বা অন্ধত্ব বা পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বলা হয়।[২]

এটা এমন একটি পরম ঐক্য বা 'ওয়াহ্‌দাত' যার মধ্যে কোন বহুত্ব নাই; তবুও এর মধ্যে সকল সুপ্ত সম্ভাবনার বীজ ঐক্যরূপে নিহিত আছে।[৩] আর এই হিসাবে এটা উপাসনার বিষয়বস্তু বা উপাস্য হতে পারে না। উপাসনার বিষয়বস্তু প্রভু বা আল্লাহ্‌ কোন একক বা ঐক্য নয়।[৪] বহুত্বকে স্বীকার করলে তবে এই ঐক্য বোধগম্য হয় যদিও এটা বহুত্বের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত এক, অসীম অনন্ত পরম ঐক্য।[৫] এই একত্ব অতি দৃঢ় ও রহস্যপূর্ণ যার বাহ্যিক প্রকাশের ফলে জড়জগতের সৃষ্টি হয়। এই একত্বের জ্ঞান লাভ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, হে বন্ধুগণ, তোমরা মনে করো না যে একত্বের পর্দা কোন দিন উন্মোচন হবে, তোমরা একত্বকে বা ঐশী নামের একত্বকে জানার জন্য তোমাদের আশাকে সীমিত কর। এটা পূর্ণ অজ্ঞেয়তাবাদ ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানবাদের মিলনকেন্দ্র। এখানে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাঁর সত্তাকে কেউ জানে না। এমনকি একজন মরমী সাধক বা সূফীও জানে না, কেননা মরমী সাধক নিজেও বহুত্বের অন্তর্গত। এটা তাঁর তত্ত্ববিদ্যার মূল কথা। জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত নিয়ন্ত্রণকারী

---

১. Fusus, pp. 414-415.
২. Dr. A. E. Affifi, p. 39.
৩. Fusus, p. 145.
৪. Idid, p. 118.
৫. Futuhat. II, p. 766—767.

পরিচালনাকারী শক্তি হিসাবে কোন সত্তার স্থান নাই তাঁর তত্ত্ববিদ্যায়; ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হিসাবে আল্লাহ্ এখানে কেবলমাত্র জ্ঞানসঞ্জাত একটি ধারণা। যে সকল সদর্থক ও নঞর্থক গুণ আল্লাহ্‌র সত্তায় আরোপ করা হয় তা মানুষের সদর্থক ও নঞর্থক গুণাবলীর মতই। "আমরা তাঁকে জানি (আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে জানি), অতএব আমরা তাঁকে সৃষ্টি করি"।[১] আমাদের দ্বারা আল্লাহ্ নিজেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, অতএব সেই হিসাবে আল্লাহ্ কেবলমাত্র বাক্যাংশ।[২] এখানে ধর্মীয় চেতনার ঐক্য ও দার্শনিক চেতনার ঐক্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের ব্যাখ্যা

ইসলাম ধর্মের নৈতিক আল্লাহ্‌র স্থানে ইবনুল আরাবীর তত্ত্ববিদ্যায় এমন একজন আল্লাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায়, যা বিশ্বের সাথে অভিন্ন, এই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী এবং প্রাণদানকারী ঐক্য নীতি। এটা তাঁর 'ওয়াহ্-দাতুল ওজুদ' দর্শনের শক্তিশালী দিক, তাঁর দুর্বলতাও এখানে যে, তিনি হেগেলের মত পরব্রহ্ম সত্তা বা আল্লাহ্‌র সক্রিয় দিক কেবলমাত্র নাম অথবা যৌক্তিক সম্পর্কে পরিণত করেছেন। তাঁর মতে মানুষ যে সকল গুণ আল্লাহ্ আরোপ করে তা সে আল্লাহ্ বলেই সম্ভব হয়। এটা একটা আকারগত যুক্তি–সিদ্ধান্ত মাত্র। আসলে আল্লাহ্ কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না, সৃষ্টির বীজ তাঁর স্বরূপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন। একই কথা তাঁর সর্বজ্ঞতা এবং অন্যান্য গুণ সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো আল্লাহ্ ও বিশ্বের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক প্রকাশ করে।

তিনি তাঁর দার্শনিক ঐক্য বা সর্বেশ্বরবাদী একত্বের ধারণার পাশে এক ধর্মীয় ঐক্য বা নৈতিক আল্লাহ্‌র ধারণা পোষণ করার ফলে যে মারাত্মক অসংগতি ঘটে তা লক্ষ্য করেছেন। তিনি তাঁর সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌কে স্বীকার করেছেন। এ স্বীকৃতি কেবল একটা মুখোশ বা পর্দা মাত্র এবং এর আড়ালে তিনি এক সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ গড়ে তুলেছেন। আর এ কাজ আল্লাহ্‌র নৈতিক ব্যক্তিগত নাম ও গুণের নতুন ব্যাখ্যার ফলে

১. Fusus, p. 125.
২. Ibid, p. 360.

সম্ভব হয়েছে। এখানে তিনি জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য একত্রিত করেছেন। তিনি দুইভাবে নাম ও গুণের ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) সকল নাম ও গুণকে আত্মগত সম্পর্ক রূপে পরিবর্তন করেছেন, সেগুলোকে বাস্তব মনে না করে কেবলমাত্র যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক বলে উল্লেখ করেছেন।

(২) সেই সকল নাম ও গুণের অর্থাৎ সেই সকল শব্দ ও পদের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। যদি কোন পদ বা শব্দের অর্থ ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তিনি সে শব্দ বা পদের অর্থ অপরিবর্তিত রেখেছেন, যদি তা সংগতিপূর্ণ না হয় তবে তিনি তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তিনি ঐশী নামকে 'হাজারত' বা ঐশী উপস্থিতি বা ঐশী বর্তমানতা বলে মনে করেন। এখানে তিনি 'হাজারত' শব্দের ভিন্ন অর্থ করেছেন, কেননা সত্তার পাঁচটি স্তর ব্যাখ্যার সময়ে তিনি এ শব্দের আরো এক অর্থ করেছেন। এখানে 'হাজারত' শব্দের অর্থ একটি 'মরমী অবস্থা' বা 'তন্ময় অবস্থা' বা স্তর যার মধ্যে আল্লাহ্‌ একটি ঐশী নামের আকার ধরে অমূর্ত অবস্থায় মরমী সাধকের বা সুফীর অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি সামান্য কয়েকটি 'হাজারা' বা নামের উল্লেখ করেছেন কেননা তাঁর মতে আল্লাহ্‌র অসংখ্য 'হাজারা' স্তর বা নাম আছে। আল্লাহ্‌ত্বের উপস্থিতি বা স্তর এমন একটা অবস্থা, যেখানে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশিত হন, করুণাময় বা দয়াশীলের 'উপস্থিতি' বা স্তর এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে আল্লাহ্‌ নিজেকে দয়াশীল সত্তারূপে প্রকাশ করেন। এই রকম পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার, নাম ও গুণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব এবং এটা তাঁর নিজস্ব অভিনবত্ব এবং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর কৃতিত্ব।

প্রত্যেকটি হাজারা বা নামের দুটি দিক আছে, অন্তর্ব্যাপী দিক ও অতিবর্তী দিক। অন্তর্ব্যাপী দিক বা অনুস্যূত দিক বিশ্বে প্রকাশিত আল্লাহ্‌ এবং অতিবর্তী দিক ঐশী সত্তাসার। ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি শুধুমাত্র নামের আকার পরিবর্তন পদ্ধতি। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায়।[১]

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 42.

(১) ঐশী নাম 'আল-মুমীন' এর অর্থ, তাঁর মতে, 'শান্তি দাতা'। 'শান্তি দাতার' অর্থ 'শান্তির উপস্থিতি'। তাঁর মতে 'শান্তির উপস্থিতি'[১] এমন একটি অবস্থা যেখানে মানবাত্মা প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানাতে চেষ্টা করে আর কষ্ট পায় না, বরং মরমী সাধকের মত তন্ময় অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে তাঁকে সন্দর্শন করে।

(২) 'আল-জাব্বার' বা সর্ব 'বাধ্যতাকারী কর্তা'। 'বাধ্যতাকারী কর্তা' হলেন আল্লাহ্, তিনি সব কিছুকে (প্রকাশ হতে) বাধ্য করেন। এখানে 'বাধ্যতা'[২] শব্দ আবশ্যিকতা বা অনিবার্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাধ্যতা বা আবশ্যিকতাই সৃষ্টির মূল নীতি।

মনোনয়ন, নির্বাচন বা পছন্দের মধ্যেও একটা বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যিকতা আছে। কিন্তু তাই বলে এই বাধ্যবাধকতা বা নিয়ন্ত্রণ কোন বাহ্যিক শক্তি নয়, বস্তুগুলো তাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতার নিয়ম মেনে চলে আর এই নিয়মই সেই পরম ঐক্যের নিয়ম।

(৩) 'আল-মুতাকাব্বির' বা 'আত্মগৌরবসম্পন্ন সত্তা'। তিনি 'আত্মগৌরব-সম্পন্ন সত্তার' অর্থ করেছেন 'অতিবর্তী সত্তা' কেননা তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে অবস্থিত।[৩]

(৪) 'আল-গাফফার' বা 'ক্ষমাশীল সত্তার' অর্থ তিনি করেছেন 'পর্দা'। পরম সত্তা নিজেকে নামের আকার বা পর্দার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ আকার বা পর্দার নাম প্রকাশ্য সত্তা।[৪]

(৫) 'আল আদল' বা 'ন্যায় বিচারক'। ন্যায় বিচারকের সত্যের দিকে ঝোঁক আছে, মিথ্যার দিকে কোন ঝোঁক নাই। অন্য কথায়, আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক কেননা আল্লাহ্ সারসত্তার আবশ্যিক অবস্থা হতে পার্থিব আবশ্যিকতার দিকে ঝোঁক দেখান অর্থাৎ তিনি বাহ্যিক জগতে নিজেকে প্রকাশ করার প্রতি ঝোঁক দেখান। 'ইচ্ছা' শব্দের একই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ইচ্ছা ঐশী সত্তাসারের নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা, অপ্রকাশিত সত্তার সত্তা প্রকাশ করার ইচ্ছা।[৫]

১. Futuhat, IV, p 260.
২. Futuhat, IV, p. 265
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 42.
৪. Futuhat, IV, pp. 273-274.
৫. Ibid, p. 302.

(৬) 'আল-লতিফ'। 'লতিফ' শব্দের অর্থ 'সূক্ষ্ম', দাতা, 'পরোপকারী'। এ নাম দিয়ে তিনি আল্লাহ্‌কে, প্রায় জড়বাদী অর্থে,[১] অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য বলে মনে করছেন। "দ্রব্য হিসাবে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্ম কিন্তু প্রকাশিত বস্তু হিসাবে তিনি অতিবৃহৎ, তাঁর (আল্লাহ্‌র) উপর ছাড়া কোন চোখের দৃষ্টি অন্য কোথাও পড়ে না, এবং তাঁর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন ভাবে দেখে না। কার কাছে তিনি গুপ্ত? তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই"।[২] অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষে অর্থ প্রকাশকারী কোরআনের বাক্য ও নবীর হাদীস তিনি গ্রহণ করেন।

তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে বলেন, আল্লাহ্ সকল সত্তার সত্তাসার। কোরআনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নবীকে মান্য করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে মান্য করে (কোরআন : ৪ : ৮২); আপনি নিক্ষেপ করেন নাই, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন (কোরআন : ৮ : ১৭) ইত্যাদি, উক্তিগুলো তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণ করেছেন।

(৭) 'আল-হাফিয' বা 'রক্ষাকর্তা' বা রক্ষক। তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ্ সকল সত্তা ও বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তারূপে এবং সেগুলোর সত্তাসারের রক্ষাকর্তা হিসাবে 'আল-হাফিয' বা রক্ষাকর্তা।[৩]

(৮) 'আল-মুকিত' বা 'সরবরাহ কর্তা'। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তা সকল জীব ও বস্তুর সত্তায় সরবরাহ করে থাকেন।[৪]

(৯) 'আর-রকীব' বা 'সতর্ক প্রহরী' বা 'অচেতন সত্তা'। আল্লাহ্ একজন সতর্ক প্রহরী, তিনি সব কিছুকে লক্ষ্য করেন কেননা তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর সত্তাসার।[৫]

(১০) 'আস-সামী' বা 'শ্রবণকারী কর্তা'। 'আস-সামী' শব্দকে 'আল আলিম' বা 'জ্ঞানী' বা জ্ঞাতা শব্দের সাথে একত্রিত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রবণকর্তা ও জ্ঞাতা স্বয়ং আল্লাহ্ কেননা তিনি নিজেকে নিজের কাছে আত্ম-সচেতন আকারে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ 'শ্রবণ' করেন অর্থাৎ তিনি সুপ্ত অবস্থায় সকল বস্তুর সত্তার ডাকে সাড়া দেন। সুফীরা এটাকে ঐশী সত্তার

১. Fusus, p. 376.
২. Fuhuhat, IV, p 304.
৩. Futuhat, p. 317, Fusus, p. 194.
৪. Futuhat, IV, pp 319-320.
৫. Ibid, p. 326.

নিয়মাবদ্ধ হওয়া বা ঐশী চুক্তি বলে উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ সকল সত্তার সুপ্ত সার সত্তা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন "আমি কি তোমাদের প্রভু নই"?[১] তারা উত্তর দেয় 'হাঁ'। হাল্লাজ ও তিনি উভয়েই মনে করেন যে এই অবস্থায় বক্তা ও শ্রবণকর্তা একই সত্তা বা স্বয়ং আল্লাহ্। হাল্লাজ এই অবস্থার একত্বের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বহুত্বের অবস্থিতিকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করেছেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ নিজেকে নিজের কাছে প্রশ্ন করেছেন এই অর্থে যে তিনি নিজেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বহুত্বের আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।[২] আর এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে তাঁর 'আয়ান আস সাবিতা' বা সৃষ্টির আদর্শ সত্তা মতবাদ।

(১১) 'আল-মুজিব' বা 'সাড়াদান কর্তা'। আল্লাহ্ সাড়াদান কর্তা, কারণ তিনি সম্ভাব্য বা অনিত্য সত্তার ডাকে সাড়া দেন সেইভাবে, যেভাবে একটি দ্রব্য তার বিভিন্ন আকারের[৩] ডাকে সাড়া দেয়। অন্য কথায়, আল্লাহ্ সব কিছুর প্রয়োজনমত আকৃতি দান করেন। এছাড়াও তিনি আল্লাহ্‌র সত্তায় নতুন নাম আরোপ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

(১২) আল্লাহ্ 'আদ-দহর'। 'আদ-দহর'-এর অর্থ পরম 'কাল বা' সময়।[৪] 'আদ-দহর' অর্থে তিনি 'অসীম অস্তিত্ব' বুঝেছেন। নিত্যতা, অক্ষয়তা এবং এ দুটির মধ্যে অবস্থিত সবকিছু মিলেই অনন্তকাল গঠিত। এইকাল ও ঐশী সত্তাসার এক ও অভিন্ন। এখানে প্লাটিনাসের সাথে তাঁর যথেষ্ট মিল আছে। বার্গস'ও 'কাল' সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলেছেন। প্লটিনাস, বার্গস[৫]ও তাঁর মতে কাল চিরন্তন বা নিত্য 'বর্তমান'[৬] কেননা যা সব কিছুকে পরিচালনা করে তা ভবিষ্যতকে বর্তমান রূপে জানতে পায়।

একইভাবে তিনি ঐশী নাম ও গুণকে অদ্বৈতবাদী মতবাদ সৃষ্টির জন্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে ইসলামের সৃজনশীল আল্লাহ্ আর স্রষ্টা হিসাবে থাকতে

---

১. কোরআন ৭: ১৭১।
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p 44.
৩. Futuhat, IV, p. 328.
৪. নবীর হাদীস—কালকে মন্দ বলো না, আল্লাহ্ই কাল।
৫. Henri Bergson : Creative, Evolution London, 1954. trans. by. Dr. Arthur Mitchell, p. 41.
৬. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 45.

পারেননি, তিনি বিশ্বের বিভিন্ন আকারের মধ্যে নিজেকে প্রকাশকারী সত্তা হিসাবে বর্তমান আছেন, দয়াশীল কর্তা আর দয়াশীল নয়, তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদী দর্শনে বিভিন্ন বস্তুর সত্তা দানকারী কর্তা।

নৈতিক ও ব্যক্তিগত গুণের তাৎপর্য তখনই থাকে, যখন আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তিনি দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না, তাঁর মতে আল্লাহ্ ও বিশ্ব ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র সত্তা নয়, একই পরম সত্তার দুটি রূপ মাত্র।[১] কিন্তু যখন তিনি ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় মত্ত থাকেন তখন তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র অতিবর্তী রূপ বেশ ভালভাবে ধরা পড়ে।[২] এখানে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এটা তাঁর দর্শন নয়। অবশ্য ধর্মীয় চেতনার ঐক্য বা আল্লাহ্ অনেক সময় তাঁর কাছে কেবলমাত্র ছায়া ও স্বপ্নের মত ধরা পড়েছে।

তাঁর মতে যে কোন ধরনের দ্বৈতবাদ বা বহুত্ববাদ সঠিক মতবাদ নয়। বিশ্ব ও আল্লাহ্‌র মধ্যে দ্বৈতবাদ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর বহুত্ববাদ আল্লাহ্‌র সত্তায় আরোপিত গুণাবলীর বহুত্ব ইত্যাদি আত্মগত এবং আপেক্ষিক মাত্র। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তিনি নিজেও তা রক্ষা করতে পারেননি। অনেক সময় তিনি 'আত্মগত' গুণকে 'বস্তুগত' গুণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বজগৎ আত্মগত জগৎ কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে অনেক স্থানে বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব অতি মূর্তরূপে ফুটে উঠেছে। মনে রাখতে হয় যে তাঁর কাব্যিক প্রতিভা তাঁর তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক বা অধিবিদ্যার মতবাদকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত করেছে। মনে রাখতে হয় যে তিনি নিজে পুরাদস্তুর দার্শনিক নন এবং তাঁর রচনার মধ্যে পূর্ণ যৌক্তিক সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর বর্ণিত আল্লাহ্‌কে কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদী, খোদাবাদী বা নব্য প্লেটোবাদী বলা যায় না, এই মতবাদ জ্ঞানমূলক চেতনা ও ধর্মীয় চেতনার মিশ্রণজাত ঐক্য বা মিশ্রনজাত আল্লাহ্।[৩]

ঐশী নামের দুইটি দিক

ইবনুল আরাবী যেমন এক ও বহু, আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন তেমনিভাবে ঐশী গুণের দুইটি দিকের মধ্যে বা দুইটি দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য

১. Ibid, p. 45.
২. Ibid, p. 45.
৩. Ibid, p. 45.

দেখিয়েছেন। ঐশী নামকে ঐক্য ও ঐশী সত্তাসারের সাথে অভিন্ন বলে চিন্তা করে ঐশী নামকে 'সক্রিয়'[১] বলা হয় কেননা তখন এক একটি নাম দ্বারা আল্লাহ্র অসীম ক্রিয়ার এক একটি দিক বুঝানো হয়। বাহ্যিক জগতে প্রকাশিত বহুত্ব হিসাবে বা বাহ্যিক জগৎ হিসাবে সে নামকে 'নিষ্ক্রিয়'[২] এবং গ্রহণক্ষম বলে উল্লেখ করা হয়। নামের প্রথম দিক সৃজনশীল স্রষ্টারূপী এবং দ্বিতীয় দিক সৃষ্টিরূপী।

'আয়ান আস-সাবিতা', 'নির্ধারিত আদর্শ সত্তা' বা 'সৃষ্টির বীজরূপী-সত্তা' আলোচনার ক্ষেত্রেও ঐশী নামকে সক্রিয় রূপে দেখা যায়, বিভিন্ন নাম সুপ্ত আকারে বাহ্যিক বিশ্ব ছাড়া আর কিছুই নয় এবং 'আয়ান' বা সুপ্ত সত্তাগুলো এই বাহ্যিক জগতের সাথে তুলনা করলে সক্রিয় বলে মনে হয়। 'আয়ান' বা সৃষ্টির বীজরূপী আদর্শ সত্তা ছোট বড়, উচ্চ নীচ সত্তার ক্রমিক ধারা, একটি স্তরের সত্তা তার উচ্চ স্তরের সত্তার তুলনায় নিষ্ক্রিয়।

ইবনুল আরাবীর আলোচনা 'চিন্তার একটি চক্র' বলে মনে হয়। এক ও বহু সম্পর্কীয় পরাতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করার পরে এটাকে তিনি আত্মগত বলে উল্লেখ করেন। এই চক্রের যে কোন স্থান হতে যাত্রা শুরু করলে যাত্রা শেষে পুনরায় যাত্রাস্থানে ফিরে আসতে হয়। তাঁর মতে একমাত্র একটিই মূল সত্তা আছে। তাকে যত খুশী বিভিন্ন নাম ও গুণ দ্বারা গুণান্বিত করা যাক না কেন অথবা বিশ্বের নামে বহুত্বরূপে দেখা যাক না কেন; তার সত্তাসার সর্বদা অননু-ভবনীয় ও অপরিবর্তনীয় থেকে যায়। মূল সত্তা সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তা আত্মগত এবং পরম জ্ঞানের তুলনায় তা অকেজো। বহুত্ব, নাম ও গুণের বহুত্ব, নিষ্ক্রিয়তা, সক্রিয়তা ইত্যাদি বলে কিছুই নাই, এগুলো মনের দেওয়া কতকগুলো শব্দ যা দিয়ে মন পরম সত্তাকে প্রকাশ করে।

'আয়ান আস সাবিতা' 'প্রথম আকারপ্রাপ্ত সুপ্ত মূল সত্তা' 'নির্ধারিত মূল আদর্শ বা প্লেটোর ধারণা'

'আয়ান আস-সাবিতা' শব্দকে 'নির্ধারিত মূল আদর্শ' অথবা 'প্রথম আকার প্রাপ্ত সুপ্ত মূল সত্তা' বলা হয়। আল্লাহ্র ধারণাকে দার্শনিকগণ সত্তাসার

১. Ibid, p. 46.
২. Ibid, p. 46.

বলেন এবং সূফীরা 'আয়ান আস-সাবিতা', 'প্রথম আকারপ্রাপ্ত মূল সত্তা', 'নির্ধারিত মূল আদর্শ' 'অব্যক্ত সত্তা' বলেন। সত্তাসার প্রথমতঃ অস্পষ্ট, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয়। কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিই তার সত্তাসার অথবা 'আয়ান'। এই প্রকৃতি অস্পষ্ট ও অপরিবর্তনশীল। সৃষ্টি 'আয়ান' বা অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়। ইবনুল আরাবীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'আয়ান আস-সাবিতা' শব্দ দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করেছেন এবং এই শব্দ তাঁর তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর 'আয়ান' যেন এরিস্টটলের 'আকার' মতবাদ, প্লেটোর ধারণাবাদ, ইশরাকীর বুদ্ধিগ্রাহ্য অস্তিত্ববাদ, আশারীয়দের দ্রব্য ও গুণের অভিন্ন কারণ মতবাদগুলোর মিশ্রণজাত মতবাদ।[১] তাঁর মতে বহিঃপ্রকাশের পূর্বে বিশ্বের সকল বস্তু আল্লাহ্‌র ঐশী সত্তাসারের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, ভবিষ্যতে আল্লাহ্ নিজেকে কি আকারে প্রকাশ করবেন সুপ্ত অবস্থা তারই ধারণা, সুপ্ত অবস্থা তাঁরই চিরন্তন জ্ঞানের আধেয় এবং তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের সমান। আল্লাহ্ আত্মচেতন অবস্থায় নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এটাই আল্লাহ্‌র প্রথম নির্দিষ্ট-করণ, নির্ধারণকরণ, বিশেষীকরন বা 'প্রথম আকারপ্রাপ্ত সুপ্ত মূল সত্তা' যার মধ্যে তিনি নিজের অসংখ্য সত্তাসাররূপী বিভিন্ন আকারকে লক্ষ্য করেছেন। ঐ আকারগুলো তাঁর নিজ সত্তাসারেরই আকার। এর দ্বারা তাঁর সত্তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ আকারগুলোকে তিনি 'আয়ান', 'আকারপ্রাপ্ত সুপ্ত মূল সত্তা' বা 'নির্ধারিত মূল আদর্শ' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আমরা 'আয়ান' বা আকারপ্রাপ্ত মূল সত্তাগুলোকে এই বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে সেগুলো আল্লাহ্‌র মনে ও সত্তাসারে অবস্থিত 'পরম সত্তার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সুপ্ত অবস্থা'। আর সেই অবস্থাগুলো আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম ও তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়। 'আয়ান'কে দুইভাবে বোঝা যায়: (১) আল্লাহ্‌র মনে অবস্থিত বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা হিসাবে ও (২) ঐশী সত্তাসারের বিশেষ আকারপ্রাপ্ত অবস্থা হিসাবে। তিনি 'মরিয়াহ' ও 'ছরিয়াহ' শব্দ দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করেছেন। 'মরিয়াহ' (পরম এক) শব্দ 'আয়ানে'র প্রথম অবস্থা ব্যাখ্যা করে, 'ছরিয়াহ' (অপর সত্তা) শব্দ 'আয়ানের' দ্বিতীয় অবস্থার

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 47.

বর্ণনা দেয়। প্রথম অবস্থা একটা 'ধারণা' এবং দ্বিতীয় অবস্থা সত্তার বিশেষ একটি 'আকার'।[১]

এ কথা বলা যায় না 'আয়ান' বা সত্তাসারের সম্ভাবনাপূর্ণ আকারগুলো সত্তাসার হতে ভিন্ন কিছু একটা এবং সত্তাসারের বাইরে এই সবগুলোর অস্তিত্ব আছে, যেমন বলা যায় না মনের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলো মন হতে ভিন্ন কিছু একটা অথবা মনের বাইরে সেগুলোর অস্তিত্ব আছে; অথবা সেগুলো অন্য কোন ভিন্ন দ্রব্যের অবস্থা মনগতভাবে সত্তাসার ও সত্তাসারের সম্ভাবনাপূর্ণ সত্তাকে (আয়ান) পৃথক করতে পারা যায়, যেমন 'মন' ও তার 'অবস্থা'কে পৃথক করা যায়।[২] 'আয়ান' প্রকৃতপক্ষে ঐশী সত্তাসার ও ঐশী চেতনার সাথে এক ও অভিন্ন। তবুও সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থা বা আকারগুলোকে 'অস্তিত্বহীন' বলেছেন এই অর্থে যে ঐশী সত্তাসারের বাইরে তাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। 'অস্তিত্বহীন' শব্দের অর্থ এই নয় যে সেগুলোর কোন সত্তা নাই। একটি মাত্র মূল সত্তা আছে। একটি অস্তিত্বহীন আত্মগত বহুত্ব আছে, আর অস্তিত্বহীন আত্মগত সম্পর্ক আছে যা মূল সত্তাকে সীমিত ও নির্ধারিত করে। 'আয়ান' ঐশী নামগুলোর যুক্তিগতভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণা কিন্তু সেগুলো আবার সম্ভাবনাপূর্ণ সত্তাও বটে। 'আয়ান' কি কখনো মূর্ত প্রকাশ ঘটে অথবা তার কি কখনো পরিবর্তন হয়? যেহেতু সেগুলো এক অর্থে আত্মগত, সেহেতু সেগুলো কি সব সময়েই অস্তিত্বহীন অবস্থায় থাকবে? সেগুলো কি প্লেটোর ধারণার মত? ধারণাগুলোকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ করা হয় এবং সত্তা বলে মনে করা হয়। সেই আদর্শ ধারণাগুলোই তাদের বাস্তব বা মূর্ত প্রকাশের বস্তুগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এক সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছা তাদেরকে এই ভাবে সৃষ্টি করেছে। এই প্রসংগে তিনি নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেছেন এটা (আয়ান) কি সেই যাকে আমরা অস্তিত্বশীল বস্তু বলি এবং অস্তিত্বহীন ব্যবস্থা হতে এটা রূপান্তরিত হয়ে অস্তিত্বশীল অবস্থায় আসে যা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি? অথবা এটা কি কেবলমাত্র এর আত্মগত নির্ধারণ (হুকুম) যাকে আসল সত্তার মূল আদর্শের (আল্লাহুর) সাথে বুদ্ধিগ্রাহ্য সম্পর্কে নিয়ে আসা হয়েছে? দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিরূপ ও দর্পণের সাথে যে সম্পর্ক 'আয়ান' ও আল্লাহুর সত্তাসারের সাথে

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 48.
২. Ibid, pp. 48-49.

কি সেই একই সম্পর্ক? যেহেতু বাহ্যিক বস্তুর 'আয়ান' সব সময় সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় ছিল সেহেতু সে বস্তু কি অস্তিত্বহীন? যদি অস্তিত্বহীন হয় তবে সম্ভাবনামূলক সত্তাগুলোর 'আয়ান' একে অপরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে কেবলমাত্র আদি মূল সত্তার দর্শনের 'আয়ান'-এর মাধ্যমে এবং 'আয়ান' সব সময়ে পূর্বের মতই অস্তিত্বহীন অবস্থায় থাকবে। এটা কি এমনি ধরনের যে আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তাকে ঐ সকল 'আয়ানের' বা নির্ধারিত সত্তার আকারের মধ্যে প্রকাশ করেন যা একটি থিয়েটারের মত হয় ও যেখানে একটি 'আয়ান' অন্য 'আয়ান-'কে প্রত্যক্ষ করে তখনই যখন আল্লাহ্ সেই অন্য 'আয়ানের' মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং বস্তু তার অস্তিত্ব অর্জন করে? অন্য 'আয়ানের' মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার অর্থ এই যে আল্লাহ্ নিজেকে সেই বস্তুর আকারে প্রকাশ করেন এবং বস্তু তার অস্তিত্ব অর্জন করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা এক দিক দিয়ে সত্যের অনেকটা কাছাকাছি। অন্য ব্যাখ্যা ও অন্য দিক থেকে সত্য। উভয় ক্ষেত্রে বস্তুর 'আয়ান' বা বস্তুর নির্ধারিত আদর্শ সত্তা অস্তিত্বহীন অবস্থায় থাকে, কিন্তু তবুও তা সম্ভাবনাপূর্ণ সত্তা হিসাবে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। মোটকথা তিনি 'আয়ান'-এর নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। স্বতন্ত্র বস্তু হিসাবে বা ভিন্ন সত্তা হিসাবে এর সার্বিক সত্তাসারের বাইরে 'আয়ান'-এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। একমাত্র সম্ভাবনা হিসাবে এবং আল্লাহ্‌র মনে অবস্থিত বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা হিসাবে সেগুলো কেবলমাত্র মনের ধারণা কিন্তু সকল বস্তুর সত্তা হিসাবে সেগুলো যা তাই, সেগুলো ঐশী সত্তাসারের বিশিষ্ট আকার-প্রাপ্ত অবস্থা ছাড়া অপর কিছুই নয়।[১] দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর 'আয়ান' বর্ণনাকারী ভাষা এমন রূপক ও কল্পনা মিশ্রিত যে 'আয়ান' মূর্ত, বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলে মনে হয়। তিনি এমন কথা বলেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, 'আয়ান' আল্লাহ্‌র বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ এক স্থান দখল করেছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নির্গমন বা প্রকাশের সময়ে এই সকল আয়ানের আকারের মাধ্যমে নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করেছেন। আদিতে আল্লাহ্ ছিলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তারপর তিনি নিজেকে 'আয়ান'-এর বুদ্ধিগ্রাহ্য আকারের মাধ্যমে নিজের কাছে প্রকাশ করেন, আল্লাহ্ 'আয়ান'কে

১. Ibid, p. 50.

অস্তিত্বের কাপড়ে আবৃত করেন ; তিনি সেগুলোকে প্রকাশ করেন, আমরা সত্তা এবং সত্তাসার হিসাবে আল্লাহ্‌র মাঝে ছিলাম। আল্লাহ্ তাঁর সুন্দর নামের মাধ্যমে বস্তুগুলোর 'আয়ান' দেখতে চান অথবা তার নিজের 'আয়ান' দেখতে চান ইত্যাদি কথা তিনি বলেছেন। তাছাড়া 'ছিলেন', 'হবে', 'পরিবর্তন', 'প্রকাশ হওয়া, শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন যা দিয়ে এক দিকে আল্লাহ্ ও 'আয়ান' এবং অন্যদিকে 'আয়ান' ও বাহ্য জগতের মূর্ত বস্তুর সাথে সাময়িক সম্পর্ক প্রকাশ পায়, এবং এই সব শব্দকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে তা তাঁর অদ্বৈতবাদী দর্শনকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে বা তাঁর মতবাদের অসংগতি প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'আল্লাহ্' ও 'আয়ান'-এর মধ্যে কোন সাময়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী নন, যদিও তাঁর ভাষা এ বিষয়ের প্রতি তেমন ইংগিত দেয়। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তির চেয়ে তাঁর ভাব অধিক বিপথগামী। সঠিকভাবেই মনে করা যায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মপ্রকাশ বা নির্গমন বা অবতরণ জীবন নাটকের মাঝে ধারাবাহিক প্রবাহ যার আদি বা অন্ত, শুরু বা শেষ নাই। এই পরম সত্তা-সারের মাঝে সম্ভাবনাগুলো ধারাবাহিক ও অবিরতভাবে কালের মাঝে মূর্তরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, তাঁর 'আয়ান' যদিও প্লেটোর 'ধারণার' অনুরূপ, তবুও এ কথা বলা যায় যে, এই দুইটি সম্পূর্ণরূপে এক নয়। 'আয়ান' ঐশী সত্তাসারের মাঝে বিশেষ আকারপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকার জন্য এবং ঐশী চেতনায় বুদ্ধিগ্রাহ্য আকার হিসাবে বর্তমান থাকায় জন্য 'আয়ানকে' অতি সহজেই প্লেটোর 'ধারণা' হতে ভিন্ন বলা যায়। তিনি ঐশী চেতনাকে প্লটি-নাসের প্রথম বুদ্ধির সাথে তুলনা করেছেন, এই চেতনা 'আয়ানের' সকল বোধগম্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য আকারকে ঘিরে আছে অর্থাৎ সত্তাসার সকল বস্তুর সুপ্ত সত্তাগুলোকে অন্তর্নিবিষ্ট করে আছে। সকল বুদ্ধিগ্রাহ্য আকার সকল সত্তাসারের সমান এবং সকল সত্তাসারকে প্রতিফলিত করে। এই সকল সত্তাসারকে তিনি আত্মা বলে উল্লেখ করেছেন। এই আত্মাগুলোর এমন কতগুলো ক্রিয়া আরোপ করেছেন যা কেবলমাত্র ধারণায় আরোপ করা যায় না। আল্লাহ্ প্রথম বুদ্ধি 'রূহ্' বা আত্মার মধ্য দিয়ে নিজের সম্পর্কে সচেতন হন কিন্তু সকল 'আয়ানের' সত্তাসার বা সার্বিক আত্মার মধ্যে অবস্থিত 'বিশেষ আকার প্রাপ্ত আত্মার' মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি 'আয়ান' বা আত্মা সম্পর্কে সচেতন হন। এই অভিমত প্লটিনাসের

'পরম এককের মন', আর 'ধারণা' সম্পর্কীয় অভিমতের অনুরূপ। তাঁর মতে 'মনই' প্রকৃতপক্ষে 'সকল বস্তু', অজড় সত্তাসারের মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলোর জ্ঞান স্বয়ং বস্তুগুলো।[১] পরম এক সত্তার মন তাঁর বস্তুগুলোকে জানে, তবে তা বাহ্যিক বস্তু হিসাবে প্রত্যক্ষণের সাহায্যে নয়, নিজের সাথে অভিন্নরূপে। এটা সর্বোচ্চ ঐক্য নয়, এর মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, 'চিন্তা' ও 'চিন্তার বিষয়বস্তুর' দ্বৈতভাব বর্তমান। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের ঐক্য। এই মতবাদ অতি সংক্ষেপে প্লটিনাসের মতবাদ। এখন ইবনুল আরাবীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এককের জ্ঞান ও বস্তুগুলোর 'আয়ান' বা সত্তা এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে প্লটিনাস ও তাঁর মতবাদ একই রকম। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষণীয় যে এ বিষয়ে প্লটিনাসের মতবাদ তাঁর মতবাদের চেয়ে সঠিক, নির্দিষ্ট, অতি সুষ্ঠু ও সংগতিপূর্ণ। তিনি 'আয়ান' দিয়ে এক এক সময় এক এক প্রকার বস্তু সত্তা বা ধারণাকে বুঝেছেন। অনেক সময় আয়ানকে বার্কলের দর্শনে আল্লাহ্‌র মনে অবস্থিত বিশ্বের ধারণার মত ধারণা মনে করেছেন। আবার 'আয়ান' শব্দ দিয়ে তিনি কেবলমাত্র শুদ্ধ ও মৌলিক বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাকে বুঝেছেন এবং অনেক সময় তিনি কেবলমাত্র তাদের সত্তাসার বুঝেছেন এবং কদাচিত উভয়টিকে বুঝেছেন যদিও তাঁর মতবাদের মধ্যে উভয়টিকে বোঝানোর মত অনেক উক্তি রয়েছে। তিনি ঐশী জ্ঞানকে ঐশী সত্তাসারের সাথে এক ও অভিন্নরূপে দেখেছেন এবং এই ধারণা হতে, যেমন প্লটিনাস বলেছেন, এটা অনুসরণ করে যে ঐশী জ্ঞান সত্তাসারের বা পরম এককের সকল সম্ভাবনামূলক আকারের সাথে সমান ও অভিন্ন এবং প্রত্যেকটি আকার ঐশী চেতনার মধ্যে অবস্থিত তার নিজের ধারণার সাথে অবশ্যই এক ও অভিন্ন হবে। অন্য কথায়, প্রত্যেকটি আকার বা প্রত্যংশ একই সময়ে ঐশী সত্তাসারের মধ্যে এবং ঐশী জ্ঞানের মধ্যে একটি অবস্থা রূপে বিদ্যমান থাকে, এই দুইটি অবস্থার মিলন ঘটে এবং এক হয়ে যায়। এই দুইটি অবস্থা মিলে এক হওয়ার পর যা হয় তারই নাম, ইবনুল আরাবীর মতে 'আয়ান আস সাবিতা'।[২]

আয়ান-আস-সাবিতা মতবাদ ইবনুল আরাবীর তত্ত্বচিন্তার মধ্যে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।[৩] 'আয়ান' পরম সত্তা ও বাহ্যিক জগতের মধ্যে

১ Ibid p 51
২ Ibid, p. 52
৩ Ibid, p. 52

অবস্থিত মধ্যবর্তী সত্তা বা ধারণা। তাঁর মতে 'আয়ান' অদৃশ্য সত্তার চাবিকাঠি।[১] প্রথম চাবি, সৃষ্টির ইতিহাসে 'আয়ানই' প্রথম অধ্যায়। এই অবস্থায় আল্লাহ্ যখন স্রষ্টা হিসাবে চিন্তা করেন তখন আল্লাহ্ আপন সত্তাসারের মধ্যে তাঁর সৃষ্টির অসংখ্য সংখ্যাকে দেখতে পান। এই বিশেষ অবস্থার জ্ঞান কেবল স্বয়ং আল্লাহ্রই আছে। 'প্রত্যাদেশ' অতীন্দ্রিয় অনুভূতিমূলক জ্ঞানও এই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এই অবস্থার নাম দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য এবং এখানে আল্লাহ্ স্বয়ং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বর্তমান।[২] যদি কেউ বলে যে, কোন 'সসীম সত্তা' 'পরম সত্তাকে' জানতে পারে এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে তবে তা ঠিক নয়। এমনকি 'ফানা বা তন্ময় অবস্থার মধ্যে তেমন অবস্থার জ্ঞান সম্ভব নয়, যে পূর্ণ তন্ময় অবস্থা বা পূর্ণ 'ফানা' সেই অবস্থার জ্ঞান দান করতে পারে, তা ইহজগতে সম্ভব নয়। তাঁর মতে যদিও একজন মরমী সাধকের পক্ষে ঐশী সত্তাসারের[৩] সাথে 'আয়ান' এর নির্দিষ্ট সম্পর্ক কি 'আয়ান' কিভাবে আল্লাহ্‌র সৃজনধর্মী শক্তির সাথে যুক্ত হয়, 'আয়ান' কিভাবে বাহ্যিক অস্তিত্বশীল বস্তুতে পরিণত হয় ইত্যাদি জানা অসম্ভব তবুও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সুফী সাধকের পক্ষে 'আয়ান'কে বিশেষ করে তার নিজের 'আয়ান'কে জানা সম্ভব হয়। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ সুফী সাধকের কাছে তার নিজের 'আয়ান' ও আয়ানের অসংখ্য অবস্থার প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ্ যেমন ভাবে তাকে জানেন ঠিক তেমনিভাবে মরমী সাধক নিজেকে জানেন বা নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানের একই উৎস (আল্লাহ্) হতে উভয়ে জ্ঞান লাভ করেন।[৪]

'এক' ও 'বহু' 'আল্লাহ্' ও 'বিশ্ব' সত্তাসার ও গুণ 'পরম সত্তা' ও 'অবভাসিক জগত' এই দুইয়ের অভিন্নতা প্রকাশকারী মতবাদই 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' মতবাদ এবং এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত সত্তা হিসাবে 'আয়ান' একই সাথে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৫] এক অর্থে 'আয়ান' পরম আত্মার বা পরম ঐক্যের 'অবতরণ' বা নির্গমন। আয়ান ঐশী নামগুলোর আকার এবং ঐশী

১. Fusus, p. 248.
২. Dr. A. E. Affifi. Ibid, p. 52
৩. Fusus. p. 249.
৪. Fusus. p. 47.
৫. Fusus. p. 15.

সত্তাসারের মধ্যে অবস্থিত 'সুপ্ত সম্ভাবনাপূর্ণ আকার' বা 'অবস্থা এবং সেই কারণেই তা নিষ্ক্রিয় সত্তা।' এবং 'আয়ান'কে সত্তাসারের দিক দিয়ে বিচার করলে অর্থাৎ সকল বস্তুর ভবিষ্যতে বস্তুরূপে প্রকাশ পাওয়ার মূল সত্তা তার নিজের মধ্যে থাকায় 'আয়ান'কে সক্রিয় বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা যৌক্তিক নির্ধারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'আয়ান' বা সত্তাগুলো ঐশী সত্তার সাথে তুলনায় নিষ্ক্রিয় কেননা ঐশী নামগুলো 'আয়ান' বা সত্তাগুলোকে নির্ধারণ করে। এই নির্ধারণ ক্রিয়া সেইভাবে সংঘটিত হয় যেভাবে 'সঠিক সত্তা' তার 'বিশেষ সত্তাগুলোকে' নির্ধারণ করে। 'আয়ান'গুলো বাহ্যিক বস্তুর সাথে তুলনা করলে সক্রিয় হয় সেইভাবে যেভাবে সম্ভাব্য সুপ্ত সত্তাগুলো বাস্তব বস্তুর সাথে তুলনা করলে সক্রিয় হয় এবং উভয় ক্ষেত্রের নির্ধারণই কেবলমাত্র যৌক্তিক নির্ধারণ।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা অতি স্পষ্ট বলা যায় যে ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' বা সত্তার ঐক্যকে কেন্দ্র করে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়েছে এবং 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' মতবাদ সত্য মতবাদ তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' ও ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র আল্লাহ্র একত্ববাদ। ইবনুল আরাবী ধর্মের আল্লাহ্কে দর্শনের পরম সত্তারূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার মধ্যে জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্য মিলিত হয়েছে। তাঁর মতে পরম সত্তা একটি। এই পরম সত্তার কয়েকটি দিক আছে। যেমন যৌক্তিক দিক ও পরাতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক দিক। যৌক্তিক দিক সম্পর্কে অনেক কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখন পরম সত্তার তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে কিছু বলা যায়। তার পরম সত্তা অদ্বৈতবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী সত্তা। এটা কোন্ প্রকার অদ্বৈতবাদ?

(১) এক প্রকার অদ্বৈতবাদ আছে যেখানে পরম সত্তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অসীম ও চিরন্তন সত্তা বলে স্বীকার করা হয়। এই সত্তা দৃশ্যমান জগতের সব কিছুর মূল উৎস। এখানে দৃশ্যমান জগৎ যেন মায়া, অলীক ও মিথ্যা। এটা যেন এক ধরনের বিশ্ব-মিথ্যাবাদ। প্রত্যেকটি সীমিত সাময়িক বস্তু মায়া ও অলীক আর এই প্রকার অদ্বৈতবাদী মতবাদে দুইভাবে পৌঁছানো যায়। এ সম্পর্কে

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (২) ধর্মীয় চেতনার দিক হতে ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপী ও চিরন্তন পরম সত্তা বলে বিশ্বাস করা হয়। আল্লাহ্ বিশ্বের সব কিছুকে ঘিরে আছেন আর এমন ধারণা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত ধারণা। (৩) দার্শনিক চেতনার দিক হতে—এমন একটি ধারণা করা হয় যে পরম সত্তা আদিতে এক, চিরন্তন, অসীম, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কোন অভিজ্ঞতা দিয়েই তাঁকে জানা যায় না। এই দার্শনিক চেতনার পরম সত্তা সব সময়ে ধর্মীয় আল্লাহ্ বা ঈশ্বর হবে এমন কথা নয়। হেগেলের 'পরম সত্তা' ও 'ঈশ্বর' সম্পর্কীয় দুইটি ধারণা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ধর্মীয় চেতনার ঐক্য ও জ্ঞানমূলক ঐক্য এক নয়। এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। মুসলিম চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় দিক থেকে আল্লাহ্ সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী মতবাদ গড়ে তুলেছেন। তিনিও একই চেষ্টা করেছেন তবে তাঁর মতবাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার ঐক্য ও জ্ঞানমূলক চেতনার ঐক্য মতবাদের মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে। তবে তিনি যুক্তির সাহায্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন নি, তাঁর মতে আল্লাহ্ সকল প্রমাণের উর্ধ্বে। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।[১] তাঁর অস্তিত্ব অনিয়ত সত্তাগুলোর সত্তাসাররূপে প্রকাশ পেয়েছে। যিনি সর্বত্র ও সর্বকালে বিরাজমান, তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ্ অস্তিত্বশীল সত্তা, তিনি ব্যতীত অস্তিত্বশীল কোন কিছু নাই। এমন কি, 'অন্য কিছু' বা 'সেখানে' বলেও কিছুই নাই, সব কিছুর সত্তাসার একমাত্র আল্লাহ্।[২] 'কার কাছ থেকে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া অস্তিত্বশীল কিছুই নাই, আমার চোখ একমাত্র তার সত্তাসার ছাড়া আর কিছুই দেখে না এবং আমার কান তাঁর বাণী ছাড়া কিছুই শোনে না।'[৩] তাঁর যৌক্তিক পদ্ধতি 'সকল সত্তার মূল ঐক্য' প্রমাণের অথবা আল্লাহ্‌র বাইরে অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তার ঐক্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা হয়েছে। তাঁর যৌক্তিক পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য মানুষের বুদ্ধির অক্ষমতা ও জড়বস্তু অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করা। মানুষের বুদ্ধি 'সমগ্র'কে সমগ্ররূপে বুঝতে পারে না।

১. Futuhat, I, pp. 554, 600
২. Ibid, I, p.884. Futuhat 11, p. 531
৩. Futuhat II. p. 206

জড় বস্তুর নিজস্ব কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। আমরা যেভাবে বুঝি তার মধ্যেই সেগুলো বহুত্বরূপে আমাদের কাছে ধরা পড়ে।[১]

ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ ও দার্শনিক অদ্বৈতবাদী এক সত্তা

একজন মুসলিম অদ্বৈতবাদী চিন্তাবিদের পক্ষে ইসলামী আল্লাহ্‌র ধারণা হতে তাত্ত্বিক পরম সত্তার ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব। অন্য কথায়, ইসলাম ধর্মের খোদাবাদী মতবাদ হতে সত্তার ঐক্য সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদে অর্থাৎ 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদে পৌঁছানো সম্ভব যদিও সে প্রচেষ্টা অনেক সময় অসংগত, অবৈধ ও ক্ষমার অযোগ্য হয়।[২] 'একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই নাই'—এই বাক্য হতে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই'—এই সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্য অনুমান করেছেন সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাবিদেরা। তাঁরা দেবতাবাদের ভয় করতেন বলে আল্লাহ্‌কে কেবলমাত্র উপাস্য বলেই স্বীকার করতে বাধ্য হননি বরং তাঁকে একমাত্র বাস্তব সত্তা এবং একমাত্র পরম সত্তা বলে মনে করেছেন। ইসলাম ধর্মে তৌহিদ মতবাদে একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং অন্যান্য সকল 'কারণ' ও মধ্যবর্তী সকল কিছুকে অস্বীকার করা হয়। তিনি তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ দ্বারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী সত্তারূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতবাদের মধ্যে দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয় বা মরমী প্রভাব স্পষ্টরূপে দেখা যায়। আল্লাহ্ ও পরম সত্তার ঐক্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা বুদ্ধি ও অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা প্রসূত ধারণা। তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে দর্শন ও সুফীবাদ উভয়ের মিলন ঘটেছে। দার্শনিক মতবাদ, সুফীবাদ, আল্লাহ্‌র জ্ঞান-ধর্মানুরাগী ব্যক্তির মতবাদ 'আল্লাহ্-ই সমগ্র' অথবা 'সমগ্র একটি ঐক্য' এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় না। সর্বেশ্বরবাদীরাও পরম সত্তায় বিশ্বাসী ভাববাদীরা মনে করেন যে বাস্তব সত্তা অথবা পরম সত্তা যদি অস্তিত্বশীল হয় এবং একটি ঐক্য হয় তবে তা বিশ্ব অথবা সমগ্র বিশ্ব মিলে একটি ঐক্য হবে এমন চিন্তা করার পক্ষে তাঁদের কি কোন প্রত্যক্ষ-পূর্ব যুক্তি আছে? সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিকরা এমন চিন্তা করার বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, মরমী

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 55. 600

২. Ibid, p. 55

সাধনার 'ফানা' বা তন্ময় অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বা অতি মানসিক স্বজ্ঞার মধ্যে তারা আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করেন আর এই প্রমাণকে তাঁরা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু একথা বলা ভ্রান্তিজনক যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশেষ এক সময় আমি এক অপরিচিত শক্তির সাথে একাত্মতা অনুভব করে তাঁকে আল্লাহ্‌ বলে মনে করি, এবং আমি একটি তাত্ত্বিক বাক্য বলতে পারি যে আমি আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন এবং এই অভিন্ন অনুভূতি হতে এর চেয়েও অধিক ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে প্রত্যেকটি অস্তিত্বশীল বস্তু আল্লাহ্‌ হতে অভিন্ন এবং যত কিছু অস্তিত্বশীল আছে সবই আল্লাহ্‌। একজন মরমী সাধক নিজের অভিজ্ঞতাকে একটি অভিজ্ঞতা হিসাবে বলতে পারেন, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে এমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁর পক্ষে সংগত নয়, যা সমগ্র পরম সত্তা সম্পর্কে তাত্ত্বিক মতবাদের সমান হয়। অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমীবাদ কোন তাত্ত্বিক মতবাদ নয় এবং এটাকে কোন তাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তি হিসাবে ধরা যুক্তিসংগত নয়।[১] কিন্তু তাঁর অতীন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা কোন প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, এটা দিয়ে মরমী সাধক বা বিশ্বকে আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়নি। তাঁর মতে এ অভিজ্ঞতা কোন একটি মাধ্যম নয়, এটাই চূড়ান্ত বা পরিণতি।[২] এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য 'পরম সত্তা মূলতঃ এক' তা পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন 'মিলন' বলতে যদি আল্লাহ্‌র সাথে এক হয়ে যাওয়া বোঝায় তবে তা ঠিক নয়। তার মতবাদের মধ্যে 'এক হয়ে যাওয়ার' মত মিলনের কোন স্থান নাই। সেখানে কেবলমাত্র এই উপলব্ধিটুকুই আছে যে 'আপনি খোদার সাথে অভিন্ন'। আর এই অর্থেই তাঁকে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বলা হয় এবং তাঁর মতবাদ হাল্লাজের মতো চিন্তাবিদদের মতবাদ হতে ভিন্ন বলা হয়। তিনি ইসলাম ধর্মে বর্ণিত আল্লাহ্‌র ধারণার স্থলে একটি নতুন ধারণা দিয়েছেন এবং তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করতে গিয়ে তাঁর সাথে কতকগুলো নৈতিক গুণ যোগ করেছেন।[৩] অবশ্য সর্বদাই তিনি এমন করেন নি। তিনি অনেক সময় সর্বেশ্বরবাদী ও খোদাবাদী মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারেন নি।[৪] যাঁর

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 57
২. Ibid, p. 57
৩. Ibid, p. 57;
৪. Ibid, p. 57.

সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না এমন আল্লাহ্‌র ধারণার সাথে সর্বেশ্বরবাদী পরম সত্তার ধারণার সমন্বয় সাধন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়।[১]

মুজাদ্দিদ আলফেসানীর মতে ইবনুল আরাবীর ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের ব্যাখ্যা ও তার সমালোচনা

ইবনুল আরাবীর সমগ্র দর্শন তথা ধর্মীয়, দার্শনিক ও সূফী চিন্তার মূল কথা[২] 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'। তাঁর মতে সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তার মূল সত্তা একটি। এই সত্তা স্বয়ং আল্লাহ্‌। আর এই দিক হতে বিচার করলে বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্‌ অভিন্ন ও সমান। বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্‌র অভিন্নতা সত্তাসার ও গুণাবলীর অভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অনেক সময় এটাকে অস্তিত্ব ও সত্তাসার এবং দ্রব্য ও গুণাবলীর অভিন্নতা বলা হয়, কারণ বিশ্বজগৎ পরম সত্তার গুণাবলীর প্রকাশ্য রূপমাত্র। অন্য কথায়, বিশ্বজগতের সৃষ্টি এক ধরনের নির্গমন। তিনি যে প্রকার নির্গমনে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর অনুসারী জ্ঞানী যে নির্গমনের ব্যাখ্যা দেন তা নিম্নরূপ :

পরম সত্তা অসীম, অনির্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্বচনীয়। এটা 'পূর্ণ শূন্যত্ব' 'পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা' 'আল আমা' বা পরম সত্তার অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা। পরম সত্তা পাঁচটি স্তরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রথম স্তর দুইটি জ্ঞানমূলক ও অপর তিনটি বাস্তব বা অস্তিত্বমূলক। প্রকাশের প্রথম স্তরে পরম ঐক্য সত্তা নিজের শুদ্ধ সত্তা সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। দ্বিতীয় স্তরে পরম সত্তা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত, ব্যাপক ও স্পষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। তিনি তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হন এবং তিনি বুঝতে পারেন যে এগুলো তাঁরই গুণ। এই দুইটি স্তরকে বাস্তব স্তর না বলে ধারণামূলক বা যুক্তিমূলক স্তর বললেই যুক্তিসংগত হয়, কারণ এগুলো দেশ-কালের অতীত এবং সত্তা-সার ও গুণাবলী বা দ্রব্য ও গুণাবলীর মধ্যে এখানে কেবলমাত্র কল্পনামূলক ও যুক্তিমূলক পার্থক্য করা হয়। এরপর আসল নির্গমন শুরু হয়। তৃতীয় স্তরে এক ঐক্যশক্তি বা আত্মা বহুরূপ ধারণ করে, যা একই আত্মা বহু ফেরেস্তা-রূপ গ্রহণ করে। চতুর্থ স্তরে ধারণার জগতের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চম স্তরে পার্থিব

১. Ibid, p. 57.
২. Dr. Burhan Ahmad Faruqi : The Mujaddid's Conception of Tawhid, p. 50 Lahore, 1970.

বস্তুর আবির্ভাব হয়। এই সকল স্তরগুলো পূর্ব হইতেই ঐশী গুণাবলীর মধ্যে বর্তমান থাকে, নির্গমনের মধ্যে কেবলমাত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়।

এই দিক হতে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে, তাঁর মতে পরম সত্তা ও গুণাবলী এক ও অভিন্ন এবং গুণাবলী বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তু বা প্রত্যংশের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করে। ঐশী প্রত্যংশ ও ঐশী গুণাবলী এবং ঐশী গুণাবলী ও ঐশী সত্তাসারের একই প্রকার অভিন্নতা অন্য একভাবেও প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মতে ঐশী নামগুলো 'নাম প্রাপ্ত বস্তুর' সমান এবং 'নাম প্রাপ্ত বস্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা সত্তা' এবং ঐশী নামগুলো সংখ্যায় বহু হওয়া সত্ত্বেও একই সত্তাকে নির্দেশ করে। প্রত্যেকটি নাম এককভাবে যে সত্তার প্রতি নির্দেশ করে, সকল নাম মিলে সেই একই সত্তার প্রতি নির্দেশ করে। কোন একটি নাম অথবা সবগুলো নাম দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা যায়, কারণ সকল নাম একই বস্তুকে নির্দেশ করে। নামের দিক দিয়ে যেমন তিনি 'বহু' তেমনি সত্তার দিক দিয়ে তিনি 'এক'। সত্তার দিক দিয়ে তিনি ধারণামূলক ঐক্য এবং অস্তিত্বের দিক দিয়ে তিনি বহু ও বাস্তব। নির্গমনের মাধ্যমে তিনিই বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অবস্থিত। নাম ও নাম-প্রাপ্ত বস্তুর অভিন্নতা, সত্তাসার ও গুণাবলী বা 'জাত ও 'সিফাত' এর অভিন্নতারই নামান্তর। নাম ও নামপ্রাপ্ত-বস্তুর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা ব্যতীত কিছু নয়।

যেমন তৌহিদ বা একত্ববাদের দিক হতে, তেমনি আল্লাহ্ ও বিশ্বজগতের সম্পর্কের দিক হতেও তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ ও বিশ্বজগৎ অভিন্ন।[১] এই অভিন্নতা হয় বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে অথবা একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাঁর মতে এই বিশ্বজগৎ কেবলমাত্র নাম, এটা অসত্য, অবাস্তব, কাল্পনিক, মায়া, অলীক ও বাস্তব অস্তিত্বহীন এবং একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র প্রত্যংশ বা একত্বের প্রত্যংশ হিসাবে এই বিশ্বজগৎ বা বৈচিত্র্যময় বহুত্ব অস্তিত্বশীল, এর নিজস্ব কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা বা 'আয়ান' এর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। ইবনুল আরাবীর মতে 'আয়ান' শব্দের অর্থ 'সত্তাসার' সত্তাসারকে দুইভাবে বোঝা যায় (১) একটি বস্তুর সত্তার ধারণা হিসাবে এবং (২) একটি অস্তিত্বশীল

১. Dr. Burhan Ahmad Faruqi, Ibid, p. 71

বস্তুর সত্তা হিসাবে। আর দ্বিতীয় অর্থেই তিনি 'আয়ান' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি প্রত্যংশকে 'আয়ান আস-সাবিতা' বলেও উল্লেখ করেন। সেগুলোকে 'আয়ান আস-সাবিতা' বলা হয় কারণ সেগুলো বাস্তব আদর্শ ও অস্তিত্বশীল। সেগুলো অস্তিত্বশীল বস্তুর সত্তাসার বা প্লেটোর 'ধারণা' বা মূল আদর্শ। আল্লাহ্‌র দিক হতে লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে, বিশ্বজগতই আল্লাহ্, বিশ্বজগৎ বিভিন্ন প্রকার ঐশী প্রত্যংশ এবং এগুলোর মধ্যে ঐশী একত্ব বহুস্বরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রত্যংশগুলোর মধ্যেই সমগ্র ঐক্য লুকিয়ে আছে। সেগুলোর ঊর্ধ্বে কোন ঐক্য নাই। সেগুলোর ঊর্ধ্বে 'পূর্ণ শূন্যতা' বা পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বা 'আল-আমা' ছাড়া কিছুই নাই, যদিও পূর্ণ শূন্যতাই পূর্ণ সত্তাসার বা আল্লাহ্। অতএব তাঁর মতে বিশ্বজগতের বাইরে আল্লাহ্‌কে সন্ধান করার কোন প্রয়োজন নাই।

এই অভিন্নতার অভিজ্ঞতা স্থায়ী অভিজ্ঞতা নয় আর সে কারণে তিনি 'অভেদ-পর প্রভেদ' বা 'মিলনের পর-বিচ্ছেদ' অভিজ্ঞতার কথা বলেন।[১] কেউ ইচ্ছা করলে অস্তিত্বশীল সত্তাকে আল্লাহ্ অথবা বিশ্বজগৎ অথবা উভয়ই বলতে পারেন। পুনরায় তিনি উভয় প্রকার অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী ধারণা এককভাবে অস্বীকার করেন। কারণ উভয়টির প্রত্যেকটি এককভাবে দ্বৈতভাবের প্রতি ইংগিত দেয়। তিনি বলেন যে, যদি আল্লাহ্‌কে কেবলমাত্র অতিবর্তী অথবা অন্তর্ব্যাপী সত্তা বলা হয় তবে তা তাঁর অসীমত্বকে খর্ব করে। সুতরাং অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয় প্রকার ধারণার সমন্বয়ে তৌহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করতে হয়। পুনরায়, তাঁর মতে আল্লাহ্ আসল বস্তু, বিশ্বজগৎ তাঁরই প্রতিফলন ও অবভাস। প্রতিফলন আসল বস্তুরই প্রতিভাস বা অবভাস, আসল বস্তুই প্রতিফলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন।

তিনি বলেন মানুষ ও আল্লাহ্‌র সম্পর্ক, অভিন্নতার সম্পর্ক, অন্তর্ব্যাপী ও নৈকট্যের সম্পর্ক।[২] কোরআনে বলা হয়েছে 'আমরা (আল্লাহ্) তাঁর (মানুষ) প্রাণরগ হতেও নিকটবর্তী।' তাঁর মতে এই বাক্যের অর্থ আল্লাহ্ মানুষের অংগ-প্রত্যংগ ও সেগুলোর সত্তাসার। তা ছাড়া, 'আপন সুরতে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন'—এর অর্থ মানুষে আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলীর প্রকাশ পায়, মানুষের দেহের মধ্যেই

১. Ibid, p. 62
২. Ibid, p. 63.

ঐশী গুণাবলী বর্তমান। আর এই কারণেই বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি তাঁর নিজের আত্মাকে জানেন, তিনি তাঁর প্রভুকে জানেন।' আত্মজ্ঞানই আল্লাহ্‌র জ্ঞান বা ঐশী জ্ঞানের মূল কথা।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তা বলতে গিয়েও তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর মতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র পক্ষে আল্লাহ্‌কে জানা। 'আমি গুপ্তধন ছিলাম, নিজেকে জানার জন্যই আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।' নিজেকে জানার এই প্রচেষ্টা পূর্ণতাপ্রাপ্তেরই প্রচেষ্টা। পূর্ণতাপ্রাপ্তের অর্থ জাগতিক বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে উপলব্ধি করা। সত্তার সুপ্ত গুণ জাগতিক জীব ও বস্তুর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ পূর্ণতা-প্রাপ্ত হন। যে দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, ইবনুল আরাবীর দর্শন 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'-এ পৌঁছায়।

মুজাদ্দিদ আলফেসানি ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তিনটি অবস্থা বা স্তর আছে—(১) 'ওজুদিয়া' বা সর্বেশ্বরবাদী, (২) জিল্লিয়াত বা প্রকাশ্য বা অবভাস অবস্থা ও (৩) আবদিয়াত বা সেবক অবস্থা। প্রথম অবস্থায় 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের' বা সত্তার ঐক্যের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এ স্তরে সাধক বিশ্বাস বা বুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে সঠিক ও নির্ভুলরূপে গ্রহণ করে। সে মনে করে যে জগৎ ও আল্লাহ্ অভিন্ন, মানুষ ও আল্লাহ্ অভিন্ন। মানুষ ও জগতের মধ্যে আল্লাহ্ উপস্থিত আছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করে যেখানে বিশ্বকে আল্লাহ্‌র সত্তার অবভাস বলে মনে হয়, আল্লাহ্ 'আসল সত্তা' বিশ্ব প্রতিচ্ছবি বা অবভাস। এ অবস্থা খুব ক্ষণস্থায়ী। এ অবস্থায় সাধক জানতে পারে যদিও বিশ্ব মূল সত্তার অবভাস, তবুও বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এটাকে 'ওয়াহ্‌দাতুশ শহুদ'' মতবাদ বলা হয়। আল্লাহ্ মূল সত্তা, এখানে মনে একটা দ্বৈত-ভাব গড়ে উঠে এবং সাধক 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' সম্পর্কে সন্দিহান হন। এর পর সাধক সেবকের স্তরে উন্নীত হন এবং আল্লাহ্ ও বিশ্বের দ্বৈত অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে জানতে পারেন। তিনি আরো স্পষ্টরূপে জানতে পারেন যে, তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা আত্মগত ও অবাস্তব ছিল, সেগুলোর কোন বাস্তব ও অস্তিত্ব নাই বিশ্ব ও আল্লাহ্ কিংবা, মানুষ ও আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন—এ কথা বলা ঠিক নয়।

মরমী অভিজ্ঞতা দিয়ে অথবা বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ্কে ভালভাবে জানতে পেরেছেন এমন কথা তিনি আর বলতে চান না। আল্লাহ্ মানব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বা স্বজ্ঞার অতীত, তিনি অদৃশ্যের অদৃশ্য। প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র সত্তা কিংবা তার গুণাবলীকে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না।

মুজাদ্দিদের মতে ইবনুল আরাবী তন্ময় বা 'ফানা' অবস্থায় বলেন যে 'আয়ান-আস-সাবিতা' বা বিশ্বের অস্তিত্বশীল সত্তা বা আদর্শ ধারণার কোন অস্তিত্ব নাই এবং আল্লাহ্ই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা। 'ফানা' বা তন্ময় অবস্থা অতিক্রমের পর সাধক তার ভুল বুঝতে পারেন। তন্ময় অবস্থায় সাধক আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্তা বা বস্তু জগৎ তিনি দেখতে পান না। এর ফলে তিনি বিশ্বকে অস্বীকার করেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেন যে আল্লাহ্ একমাত্র সত্তা। যেমন দিবালোকে নক্ষত্র-রাজির অস্তিত্ব লোপ পায়, তন্ময় অবস্থায় ঠিক তেমনি বিশ্ব ও অন্যান্য অস্তিত্ব-শীল সত্তা ও বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্ররাজি আকাশে বিদ্যমান থাকে কিন্তু সূর্যের প্রখর তেজে দেখা যায় না বা বোঝা যায় না। মানুষ ও বিশ্বজগতকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের জ্যোতিতে ঠিক তেমনি দেখা যায় না।

আল্লাহ্র জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে যখন সাধক নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তখন একমাত্র জ্যোতিঃ ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না—(১) মুজাদ্দিদের মতে ইবনুল আরাবী 'ফানা' বা তন্ময় অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তিনি তেমন অবস্থায়ও বিশ্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং বিশ্ব ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। (২) দ্বিতীয়তঃ তিনি ওয়াহ্দাতুল ওজুদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রকৃত অতীন্দ্রিয় সত্তার অভিজ্ঞতায় ও প্রত্যাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা প্রত্যাদেশের বিপরীত মতবাদ। কোরআনে শিক্ষা দেওয়া হয় যে আল্লাহ্ বিশ্ব হতে ভিন্ন এবং বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাঁর কথা সত্য হলে আল্লাহ্র বাণী অর্থহীন হতো। বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলে তবে ঐশী বাণী অর্থপূর্ণ হয়, পাপ-পুণ্য, পুরস্কার-শাস্তি, পরজগৎ ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ হয়। (৩) তৃতীয়তঃ বাস্তব জড় জগতকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্র সৃষ্টিকে অস্বীকার করা এবং মায়া বা অলীক বলে ভুল করা।

তাছাড়া বিশ্বজগতকে কল্পনার জগৎ বলা ঠিক নয়। অবশ্য কল্পনার জগত সমূহকে দুইভাবে বোঝা যায়। (১) প্রথমতঃ কল্পনার সৃষ্টি হলে বিশ্ব আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত কিছুই না। এমন অবস্থায় আমাদের কল্পনা না থাকলে বিশ্ব বা আল্লাহ্র সৃষ্টি অস্বীকৃত হয়। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। (২) এমন হতে পারে যে বিশ্বের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বর সাথে বিশ্বের অস্তিত্বের তুলনা করলে বিশ্বের অস্তিত্বকে অলীক মায়া বা ভ্রম বলে মনে হয়। আর একথা সত্য হলে বিশ্ব ও আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন বলা যায় না। বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী সম্ভাব্য অস্তিত্ব আর আল্লাহ্র অস্তিত্ব অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, অত্যাবশকীয়, অপরিহার্য ও চিরস্থায়ী অস্তিত্ব। এই দুইটি এক হতে পারে না, অভিন্নও হতে পারে না। দুইটি কখনো এক সমান নয়। কেমনকরে ও কেন বা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে এমন সব প্রশ্ন বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু এসব আল্লাহ্র ক্ষেত্রে অবান্তর। অতএব ধর্মীয় ও যৌক্তিক বা দার্শনিক কোন ক্ষেত্র হতেই বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, বিশ্ব ও আল্লাহ্কে এক ও অভিন্ন বলা যায় না।

তা ছাড়া মুজাদ্দিদের মতে, ইবনুল আরাবী যখন আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন তখন তিনি 'তাজাল্লী-ই-জাতী' অবস্থা বা আল্লাহ্র সত্তা সন্দর্শন করা অবস্থায় থেকে কথা বলেন। 'তাজাল্লী-ই-জাতী' এমন একটা অবস্থা যখন সাধক অনুভব করেন যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র সত্তাকে অবলোকন করেছেন। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করার পরেই সাধক তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে আল্লাহ্ বিশ্বের বহু ঊর্ধ্বে এবং বিশ্ব ও আল্লাহ্ এক নয়। বিশ্ব ও আল্লাহ্কে এক ও অভিন্ন বলার অর্থ এই যে, তিনি হয়ত বা এই স্তরের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন নি এবং এই স্তরই তার মরমী সাধনার জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর ছিল। এই স্তরের ঊর্ধ্বে গমন করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, আল্লাহ্ যথার্থ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা মরমী স্বজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। 'তাজাল্লী-ই-জাতী' অবস্থা বা আল্লাহ্র সত্তার সন্দর্শন লাভ ঘটলে তাঁর কেবলমাত্র আল্লাহ্ সম্পর্কে কথা বলা ঠিক ছিল, বিশ্ব সম্পর্কে কিংবা বিশ্ব ও আল্লাহ্র এক ও অভিন্নতা সম্পর্কে কোন কথা বলা ঠিক হয়নি। তাছাড়া তাঁর মরমী স্বজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা যদি অন্যভাবে ব্যাখ্যাত না হয় তবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাদেশ-বিরোধী হয়। প্রত্যাদেশ অনুসারে এটা খুব মন্দ কাজ।

তাঁর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদের' অন্য একটি দিক 'ফারকবাদ আলজাম' বা 'অভেদ পর প্রভেদ'।[১] মুজাদ্দিদ বলেন যে যদি 'আয়ান-ই-খারিজী' বা অস্তিত্ববাদ সত্তাসারের অস্তিত্বশীল হওয়ার কোন গুণ বা বাস্তবতা না থেকে থাকে তবে কী করে অতিবর্তী সত্তার অসীম অবস্থা হতে সসীম অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ্ অস্তিত্বশীল ও সত্তাবান, বিশ্ব অস্তিত্বহীন, অলীক, মায়া, এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। একটি কাল্পনিক ও অলীক সত্তা কী করে অস্তিত্বশীল বাস্তব সত্তার বাধা সৃষ্টি করতে পারে? আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন বলে মনে করলে আল্লাহ্‌র অসীমত্ব ও অপূর্বত্ব গুণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যদি অনুস্যূত বা অন্তর্নিহিত ধারণাকে অতিবর্তী ধারণার সাথে এক করে দেখা যায় তবে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সেইজন্য তিনি বলেছেন, যে কোন বস্তু বা সত্তার উপাসনাই আল্লাহ্‌র উপাসনা আর এমন ধারণা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাদেশ বিরোধী। কোরআনে বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করি না এবং আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করি না। তৃতীয়তঃ যারা আল্লাহ্‌র অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী ধারণাকে অভিন্নভাবে দেখেন তারা জানেন না যে আল্লাহ্ মানব জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত। আল্লাহ্ মরমী অভিজ্ঞতারও ঊর্ধ্বে। চতুর্থতঃ তিনি যে স্তরকে 'ফারকবাদ-আল-জাম' বা অভেদ-পর-বিভেদ বলে মনে করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে সে স্তর নয়। আল্লাহ্ ও বিশ্ব—এ দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করলে তবেই এই স্তরে উপনীত হওয়া যায়। তিনি এই দুটিকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করেন নি অর্থাৎ তিনি বলতে পেরেছেন যে মূল সত্তাকে 'আল্লাহ্' বা বিশ্ব যে কোন এক নামে উল্লেখ করা যায় অথবা দুটিকে অভিন্ন বলা যায়। তিনি যে স্তরে উন্নীত হয়েছেন সে স্তর হতে 'অভেদ পর বিভেদ' ফারকবাদ আলজাম' স্তর ঊর্ধ্বে অবস্থিত আর তিনি এ স্তরে উঠতে সক্ষম হন নি।

পুনরায় তিনি তাঁর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদে'র মধ্যে মূল সত্তা ও তার গুণ 'আসল সত্তা ও তার প্রকাশ্য অবস্থা' অর্থাৎ আসল ও অবভাসকে এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি এক ও অভিন্ন নয় কেননা অবভাস কখনো বাস্তব সত্তা হতে পারে না। আসল বাস্তব প্রতিরূপ কখনো আসল বস্তুর সমান হতে পারে না। জ্যোতিঃ আসলের ছবি বা প্রতিরূপ।

১. Ibid. p. 72

আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে জ্যোতিকে জানার অর্থ উপাসনা বা ইবাদত। সেবার অর্থ আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভের ফলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে, এতে আল্লাহ্‌র পূর্ণতা প্রাপ্তির কোন প্রশ্ন উঠে না, কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পূর্ব হতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে যেমন পূর্ণ ছিলেন বর্তমানেও ঠিক তেমনি পূর্ণ আছেন। মোটকথা তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, তিনি পূর্ণ আছেন।

'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' প্রকৃতপক্ষে ঠিক মতবাদ নয়।[১] সত্তা এক নয় আর মুজাদ্দিদ এ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' অভিজ্ঞতা বাস্তব নয়, তা আত্মগত বা ভাবগত, এটা কেবলমাত্র 'ওয়াহ্‌দাতুশ শহুদ' বা 'অবভাসিক ঐক্য' বা প্রতীয়মান ঐক্য। 'ওয়াহ্‌দাতুশ শহুদ' বা 'তাওহীদ-ই শহুদী' শব্দের অর্থ 'প্রাকৃতিক দৃশ্যমান বস্তুসমূহের স্বতন্ত্র-মূলক ঐক্য'। এখানে আল্লাহ্‌ ও বিশ্বজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। মুজাদ্দিদের মতে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' শুধুমাত্র অবভাস বা প্রতিভাস, এটা অবভাসরূপে দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে এটা তেমন নয়, এটা 'শহুদ' এখানে বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। মুজাদ্দিদের দর্শনে 'ওয়াহ্‌দাতুশ শহুদ' সৃষ্টিতত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সৃষ্টিতত্ত্ব নয়, এটা অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের ঐক্য, আল্লাহ্‌ ও বিশ্বের স্বতন্ত্র ঐক্য ব্যাখ্যা করে।

প্রেমের বিষয়বস্তু একমাত্র আল্লাহ্‌। সাধকেরা সাধনার সময় এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। আর এজন্যই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র ঐশী সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে তাঁরা বিশ্বের প্রত্যেক জীব ও বস্তুর মধ্যে তাঁদের প্রেমের আসল সত্তাকে দেখতে পান, তাঁরা বহুত্বকে কেবলমাত্র পরম প্রেমাস্পদরূপে বা সৌন্দর্যের জ্যোতিঃরূপে দেখতে পান। তাদের কাছে মনে হয় 'বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত' প্রত্যেকটি বস্তু ও জীব যেন এক একটি বস্তু ও জীব বা এক একটি মুকুর বা দর্পণ বা আয়না, সেখানে সর্বদা পরম প্রেমাস্পদের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। যে সকল মরমী সাধক প্রেমাস্পদের সত্তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেন, তাঁরা সেই তন্ময় অবস্থায় থাকতে ভালবাসেন

---

১. Ibid, p. 77

এবং আত্ম-অস্বীকৃতিকে উত্তম বলে মনে করেন। মোটকথা তাঁরা 'ফানা' অবস্থা পছন্দ করেন। সাধক কোন বিশ্রাম চান না। বিশ্রামের ক্ষেত্রে বিস্মরণ বা বিস্মৃতির প্রয়োজন কিন্তু যেখানে প্রেমের অগ্নি সর্বদা তাঁদেরকে দাহ্য করছে, সেখানে বিস্মৃতি সম্ভব নয়। তাঁরা চিন্তা গজল ও গ্রন্থ রচনার মধ্যে 'ওয়াহ্‌-দাতুল ওজুদ' ধারণা প্রকাশ করেন। অনেকে সাধনার এই স্তর পার হয়ে অর্থাৎ 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' পার হয়ে যান এবং সত্তার ঐক্য বা অভেদ নীতি বা বিশ্ব ও আল্লাহ্ এক সমান এই কথার ভুল বুঝতে পারেন এবং সর্বেশ্বরবাদী ধারণার জন্য অনুতাপ করেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মুজাদ্দিদ বলেন যে আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, গাছপালা, বৃক্ষলতা, জড়-জগৎ, জীবজন্তু, মানব, জ্বীন, ফেরেশতা, ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা। মোটকথা, আল্লাহ্ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি শূন্য হতে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র দাতা, ত্রাণকর্তা ও সাহায্যকারী সত্তা। তিনি আমাদের অনেক কিছুকে গোপন রাখেন এবং মন্দ কার্যের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য, মানুষ তাঁর ভালত্ব ও মন্দত্বের মূল্যায়নও সঠিকভাবে জানে না। তিনি পরিচালক, তিনি নবী ও রসূলের মাধ্যমে অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানদান করেন ও সৎপথে আনয়ন করেন। তিনি ভালমন্দ, পাপপুণ্য, শাস্তি পুরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি এক এবং তার কোন অংশীদার নাই। তিনিই একমাত্র ঐশী সত্তা। তাঁর মত গুণসম্পন্ন কোন কিছুই নাই। তিনিই একমাত্র মাবুদ বা উপাস্য। তিনি সব কিছুকে ঘিরে আছেন, সর্বত্র বর্তমান, এমনকি তিনি আমাদের প্রাণরগ হতেও নিকটতর। কিন্তু তার সর্বজ্ঞান, সর্বত্র উপস্থিতি ও নৈকট্য আমাদের জ্ঞানের অতীত। জীবন, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, বাণী ও সৃষ্টি তাঁর গুণের অন্তর্গত এবং এগুলো তাঁর সত্তার মতোই মানব জ্ঞানের অতীত।

মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুসারে ঐশী গুণাবলী পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত (১) যেগুলো আল্লাহ্র সত্তার যথাকার অসম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করে এবং যেমন আল্লাহ্র সমকক্ষ কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, পিতামাতা নাই, সন্তানাদি নাই (২) যেগুলো তাঁর অসীমতা ও অতীন্দ্রিয়তা, অতিবর্তিতা, অদৃশ্যের অদৃশ্যতাকে উল্লেখ করে, যেমন আল্লাহ্ দেহ কিংবা জড়বস্তু নয়, দ্রব্য কিংবা গুণাবলী নয়, সসীম নয়, তাঁর পরিধি বা বিস্তৃতি নাই, পূর্বাপর সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ তিনি আমাদের

জ্ঞান কাঠামো বা চিন্তার শেষ কাঠামোর বহু উর্ধ্বে। সদর্থক গুণাবলী দুই ধরনের। আপেক্ষিক গুণাবলী যা তাঁর সম্পর্কে বলা যায় যেমন তিনি স্বয়ং অস্তিত্বশীল, চিরন্তন, আবশ্যিক ও একমাত্র উপাস্য। আমরা এই সব গুণাবলী আল্লাহ্‌তে আরোপ করি কেননা এসব গুণের বিপরীত গুণাবলী অসম্পূর্ণতার লক্ষণ। সেগুলোর উল্লেখ করেই আমরা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণতাকে উল্লেখ করি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌র প্রকৃতি বা স্বরূপ ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়।

অন্যান্য ঐশী গুণ সত্তাসারের আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েও সত্তার বাইরে অবস্থিত কেননা পূর্ণ সত্তা বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের পর এক প্রত্যেকটি গুণকে বাস্তবায়িত করেছেন। গুণাবলীর এই স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক স্তরবিন্যাস মাত্র।

ইবনুল আরাবীর মতবাদের মধ্যে একটি পরম সত্তার ধারণা

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা অদ্বৈতবাদ এক ধরনের বিশ্বমিথ্যাবাদ বা মায়াবাদ। এই অদ্বৈতবাদী ধারণার মধ্যে এক ধরনের পরম সত্তার অস্তিত্ব আছে আর এই পরম সত্তা আর যাই হোক না কেন সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত নৈতিক ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌ নয় কারণ কোন সর্বেশ্বরবাদী সত্তা কখনো তেমন হতে পারে না।[১] বাসেত সাহেব বলেছেন যে, ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদ এমন ধরনের মতবাদ যেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া সব কিছুকে আল্লাহ্‌ বলা হয়। আর আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এই প্রকার ধারণা ইবনুল আরাবী ও স্পিনোজার মত চিন্তাবিদদের সর্বেশ্বরবাদকে জড়বাদ হতে ভিন্ন করেছে। তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি ভিন্ন ধরনের, কিন্তু তা অনেকটা খোদাবাদে বিশ্বাসীদের অনুভূতির কাছাকাছি। অনেক সময় তাঁদের সে অনুভূতি খোদাবাদে বিশ্বাসীদের অনুভূতির চেয়েও অধিকতর গভীর। তাঁরা বিশ্বকে বাস্তব সত্তা বলে মনে করেন। বিশ্বের উপাসনা করেন তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা বিশ্বের কাছে উপাসনা করেন, বিশ্বকে তাঁরা 'আকার' 'প্রতিভাস', বা 'অবভাস' হিসাবে অসহায় মনে করে তার মধ্য দিয়ে চিরন্তন ও সয়ম্ভু সত্তার উপাসনা করেন। কোন খোদাবাদী চিন্তাবিদ এই ধরনের উপাসনার কথা চিন্তা করেন না।

১. A. M. Fairbairn: Studies in the Philosophy of Religion and History, London, 1876, p. 382.

তবে ইবনুল আরাবী যখন বলেন যে, "আমরা কেবলমাত্র তাঁর (আল্লাহ্‌র) উপরেই সব কিছুর জন্য নির্ভর করি," অন্যান্য বস্তুর উপর নির্ভর করার অর্থ তাঁরই উপরে নির্ভর করা কেননা সেগুলো আল্লাহ্‌র প্রতিভাস, তখন কোন খোদাবাদী তা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। জড়বাদে বিশ্বাসী সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাবিদের কাছে জড় জগতই সব কিছু, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত 'বহুত্ব' আসল সত্য। ইবনুল আরাবীর মতে অবভাসিক ও প্রতিভাসিক বিশ্বের উর্ধ্বে অবস্থিত সত্তাই প্রার্থনার আসল বস্তু বা পরম সত্তা আর এ সত্তা বিশ্বের সব কিছু ঘিরে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ করে ও পূর্ণতা দান করে। আর এই কারণেই তিনি পরম সত্তার দুইটি দিকের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থাৎ পরম সত্তাকে অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী বলে স্বীকার করেন। অনেক সময় তাঁর মনের অবস্থা অনুসারে দুইটি দিকের যে কোন একটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। যেমন অনেক সময় অন্তর্ব্যাপী দিকের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন যে তাঁকে একজন জড়বাদে বিশ্বাসী সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক বলে মনে হয়। যখন তিনি আল্লাহ্‌কে আশারীয়দের আদিম দ্রব্যের সাথে এবং অবভাসিক ও প্রতিভাসিক বিশ্বকে আদিম দ্রব্যের বিভিন্ন অবস্থা অথবা অবান্তর-গুণের[১] সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেন তখন তাঁকে একজন জড়বাদে বিশ্বাসী সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাবিদ বলে মনে হয়। যখন তাঁর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির প্রাবল্য দেখা যায়, তখন তিনি আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী সত্তা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুরই তুলনা হয় না, তাঁর সত্তাসার আমরা বুঝতে পারি না বা জানতে পারি না।[২] সুতরাং আমরা তাঁকে নিয়ত বস্তুর সাথে তুলনা করতে পারি না, এমনকি তাঁর কার্যও আমাদের কার্যের মত নয়।

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ ও নব্য প্লেটোবাদ

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ ইসলামের শিক্ষা হতে উদ্ভূত, হেলেনিক বা গ্রীক মতবাদ এবং বিশেষ করে নব্য প্লেটোবাদ দ্বারা প্রভাবিত মতবাদ।[৩] 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ আশারীয়দের বিশ্ব সম্পর্কীয় মতবাদ

---

১. Fusus, p. 376, 227-228.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p, 59.
৩. Dr A. E. Affifi, Ibid, p. 59.

দ্বারা প্রভাবিত। আশারীয় চিন্তাবিদেরা বিশ্বকে পরম দ্রব্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে দ্রব্যের অসংখ্য গুণ অথবা পরিবর্তনশীল অবস্থা হতে অভিন্ন বলে চিন্তা করেছেন। আর এই মতবাদই তাঁর অদ্বৈতবাদের মধ্যে পরম সত্তাকে একটি 'ঐক্য' বা 'সমগ্র' রূপে চিন্তা করার আকারগত ভিত্তি দান করেছে। আশারীয় মতবাদ ও তাঁর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন যে আশারীয়রা অবভাসিক বিশ্বের সত্তাসারকে একটি দ্রব্য বলেছেন আর তিনি নিজে তাকে বলেছেন আল্লাহ্ বা পরম একক। তাঁর অদ্বৈতবাদ তৌহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে ইসলামী মতবাদের অবৈধ বিস্তৃতিবাদ। কিন্তু তাই বলে তাঁর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' মতবাদ ইসলামী ধর্মে বর্ণিত আল্লাহ্‌র 'একত্বের' ধারণা, আশারীয়দের বর্ণিত 'দ্রব্য ও গুণের' ধারণা এবং নব্য প্লেটোবাদীদের 'পরম একক' ধারণা যে কোন একটির সাথে এককভাবে সমান নয়। এটা সব কয়টি ধারণার মিশ্রণের ফল, এটা একটা সমন্বয় ক্ষেত্র।

ইবনুল আরাবীর আল্লাহ্ ও নব্য প্লেটোবাদীদের ঈশ্বর এক নয়।[১] সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে নব্য প্লেটোবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলা যায় না কারণ নব্য প্লেটোবাদ অনুসারে ঈশ্বর ও বিশ্ব এক ও অভিন্ন নয়, এমন কি বিশ্ব ঈশ্বর বা পরম এককের অংশ অথবা কোন দিক নয়। বিশ্ব ঈশ্বর বা পরম একক হতে আগত। ইবনুল আরাবীর অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্লাটিনাসের মত নির্গমন তত্ত্বের স্থান নাই। সেখানে পরম এককের আত্মপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ঐশী সত্তাসারের জাগতিক বস্তুর আকারের মধ্যে প্রকাশের কথা বলা হয়েছে এবং এর সাথে প্লাটিনাসের নির্গমন তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে। এই মতবাদ একদিকে প্লাটি-নাসের দর্শনের মত না হয়ে আপাতদৃষ্টিতে হেগেলের পূর্ণ ভাববাদের মত হয়েছে। তাঁর মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে হেগেলের মতবাদের মত **যৌক্তিক মতবাদ। মনে হয় যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু আসলে তা নয়।** তাঁর মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চক্রাকার। যেখান থেকে আরম্ভ হয় সেখানে শেষ হয়। নব্য প্লেটোবাদীদের নির্গমন মতবাদের মধ্যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে চক্রাকার নয়, এটা একটা সোজা পথে উন্নতিশীল গতি। সেখানে এক নয়, একাধিক নির্গমন দেখা যায়, ক্রমিক ধারায় প্রত্যেকটি সত্তা নতুন সত্তা সৃষ্টি করে অথবা তার পরবর্তী নিম্ন সত্তার রহস্যজনকভাবে

১. Ibid. p. 60.

উৎপত্তি ঘটায় এবং পরবর্তীটি যদিও পূর্ববর্তীটির চেয়ে নিম্নস্তরের তবুও পূর্ব-বর্তীটির পূর্ণতা পরবর্তীটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ক্রমিক ধারায় নিম্নতম সত্তা অবভাসিক জগৎ যা প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরম এককে জানতে পারে না। নিম্নস্তরে অবস্থিত কেবলমাত্র মানবাত্মা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কি ক্রমিক ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা অর্থাৎ সার্বিক আত্মার সাথে মিশে যায়। ইবনুল আরাবীর মধ্যে স্পষ্ট নির্গমন মতবাদ নাই বা প্রকৃত অর্থে কোন পূর্ণ মিশ্রণ বা লীন হওন মতবাদ নাই। বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তাঁর উপর নব্য প্লেটোবাদীদের প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে ইসমাইলীদের ভাবধারার প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। পবিত্র ভ্রাতৃ-সংঘের লেখকগণের মত তিনি গ্রীক দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ হতে তাঁর দর্শনের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। যেমন প্লাটিনাস হতে নির্গমনবাদ, টলেমীর জ্যোতি-বিদ্যা, ইমপেডকলসের চার উপাদানতত্ত্ব সংগ্রহ করে বিশ্ব সম্পর্কে ইসলামী ভাবধারার[১] বিবরণের সাথে সেগুলো মিশ্রণ করে এক নতুন মতবাদের সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন যে, বিশ্ব কোন কাল বা সময়ে সৃষ্টি হয়নি। তাঁর পরম সত্তা সম্পর্কে পরাতাত্ত্বিক মতবাদ বিশ্ব সৃষ্টি হেতু ঐ রকম সৃষ্টি ধারার বর্ণনার সাথে মিশ্রিত হয়েছে, যদিও তাঁর বিশ্ব কোন কালের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তিনি অনেক সময় প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, "আমি (আল্লাহ্) গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম, আমি নিজেকে জানাতে চাইলাম, সুতরাং আমি বিশ্ব সৃষ্টি করলাম যেন এর মধ্যে আমাকে জানিতে পারে।" এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন যে, সৃষ্টির গতি শুরু হয়েছে প্রেম হতে,[২] যে প্রেমের মাঝে আল্লাহ্ বাহ্যিক জগতের সকল বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অতএব আল্লাহ নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ করেছেন—এই মতবাদ এবং প্লাটিনাসের নির্গমনবাদ এক ধরনের মতবাদ নয়। তাঁর মতবাদ 'তাজাল্লিয়াত' প্রতিভাস, অবভাস, আত্মপ্রকাশ, প্রকাশ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করা যায়। আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভের সময় তিনি নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন, নিঃসৃত বা আগত সত্তা হিসাবে নয়।

১. Futuhat III. pp. 578-580.
২. Fusus. p. 408.

তাঁর মতে 'তাজাল্লী' অনন্ত, অসীম ও ক্ষয়হীন আত্মপ্রকাশ।[১] এটা অনন্ত ও অবিরত অস্তিত্বের প্রকাশ এবং এই প্রবাহ সত্তাসার হতে আকারে প্রকাশ পায়। 'সত্তাসার' ও 'আকার' একই পরম সত্তার দুইটি দিক, দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস নয়। নব্য প্লেটোবাদীদের নির্গমন মতবাদের চেয়ে তাঁর মতবাদ খুব সংগতিপূর্ণ না হলেও অনেকটা সন্তোষজনক। তাঁর অন্তর্ব্যাপী ধারণা দিয়ে 'এক' ও 'বহুর' মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়। নব্য প্লেটোবাদীরা পরম এককে পরম সত্তা বলে উল্লেখ করেন এবং বিশ্বকে আগত বা নির্গত সত্তা বলেন এবং পরম সত্তা ও বিশ্বের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নির্গমন সম্পর্ক বলা হয়। কিন্তু এটা পরম সত্তার প্রকৃতি বিরোধী, কারণ পরম সত্তা সকল সম্পর্কের উর্ধ্বে।

ইবনুল আরাবীর দর্শনের আত্মপ্রকাশ প্রায় প্লাটিনাসের নির্গমনের মত

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা অদ্বৈতবাদ অনুসারে একমাত্র একটি পরম সত্তাই অসংখ্য আকারের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন।[২] এই পরম সত্তা এমন নয় যে এই সত্তা হতে স্বতন্ত্র কিছু একটা তৈরী হয়ে বা সৃষ্টি হয়ে বা বেরিয়ে আসে বা নিঃসৃত হয়। এমন কি 'আকারের মাধ্যম প্রকাশ' এই কথাও বিপথগামী কেননা 'সত্তাসার' ও 'আকার' একে অন্য হতে ভিন্ন নয়। একমাত্র চিন্তায় 'আকার' ও সত্তাসারকে ভিন্নভাবে দেখা যায়। প্লাটিনাসের নির্গমন আরাবীর মতবাদে গুণ বা কয়েকটি দিক যা দিয়ে এক বাস্তব সত্তাকে জানা যায়। প্রথম বুদ্ধি, সার্বিক আত্মা, সার্বিক প্রকৃতি ইত্যাদি কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বশীল সত্তা বা একে অন্য হতে ভিন্ন কোন সত্তা নয়, এগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সত্তাকে দেখার কয়েকটি দিক, বিশ্বের সক্রিয় নীতি হিসাবে পরম সত্তা, 'জীবন দানকারী নীতি' হিসাবে পরম সত্তা, বাহ্যিক জগতে মূর্ত প্রকাশরূপী পরম সত্তা। যেভাবে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে অনেকে তাঁর মতবাদকে নব্য প্লেটোবাদীদের নির্গমন মতবাদের অনুরূপ বলতে পারেন, কারণ দুইটি মতবাদের চেহারা প্রায় একই রকম।[৩]

পরম এককের আত্মপ্রকাশ নিম্নরূপ। যখন সকল সম্ভাব্য সম্পর্ক ও

১. Fusus, p. 15.
২. Dr. A. E. Affifi. Ibid. p. 63.
৩. Futuhat, III, p. 553-554.

বিশেষীকরণের উর্ধ্বে থেকে পরম এককের ধারণা করা হয় তখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ নিজেকে ঐক্য অবস্থায় প্রকাশ করেন বা 'সত্তাসারের সত্তাসার' রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। যখন পরম একককে অবভাসিক জগতের সুপ্ত-অস্তিত্বের সাথে তুলনা করা হয় তখন বলা হয় যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ত্বের অবস্থায় প্রকাশ পান। এই অবস্থাকে অনেক সময় 'একত্বের অবস্থা' বলা হয়। অবশ্য তিনি এই অবস্থাকে 'আয়ান আস সাবিতা' ও ঐশী নামের অবস্থা বলেছেন। যখন পরম একককে অবভাসিক জগতের বাস্তব প্রকাশিত বস্তুর সাথে তুলনা করা হয় তখন বলা হয় যে আল্লাহ্ প্রভুত্বের অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। যদি সকল বাস্তব ও সুপ্ত সম্ভাবনামূলক অস্তিত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য আকারগুলোর আধার সার্বিক চেতনারূপে পরম একককে চিন্তা করা যায়, তখন বলা হয় যে পরম সত্তা নিজেকে প্রথম বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ নিজকে আভ্যন্তরীণ অথবা অদৃশ্য সত্তারূপে প্রকাশ করলে এই অবস্থাকে 'হকিকত-উল-হকিকত' বা 'সকল সত্তার পরম সত্তা' নামে উল্লেখ করা হয়। যখন আল্লাহ্কে বাহ্যিক জগতের প্রকাশিত সত্তারূপে চিন্তা করা হয়, তখন বলা হয় যে আল্লাহ্ নিজেকে বিশ্বের বিভিন্ন 'আকারের' মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্কে 'সার্বিক পিণ্ড' বা 'সার্বিক দেহের' সাথে তুলনা করা হয়। সকল আকার ধারণকারী সার্বিক দ্রব্য হিসাবে চিন্তা করার সময়ে তাঁকে 'আদিম জড়' বা 'আদিম পদার্থ' বলা হয়। এইভাবে ইবনুল আরাবী প্লাটিনাসের নির্গমন তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, ইমপেডকলসের চারটি মূল উপাদান ও আরো অন্যান্য স্তরের যোগ করেছেন যেখানে আল্লাহ্ নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা চমৎকার, কিন্তু বিপথগামী। তবুও তাঁর "ওয়াহ্দাতুল ওজুদ" বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে একটি জিনিস অতি স্পষ্ট। পরম সত্তার সংখ্যা একটি, এটা একটা পরম একত্ব, সত্তা বা অস্তিত্বের পরম ঐক্য। পরম সত্তাকে বুঝার জন্য বহুত্বরূপে দেখা হয়। নির্গমনের অর্থ আত্ম-প্রকাশ, কিন্তু পরম সত্তার মূল ঐক্য ইবনুল আরাবীর দর্শনে অপ্রমাণিত রয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবনুল আরাবীর 'লগস' তত্ত্ব ঃ নূরে মুহাম্মদী তত্ত্ব ঃ প্রজ্ঞা তত্ত্ব

ইবনুল আরাবীর পূর্বে কোন দার্শনিক ও সূফী 'লগস তত্ত্ব' বা 'প্রজ্ঞা তত্ত্ব' বা 'নূরে মুহাম্মদী তত্ত্ব' নিয়ে এত বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ফুসুস-উল-হিকাম'-এর একটা বিরাট অংশে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'লগস' তত্ত্ব বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দার্শনিক, অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ও সূফীর দর্শনে আলোচিত হয়েছে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। 'লগস' তত্ত্ব ইসলামী দর্শনে, বিশেষ করে সূফী দর্শনে[১] একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ 'লগস' তত্ত্ব আলোচনার সময়ে অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক প্লাটিনাসের দর্শনের আলোকে তার ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের বিশ্বাস ইবনুল আরাবীও একই পথ অনুসরণ করেছেন এবং প্লাটিনাসের শিক্ষার আলোকে তাঁর মতবাদ গড়ে তুলেছেন। ইবনুল আরাবী প্লাটিনাসের কাছ থেকে কিছু পরিভাষা ও ভাবধারা সংগ্রহ করলেও তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্লাটিনাস ও তাঁর মতবাদের মধ্যে একটা পার্থক্যের বিরাট প্রাচীর গড়ে উঠেছে এবং সূফী দর্শনের রঙে রঞ্জিত হয়ে তা এক অপূর্ব মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে।

তাঁর মতে 'লগস' বা নূরে মুহাম্মদী সৃজনশীল, প্রাণদানকারী ও প্রজ্ঞাময় বা বুদ্ধিময় নীতি আর সে কারণে এটাকে বাস্তব সত্তাসমূহের বাস্তব সত্তা বা সত্তার সত্তা বলা হয়। আল্লাহ্‌র সত্তার ভিতরের দিকে নূরে মুহাম্মদী বা 'লগস' বা পরম তত্ত্ব এবং বাইরের দিকে আল্লাহত্ব বা ঈশ্বরত্ব। এই পরম তত্ত্ব আল্লাহ্‌র চেতনা এবং এর মধ্যে সকল অস্তিত্বের ধারণাগুলো অব্যক্ত বহুত্বরূপে বিদ্যমান। এর মধ্যে সত্তা, নাম ও গুণের অপূর্ব মিলন ঘটে এবং এর মাধ্যমে বাহ্যিক জগৎ ও তার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। এটাকে 'আয়ান-আস-সাবিতা'ও

---

১. মোহাম্মদ জাবীর : আওয়ারিফে মোহাম্মদী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৪, ঢাকা, পৃঃ ১-১৩। Rom Landau : The Philosophy of Ibn Arabi, London, 1959, pp. 18, 54. W., H. T. Gairdner (tr), Al-Ghazzali's Mishkat-Al-Anwar ; Introduction, Lahore, 1952, p. 35-39. Dr. A. E Affifi: The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, 1st edn. 1938. Reprint, Lahore, Pakistan, pp. 66-101.

বলা হয়। আল্লাহ্‌র ধারণাগুলো দার্শনিকদের ভাষায় আল্লাহ্‌র সত্তাসার এবং সূফীদের ভাষায় 'আয়ান-আস-সাবিতা' এবং 'আয়ান-আস-সাবিতা'ই বিশ্ব সৃষ্টির মূল ধারণা। যেহেতু বিশ্ব পূর্ণতা প্রকাশ করে, অতএব এটাও পূর্ণ। সৃজনশীল ঐশী নীতি ছাড়াও এটা প্রজ্ঞাবান এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ নিজ সম্পর্কে সচেতন হন। ঐশী চেতনা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণ মানবের মধ্যে আল্লাহ্ নিজেকে পূর্ণভাবে জানতে পারেন। হাদীসে উল্লেখ আছে এই নীতি বা নূরে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমার মতো এত প্রিয় করে সৃষ্টির মধ্যে আমি আর কাউকে সৃষ্টি করিনি। তোমারই মাধ্যমে আমি দান করি, তোমারই মাধ্যমে আমি গ্রহণ করি এবং তোমারই মাধ্যমে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি।" তাহলে দেখা যায় যে, তাঁর মতে নূরে মুহাম্মদী বা 'লগস' একটা মধ্যবর্তী সত্তা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ পরম অচিন, অজ্ঞেয়, অনির্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা হতে সত্তা ও গুণাবলীর প্রথম মিশ্রণজাত অবস্থায় নিজের কাছে নিজে আত্মপ্রকাশ করেন। এরই নাম প্রথম নির্ধারণী স্তর বা প্রকাশ, 'আহাদ' হতে 'আহাম্মদী' অবস্থায় প্রকাশ, আল্লাহ্ হতে প্রথম প্রজ্ঞার উৎপত্তি।

ইবনুল আরাবীর মুসলিম 'লগস' মতবাদ

ইবনুল আরাবীর এই 'লগস'[১]কে বর্ণনা করার জন্য 'আল-হাকিকতুল মুহাম্মদীয়া' (মুহাম্মদের মূল সত্তা), 'হকিকতুল হকিকত' (মূল সত্তাগুলোর মূল সত্তা), 'রূহ মুহাম্মদী (মুহাম্মদের আত্মা), 'আল আকল আল আওয়াল' (প্রথম প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি), 'আরশ' (সিংহাসন), 'আল রুহুল আযম' (সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন আত্মা), 'আল কালামুল আলা' (সর্বশ্রেষ্ঠ কলম), 'আল খলিফা' (প্রতিনিধি), 'আল ইনসানুল কামিল' (পূর্ণ মানব), 'আসলুল আলম' (বিশ্বের উৎস), 'আদম আল হকিকি' (মূল আদম), 'আল বরজোখ' (মধ্যস্থতাকারী), 'ফালাকুল হায়া' (জীবন স্তর), 'আল-হককুল মখলুকবিহি' (সৃষ্টির মূলতত্ত্ব), 'আল হায়ুলা' (মূল বা আদিম জড় উপাদান) 'আল রূহ' (আত্মা), 'আল কুতুব' (কুতুব), 'আবদ আল-জামি' (সর্বব্যাপী একের দাস), ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মূলতঃ এইসব শব্দ ও নাম একই 'লগস'-এর বিভিন্ন দিক প্রকাশ করেছে।

১. Dr A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, p. 66 Footnote 1

তাঁর 'লগস'-এ তিনটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়—(ক) পরাতাত্ত্বিক দিক, (খ) মরমী দিক ও (গ) মানবীয় দিক।

পরাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে 'লগস'-কে প্রথম বুদ্ধি[১] প্লাটিনাসের 'নাউস' বা চেতন, স্টোয়িকদের সার্বিক প্রজ্ঞা[২] বা আদি প্রজ্ঞা বলা হয়। তিনি স্টোয়িকদের মতো 'প্রাকৃতিক একত্ববাদী' ছিলেন। তাঁর 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞা বিশ্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত খোদার কোন অতিরিক্ত সত্তা উল্লেখ করে না, এটা বিশ্বমাঝে অনুস্যূত বা অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাবান নীতি।[৩] ঐশী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সক্রিয় নীতি হিসাবে অতীন্দ্রিয় বা মরমী দিক হতে তিনি 'লগস'কে 'মুহাম্মদের বাস্তব সত্তা,[৪]' মূল সত্তা, 'কুতুব', 'পূর্ণ মানব' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। আবার মানবীয় দিক হতে এটাকে 'আদম', 'মানুষের মূল সত্তা'[৫] ইত্যাদির সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। বিশ্বের সাথে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাকে 'মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা'[৬] বলেন। সকল কিছু লিপিবদ্ধকারী গ্রন্থ হিসাবে এটাকে 'কিতাব'[৭] ও অনেক সময় 'শ্রেষ্ঠ কলম'[৮] বলে উল্লেখ করেন। সব কিছুর মূল উৎস হিসাবে এটাকে 'হায়ুলা' বা মূল-পদার্থ বলে উল্লেখ করেন। একই 'লগস'-কে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করার অর্থ এই যে এটার বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে এবং মূল শব্দ রক্ষা করে অর্থের তাৎপর্যের সমন্বয় সাধন করে এর একটা ব্যাপক অর্থ দেওয়া হয়েছে। তাঁর 'লগস' মতবাদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন 'লগস' মতবাদ হতে এর উপকরণ সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এটা একটা অপূর্ব ও অভিনব 'লগস' মতবাদে পরিণত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি নাম এর এক একটি দিকের অর্থ প্রকাশ করে সামগ্রিকভাবে এর উৎকর্ষ সাধন করেছে। এটাকে 'মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা' বা 'মানুষের মূল সত্তা' বা অন্য যে কোন নামেই তা উল্লেখ করা হোক না কেন মূল সত্তা আসলে একটা।

তাঁর 'লগস' মতবাদ স্পষ্টরূপে বুঝার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, তিনি

১. First intellect.
২. Universal Reason.
৩. Rational Principle.
৪. Reality of Muhammad.
৫. Reality of Man.
৬. Reality of Realities
৭. The Book.
৮. The Most Exalted pen.

একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক, আর সে দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকটি নাম একই সত্তার বিভিন্ন দিক না বুঝায়ে বিভিন্ন সত্তাকে বুঝায়। এখন তাঁর 'লগস'-এর প্রধান প্রধান দিক সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

(ক) **'লগস'-এর পরাতাত্ত্বিক দিক :** 'লগস'কে মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা, বিশ্বের সৃজনমূলক, প্রাণদানকারী ও প্রজ্ঞামূলক 'নীতি' হিসাবে বিচার করলে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ :

জ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহকে প্রধানতঃ তিন প্রকার তাত্ত্বিক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়[১] : (১) সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর উৎস হিসাবে অস্তিত্বশীল পরম সত্তা, (২) অস্তিত্বশীল সত্তার উপর নির্ভরশীল অনিয়ত সত্তা অর্থাৎ এই বিশ্ব, (৩) আর এক ধরনের সত্তা বা অস্তিত্বশীল কিম্বা অস্তিত্বহীন এই দুইটার একক-ভাবে কোনটাই নয়—এটা চিরন্তন বা নিয়ত কিংবা অচিরন্তন বা অনিয়ত দুইটার কোনটাই নয়। এ প্রকৃতি এমন যে নিয়ত বা চিরন্তনের দিক হতে লক্ষ্য করলে এটাকে চিরন্তন বলে মনে হয় আবার অচিরন্তন বা অনিয়তের দিক হতে বিচার করলে এটাকে অনিয়ত বা অচিরন্তন বলা যায়। এই শ্রেণীর সত্তা সম্পর্কে একথা বলতে পারা যায় না যে, এটা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব হতেই আছে। একথা বলা যায় যে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব হতে আল্লাহ্ আছেন। যদিও এটা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব হতে আছে তবু এর পূর্ববর্তিতা বাস্তবধর্মী নয়, তা যৌক্তিক পূর্ববর্তিতা। এটা আল্লাহ্ত্বের ভিতরের দিক এবং আল্লাহ্ত্ব-এর বাইরের দিক[২] এটা 'মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা,' সৃজনীশক্তি, প্লেটোর ভাষায় 'ধারণাসমূহের ধারণা,' সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি 'প্রথম বুদ্ধি' ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা সকল ধারণা ও অস্তিত্বশীল বস্তুকে ঘিরে আছে, সব কিছুর উৎস এটা। এটা চেতনাশক্তিসম্পন্ন একটা কিছু। এটা বর্ণনাতীত, ব্যাখ্যাতীত ও সংজ্ঞাতীত। এটা অনেকটা প্লাটিনাসের আধ্যাত্মিক পদার্থের মতো, এরিস্টটলের আকারের মতো, এটাকে মূল পদার্থের কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং বাহ্যিক বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যদিও

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 68.

২. (I) Rom Landau, Ibid. p, 55.

(II) The Moslim world, Hartford Seminary Foundation, Hartford. conn. 'The Philosophy of Ibn Arabi, published in January and April, 1957 in the Quarterly.

একমাত্র চিন্তা ছাড়া অন্যভাবে এটাকে বিভক্ত করা যায় না। কেউ যদি ইচ্ছা করে তবে এটাকে আল্লাহ্ বা বিশ্ব যে কোন একটা বলতে পারে, কিংবা এটা এ দুইটার কোনটাই নয়, তাও বলতে পারে। যেমনভাবে 'সার্বিক' থেকে 'বিশেষ'-এর উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনিভাবে এটা হতে 'বিশ্বের' উৎপত্তি হয়। এটা বিভিন্ন বস্তুর সত্তাসারের আধার হওয়া সত্ত্বেও এটা সমসাত্ত্বিক। আল্লাহ্র জ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক অতি নিবিড়। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ এটাকে জানেন অর্থাৎ এটা আল্লাহ্রই নিজস্ব চেতনা। তাই বলে এটা কিন্তু ঐশী জ্ঞান নয়, ঐশী জ্ঞানের আধেয় দ্রব্য স্বরূপ। এর মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে এ তিনটার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। এর মাধ্যমে বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব হয়। এরিস্টটলের আকারের মতো এটা পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোর ধারণার ভাণ্ডার স্বরূপ। এটা আল্লাহ্র সত্তার সুপ্ত সম্ভাবনা যা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এটা বিশ্বের আত্ম-প্রকাশকারী নীতি বা আল্লাহ্। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন। এ যেন বিশ্ব চেতনারূপে আত্মপ্রকাশকারী আল্লাহ্। তবে আল্লাহ্র এই প্রকাশ দেশ-কালে কোন বিশেষ রূপের মধ্যে নয়। বিশ্বের সমগ্র বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তারূপে প্রকাশ। আল্লাহ্র এই প্রকাশ মূলসত্তা যা সকল সত্তার মূলে বিদ্যমান। আল্লাহ্ এমন একটা সত্তার চেতনারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন যা আল্লাহ্র সত্তাসারের[১] সমান।

মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা বিশ্বের মাঝে প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের মাঝে এর বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়। এটা পূর্ণ এবং যে বিশ্বের মাঝে এর পূর্ণতা প্রকাশিত হয়, সে বিশ্বও পূর্ণ। এটাকে বিশ্ব বিশ্লেষাত্মকভাবে প্রকাশ করে, একমাত্র পূর্ণমানবই এটাকে সংশ্লেষাত্মকভাবে প্রকাশ করে।

ইবনুল আরাবী এই মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা বা প্রথম বুদ্ধি, ইত্যাদিতে পূর্ণ মানবের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মতো সৃজনীশক্তি আরোপ করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে আত্মপ্রকাশের সম্পর্ক। ইচ্ছার সাথে যেমন মনের সম্পর্ক, মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তার সাথেও 'বস্তুসমূহের সুপ্ত সম্ভাবনার' তেমন ধরনের সম্পর্ক বর্তমান। সৃজনী শক্তি ছাড়াও এর প্রজ্ঞা গুণ আছে অর্থাৎ এটা

১. Essence.

প্রজ্ঞাময়। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ সচেতন হন। প্লাটিনাসের মতো তিনি মনে করেন যে চিন্তাশক্তি মনেরই শক্তি, তা একক সত্তার অন্তর্গত নয়। তাঁর মতে সৃষ্টির বিষয়বস্তু বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য এই ঐশ্বরিক চেতনা পূর্ণমানবের ভিতরে পূর্ণত্বে পৌছায়। অতএব পূর্ণমানবের ভিতর দিয়েই আল্লাহ্র প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তা ও গুণ সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করেন। আর এই পূর্ণমানবেই আল্লাহ্ নিজেকে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজে নিজেকে পূর্ণরূপে জানেন।

তিনি বলেন যে 'মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তাই' নিম্নক্রম বা অধোগতির প্রথম নির্দিষ্ট স্তর, সেখানে আল্লাহ্ অনির্ণীত, অনির্দিষ্ট সত্তা হতে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট সত্তা ও গুণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন[১] এবং মানবীয় জ্ঞান দ্বারা এই প্রথম নির্দিষ্ট স্তর বা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তাকে জানা যায়। এটা আল্লাহ্র প্রথম আত্মপ্রকাশ[২] এবং এই প্রকাশ্য অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তোমার চেয়ে প্রিয়তর আর কোন কিছুই সৃষ্টি করি নাই, তোমার মাঝেই আমি আত্মপ্রকাশ করি, তোমার মাঝেই আমি জ্ঞানলাভ করি এবং তোমার মাঝেই আমি শাস্তি দান করি।"[৩]

(খ) 'লগস'-এর মরমী দিক

মরমী সাধনা বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দিক হতে লক্ষ্য করলে ইবনুল আরাবীর 'লগস' ও সূফী সিলসিলার প্রধান মুহাম্মদ এক ও অভিন্ন।[৪] এই 'লগস' অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আধার। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তিনি এখানে নবী মুহাম্মদকে নূরে মুহাম্মদী বা মুহাম্মদের মূল সত্তার সাথে ভিন্নরূপে দেখেছেন।[৫] নবী মুহাম্মদ মক্কানগরে হযরত আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নূরে মুহাম্মদী বা 'লগস' নবী মুহাম্মদের মূল সত্তা, এটা বার্গসঁর প্রাণ-প্রবাহ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের কাম্য বস্তু এক সক্রিয় নীতি।

---

১. Dr. Mir Valiuddin, The Quranic Sufism, Patna, 1959, pp. 91-95.
২. মোহাম্মদ জাকীর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।
৩. Ibnul Arabi's Commentary on the Quran I, p. 6.
৪. Qashani's Commentary on the Fusus, p. 430, Quoted by Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 70.
৫. Rom Landau, Ibid, p. 57.

তাঁর বহু পূর্বে হাল্লাজের মত সূফী সাধকগণ বলেছেন যে এ সক্রিয় সচেতন নীতি ও মুহাম্মদ অভিন্ন। কিন্তু তাদের সে ব্যাখ্যা কখনও দার্শনিক রূপলাভ করেনি যেমন আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। তাঁর মতে মুহাম্মদ বা মুহাম্মদের মূল সত্তা আদি প্রজ্ঞা, প্রথম বুদ্ধি, সার্বিক প্রজ্ঞামূলক নীতি বুঝায় যা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। এটাকে তিনি কুতুব, প্রাক্তনের, কাম্য বস্তু নবীদের ও সূফীদের সিলসিলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান বলে উল্লেখ করেন।[১]

'কুতুব' হিসাবে মুহাম্মদের মূল সত্তার সাথে অন্যান্য নবী ও সাধু পুরুষদের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

ইবনুল আরাবীর মতে প্রত্যেক নবী এক একটি 'লগস' বা প্রজ্ঞা এবং নবী মুহাম্মদ তাঁদের সিলসিলার সর্বপ্রধান 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞা।[২] যে সকল বস্তু প্রজ্ঞা ও জীবনের সার্বিক নীতিতে অংশ গ্রহণ করে, সে সকল বস্তু প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র 'লগস', প্রত্যেকটিই আল্লাহর বাণী (কালিমা)।[৩] নবী ও সাধু পুরুষগণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় কেননা তাঁদের মাঝে 'লগস' বা মুহাম্মদের মূল সত্তা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদের মূল সত্তা ও অন্যান্য নবীদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা কোন কিছুর 'সমগ্র' ও তার 'অংশের' অনুরূপ। মুহাম্মদের মূল সত্তাই আদি প্রজ্ঞা, সমস্ত ও নবী তাপসগণ মুহাম্মদের মূল সত্তা বা আদি প্রজ্ঞার প্রকাশ। সমগ্র তাপসগণ প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু মুহাম্মদ নিজেই আদি প্রজ্ঞা। সমগ্র তাপস, আউলিয়া ও আম্বিয়া এবং মুহাম্মদের মধ্যে পার্থক্য এই যে তাঁরা প্রত্যেকে যে সমস্ত গুণের অধিকারী, মুহাম্মদ এককভাবে সেই সকল গুণের অধিকারী। প্রেরিত পুরুষ ও তাপসগণ এই প্রজ্ঞার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করেন। মুহাম্মদ অনন্ত ও অসাধারণ গুণের অধিকারী, তাঁর উপর কেবলমাত্র পরম সত্তা বিদ্যমান, তিনি পরম সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। মুহাম্মদের মূল সত্তার মধ্যে সকল নবীর সত্তা একত্রিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর মূল সত্তা ও আদমের মূল সত্তার মধ্যে পার্থক্য এই যে এ দুইটা যেন একই সত্তার ভিতর ও বাইরের দুইটি দিক মাত্র। এ জগতে মুহাম্মদের মূল সত্তা আদম তথা সমগ্র মানব জাতির মূল সত্তার ভিতরের দিক, কিন্তু পরজগতে অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে আদমের মূল সত্তা হবে ভিতরের দিক আর মুহাম্মদের

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 7o.
২. Ibid, p. 72.
৩. Fususul Hikam, p. 270.

মূল সত্তা হবে বাইরের দিক। অর্থাৎ মুহাম্মদের আকার হবে আদমের আকার বা মানুষের আকার এবং মুহাম্মদের মূল সত্তা হবে মূল আদম।[১] মোটকথা, আল্লাহ্‌র পরেই মুহাম্মদের মূল সত্তার স্থান। তারপর অন্যান্য মূল সত্তাসমূহ অর্থাৎ অন্যান্য প্রেরিত পুরুষ ও নবীগণ, তাপসগণ, সাধকগণ। মুহাম্মদের মূল সত্তার উপরে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নাই। সকল মূল সত্তা একটা সার্বিক নীতির মধ্যে একত্রিত হয়ে সকল প্রজ্ঞাবান সত্তাসমূহের মধ্যে কাজ করে যায় আর এই নীতি মুহাম্মদের মূল সত্তা। ঐশীবাণী হিসাবে মুহাম্মদের মূল সত্তা সকল প্রত্যাদেশ ও প্রেরণার মধ্যে সক্রিয় নীতি। এই বাণী মুহাম্মদ সহকারে সকল নবী ও সাধু তাপসদের কাছে ঐশী জ্ঞান হিসাবে পাঠানো হয়। মুহাম্মদের মূল সত্তা সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীবাণী। হাদীসে উল্লেখ আছে : আদম যখন পানি ও কর্দমাক্ত অবস্থায় ছিল মুহাম্মদের মূল সত্তা তখন নবী ছিলেন[২] আর এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই সূফীগণ আত্মা হিসাবে মুহাম্মদের মূল সত্তার পূর্ব অস্তিত্ব ও চিরন্তনতায় বিশ্বাস করেন। মুহাম্মদের মূল সত্তা বা আত্মা আদম হতে শুরু করে সকল নবী ও সাধু পুরুষ ও তাপসদের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

তাঁর 'ফুসুস-উল-হিকামের' আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো কিভাবে বিভিন্ন নবী, আওলিয়া, আম্বিয়া তথা সাধু পুরুষগণ শেষ নবীর আত্মা হতে ঐশী জ্ঞানলাভ করেন এবং এক একজন ব্যক্তির জ্ঞান ঐশীনাম অনুসারে নির্ধারিত হয় তা বর্ণনা করা।[৪] মুহাম্মদের মূল সত্তার মধ্যেই সকল ঐশী নামের সমন্বয় সাধিত হয়েছে অথবা 'আল্লাহ্' নামে সকল নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাঁর মতে একজন সূফী যখন কোন নবী, যেমন যীশুখ্রীস্ট বা মূসার কাছ থেকে ঐশী জ্ঞানলাভ করেন তখন তিনি মুহাম্মদের মূল সত্তা বা আত্মা বা আলোর মাধ্যমেই তা লাভ করেন।[৫] আর এই অর্থেই তিনি বলেন যে, একজন মুসলিম সাধক নবুয়তের অধিকারী হন কেননা মুসলিম সাধক বা তাপসগণ ও নবীগণ জ্ঞানের একই উৎস বা আধার হতে জ্ঞানলাভ করেন।

১. Futuhat, II. p. 115, l. 12.
২. (i) Fusus, p. 54, (ii) Futuhat, I, p. 174, (iii) মোহাম্মদ হারীফ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯
৩. মোহাম্মদ হারীফ, পূর্বোক্ত, পৃ : ৮—১৭
৪. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p 74.
৫. ইবনুল আরাবী এক হাদীস উদ্ধৃত করেন 'আমার কওমের সাধুগণ ইস্রাইলীয় বংশের নবীদের মত।'

মুহাম্মদের মূল সত্তা বা আত্মার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ[১] :

(১) মুহাম্মদের মূল সত্তা বা আদি প্রজ্ঞা আল্লাহ্‌র সত্তাসারের মধ্যে অবস্থিত সত্তা প্রকাশকারী মূল সত্তা এবং ঐশী জ্ঞানদানকারী কর্তা। এই মূল সত্তা আল্লাহ্‌র সত্তাসারকে প্রকাশ করে, সকল 'কুতুব'গণকে এবং 'কুতুব'গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুতুব অর্থাৎ স্বয়ং মুহাম্মদকে ঐশী জ্ঞান দান করেন।[২] এই মতের সাথে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের 'অভ্রান্ত ইমাম' সম্পর্কীয় মতবাদের মিল আছে। ইসমাইলীদের মতে আদি ইমাম বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল আরাবী কিন্তু 'বাহ্যিক ইমামে'র জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন না যদিও তাঁর কাছ থেকে শোনা যায় যে 'সুপ্ত ইমাম' বা কুতুব বা মুহাম্মদের মূল সত্তাই একমাত্র অভ্রান্ত বা সঠিক ইমাম।[৩]

(২) তাঁর মতে 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞা বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি হিসাবে সকল সৃষ্টির একমাত্র কারণ। এটাকে আত্মা বা পবিত্র আত্মা[৪] ও আল্লাহ্‌র সৃজনী শক্তির[৫] সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, সকল সত্তার জীবনদানকারী নীতি।[৬]

(গ) 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞার মানবীয় দিক

পূর্ণমানব হিসাবে আদি প্রজ্ঞা বা 'লগস'।

ইবনুল আরাবীর দর্শনে 'পূর্ণ' শব্দ বিশেষ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মতে 'পূর্ণতা' শব্দের অর্থ বাস্তবায়িত হওয়া বা অস্তিত্বশীল হওয়া এবং এর মধ্যে কিছু নৈতিক ও অন্যান্য অপূর্ণতা অন্তর্গত রয়েছে।[৭] যে বস্তু যে পরিমাণ ঐশী গুণ নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারে বা করার শক্তি রাখে সে বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ পূর্ণ বা বাস্তব হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণসত্তা আল্লাহ্ এবং পূর্ণ মানব আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

---

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 74.
২. Futuhat I, p. 196.
৩. Futuhat. III, p. 183.
৪. Futuhat, I, p. 109, 1. 14, Futuhat III, p. 580, Futuhat III, p. 101, l.12, foot-note.
৫. Futuhat I, p. 79.
৬. Futuhat I, p. 99, l.10.
৭. Dr. A. E. Affifi, p. 77.

তাঁর পূর্ণমানব সম্পর্কীয় মতবাদ আদি প্রজ্ঞার ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। পূর্ণমানব লগসের পূর্ণ প্রকাশ। মোটকথা, তাঁর আদি প্রজ্ঞা সম্পর্কীয় মতবাদ নিম্নরূপে বলা যায়[১] :

(১) পরাতাত্ত্বিক দিক হতে 'লগস' বা আদি প্রজ্ঞা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা, (২) মরমী দিক হতে এটা মুহাম্মদের মূল সত্তা এবং (৩) মানবীয় দিক হতে এটা পূর্ণমানব।

ফিলো ও স্টোয়িকদের মতো তিনি গুপ্ত, অপ্রকাশিত প্রজ্ঞা ও প্রকাশিত প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য করেছেন 'মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা' বা মুহাম্মদের মূল সত্তা বা 'কুতুব' এবং পূর্ণমানব মতবাদের সাহায্যে। 'লগস' বা সার্বিক প্রজ্ঞা নীতি সবকিছুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। এটাকে ঐশী চেতনা বা অর্ধ-চেতনা বলা হয় এবং এটা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা বা মুহাম্মদের মূল সত্তার সাথে অভিন্ন। এটা সকল জীব ও বস্তুর মধ্যে সমান মাত্রায় প্রকাশিত হয়নি। এটা কেবলমাত্র মানব তথা পূর্ণমানবের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই জন্য মানবকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা মুকুর বলা হয় যেখানে আল্লাহ্‌র সকল পূর্ণতা ও গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। একই কারণে মানবকে তথা পূর্ণমানবকে আল্লাহ্ বলেও উল্লেখ করা হয়। ইবনুল আরাবী অতি দৃঢ়তার সাথে এই কথা ব্যক্ত করেছেন :

(ক) কেবলমাত্র দুইটা সত্তাই নিজেকে আল্লাহ্ বলে উল্লেখ করতে পারেন : স্বয়ং আল্লাহ্ যিনি ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে নিজেকে আল্লাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বায়েজীদের মত পূর্ণমানব। এবং (খ) যখন সর্বশক্তিশালী আল্লাহ্ তাঁর সত্তাসারকে একটি সার্বিক সত্তার মধ্যে প্রকাশ করে জানতে চান এবং যখন তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অসীম রহস্যের বাস্তবে প্রকাশ ঘটে তখন সেই সার্বিকসত্তা দর্পণস্বরূপ কাজ করে এবং আল্লাহ্‌র মহিমার প্রতি-চ্ছবি সেখানে ফুটে উঠে, তখন সেই সত্তা নিজেকে আল্লাহ্ বলে উল্লেখ করতে পারেন। আদম সেই দর্পণ বা মুকুর পরিষ্কার করার মূল জিনিস এবং সেই দর্পণের আকৃতির আত্মিক শক্তি, যার মধ্যে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ

১. Ibid, p. 77.

করেন অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন। ফেরেশতাগণ সেই আকৃতি বা আকারের কিছু শক্তি। মোটকথা মানব, তথা পূর্ণ মানবও আল্লাহ্ বলে উল্লেখ করতে পারেন কেননা মানবে আল্লাহ্র গুণাবলী পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এই প্রসংগে বলা যায় যে, ইবনুল আরাবী হাল্লাজের 'লাহুত' বা 'নাসুত' মতবাদ বা অবতারবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন যদিও হাল্লাজ ও তাঁর মতবাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। হাল্লাজ দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করতেন[১] কিন্তু তিনি একত্ববাদ তথা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।

অল্প কথায় বলতে গেলে তাঁর পূর্ণ মানব[২] নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে প্রতিফলিত করে, সমগ্র সত্তাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। পূর্ণ মানবই বিশ্বের প্রাণ, শক্তি, প্রাণপ্রবাহ, কারণ ও সবকিছু।

তবে মনে রাখতে হবে যে তাঁর যে-মানব আল্লাহ্র সাথে অভিন্ন, বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তা, প্রাণদানকারী কর্তা, তা কিন্তু কোন পশু মানব (আল ইনসানুল হায়ানি) নয়, এটা প্রজ্ঞাবান মানব। সকল প্রেরিত পুরুষ, নবী, রসুল, আওলিয়া, সাধক ইত্যাদি এই প্রজ্ঞাবান মানব শ্রেণীর অন্তর্গত। আরো সূক্ষ্মভাবে বললে বলতে হয় যে পূর্ণ-মানব দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি।[৩]

লাইবনিজ যেমন বলেন যে 'মনাড' বা চিৎপরমাণুগুলো সকলেই সমান নয়, একই রকম প্রত্যক্ষের দাবীদার নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি 'মনাড' নিজ শক্তি অনুসারে প্রত্যক্ষণ করতে পারে বা সমগ্র বিশ্ব তার মধ্যে তার শক্তি অনু-সারে প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে তিনি বলেন যে, বিশ্বের সকল বস্তুর শক্তি সমান নয়, প্রত্যেকটি বস্তু একই মাত্রায় সার্বিক-প্রজ্ঞাময় নীতি প্রতি-ফলিত করতে পারে না। বিশ্বের তথাকথিত জড়বস্তুর মধ্যেও প্রজ্ঞানীতি কিঞ্চিত পরিমাণে প্রতিফলিত হয়,[৪] কেননা সেসব বস্তু আভ্যন্তরীণ নিয়ম মেনে চলে। আর এই অর্থে তিনি সকল বস্তুকে প্রজ্ঞাবান বলে উল্লেখ করেন। বিশ্বের নিম্নস্তর নির্জীব বস্তু হতে শুরু করে পূর্ণ চেতনার অধিকারী পূর্ণ মানব পর্যন্ত সকল কিছুই এক-একটা প্রজ্ঞামূলক সংগঠন। তাঁর মতে যদি কোন ব্যক্তি কি

১. R. A. Nicholson, The Idea of Personality in Sufism, Lahore, 1964, p. 39.
২. Ibid, pp. 63, 79.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 79.
৪. Fusus, p. 34.

ভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনা করতে হয় তা না জানে, তবে সে মানুষের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না এবং বিশ্বের মাঝে তার স্থান কোথায় জানে না। মানুষই একমাত্র জীব, যে আল্লাহ্‌কে পূর্ণভাবে জানার দাবী করতে পারে।[১] আসলে মানুষের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ নিজেকে জানেন কারণ মানুষ আল্লাহ্‌র চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মানুষের সত্তা আল্লাহ্‌রই সত্তাসার আর সে হিসাবে মানুষ আসল সত্য, চিরন্তন, নিত্য এবং আভ্যন্তরীণ, গুপ্ত বা ভিতরের জীব। কিন্তু মানুষের আকার বা আকৃতি আল্লাহ্‌র সত্তাসারের বহিঃপ্রকাশিত অবস্থা আর এই দিক দিয়ে বিচার করলে মানুষকে অবভাসিক, ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য বা বাইরের জীব বলা যায়।[২] অন্যান্য জীবও আল্লাহ্‌কে তাদের ক্ষমতা অনুসারে জানতে পারে, কেননা পদার্থিক বস্তুগুলো আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। মানুষের সাথে তাদের জ্ঞানের তুলনা করলে তাদের জ্ঞানকে অপ্রতুল ও কিঞ্চিত বলে মনে হয় কারণ মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। কেবলমাত্র মানুষ আল্লাহ্‌কে মূল সত্তারূপে এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক,[৩] নিত্য ও অনিত্যরূপে বুঝতে পারে।[৪] পূর্ণ মানবের আত্মা সার্বিক প্রজ্ঞা বা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা বা মুহাম্মদের মূল সত্তা ইত্যাদি প্রকাশের উপযুক্ত স্থান এবং এরই মধ্যে 'লগস' বা সার্বিক প্রজ্ঞার ক্রিয়াকলাপ পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ণ মানব মূল সত্তার অতি নিকটবর্তী সত্তা এবং তার মধ্যেই সার্বিক ও বিশেষের মৌলিক ঐক্য বাস্তবায়িত হয়।[৫]

এখন প্রশ্ন উঠে: পূর্ণ-মানব পূর্ণতা কিভাবে লাভ করে? এই বিষয়ের উত্তর দিতে গিয়ে ইবনুল আরাবী ও জিলি এই প্রশ্নের দার্শনিক দিকের সাথে মরমী দিকের মিশ্রণ করেছেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে বললে বলতে হয় যে মানুষ (মানব জাতি) আল্লাহ্‌র গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং কেবলমাত্র পূর্ণ মানবের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র পূর্ণতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে।[৬] মরমী

১. Fusus, p. 325.
২. Fusus, p. 36.
৩. Fusus, p 31.
৪. Fusus, p. 19.
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 80.
৬. R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, Reprinted 1967, pp. 77—142.

দিক হতে বিচার করলে বলতে হয় যে এক শ্রেণীর মানব, যাদেরকে পূর্ণ-মানবের শ্রেণীভুক্ত করা যায়, যারা বিশেষ এক মরমী অবস্থার মধ্যে এক পরম সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করতে এবং এই উপলব্ধির মাধ্যমেই তারা তাদের নিজেদের ও আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। তাহলে পূর্ণ-মানবের পূর্ণতা কি তার সত্তার দ্বারা বা জ্ঞান দ্বারা অথবা উভয়ের দ্বারাই লাভ হয়? মানব কি ঐশী অর্থাৎ আল্লাহ্র উপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত সকল গুণাবলী, মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা এবং বিশ্বজগৎ নিজের মধ্যে প্রকাশ করার জন্যই কি পূর্ণতা লাভ করে? অন্য কথায়, আল্লাহ্র পূর্ণ প্রকাশ হয় বলেই কি মানুষকে পূর্ণ মানব বলা হয়? অথবা মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করার জন্যই তাকে পূর্ণ মানব বলা হয়?[১] ইবনুল আরাবীর মতে এই দুইটার মধ্য দিয়েই মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তিনি এই দুই ধরনের প্রশ্নের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাঁর মতে একজন পূর্ণ মানব কখনো পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারে। আর এ দিয়েই একজন সাধারণ মানুষ ও একজন পূর্ণ মানবের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়। একজন মানুষ একটা ক্ষুদ্র বিশ্ব, আর এটা তার মধ্যে সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান। একজন পূর্ণ মানব কিন্তু বাস্তব ক্ষুদ্র বিশ্ব, কেননা তার মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলী ও পূর্ণতা বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয় এবং এই প্রকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদি না সে আল্লাহ্র সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারে। প্রত্যেক পূর্ণ মানবই এক একজন মরমী সাধক বা সুফী, কারণ মরমী সাধনার মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ ঘটে।[২]

পূর্ণ মানব একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব বা অণুজগৎ[৩]

ইবনুল আরাবীর মতে পূর্ণ মানব পরম সত্তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রকাশ আর এ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি ক্ষুদ্র বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড বলতে কি বুঝেছেন। পূর্ণ মানব পরম সত্তার একটি অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন বা আকার অর্থাৎ পূর্ণ মানব আল্লাহ্ ও বিশ্বেরই প্রকাশ মাত্র।[৪] পূর্ণ মানব ক্ষুদ্র বিশ্ব বা অণুজগৎ হিসাবে কিভাবে

১. Fusus, p. 17. Futuhat II, p. 88.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 81.
৩. Ibid, p. 82.
৪. Ibid, p. 82.

নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও জড় জগতের সমগ্র গুণাবলী একত্রিত করে প্রকাশ করে তার ব্যাখ্যা তিনি করেন নি। নিম্নলিখিত উদাহরণটি ক্ষুদ্র বিশ্ব বা অনুজগৎ ও বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তা ব্যাখ্যা করে। পূর্ণ মানবের সত্তাসার ঐশী সত্তাসারেরই একটি প্রকাশ্য রূপ বা তার আত্মা সার্বিক আত্মারই একটি প্রকাশ্য রূপ। তাঁর দেহ সার্বিক দেহেরই একটি প্রকাশ্য রূপ। তাঁর জ্ঞান ঐশী জ্ঞানেরই অনুলিপি বা প্রতিফলন। পূর্ণ মানবের অন্তঃকরণ বা হৃদয় কাবাগৃহেরই স্বর্গীয় মূল আদর্শ।[১] তাঁর আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিগুলো ফেরেস্তাদের মতো, তাঁর বুদ্ধি সূর্যের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের চিন্তাবিদগণ ক্ষুদ্র বিশ্ব ও বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তাঁর আলোচনার মধ্যেও এই দুইটির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সেই সকল কথা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের ক্ষুদ্র বিশ্ব ও বিশ্ব সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।[২]

সার্বিক 'লগস' বা সার্বিক প্রজ্ঞা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়। সার্বিক প্রজ্ঞার মতোই পূর্ণ মানবকে 'বরজোখ' বা মধ্যবর্তী ব্যক্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৩] অবশ্য 'বরজোখ' বা মধ্যবর্তী শব্দ বিশেষ এক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ণ মানব আল্লাহ্ ও বিশ্ব বা ঐশী জগৎ ও মানবিক জগৎ— এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত কোন স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়নি। বরজোখ বলতে এখানে কোন মধ্যস্থকারী স্বতন্ত্র সত্তাকে বুঝানো হয়নি।[৪] এখানে যা বুঝানো হয়েছে তা এই যে, পূর্ণ মানবের মধ্যে আল্লাহ্ ও বিশ্ব বা ঐশী ও মানবিক গুণাবলী একত্রিত হয়েছে এবং পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্ণ মানব বিশ্ব সৃষ্টির কারণ[৫]

অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ইবনুল আরাবী সৃষ্টির রহস্যকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রেমের মাধ্যমে পরম একত্বের মাঝে নিজেকে জ্ঞাত করানো ও প্রকাশিত হওয়ার

১. Ibid, p. 82.
২. Ibid, p. 82.
৩. Ibid, p. 82.
৪. Ibid, p. 82.
৫. Ibid, p. 82.

জন্য আল্লাহ্ নিজেকে বাহ্যিক বা অবভাসিক জগৎ রূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রায় উল্লেখিত হয়: "আমি গুপ্তধন রূপে বিদ্যমান ছিলাম, যখন আমি প্রেমের মাঝে নিজকে জানতে চাইলাম, তখন বিশ্বকে সৃষ্টি করলাম যেন তারা সেগুলোর মাধ্যমেই আমাকে জানতে পারে।" আল্লাহ্ তাঁর এই পরম এককের চিরন্তন প্রেম আকর্ষণের মাঝে নিজের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নিজের মাঝে নিজেকে পূর্ণরূপে জানানোর জন্য আল্লাহ্র যে চেষ্টা তা পূর্ণমানবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে আর এই পূর্ণমানব এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্কে পূর্ণভাবে জানেন এবং আল্লাহ্র গুণাবলী পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। তিনি আল্লাহ্কে তাঁর অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা সন্দর্শন করেন। তাঁরই মাঝে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করেন এবং তাঁরই মাধ্যমে তাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি করেন। পূর্ণমানবই সৃষ্টির কারণ[১] কেননা তাঁর মধ্যেই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। সৃষ্টির মূল বিষয় বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়াকে কোরআনে বর্ণিত 'আমানত' শব্দের আলোকে বুঝতে হয়। আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আমি আমার 'আমানত' স্বর্গ, বিশ্ব ও পর্বতকে দিয়েছিলাম কিন্তু তারা তা বহন করতে অক্ষম হয় এবং তারা এ 'আমানত' নিতে অস্বীকার করে, কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছে।" যদি এটা পূর্ণ মানবের জন্য সৃষ্টি করা না হতো, তবে সমগ্র সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন হতো, কেননা তাহলে আল্লাহ্র প্রকাশ সম্পূর্ণ হতো না এবং আল্লাহ্কে প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হতো না। সুতরাং এটা ঠিক যে পূর্ণ মানবের খাতিরেই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ বিশ্ব ও পূর্ণ মানবের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।[২]

তাঁর মতে, মানবের মর্যাদা খুব বেশী। মানব আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব তাকে রক্ষা করা ও সম্মান করা উচিত কেননা "যে মানুষের সেবা করে সে আল্লাহ্রই সেবা করে।"[৩] অর্থাৎ "জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে

১. Ibid, p. 83.
২. Ibid, p. 83.
৩. Fusus, p. 324.

ঈশ্বর।" মানবজাতিকে রক্ষা করা ধর্মীয় অনুশাসনের অন্যতম নির্দেশ।[১] তিনি বলেন যে আল্লাহ্ মানুষকে এত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে আসমান ও জমিন এবং তন্মধ্যস্থ সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কি দেখনি যে আল্লাহ্ বেহেস্ত ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর কর্তৃত্ব মানুষের হাতে দিয়েছেন।"[২] আর এই ধারণা থেকেই তিনি মনে করেন যে, সমগ্র বিশ্বে যা আছে, পূর্ণ মানবের মাঝেও তা আছে। স্বরূপ ও আধেয়ের দিক হতে 'ভাণ্ড' ও 'ব্রহ্মাণ্ড' একই সমান।

তিনি মানবকে (পূর্ণ মানব) কেবলমাত্র সৃষ্টির কারণ বলেই উল্লেখ করেন নি, তাঁকে বিশ্বের রক্ষক ও পরিচালক বলেও উল্লেখ করেছেন।[৩] যতক্ষণ পূর্ণ মানব বিশ্বের মাঝে আছেন ততক্ষণ বিশ্ব অস্তিত্বশীল থাকবে। যখন আল্লাহ্ নিজেকে আর প্রকাশিত অবস্থায় রাখবেন না তখন তাঁর 'আমানত' উঠিয়ে নেবেন। তখন মূল সত্তার বাহ্যিক দিক অন্তর্হিত হবে, কেবল আভ্যন্তরীণ দিক বর্তমান থাকবে।

তিনি আর এক অর্থে পূর্ণ মানবকে বিশ্বের রক্ষক ও পরিচালক বলে উল্লেখ করেন। 'বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি' হিসাবে পূর্ণ মানব বিশ্বকে রক্ষা করেন ও পরিচালনা করেন। মরমী সাধকের সৃজনশীল ক্রিয়া সম্পর্কে যা বলা যায় তা এ প্রসংগেও উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তিনি যেমন অনেক সময় 'লগস' বা অমূর্ত বা আদি প্রজ্ঞা বা নূরে মুহম্মদী ও মূর্ত পূর্ণ-মানবকে এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা যেন তা মনে না করি। সার্বিক প্রজ্ঞা (বা সত্তাসমূহের মূল সত্তা, মুহম্মদের মূল সত্তা, চেতস, আত্মা ইত্যাদি ইত্যাদি) 'বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি' এবং এই নীতি বিশ্বকে রক্ষা করে, পরিচালনা করে ও প্রাণ দান করে। তা ছাড়া এই নীতির পূর্ণ প্রকাশ এক শ্রেণীর মানব তথা পূর্ণমানব শ্রেণীর মধ্যে ঘটে-অর্থাৎ বাস্তবায়িত হয়। যখন তিনি পূর্ণ মানবকে মূর্ত ও বাস্তব অর্থে বিশ্বের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলে উল্লেখ করেন, তখন তিনি এই মনে করেন যে মরমী অভিজ্ঞতা 'ফানা বা আত্মবিলোপ বা তন্ময়তার মধ্যে পূর্ণ মানব নিজেকে চেতস, বিশ্বাত্মা বা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তার সাথে অভিন্নরূপে প্রকাশ করেন অর্থাৎ

১. Fusus, p. 323.
২. Fusus, p. 402.
৩. Fusus, p. 20.

নিজেকে 'আল্লাহ্-মানব' বা 'পরমাত্মা-মানবাত্মা,' চেতন আত্মা বা মূল সত্তা-সমূহের মূল সত্তা মনে করেন। আল্লাহ্ সৃষ্টিধর্মী প্রজ্ঞাবান নীতি বা প্রাণ প্রবাহ। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয় যে পূর্ণ মানব 'বিশ্বনীতি' বা 'প্রাণপ্রবাহ' হতে অভিন্ন বলে তিনি মনে করেন। আর যদি এই হয় তবে পূর্ণ মানব আর মানব নয় বা কোন আকার বা অস্তিত্ব বিশিষ্ট জীব নয়—এটা একটা সাৰ্বিক নীতি বা স্বয়ং আল্লাহ্ যিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত সকল কিছুর ভিতরে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।[১]

তিনি বলেন যে, ধাতুর মধ্যে সোনা সবচেয়ে পূর্ণ আকারপ্রাপ্ত বস্তু, গাছের মধ্যে 'শাজারুল ওয়াক ওয়াক' পূর্ণ গাছ, জীবের মধ্যে মানব পূর্ণ জীব, আর এ সবগুলোই পূর্ণমানব হতে পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ এদের পূর্ণতা পূর্ণ মানবের উপর নির্ভরশীল। পূর্ণ মানবের মধ্যে বিশ্বের গুণাবলী ছাড়াও ঐশী গুণাবলী আছে, যার জন্য তিনি আল্লাহ্র প্রতিনিধি বা খলীফা বলে সঠিকভাবে উল্লেখিত হয়েছেন।[২] তিনি (পূর্ণ মানব) প্রত্যেকটি জিনিসের আকৃতি দান করে তাঁর নিজস্ব আত্মা দান করেছেন এবং তখন আকারগুলো জীবন্ত বা প্রাণপ্রাপ্ত হয়েছে। একটা কথা স্পষ্ট যে, তিনি পূর্ণ মানব বলতে কেবলমাত্র কোন মূর্ত মানুষ, প্রেরিত পুরুষ বা নবী অথবা সাধু বা ওলীকে বুঝান নি।[৩] তিনি পূর্ণ মানবকে পবিত্র আত্মা অথবা মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা বা মুহম্মদের মূল সত্তা বা স্বয়ং আল্লাহ্কে বুঝিয়েছেন এবং সেজন্য এই নীতিকে পূর্ণ মানব বলার অধিকার তাঁর নাই।[৪] পূর্ণ মানব অবশ্যই ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাঁর এই বিশ্বতাত্ত্ব সাৰ্বিক নীতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না ব্যক্তিত্বহীন সে কথা স্পষ্ট করে বলা কঠিন।

আদি প্রজ্ঞা বা লগস মতবাদের উৎস এবং তার সমালোচনা

ইবনুল আরাবীই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন সূফী ও দার্শনিকদের 'লগস' সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ সংগ্রহ করে তার সমন্বয় সাধন করেন। সমন্বয়ের ফলে যে মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে 'ইসলামী লগস'' বা 'মুসলিম লগস'

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 85.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 85.
৩. Ibid, p. 85.
৪. Ibid, p. 85.

মতবাদ[১] বলা যায়। তাঁর পরবর্তী সূফী ও দার্শনিকেরা কমবেশী তাঁর মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

সর্বপ্রথমেই হাল্লাজের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনিই ইবনুল আরাবীর 'লগস' মতবাদ সৃষ্টির পথ সুগম করেছেন।[২] হাল্লাজ মুহম্মদের ঐশীত্ব এবং চিরন্তনত্ব স্বীকার করে বলেছেন যে সকল কিছু সৃষ্টির পূর্ব হতে, এমন কি অনস্তিত্বের পূর্ব হতে মুহম্মদের সত্তাসার বর্তমান ছিল, 'কলম' সৃষ্টিরও বহু পূর্ব হতে তাঁর নাম ছিল। দ্রব্য ও গুণ এবং পূর্বাপর সকল সম্বন্ধ সৃষ্টিরও বহু পূর্ব হতে তিনি ছিলেন। তিনি এমন এক বংশ হতে উদ্ভব হয়েছেন, যা পূর্ব বা পশ্চিম কোন দিকেরই নন। এর সাথে কোরআনের আয়াতের মিল আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো এবং এই আলোর সাথে মুহম্মদের অভিন্নতা প্রকাশ করা হয়েছে। হাল্লাজ বলতেন 'মুহম্মদ' ও 'চিরন্তন আলোক' অভিন্ন, সূফীদের হৃদয় এই আলোকে আলোকিত হয়। সকল নবী ও সাধু পুরুষগণ মুহম্মদের নিকট হতে এই আলোক বা জ্ঞান গ্রহণ করেন। ঐশী কলমের আলোকের চেয়েও মুহম্মদের আলোক অধিকতর উজ্জ্বল ও চিরন্তন। এখানে ঐশী কলমের অর্থ 'প্রথম বুদ্ধি'।[৩] ইবনুল আরাবী হাল্লাজের কথা স্বীকার করেছেন এবং ঐশী কলমকে মুহম্মদের সত্তার সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যার মতবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন তিনি আল-গাজ্জালী। আল গাজ্জালী তাঁর 'আল-মুতা'[৪] মতবাদের মধ্যে মুহম্মদ সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য আল-গাজ্জালীর মতবাদ অনেকটা দার্শনিক ভাবসম্পন্ন ছিল। তাঁর পরে এবং ইবনুল আরাবীর পূর্বে এ মতবাদ নিয়ে কোন সূফী-দার্শনিক বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি।

ইবনুল আরাবী হাল্লাজের 'লগস' সম্পর্কীয় সহজ মতবাদ হতে একটা পরাতাত্ত্বিক মতবাদ গঠন করে তার দার্শনিক আলোচনায় বিশেষ স্থান দান

১. Ibid, p. 86.
২. Ibid, p. 86.
৩. Tawariu, pp 11—12 quoted by A. E Affifi, Ibid, p. 86,
৪. W. H. T. Gairdner : Al Ghazzali's Mishkat al. Anwar (The Niche for Lights), Lahore Reprinted, 1952. p. 35.

করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর 'ইনসানুল কামেল' বা আদর্শ মানব বা পূর্ণ মানব মতবাদের মধ্যে তাঁর মতবাদের পুনরাবৃত্তি করেছেন বলে মনে হয়।[১]

যা 'লগস' মতবাদের মধ্যে দেখা যায় তা হতে মনে হয় যে কমপক্ষে দুইটি জিনিস তিনি অন্যদের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন (১) হেলেনীয় প্রভাব বা গ্রীক প্রভাব যা তিনি স্টোয়িক, ফিলো ও নব্য প্লেটোবাদীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। আর এই প্রভাব তাঁর 'লগস'-এর পরাতাত্ত্বিক ও মানবীয় দিক প্রভাবিত করেছে এবং (২) ইসলামী প্রভাব যা তিনি ইসমাইলী সম্প্রদায় ও হাল্লাজের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন এবং এই আলোকে তাঁর লগসের মরমী দিক গড়ে তুলেছেন।

মনে হয় বহু খ্রীস্টান ও ইহুদী চিন্তাবিদের হাতে গ্রীসীয় 'লগস' মতবাদের অস্তিত্ব ও মানবিক দিকগুলো বহু রূপান্তর ও উৎকর্ষ সাধনের পর হাল্লাজের মতো সূফীদের হাতে আসে এবং সেখান হতে তিনি সে মতবাদ গ্রহণ করেন।[২] ত্রিত্ববাদের তত্ত্বীকে সার্বিক প্রজ্ঞার সকল সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করাই প্রমাণ করে দেয় এটা খ্রীস্টীয়ান মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অবশ্য এটা খ্রীস্টধর্মের প্রভাব নয়, ধর্মের অন্তর্নিহিত বা ত্রিত্ববাদের দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর 'লগস' মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। 'লগস' এর তিনটি আপেক্ষিক দিক ত্রিত্ববাদের প্রতি ইংগিত দেয়।[৩] অবশ্য মুহম্মদের মূল সত্তা তিন ধরনের এবং তিনি অতি জোর দিয়ে বলেছেন যে, "যদিও আসলে তিনি এক, তবুও আমার প্রেমিকা তিনজন।"[৪] খ্রীস্ট ধর্মে বলা হয়েছে যে যীশুখ্রীস্ট 'পিতা ঈশ্বর' ও জগতের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী সত্তা এবং এর 'চিরন্তন জীবন হতে এই ক্ষণস্থায়ী বিশ্ব প্রকাশ লাভ করেছে। শব্দ বা বাণী পিতার মহিমা বা গৌরব, এর মধ্য দিয়ে এবং এটা দিয়ে কালের মাঝে তিনি তাঁর সকল ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন—তিনিই প্রকাশক ও প্রকাশিত বস্তু, চালক ইত্যাদি ইত্যাদি। যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে যে সব কথা

১. (i) R. A Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, pp. 112-113.
(ii) Dr. Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1954, p. 74-76.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 87.
৩. Ibid, p. 87.
৪. Tarjumanul Ashwaq, trans by R.A. Nicholson, pp. 70-71. Futuhat, III, p. 171.

বলা হয়েছে, তাঁর আলোচনায় মুহম্মদের মূল সত্তা, পূর্ণ মানব ইত্যাদি সম্পর্কে সেই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবুও খ্রীস্ট ধর্মের 'লগস' ও তাঁর 'লগসের' মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁর মতবাদের মধ্যে 'কুতব' হিসাবে মুহম্মদের যে ধারণা পাওয়া যায় তা এই যে এটা সকল নবী, প্রেরিত পুরুষ, রসূল, সাধু পুরুষের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্নিহিত 'প্রজ্ঞাবান নীতি' আর এর সাথে, আফিফি সাহেবের মতে, মাকারিয়াসের মতবাদের মিল আছে। মাকারিয়াস বলেছেন যে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের আত্মার সাথে 'লগস' এর (খ্রীস্টের) মিলন হয়। "প্রত্যেকটি জন্ম গ্রহণকারী আত্মাই খ্রীস্ট।"[১] ইবনুল আরাবী এর চেয়েও এক-ধাপ বেশী অগ্রসর হয়ে বলেন যে, মুহম্মদের মূল সত্তা সকল বস্তুর মাঝে অন্ত-নিহিত প্রজ্ঞাবান নীতি হিসাবে বর্তমান। তাই এখানে খ্রীস্টের চেয়ে মুহম্মদের মূল সত্তা অধিক ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া তিনি 'লীন' হয়ে যাওয়া বা 'মিশে যাওয়া 'কিংবা' 'অবতার' হওয়ায় বিশ্বাস করেন না। খ্রীস্ট ধর্মে অবতারে বিশ্বাস করা হয়। মুহম্মদের মূল সত্তা স্বয়ং আল্লাহ্ আর একথা বলা হয় বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে, মুহম্মদকে কখনও 'আল্লাহ্ত্ব' বা খোদাত্ব আরোপ করা হয় না বা যায় না বা দ্বিতীয় আল্লাহ্ বা ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয় না। এখানে মুহম্মদ দ্বিতীয় ঈশ্বর বা আল্লাহ নয়।[২] তাছাড়া খ্রীস্টা ধর্মের 'পিতা ঈশ্বর' এই পরিদৃশ্যমান অবভাসিক জগতের ঊর্ধ্বে কোন সত্তা নয়। আর এই হিসাবে তাঁর অদ্বৈতবাদী মতবাদের সাথে এর মিল আছে। বিশ্বের সাথে অভিন্ন হলেও খ্রীস্ট ধর্মে ঈশ্বরকে প্রেম, আলো, জ্যোতিঃ ও আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর পরম সত্তাসার জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তাঁর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁর কোন গুণ নাই। এই এক সত্তাসার নিজেকে যার মধ্য দিয়ে বা যার মধ্যস্থতায় প্রকাশ করেন তার নামই মুহম্মদের মূল সত্তা বা 'লগস'। তিনি তাঁর 'লগস' মতবাদ খ্রীস্ট ধর্মের বর্ণিত লগসের চেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তিনি 'লগস' শব্দকে অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। খ্রীস্ট ধর্মে লগসের সংখ্যা এক কিন্তু তাঁর মতে লগসের সংখ্যা অসংখ্য। অন্ত

১. Dean Inge, Personal Idealism and Mysticism, p. 79.
২. (I) R. A. Nicholson : Studies in Islamic Mysticism, p. 87.
(II) R.A. Nicholson : Idea of Personality in Sufism, Lahore, 1964 pp. 38, 63, 79,

কথায়, প্রত্যেকটি জিনিসই এক একটি লগস এবং এই সব লগসগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ 'লগস' মুহম্মদের মূল সত্তা হতে শক্তি সংগ্রহ করে, সকল বস্তুই আদি 'লগসের' মন ও সত্তাসারের মাঝে অবস্থিত। এখন আমরা অন্যান্য উৎস সম্পর্কে একের পর এক বর্ণনা করবো। এখন ইসমাইলী সম্প্রদায়ের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়। 'লগস'-এর মরমী দিক বা 'কুতব' সম্পর্কে ধারণা ইসমাইলী সম্প্রদায়ের প্রভাবের ফল।[১]

কুতবের ধারণা সূফীবাদের মতই পুরাতন।[২] আগের সূফীরা বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞানলাভের অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাদেশের উৎস এক, আর সে উৎস নবী মুহম্মদ ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ। কিন্তু ইবনুল আরাবীর পূর্বে কোন সূফীই মুহম্মদকে (মুহম্মদের মূল সত্তা বা আত্মা বা নূর) প্রাণদানকারী, সৃষ্টিকারী ও অনুপ্রেরণা-দানকারী সার্বিক নীতির সাথে বা স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে তুলনা করেন নি বা অভিন্ন-ভাবে কল্পনা করেন নি। সাধারণতঃ সূফীদের রচনায় 'কুতব' শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করা হয়, তিনি সে অর্থের পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মতে 'কুতব' কোন সাধু ব্যক্তি, ওলী, কোন নবী বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব নয়। সে 'কুতব' বিশ্বের 'মূলনীতি'। ইসলামী চিন্তাধারায় ইসমাইলী ও কারমাথিয়ানদের 'অভ্রান্ত ইমাম' সম্পর্কে যে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর 'কুতব' শব্দের অর্থের অনুরূপ।[৩] ইমাম আহম্মদ ইবনুল কায়াল পূর্ণ ইমাম সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ :

(১) তিনিই ইমাম যিনি উচ্চস্তরের আত্মাকে নিম্নস্তরের আত্মার উপর কর্তৃত্ব করার শক্তিদান করেন।

(২) তিনি সকল সার্বিক অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

এ থেকে পূর্ণ ইমামের কার্যকলাপকে একটা সার্বিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বোঝা যায় যা অনেকটা ইবনুল আরাবীর 'লগস' এর মতো।

ইবনুল আরাবী ও কারমাথিয়ানদের চিন্তাধারার মধ্যে নিম্নরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

কারমাথিয়ানরা বিশ্বাস করতেন যে 'নাতিক'[৪] বা 'বক্তা' সার্বিক প্রজ্ঞার

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 89.
২. Ibid, p. 89.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 89.
৪. (I) Ibid, p. 89.
(II) Dr. Masignon : An article on the Carmathians in Encyclopaedia of Islam, No 30, p. 771.

বহিঃপ্রকাশ। ইবনুল আরাবী বলেন যে নবী ও সাধু পুরুষগণ 'লগস'-এর বহিঃপ্রকাশ। কারমাথিয়ান নাস্তিকদের সিলসিলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং ইবনুল আরাবীর সূফী, সাধু ব্যক্তি, নবী ইত্যাদির সিলসিলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নবী হযরত মুহম্মদ। তাঁর ও কারমাথিয়ানদের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারমাথিয়ানরা চক্রের (যেখানে মুহম্মদকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে ধরা হয়) ঊর্ধ্বে উঠে প্লটিনাসের 'প্রথম বুদ্ধি' হতে জ্ঞান সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি এই প্রথম বুদ্ধিকে মুহম্মদের আত্মার সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেন। ইমাম সম্পর্কে কারমাথিয়ান বা ইসমাইলীরা যা বলেন তার সাথে তাঁর মতবাদ এক নয় এমন কি তিনি তাদের অবতারবাদ, দেহান্তরবাদ, অথবা একত্বে বিশ্বাস করেন না।[১] তিনি তাঁর 'লগস' মতবাদের জন্য ইসমাইলী ও কারমাথিয়ানদের কাছে এবং আরও অন্যান্য দার্শনিকদের কাছে ঋণী, কিন্তু তাই বলে তাদের যে কোন একজন বা বিশেষ এক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁকে অভিন্ন বা সমান বলে মনে করা যায় না। যদিও তাঁর 'কুতব' তত্ত্ব বিভিন্ন ধারণার সমন্বয়ের ফল,[২] তবুও তিনি এটাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে এর মধ্যে একটা অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি তাঁর 'লগস' মতবাদের মানবীয় দিক সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা এসেছে প্রকৃতপক্ষে স্টোয়িকদের কাছ থেকে। স্টোয়িকরা 'প্রজ্ঞা নীতির' সুপ্ত অবস্থা ও বাস্তব প্রকাশের অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তিনিও তা তাঁর 'লগস' মতবাদের মধ্যে ব্যবহার করেছেন।[৩] 'লগস'-এর মানবীয় দিকের মধ্যে মানুষ ও আল্লাহ্‌র পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর তিনি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, এঞ্জেলাস সাইলেসিয়াসের মতো তিনি মনে করেছেন যে মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, যেমন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়। তিনি বলেছেন যে "তিনি কি করে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হতে পারেন এবং আমি কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারি? আমি তাকে জানি (আমি অর্থ পূর্ণ মানব), সুতরাং আমি তাকে সৃষ্টি করি।"[৪] তাঁর দর্শনের এই অংশটুকু

---

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 89.
২. Ibid, p. 90.
৩. Ibid, p. 90.
৪. Fusus, p. 125.

হেগেলের মতবাদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা হেগেল বলেছেন যে, যখন আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ধ্যান করি, তখন আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা করি।[১]

স্টোয়িকদের মতে, মানুষের মধ্যে 'লগস'-এর অবতরণ এমনভাবে হয় যে তার ব্যক্তিত্বকে লগসের আসল একটি অংশ বলে মনে করা হয়। প্লেটোবাদিগণ ও স্টোয়িকগণ উভয়েই চিন্তা করেন যে মানুষের আত্মার মধ্যে ঐশী বস্তু আছে। আর এই ধারণাটি বিভিন্নভাবে মুসলিম ও খ্রীস্টান মরমী সাধক ও সুফী দার্শনিকদের কাছে গৃহীত হয়েছে এবং এর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সাধু পল বলেন যে, "আমি নই, আমার মধ্যে যীশু খ্রীস্টই বাস করছেন।"[২] মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান মরমী সাধক একহার্ট বলেন, "পিতা (ঈশ্বর আত্মার মধ্যে 'বাণী' প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন এবং যখন পুত্রের জন্ম হয় তখন প্রত্যেক আত্মাই মরিয়ম বা ম্যারী হয়ে যান।" হাল্লাজ সাধু পলের মতবাদের মধ্যে খ্রীস্টের স্থানে আল্লাহ্‌কে বসিয়েছেন এবং এর উপরেই তাঁর 'লাহুত' ও 'নাসুত' বা 'ঐশী' ও মানবীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর সেটাই তাঁর পূর্ণ মানব সম্পর্কীয় মতবাদের ভিত্তি বলে মনে হয়।

ফিলোর 'লগস' দর্শনের প্রভাব তাঁর 'লগস' মতবাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে, উভয়ের মধ্যে একই পদ ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি 'লগস' (কালিমা) এর দুইটা অর্থ করেছেন (১) অনন্ত জ্ঞান, যে অর্থে গ্রীক দর্শনে মূলতঃ চিরন্তন জ্ঞান বলা হতো এবং (২) শব্দ, বাণী বা কথা, যেমন প্রথমে হিব্রু ভাষায় এর অর্থ করা হতো। আর ফিলোনীয় দর্শনে লগসের এই একই রকমভাবে দুই অর্থে প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই এই ক্ষেত্রে তাঁর ও ফিলোনীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বললেই চলে। তিনি যখন 'কালিমা' বা 'লগস' শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তা আল্লাহ্র 'অনন্ত জ্ঞান' বা 'চিরন্তন জ্ঞান' বলে মনে করেন এবং যখন তিনি এটাকে মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তার সাথে তুলনা করেন বা অভিন্ন বলে মনে করেন অথবা সার্বিক প্রজ্ঞা বলে মনে করেন এবং সে সময়ে তিনি এটাকে 'রূহ' বা আত্মার সাথে অভিন্ন করে দেখেন।

ফিলো ও ইবনুল আরাবী উভয়েই 'লগসকে' দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 90.
২. Dean Inge's Personal Idealism and Mysticism, p. 80.

(১) ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বা আল্লাহ্‌ত্ব হিসাবে সার্বিক প্রজ্ঞা এবং (২) মানব অথবা সার্বিক আত্মার প্রজ্ঞা হিসাবে চিরন্তন ঐশী আত্মার আলোকের প্রতিফলন হিসাবে যার সাথে এর তুলনা করা চলে না।

একটা কথা এখানে উল্লেখ্য যে ইবনুল আরাবীর 'লগস' সম্পর্কে এখানে যা বলা হলো তা তাঁর গ্রন্থের কোন জায়গায় ধারাবাহিকরূপে একত্রে রচিত হয়নি। তাঁর বিভিন্ন লেখায় যে সকল উক্তি ছড়িয়ে আছে, সেগুলো একত্রিত করে তাঁর মতবাদটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

নবী ও আওলিয়া

সূফীরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহম্মদ সূফী সিলসিলার সর্বপ্রধান এবং সূফীরা তাঁর উত্তরাধিকারী।[১] হযরত মুহম্মদের নূর বা আলোক হতে সকল সূফীরা নূর বা আলোক লাভ করেন। ইবনুল আরাবী এ বিষয়ে অন্যান্য সূফীদের সাথে একমত। অধিকন্তু তিনি তাঁর নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে একটি তাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে তুলছেন, নবী ও আওলিয়াদের মধ্যে সম্পর্ক ও প্রভেদ বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যা হতে মনে হয় তিনিই যেন শেষ আওলিয়া।

'আওলিয়া' শব্দের অর্থ

ইবনুল আরাবীর মতে একজন সাধু, ওলী ও সূফী যে শুধু আত্মিক পবিত্রতার অধিকারী হবেন তাই নয়, তিনি অবশ্যই ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ও অবশ্যই অদ্বৈতবাদী হবেন।[২] কোন ব্যক্তি যদি ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হন, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক ভালভাবে বুঝতে পারেন, পরম সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করেন, বহুত্বের মধ্যে পরম সত্তার ঐক্য অনুধাবন করেন, সমগ্র বিশ্বকে যদি এক সত্তার বাহ্যিক প্রকাশ বলে স্বীকার করেন তবেই তিনি একজন সাধু বা ওলী ব্যক্তি হতে পারেন।[৩] অন্য কথায় তাঁর

১. (I) Dr. A. E. Affifi, p. 92.
(II) S. A. Q. Husaini Ibn al-Arabi, Madras 1931, p. 76.
২. Ibid, p. 93.
৩. (I) S. A. Q. Husaini, Ibid, p. 76.
(II) Futuhat II, p. 52.

মতে, একজন ব্যক্তি পূর্ণ মানব হলেই তিনি সাধু, সূফী ও দরবেশ হতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস এই যে সাধু বা সূফীর হৃদয় আল্লাহ্‌র আলোকে পরিপূর্ণ, তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে দেখেন না, আল্লাহ্‌র বাণী ছাড়া অন্য কিছু তিনি শোনেন না। তিনি যা কিছু দেখেন ও শোনেন তা তিনি আল্লাহ্‌র মাধ্যমেই দেখেন বা শোনেন। তিনি অদৃশ্য সত্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এমন কি নিজ আত্মাকেও ভুলে যান। এই ধরনের সাধু বা সূফীকে তিনি 'মালামিয়া' নামে উল্লেখ করেন। মালামিয়া নিজের বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য অপরের কাছে সমালোচনার পাত্র হন। তিনি ঐশী তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং ঐশী জ্ঞান অপরের কাছে কখনও ব্যক্ত করেন না। ইবনুল আরাবীর মতে একজন মালামিয়া শ্রেষ্ঠ সূফী, কারণ তিনি পরের সমালোচনা বা প্রশংসায় কখনও ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁর হৃদয় সব সময় আল্লাহ্‌র চিন্তায় মশগুল থাকে।

ইবনুল আরাবী 'মালামিয়া' শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং সকল নবী ও রসূলকে এই 'মালামিয়া' শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১] তাঁর মতে হযরত মুহম্মদ একজন মালামিয়া। আবদুল কাদির জিলানীর মত শ্রেষ্ঠ সূফী ও আওলিয়া সর্বদা সতর্ক প্রহরী, হযরত রাবেয়ার মত প্রেমিকা মালামিয়া দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ইবনুল আরাবী ওলী, বা সাধু শব্দের ব্যাপক অর্থ করে তার মধ্যে সকল নবী বা রসূলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একজন নবী অবশ্যই একজন সাধু ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি বাণী লাভ করেন এবং সে বাণী প্রচার করেন এবং একজন রসূলও অবশ্যই একজন সাধু, অন্যান্য আওলিয়াদের সাথে তাঁর পার্থক্য এই যে তিনি অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অপূর্ব জ্ঞানের অধিকারী।

সাধুতা বা ওয়ালিয়াৎ বা বেলায়েত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার ভিত্তি আর এটা সকলের মধ্যেই সাধারণ। ইবনুল আরাবীর মতে এটা একটা ঐশী গুণ (কেননা আল্লাহ্ নিজেকে সাধু বা ওলী বলে উল্লেখ করেছেন) এবং যখন এ গুণ মানুষের প্রতি আরোপের সময় এটা কেবলমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন। এটা (ওয়ালিয়াত) 'নবুয়াত' ও 'রিসালাত' এর চেয়েও অধিকতর সাধারণ।

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 93.

'ওয়ালিয়াত' স্থায়ী অবস্থা কিন্তু 'নবুয়াত ও রিসালাত' সাময়িক অবস্থা।[১] একজন ওলী বা সাধু ব্যক্তির জ্ঞান অসীম কেননা এ জ্ঞান 'আল্লাহ্‌র জ্ঞান' এবং 'নূরে মুহম্মদীর জ্ঞানের' সমান এবং অভিন্ন। অপরপক্ষে তিনি মনে করেন যে 'নবুয়াত' ও 'রিসালাতের' জ্ঞান সীমিত জ্ঞান।

তাঁর মতে সার্বিক প্রজ্ঞা বা 'লগস' মুহম্মদের নূর, মুহম্মদের সত্তা বা আত্মা।[২] আল্লাহ্‌র আসল 'প্রতিনিধি' বা 'খলীফা' মুহম্মদের সত্তা বা নূর যা বিভিন্ন নবী ও রসূল, ওয়ালী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং যাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলীফা বলা যায়। যাঁরা সাধারণ প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করেছেন তাঁদেরকে সাধু বলা যায়। কেননা প্রত্যেক নবী বা রসূল একদিক দিয়ে এক একজন সাধু। সকল সাধুগণ তাঁদের প্রতিনিধিত্ব বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংগ্রহ করেন মুহম্মদের আত্মা বা নূর হতে। সকল নবী ও রসূলগণ এ জ্ঞান ছাড়াও 'নবুয়াত', 'রিসালাত' বা বিশেষ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী। সাধু ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক নবী ও রসূল একজন ওলী ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত। ইবনুল আরাবী বিশ্বাস করেন যে, কোন সাধু ব্যক্তি যত অধিক মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন না কেন, তিনি কখনও একজন নবী বা রসূলের চেয়ে অধিকতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে পারেন না। তবে একজন নবী বা রসূলের সাধুতার দিক 'নবুয়াত' বা 'রিসালাত'-এর দিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এখানে সাধুতা বা 'ওয়ালিয়াত' ও 'নবুয়াত' একই মানুষের দুইটি দিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

এইভাবে তিনি সকল নবী, রসূল ও ওয়ালীদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁদের মাঝে 'লগস' বা মুহম্মদের নূর বা আত্মা 'সাধারণ সক্রিয় নীতি' আর এই নীতিই সকল প্রকার প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণার মূল উৎস। তিনি এমন কথাও বলেন যে হযরত আদম হতে শুরু করে হযরত মুহম্মদ পর্যন্ত প্রচারিত সকল ধর্মই 'মুহম্মদের ধর্ম,' বিভিন্ন নবীর কাছে যুগ ও সময় উপযোগী ধর্ম সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়েছে আর 'এই ধর্ম' এক 'সার্বিক ধর্ম ইসলামেরই' বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। তিনি বিশ্বাস করেন যে 'রিসালাত' ও 'নবুয়াত'

১. Fusus, p, 51.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 95. S. A. Q. Hussaini, Ibid, pp. 79-83.

শেষ হয়েছে, বাকী রয়েছে কেবল সাধারণ প্রতিনিধিত্ব এবং তাঁর বিশ্বাস এই যে, যে-সকল সাধু ব্যক্তি হযরত মুহম্মদের শরীয়ত ও আইন মেনে চলেন সেই সকল মুসলিম সাধু ব্যক্তিই কেবল শেষ প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। তিনি 'আল-খলিফাতুল আম্মাহ্' বা সাধারণ প্রতিনিধিত্ব এবং 'খলিফাতুল তাশরী' বা বিশেষ প্রতিনিধিত্ব-এর মধ্যে প্রভেদ টেনে বলেছেন যে প্রথমটি সাধুদের শেষ ব্যক্তির নিকট আর 'খলিফাতুল তাশরী' নবীদের শেষ ব্যক্তি বা হযরত মুহম্মদের নিকট শেষ হয়েছে।

তাঁর মতে, 'ইসলাম ধর্ম' সর্বশেষ ঐশী ধর্ম এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এই ধর্মের নিয়ম-কানুন মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।[১] তিনি বিশ্বাস করেন যে ইসলাম ধর্মের আইন সম্পর্কীয় যে বাণী হযরত মুহম্মদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল তা পুনরায় কিছুসংখ্যক সুফীর কাছে একই উৎস হতে প্রকাশিত হয়।[২] সুফীদের হযরত মুহম্মদের অনুসারী বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুফীরা তাঁদের নিজেদের আইন মেনে চলেন, অবশ্য তাঁদের কাছে আদি উৎস হতে প্রকাশিত জ্ঞান ও নবীর কাছে প্রকাশিত জ্ঞান একই ধরনের। সুফীদের ভাষায় সেইসব সুফীদের আল্লাহ্র খলিফা বলা হয়, কিন্তু সাধারণ-ভাবে তাঁদেরকে নবীর অনুসারী বলে উল্লেখ করা হয়। এ কারণেই হযরত মুহম্মদ মৃত্যুর সময় কোন খলিফা নিয়োগ করে যান নি। নবী জানতেন যে, তাঁর পরে আরো বহু খলিফা আসবেন, যাঁরা আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু সুফীদের 'কাশ্ফ', স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান বা প্রত্যাদেশ যদি নবীর প্রত্যাদেশ বা আইনের সাথে কখনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় অর্থাৎ এই দুই প্রকার প্রত্যাদেশের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায়, তবে তাঁর মতে, নবীর প্রত্যাদেশ বা আইন সত্য বলে স্বীকার করতে হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সুফীরা ভুল করেন[৩] তবে তাঁদের প্রাত্যাদেশের ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে। তিনি এই প্রকার সুফীদের নবী বলে উল্লেখ করেন। 'আল-নবুয়্যত আল-মুতলাকাহ্' বা 'আল-নবুয়াত আল-আম্মাহ্' অথবা 'পূর্ণ বা সাধারণ নবুয়ত' সুফীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু 'নবুয়তুল ইখতিসাস' কেবলমাত্র খাস

১. Dr A. E. Affifi, Ibid, p. 96.
২. Fusus 3.4.
৩. Futuhat. II, pp. 9, 34.

নবীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। সূফীদের নবুয়ত হলো এক ধরনের নবুয়ত, কিন্তু এর মধ্যে কোন নতুন আইন নাই। এর সহজ অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক সূফী আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে নবীদের সমপর্যায়ে উন্নীত হন এবং হযরত মুহম্মদের শরীয়তের মাধ্যমে তাঁহার মতই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করেন। তাঁর বিশ্বাস কোরআন আল্লাহ্‌র বাণীর আংশিক প্রকাশ।[১] আল্লাহ্‌র বাণী এখনও সূফীদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত মুহম্মদের কাছে বাণী অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেমন তিনি প্রত্যক্ষভাবে ফেরেস্তা অথবা তাঁর প্রজ্ঞাবান আত্মাকে দেখেছিলেন,[২] সূফীদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হওয়ার সময় সূফীরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখেন। যে-সকল ইসলামী আইন-কানুন মুক্ত বুদ্ধি বা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সূফীরা তা পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। কিন্তু যে-সকল আইন কোরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা কখনও পরিবর্তন করতে পারেন না কারণ সে সকল আইন চিরন্তন বা অপরিবর্তনযোগ্য। নবীর হাদীসের সত্যতা আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, যদি সেই হাদীস আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশের সাথে সম্পূর্ণরূপে অসংগতিপূর্ণ হয় তবে সূফীরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারেন।[৩] সেই হাদীসের বর্ণনাকারী যে-ব্যক্তিই হোন না কেন তাতে সূফীদের কিছু এসে যায় না। আবু সাইদ বিন আবুল খায়েরের মতো তিনি একথা বলেন নি যে কোরআন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বা বাণী নয় এবং সূফীরা কোরআনের আইনের সাথে নতুন হয়।[৪] আইন যোগ করতে পারেন যদি তা কোরআনের আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ না ইসলামী আইন কোরআন রূপে হযরত মুহম্মদের কাছে আল্লাহ্‌র শেষ বাণী। প্রকৃত হাদীস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যদিও অনেক সময় তিনি বলেন যে কোরআন 'অসম্পূর্ণ', তবুও উল্টা কথা বলে তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোরআনের আইন ও নবীর হাদীস পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নাই কেননা তা 'সম্পূর্ণ' ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূফীরা যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও প্রত্যাদেশ লাভ করেন তা 'কোরআনের বাণীর

১. (i) Fatuhat II. p. 666, l. 10.
   (ii) Dr. A. E. Affifi, Ibid. p. 97.
২. Ibid.
৩. Fusus. p. 315.
৪. R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, p. 60.

মতই সত্য।' তাই বলে সূফীরা কোরআনের আইন-কানুন ও নবীর হাদীস পরিবর্তন করেন না বা তার সাথে কোন কিছু যোগ করেন না। অন্য কথায়, সূফীরা কখনো ইসলামী আইন-কানুন বদলের পক্ষপাতী নন।[১]

সকল প্রকার প্রত্যাদেশ, অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নূরে মুহম্মদী বা মুহম্মদের আত্মা বা প্রথম প্রজ্ঞা সক্রিয় নীতি হিসাবে বর্তমান থাকায় সকল নবী এমন কি হযরত মুহম্মদ এবং আউলিয়া, সাধু ব্যক্তি, সূফী প্রমুখ একই উৎস হতে ঐশী জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁরা সকলে একই নূরে মুহম্মদী বা মুহম্মদের আত্মার বা সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[২] হযরত মুহম্মদ নিজেও সেই নূরে মুহম্মদীর প্রকাশ। কারণ নূরে মুহম্মদী বা মুহম্মদের আত্মা আধ্যাত্মিক সিলসিলার আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ, আর শেষ ওলী বা শেষ সাধু ব্যক্তি সেই নূরে মুহম্মদের অনন্ত রূপ প্রকাশের একটি প্রকাশ মাত্র।[৩] ইবনুল আরাবী অতি যত্নের সাথে নূরে মুহম্মদী বা মুহম্মদের আত্মা বা সত্তা এবং নবী হযরত মুহম্মদ-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন যে নূরে মুহম্মদী মূল উৎস, যা থেকে হযরত মুহম্মদের প্রকাশ লাভ ঘটেছে। তিনি সর্বশেষ ওলী বা সর্বশেষ সাধু ব্যক্তিকে অন্যান্য সাধু ব্যক্তি ও নবীগণ হতে পৃথক করেছেন এবং বলেছেন যে সর্বশেষ সাধু ব্যক্তির মধ্যে নূরে মুহম্মদী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে নূরে মুহম্মদীর পূর্ণ অধিকারী, 'নূরে মুহম্মদী' বা 'প্রজ্ঞাবান নীতির' আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রকাশের শেষ ব্যক্তি। তিনি সর্বশেষ সাধু ব্যক্তির পরে অন্য সাধুদের আবির্ভাব অস্বীকার করেন নি; কিন্তু তাঁর মতে তাঁরা নূরে মুহম্মদীর প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নয়, তাঁরা শেষ সাধুর মাধ্যমে অন্যান্য নবী ও সাধু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হতে পারেন। তিনি 'নূরে মুহম্মদী'র চিরন্তনতা, নিত্যতা ও পূর্ব হতে অস্তিত্বশীল হওয়া সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, সাধুদের শেষ ব্যক্তির সত্তা সম্পর্কেও তাই প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলতে চান যে, আদম যখন কাদা পানির অবস্থায় ছিল, মুহম্মদ ও সাধুদের শেষ ব্যক্তি উভয়েই তখন অস্তিত্বশীল ছিল। এখানে 'উভয়' শব্দ দিয়ে নূরে মুহম্মদীর দুইটি দিক বুঝানো হয়েছে। নূরে মুহম্মদী নবী হিসাবে জন্ম

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 98.
২. Ibid, p. 98.
৩. Ibid p. 98

তৃতীয় অধ্যায়

ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্ব—মনোবিজ্ঞান ও সূফীবাদ[১]

সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি, সত্তা, ঘটনা বা ধারণা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় ও স্পষ্ট ধারণা লাভের নাম জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের উৎপত্তি, পরিসর, বৈশিষ্ট্য, এক কথায়, তার প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন দার্শনিক তাঁর অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা যে তত্ত্ব পরিবেশন করেন, তাই তাঁর জ্ঞান-তত্ত্ব। ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানের উৎপত্তি, তাৎপর্য, লক্ষ্য, পরিসর ইত্যাদি দ্বারা যে তত্ত্ব পরিবেশন করেন তাই তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব। ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানের উৎপত্তি, তাৎপর্য, লক্ষ্য, পরিসর ইত্যাদি এবং জীবন ও মন সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ, জীবন ও জগতের মূল পরম সত্তার সামগ্রিক ঐক্যরূপ দর্শন, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল দার্শনিকরা একমত নন। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনে যেমন অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ ও স্বজ্ঞা-বাদ দেখা যায়, মুসলিম দর্শনের মধ্যেও কাদেরীয়া সম্প্রদায়, মুতাজিলা সম্প্রদায় ও এরিস্টটলের অনুসারী মুসলিম দার্শনিক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবাদ আশারীয়দের বুদ্ধি ও প্রত্যাদেশবাদ, সুফীদের স্বজ্ঞাবাদ দেখা যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে বুদ্ধি একমাত্র জ্ঞানের উৎস। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের আল-নাজ্জাম, পর-বর্তীকালে দার্শনিক আল-ফারাবী, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ এবং আরও পরবর্তীকালের দার্শনিক স্যার সৈয়দ আহম্মদ, আবদুল হাকিম প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদ বুদ্ধিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন। পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের লেখকগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার সাহায্যে দার্শনিক স্পিনোজার মতো

১. Dr. A. E. Affifi. The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Lahore edition. First Published in 1938, Cambridge, p. 102.

জ্ঞান লাভের কথা বলেন। সূফী সম্প্রদায় সর্বোচ্চ অবস্থায় বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে বলেন যে, স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই জ্ঞানলাভের এক-মাত্র উৎস। আল-গাজ্জালী ও জালালউদ্দীন রুমী স্বজ্ঞাবাদের প্রধান সমর্থক। ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের যুক্তি এবং সূফীদের স্বজ্ঞা[1] বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মিশ্রণজাত মতবাদ। তাঁর স্বজ্ঞাবাদে কিভাবে স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানের বিষয়বস্তু কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আর স্বজ্ঞালাভকারী ব্যক্তি বা আত্মার বিশ্লেষণ তাঁর মনোবিজ্ঞার আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতবাদ বুদ্ধিভিত্তিক একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ। সমগ্র বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান ও জীবন্ত সত্তা।[2] সমগ্র বিশ্বের কোন কোন অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে নিজে-দের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে বেশী সচেতন। অন্যান্য অংশের মধ্যে একই বুদ্ধিবৃত্তি আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে তারা একই রকম সচেতন নয়।

বিশ্বের মাঝে অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষের সর্বোচ্চ পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি আছে, পূর্ণ মানবের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা বা অব্যক্ত সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান। মানবাত্মা মূলতঃ একটি প্রজ্ঞাবান বা সত্তা বুদ্ধিমান সত্তা। তাঁর মতে মানুষের বুদ্ধিমান আত্মা অথবা হৃদয় ও বুদ্ধি এক জিনিস নয়। দার্শনিকরা বুদ্ধিমান আত্মাকে বুদ্ধির সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান আত্মা ও বুদ্ধিকে এক ও অভিন্ন মনে করেন নি। সেইজন্য তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অন্যান্য দার্শনিক-দের জ্ঞানতত্ত্ব হতে ভিন্ন ধরনের।

ইবনুল আরাবীর মতে জ্ঞান দুই প্রকার (১) প্রত্যক্ষ পরিচয় জ্ঞান বা আল-'মারিফত' ও (২) বুদ্ধিজাত জ্ঞান বা 'আল-ইলম'।[3] অবশ্য এক সময় তিনি বলেছেন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান 'ইলম', মারিফত নয়। তিনি একজন অতীন্দ্রিয়বাদী বা সূফীকে 'আলীম' ও অন্য সময় 'আরিফ' বলেছেন এবং 'ইলম' শব্দ

১. Futuhat I. p. 375. Futuhat II.p.403. Futuhat III. p. 341,1.3, p. 343, 1.1 etc. etc.

২. Fususul Hikam. p. 295.

৩. Futuhat. II. p. 393. অন্য এক স্থানে তিনি জ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, (ক) ইলম-আল-'আকল' বা বুদ্ধিজাত জ্ঞান, (খ) ইলম-আল-আহওয়াল বা অবস্থা সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং (গ) ইলম-আল-আসরার' বা ঐশী রহস্য সম্পর্কীয় জ্ঞান। তবে তিনি দুই প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ বুদ্ধিজাত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান (দিব্যজ্ঞান)—এদের পার্থক্যের উপরেই জোর দিয়েছেন।

দিয়ে যুক্তিমূলক প্রজ্ঞা, মনন বা বোধশক্তিকে বুঝেছেন এবং 'মারিফত' শব্দ দিয়ে ঐশী সত্তার জ্ঞান বুঝেছেন। যা হোক, তাঁর মতে আত্মা মারিফতের উৎস এবং বুদ্ধি 'ইলম'-এর উৎস। এখন এই দুই প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ কি? কিভাবে এই জ্ঞান লাভ করা যায়? বুদ্ধিমান আত্মা ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ধর্মীয় সত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর ধর্মীয় সত্তার জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে তাঁর জ্ঞান তত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয়বাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

(ক) বিভিন্ন প্রকার বাক্য বা অবধারণ

ইবনুল আরাবীর মতে জ্ঞানের উৎস বিভিন্ন প্রকার হওয়ার ফলে জ্ঞান বিভিন্ন প্রকার হয়। তিনি এর উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের বাক্যসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা হয়। পাঁচটি বাহ্যিক ও একটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়। এই আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের নাম বুদ্ধিবৃত্তি, এটা মনের একটি বৃত্তি বা শক্তি। ইন্দ্রিয়সমূহ সংখ্যার দিক দিয়ে বহু এবং ভিন্ন ধরনের। কিন্তু সেগুলোর কার্য মূলতঃ এক।[১] তাঁর মতে অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা এই নিয়ম মেনে চলেন না, তাঁদের সকল প্রকার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোন একটি বা কয়েকটি দিয়ে লাভ হয়। আবার অনেক সূফী ব্যক্তি আছেন, যাঁরা কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্য ছাড়াই জ্ঞান লাভ করেন।[২] 'অতীন্দ্রিয় সত্তার দর্শন, শক্তি, দূরে অবস্থিত কোন সত্তা সম্পর্কে মনোভাব জ্ঞাপন ও সংবেশন হতে উদ্ভূত জ্ঞান, বিশেষ করে অতীন্দ্রিয় বা স্বজ্ঞামূলক বা অতীন্দ্রিয় উৎস হতে উদ্ভূত জ্ঞান, তাঁর মতে অস্বাভাবিক জ্ঞান।[৩] তিনি বাক্য বা অবধারণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) আবশ্যিক অবধারণ এবং (২) সম্ভাব্য বা অনাবশ্যক অবধারণ।[৪]

(১) আবশ্যিক অবধারণের মধ্যে তিন প্রকার অবধারণ আছে।[৫] সকল প্রত্যক্ষগত অবধারণ এর মধ্যে বোধশক্তির কোন প্রভাব নাই। (খ) কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজাত

১. futuhat 1. p. 278
২. futuhat 1. p. 279.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 103.
৪. Ibid, p. 104.
৫. Ibid, p. 104.

অবধারণ, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ অবধারণ আছে, যেমন বিশুদ্ধ গণিত ও আকারগত যুক্তিবিদ্যার বাক্যসমূহ এবং (গ) সকল স্বজ্ঞামূলক অবধারণ[১] বা সকল আধ্যাত্মিক অবধারণ (২) সম্ভাব্য বা অনাবশ্যিক অবধারণ।[২] বোধ শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে যে সকল অবধারণের সৃষ্টি হয় তা সম্ভাব্য বা অনাবশ্যিক অবধারণ। তাঁর মতে কেবলমাত্র আবশ্যিক অবধারণই আবশ্যিক রূপে সত্য। সম্ভাব্য অবধারণও সত্য হতে পারে কিন্তু এর সত্যতা আবশ্যিক নয়। প্রত্যক্ষগত অবধারণকে মিথ্যা বলা যায় কারণ সেগুলোর অনুরূপ কোন বাস্তব সত্তা বাহ্যিক জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও সেগুলো অবশ্যই সত্য এই অর্থে যে সেগুলোর অনুরূপ একটা কিছু আছে। তিনি ভ্রমের বিষয়বস্তুকে এই প্রকার অবধারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। যে সকল অবধারণ দ্বারা কোন বাস্তব বস্তু অথবা অন্য কোন কিছুকে বোঝায় না, তা অবশ্যই মিথ্যা। এখন যদি মনে করা যায় যেভাবে বোধ শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ঠিক সেইভাবে একটি মানসিক শক্তি বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে, তবে এমন একটা ধারণা করা যায় যে, যেমন ভাবে বোধশক্তি ইন্দ্রিয়গুলোর কিছু ত্রুটি নির্দেশ করে, ঠিক তেমনিভাবে সেই মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির কিছু ত্রুটি বলে দিতে পারে। অন্য কথায়, একটা মানসিক শক্তি বুদ্ধিজাত কিছু স্বতঃসিদ্ধ বাক্য ও আবশ্যিক সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে। তিনি তেমন কোন মানসিক শক্তির কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি, কিন্তু তিনি একটা বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এইভাবে যে, এই ধরনের বুদ্ধিজাত আবশ্যিক জ্ঞান স্বগতরূপে সত্য এবং এটা কোন বোধশক্তির ভুল অবধারণের ফলেই হোক কিংবা রহস্যজনক বিচারকের বিচারের ফলেই হোক, সেই সব আবশ্যিক জ্ঞান অনেক সময় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

(খ) অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। ইবনুল আরাবীর তিন প্রকার আবশ্যিক জ্ঞানের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শনের মূল বিষয়বস্তু।[৩] অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতো তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের

১. ইবনুল আরাবীর মতো বাগদাদীও অন্যদের মতো যা উপরে বর্ণিত তিন প্রকার অবধারণ অন্তর্ভুক্ত করে। ডঃ এ.ই. আফিফি পূর্বোক্ত পৃঃ ১০৪ পাদটীকা।

২. Dr. A.F. Affifi, Ibid, p. 104

৩. Ibid, p. 105.

সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সত্যের অব্যবহিত প্রত্যক্ষ-জাত জ্ঞান যুক্তিমূলক জ্ঞান নয়। অন্য কথায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বস্তুর অন্ত-র্নিহিত সত্তার সম্যক জ্ঞান, উপলব্ধিজাত জ্ঞান আর এ জ্ঞান বুদ্ধির সম্ভাব্য ও কল্পনাজাত জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ও উন্নত মানের। তাঁর বহু পূর্বে মনসুর হাল্লাজ বলেছেন যে, মানব বুদ্ধি বস্তুর সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়। চিন্তা কেবলমাত্র সম্পর্কগুলোর ধারণা মাত্র, সার্বিক আত্মা হতে প্রকৃত জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আসে মানবাত্মায় অথবা হাল্লাজের ভাষায় 'পরম আলোক' হতে 'আলোকে'। ইবনুল আরাবীও আলোকের সাহায্যে পরম আলোকের জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন।[১] হাল্লাজ জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন :

বাস্তব বা সত্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং অবভাস বা বাহ্যিক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান। সত্যকে জানার অর্থ নিজে প্রত্যক্ষভাবে সন্দর্শন করা, বোধজাত জ্ঞান সীমিত ও অপ্রত্যক্ষ। তিনি হাল্লাজের মতো একই ধারণায় বিশ্বাসী।[২] তাঁর জ্ঞানের সাথে স্পিনোজার তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে। স্পিনোজার তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের নাম 'বৈজ্ঞানিক স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান'। এই জ্ঞান এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে মানবীয় চেতনা ঐক্য চেতনার সাথে মিশে যায়, আলোর সাহায্যে আলোর জ্ঞান লাভ হয়।[৩] সূফীরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে 'স্বাদ' স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত জ্ঞান, অন্তরের প্রত্যক্ষণ বলেন ; এটা চিন্তার কোন ক্রিয়া নয় বা চিন্তা ক্রিয়ার কোন ফল নয়। অনেক সময় সূফীরা এই প্রকার জ্ঞানকে ইলমুলাহুয়ী' বা ঐশী জ্ঞান, 'ইলম-আল আসরার'[৪] বা 'গুপ্ত জ্ঞান,' 'ঐশী রহস্য সম্পর্কীয়' জ্ঞান, 'দিব্য জ্ঞান' বলেন। ঐশী রহস্য সম্পর্কীয় জ্ঞানের মধ্যে তিনি প্রবৃত্তিমূলক বা সাহজিক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন যে,

---

১. Futuhat III, p. 365, Quoted by Margaret Smith. 'Readings from the Mystics of Islam, Luzae & Co. 1950, (ii) Rom Landau The Philosophy of Ibn Arabi, London, 1959 pp. 78-81.

২. (i) Mignel Asin Islam and the Divine Comedy trans. by Harold sun-derlano London John Merray 1926, pp. 157-159. Quoted from Futuhat. (ii) Rom Landan, Ibid, p. 79.

৩. Rom Landan, Ibid p. 81.

৪. Futuhat 1, p. 38.

নির্জীব সত্তাও আল্লাহ্কে জানে এবং তাঁর প্রশংসা করে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে 'ইলম-আল-গায়ের' বা গুপ্ত জ্ঞান, অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান বলা হয়। তাঁর মতে অদৃশ্য সত্তা দুই প্রকার: 'পরম অদৃশ্য ঐশী সত্তাসার', যা অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত এবং 'আপেক্ষিক অদৃশ্য সত্তা' যা কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে জানা সম্ভব এবং অন্যদের জন্য অসম্ভব হয়। এই জ্ঞানকে নবী, রসুল ও আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ, আউলিয়া-দরবেশদের জ্ঞানও বলা হয়।[১] সুতরাং এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য মনে রেখে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে স্বজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি অথবা সত্যের অব্যবহিত প্রত্যক্ষণ বা অন্য যা কিছু বলা যায় না কেন তাতে কিছু এসে-যায় না।[২] এখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়।

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

ইবনুল আরাবীর মতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়: (১) আধ্যাত্মিক জ্ঞান সহজাত জ্ঞান আর বুদ্ধিজাত জ্ঞান অর্জিত জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ঐশী আলোক বা দীপ্তি যা সৃষ্টির সকল বস্তু ও জীবের আত্মাকে আলোকিত করে। পূর্ণ মানবের মধ্যে বিশেষ তন্ময় অবস্থায় প্রকাশ পায়। এ জ্ঞান কোন যোগ বা চেষ্টার ফল নয়,[৩] এ জ্ঞান মানবের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে গুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে।

(২) আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিচার-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং বুদ্ধি দিয়ে এটাকে বিচার করা যায় না। যদি কোন স্বজ্ঞা ও বুদ্ধির মধ্যে বিরোধ বাধে তবে স্বজ্ঞাকে গ্রহণ, বুদ্ধিকে ত্যাগ করতে হয়। নবী ও সাধু পুরুষদের ঐশী সত্তা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি যদি বুদ্ধির বিরোধী বলে মনে হয় তবে বুদ্ধিকে গ্রহণ না করে নবী ও সাধু ব্যক্তিদের কথা স্বীকার করা উচিত, কেননা ঐ সকল সত্তার সত্য সম্পর্কে বুদ্ধি কোন বিচার করতে পারেন না। তিনি বলেন যে, বুদ্ধি কখনও কখনও সত্যের সন্ধান দেয় তবে তার সম্ভাবনা খুব কম ও আকস্মিক। অতএব ঐশী জ্ঞানের সাথে বুদ্ধির তুলনা হয় না এবং ঐশী বিষয়ে বুদ্ধির হস্তক্ষেপ করাও উচিত নয়।[৪]

১. Fusus, p. 369.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 106.
৩. Fusus, p. 371.
৪. Futuhat II, p. 394, l. 3.

(৩) অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হৃদয় বা অন্তরে 'আলো' আকারে প্রকাশিত হয়।[১] সৎকাজ, সৎ চিন্তা, মোনাজাত বা প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে হৃদয় বা অন্তরের কালিমা দূর করে আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে নিজ অন্তরকে দর্পণের মত স্বচ্ছ করলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান 'আলো' আকারে হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং সাধকের সমস্ত অন্তর আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

(৪) আধ্যাত্মিক জ্ঞান অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। ইবনুল আরাবী নির্ধারণবাদ বা নিয়তিতে বিশ্বাস করেন।[২] তাঁর মতে কেউ চেষ্টা করলেই এ জ্ঞান লাভ করবে এমন কথা নয়। এই অর্থে এটাকে 'দেয় জ্ঞান' বলা হয়। এ জ্ঞান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ জ্ঞানের শক্তি নির্ধারিত পরিমাণে দিয়েছেন, মানুষ যখন চেষ্টা দ্বারা অন্তরের পর্দা উন্মোচন করে, তখন সে তার শক্তি অনুযায়ী অন্তরের অন্তর-চক্ষু দ্বারা সকল কিছু বাস্তব ও সম্ভাব্য সত্তাকে জানতে পারে, মানুষ ঐশী জ্ঞানে জ্ঞানী হয়।[৩]

(৫) স্বজ্ঞা নিশ্চিত জ্ঞান দান করে, এমন নিশ্চিত জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া যায় না। বুদ্ধি সম্ভাব্য বা অনিশ্চিত জ্ঞান দান করে। বুদ্ধি সত্য বা অন্তরের ছায়া বা অবভাসিক জগতের জ্ঞান দান করে, কিন্তু স্বজ্ঞা আদি সত্য বা মূল সত্যের জ্ঞান দান করে।[৪] প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে ঐশী সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিজাত জ্ঞান এবং আল্লাহ্ যাদের দয়া প্রদর্শন করেন তাদের জ্ঞানও অনুরূপ হয়।

(৬) স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র জ্ঞান এক ও অভিন্ন,[৫] এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে এক অর্থে কোন পার্থক্য নাই। যদিও স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান বিভিন্ন প্রকারের মানুষের কাছে আসে, কিন্তু মূলত সেগুলো একই ধরনের।

স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান যে আল্লাহ্‌রই জ্ঞান, তা একটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয়।

১. Mignel Asin: Islam and the Divine Commedy tr. by. Harold Sunderland, London, John Murray, pp. 157-159.
২. Fusus. pp. 122-123.
৩. Fusus, pp. 245-246.
৪. Fusus pp. 336-337.
৫. Fusus, p. 378.

কোন সূফী সাধনার কোন মোকামে উন্নীত না হলে ঐশী জ্ঞান তার প্রকাশিত হয় না। যখন সে সাধনার বিশেষ বিশেষ মোকামে উপস্থিত হয়, তখন সে সকল মোকাম বা স্থানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সে আল্লাহ্‌র সাথে তার একাত্মতা অনুভব করতে পারে।[১] অন্য কথায়, সাধক কমপক্ষে 'ফানা' বা আত্মবিলুপ্ত, আত্মলয়, আত্মবিস্মরণ অবস্থায় উন্নীত হলে আল্লাহ্ তার 'কান' হন যা দিয়ে সে শুনে, 'চোখ' হন যা দিয়ে সে দেখে।[২] মোটকথা সাধকের নিজের শক্তি বলতে আর কিছু থাকে না, যা থাকে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র দান। সাধক আল্লাহ্‌র মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভ করে। 'আল্লাহ্‌র জ্ঞান' 'সাধকের জ্ঞানের' উৎস একই উৎস। জ্ঞাতার মূল সত্তা এক ধরনের সত্তা হতে উৎপত্তি হওয়ার ফলে জ্ঞানলাভের বৃত্তিগুলোও মূলতঃ এক এবং তার জ্ঞানও এক।[৩] ইশরাকীদের অনুসরণ করে ইবনুল আরাবী বলেন যে বিশুদ্ধ আলোই শুদ্ধ সত্তা এবং এটাই জ্ঞানের মূল উৎস। মানুষের ইন্দ্রিয়-গুলো এবং অন্যান্য বৃত্তিগুলো কেবলমাত্র মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে ঐশী আলোক নিজেকে প্রকাশ করে। আলোকই সকল সচেতন সত্তার মধ্যে একমাত্র উপলব্ধি করার শক্তি বা নীতি কেবলমাত্র এটাই নিজ আলোকে উদ্ভাসিত নীতি, এর নিজের আলোকের সাহায্যেই তাকে দেখা যায়, অন্যান্য সব কিছুই এরই আলোকে আলোকিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে আসে।[৪]

(৭) আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবর্ণনীয়। এটা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের মতই সত্য।[৫] এটাকে অব্যবহিত অভিজ্ঞতা[৬] ব্যতীত অন্য কোন ভাবে জানা যায় না। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে মরমী অভিজ্ঞতা লাভ করেনি সে মরমী অভিজ্ঞতা বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারে না। একমাত্র অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমী সাধকই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। এটাকে একমাত্র উপমা ও রূপকের সাহায্যে বর্ণনা

১. Fusus. p. 378.
২. Futuhat II, p. 393. 1·23. Fusus. p. 198.
৩. Fusus. p. 185.
৪. Futuhat III, p. 365, 1·23. Futuhat I, p. 57, 1.8. Mignel Asin, Ibid. pp. 157-159
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid. p. 108.
৬. Dr. Ishrat Hasan Enver, the Metaphysics of Iqbal, Lahore. 1955. p. 16.

করা যায়। কিন্তু রূপক ও উপমা অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক ও বিপথগামী। এ রূপক ও উপমার অর্থ কেবলমাত্র সূফী ও মরমী সাধকরাই ভাল জানেন। প্লটিনাস বলেছেন যে দেখার শক্তি আছে কেবলমাত্র তারই, যে, এটাকে দেখতে পারে।

(৮) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে সূফী ও মরমী সাধক বাস্তব সত্তার প্রকৃতির পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।[১] অনুন্নত বুদ্ধি সব সময় আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ অতিবর্তিতার কথা বলে। একজন মরমী সাধক আল্লাহ্কে অতি-বর্তী ও অন্তর্ব্যাপী—উভয় রূপে জানেন। তিনি ঐশী আলোকের মাধ্যমে দেখতে পান যে, এক পরম সত্তা বহু সত্তাকে কিভাবে ঘিরে আছে। তিনি জানতে পারেন যে, পরম এক সত্তা ও বাস্তব জগতের বহু সত্তার মধ্যে প্রভেদ কোথায়। ইবনুল আরাবীর মতে সকল ঐশী ধর্ম ঐ একই কথা প্রচার করে এবং সকল কল্পনা বা 'ওহাম' এই কল্পনাকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি 'কল্পনা'-কে জ্ঞানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে কল্পনার প্রকৃতি আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপী সত্তাকে স্বীকার করা, অপরপক্ষে বুদ্ধির প্রকৃতি হলো আল্লাহ্‌র অতিবর্তী সত্তার কথা বলা। একমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমেই এই দুইটির মিলন সম্ভব। সূফীর কল্পনা বুদ্ধির বিপরীত নয় বরং সম্পূরক। তিনি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির 'ওহাম' বা খেয়াল বা কল্পনা না থাকে তবে তার জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান নয়, সত্য জ্ঞান লাভ তার কখনো হতে পারে না। অবশ্য কল্পনার সাহায্যে একজন সূফী আল্লাহ্র অন্তর্ব্যাপী সত্তা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা দার্শনিকদের অভিমত হতে ভিন্ন ধরনের। সূফী হৃদয়ে পরম একক সত্তা প্রকাশিত হওয়ার ফলে সূফী সমগ্র পরম এক সত্তাকে সন্দর্শন করেন। আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপী দিকের জ্ঞান কোন অনুমান বা যৌক্তিক অবরোহণের ফল নয়। একটির প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান, অন্যটির বর্ণনা-মূলক জ্ঞান। একটির পূর্ণ জ্ঞান অপরটির আংশিক জ্ঞান, একটির স্বয়ং সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান অপরটির সত্তার প্রতিভাসের ব্যাখ্যামূলক বা অনুমানমূলক জ্ঞান।[২] পরম সত্তার জ্ঞান লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য।[৩]

১. Dr. A. E. Affifi : Ibid p. 109
২. Dr. A. E Affifi : Ibid. p. 109.
৩. Dr. Tarachand : Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad : 1954. p. 74.

ইবনুল আরাবীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান

ইবনুল আরাবীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রকৃতি একজন বিশ্বাসী (সুফী) ও একজন দার্শনিকের জ্ঞান লাভের প্রকৃতির সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন যে একজন বিশ্বাসী ও একজন দার্শনিক[১] জ্ঞান সংগ্রহের পথে যে যাত্রা শুরু করেন তা মিরাজ বা হযরত মুহম্মদ-এর স্বর্গারোহণের মতো।[২] একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির যাত্রাপথে তার অন্তরে ঐশী সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, কিন্তু একজন দার্শনিকের মনে জাগে সংশয়। যাত্রা শেষে একজন দার্শনিক ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একজন বিশ্বাসী হতে চেষ্টা করেন। ঐশী জগতের প্রত্যেকটি স্তর জ্ঞান পথের এক একটি স্তর বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক স্তরে বিশ্বাসী ও দার্শনিক উভয়েই কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করেন, একজন দার্শনিক স্তরের বাহ্যিক দিকের বা অবাভাসিক দিকের জ্ঞান লাভ করেন, একজন বিশ্বাসী স্তরের আভ্যন্তরীণ দিক বা স্তরের আত্মা হতে জ্ঞান পান, তিনি আসল জ্ঞান পান। প্রত্যেকটি স্তরের শক্তি বা আত্মা এক-একজন নবী বা প্রজ্ঞা যাঁরা বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জ্ঞান দান করে থাকেন। ইবনুল আরাবী তাঁর 'ফুসুস-উল-হিকামের' মধ্যে প্রত্যেক স্তরের নবীর মুখ হতে তাঁর মরমী দর্শনের এক একটি মতবাদ প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হযরত মুসা তাঁর দর্শনের সার্বিক ধর্ম ও সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ প্রকাশ করেছেন, হযরত ইউসুফ তাঁর অসীম ও সৌন্দর্য তত্ত্ব 'আকার' এর পূর্ণতা সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আদম তার কার্যকারণ তত্ত্ব, বাস্তব ও অবভাসিক কারণের অর্থ, প্রতিনিধিত্বের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অর্থ প্রকাশ করেছেন। হযরত ঈসা বা যীশুখ্রীস্ট জীবন ও আধ্যাত্মিকতার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত ইদরিছ দ্রব্যের অপরিবর্তনশীলতা ও বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন।[৩] এই-ভাবে একের পর এক নবী বিশ্বাসী ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবন ও জগতের সকল

১. Ibid p. 74
২. Futuhat II pp. 359-74.
৩. (I) S. A. Q. Husaini, Ibn-al-Arabi, Madras, 1931, pp. 51-75, quoted from Fususul Hikam.
(II) R. A. Nicholson : Studies in Islamic Mysticism, pp. 122-123.

রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। দার্শনিক কিন্তু বাহ্যিক ও যৌক্তিক জ্ঞান লাভের দ্বারা সত্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া ভিন্ন হওয়ার ফলাফল ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দার্শনিক কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে বাহ্যিক জগতের কার্যকারণ সম্বলিত ঘটনা প্রবাহের নিরীক্ষণ এবং তা হতে যৌক্তিক নিয়মে অনুমান ছাড়া অধিক কিছু জানতে পারেন না। অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী সন্দর্শন করেন কেমন ভাবে একই কারণ সমগ্র বিশ্বের পিছনে কাজ করে যায়। দার্শনিক আল্লাহ্‌র অতিবর্তী রূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। কিন্তু বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র সত্তাসারের স্বাদ গ্রহণ করেন। তাঁর অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয় রূপের অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলে তিনি জানতে পারেন। যাত্রাপথের এক অবস্থায় বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। আর সে অবস্থা এমন একটি অবস্থা যেখানে কর্তা ও কর্ম, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সকল ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। জগতের একমাত্র সত্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়। দার্শনিক কিন্তু এই সব অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হন না।

আধ্যাত্মিক জগতে একের পর এক সাতটি স্তর অতিক্রম করার পর দার্শনিকদের যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বাসী কিন্তু তখনও চলতে থাকেন। সপ্তম স্তর অতিক্রমের পর বিশ্বাসী সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখান হতে স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক সত্তা ও অন্যান্য বিষয়-বস্তু ও সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। দার্শনিক তাঁর মতে, এসব বস্তু ও সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। এইভাবে তিনি পরম সত্তা ঐশী জগতের বিভিন্ন সত্তার জ্ঞান বলতে কি বুঝেছেন এবং কিভাবে এই জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। দার্শনিক, বুদ্ধি দিয়ে যা জানেন, বিশ্বাসী বা মরমী সাধক তাঁর মরমী অভিজ্ঞতার মাঝে তা সন্দর্শন করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ইবনুল আরাবীর মতো ব্যক্তির (যার মধ্যে বিশ্বাসী ও দার্শনিক—উভয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়) জ্ঞানকে আমরা কোন্ প্রকারের জ্ঞান বলতে পারি? এটা কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান না বুদ্ধিজাত জ্ঞান? তাঁর জ্ঞানকে অন্যান্য সূফী-দের জ্ঞানের মতো যদিও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বলা হয়, তবুও তাঁর দর্শনের অন্যান্য মতবাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বুদ্ধি—উভয়ের

মিশ্রণ ঘটেছে, সূফীদের অভিজ্ঞতাকে যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান বার্গস'র স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান বা স্পিনোজার বৈজ্ঞানিক স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের অনুরূপ। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব যেন মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবী, আল-কিন্দি, ইবনে রুশদ প্রমুখ চিন্তাবিদের জ্ঞানতত্ত্বের উপর সূফী জ্ঞানতত্ত্বের আবরণ দ্বারা আবৃত জ্ঞানতত্ত্ব। পরবর্তীকালে ডঃ ইকবাল তাঁর 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামক গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অতীন্দ্রিয় ও পরাতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান :
ইবনুল আরাবীর আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ

ইবনুল আরাবীর মতে মানব হৃদয়ে ঐশী জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। হৃদয় মানবের প্রজ্ঞামূলক একটি দিক, একখানি দর্পণ। অন্য কথায়, মানবাত্মার একটি অংশ বিশেষ। তাই বলে হৃদয় ও বুদ্ধি এক নয়। তাঁর মতে বুদ্ধি অবভা-সিক এবং দেহের উপর নির্ভরশীল, আর হৃদয় সার্বিক বুদ্ধির নীতির অবি-চ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। যদিও হৃদয় দেহের মধ্যে অবস্থান করে ও তার মাধ্যমে সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তবুও এটা নিজে একটি দেহ নয়, কিংবা দেহের উপর এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। এমনকি জড় বস্তুর কোন সীমাবদ্ধ-তাই এটাকে স্পর্শ করে না। এই রহস্যময় শক্তির একটি রহস্যময় বৃত্তি আছে যার নাম তাঁর মতে, অন্তর্চক্ষু। এই অন্তর্চক্ষু দিয়ে আধ্যাত্মিক বস্তুকে বাহ্যিক বস্তুর মতই প্রত্যক্ষণ করা যায়। তবে অন্তর্চক্ষুর প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু স্বয়ং পরম সত্তা। প্লটিনাসের মতো তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র অন্তর্চক্ষু চিন্তার উর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুকে দেখতে পায়। মন্দ চিন্তা, অসৎকার্য ও জড় জগতের অন্যান্য মন্দ জিনিসের প্রভাবের দ্বারা অন্তর্চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে যায় এবং তখন আর কিছুই সেখানে প্রতিফলিত হয় না। অন্তর্চক্ষু যেন একখানি দর্পণ, দর্পণ পরিষ্কার থাকলে সেখানে প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে পারে, অস্বচ্ছ অবস্থায় তা সম্ভব হয় না। সৎচিন্তা,, সৎকার্য ইত্যাদি দ্বারা যখন অন্তর্চক্ষু নির্মল, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, তখন সে পরম সত্তাকে দেখতে পায় এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের প্রজ্ঞাবান নীতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে অর্থাৎ একত্বের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়।[১]

১. Futuhat II, p. 767.

বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি ও সার্বিক প্রজ্ঞার মধ্যে সম্পর্ক[১]

(ক) ইবনুল আরাবীর মতে একজন সুফী বা মরমী বা অতীন্দ্রিয়বাদীর হৃদয় ও দার্শনিকদের বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি এক ও অভিন্ন। হৃদয় প্রজ্ঞাবান আত্মা, বুদ্ধি নয়। একটি বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি একটি প্রত্যংশ সার্বিক প্রজ্ঞার একটি বিশেষীকরণ অবস্থা। এটা মূলতঃ সার্বিক আত্মা হ'তে অভিন্ন কিন্তু ধারণাগত-ভাবে ভিন্ন। এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য সার্বিক ও তার বিশেষের মধ্যে পার্থক্যের অনুরূপ। প্লটিনাসের মতো তিনি বলেন যে 'বিশেষ আত্মা' 'বিশ্ব আত্মার' অথবা সার্বিক প্রজ্ঞার বিভিন্ন প্রত্যংশ, সেগুলো বিশ্ব আত্মার অংশ বিশেষ নয়। প্লটিনাস বলেছেন যে, আত্মার অংশের কথা বলা যায় না কারণ আত্মার কোন আয়তন বা পরিধি নাই। আত্মগত সম্পর্ক দ্বারা এক পরম সত্তাসার যেমন বহুত্বে পরিণত হয় তেমনিভাবে এক আত্মা বহু আত্মায় পরিণত হয়। তা ছাড়া আত্মা অবিভক্ত, এটাকে বিভক্ত করা যায় না।[২] 'বিশেষ আত্মা' 'সার্বিক আত্মার' অংশ নয়। একই ধরনের উপমা দিয়ে তিনি বলেন যে 'বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি সার্বিক আত্মার শক্তি।[৩] সার্বিক আত্মা 'সমগ্র' সম্পর্কে সচেতন এ কথা থেকে মনে হয় যে সার্বিক আত্মা তার অংশ সম্পর্কেও সচেতন। কিন্তু বিভিন্ন 'অংশ' 'সমগ্র' সম্পর্কে সচেতন নয়। সেগুলো স্বতন্ত্র স্বত্তারূপে সচেতন।

এখন দেখা যাক, ইবনুল আরাবী আল্লাহ্র সাথে আধ্যাত্মিক মিলন, আল্লাহ্র দিকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ, পর্দা নিরসন ইত্যাদি বলতে কি বুঝেছেন। 'মিলন' শব্দ তাঁর দর্শনে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু 'বিশেষ আত্মা' ও 'সার্বিক আত্মা' মিলিত অবস্থায় আছে, সেহেতু মরমী অভিজ্ঞতার মধ্যে কি করে বাস্তব মিলন সম্ভব হবে? তাঁর আল্লাহ্ বিশ্বের 'প্রজ্ঞাবান নীতি'। তথাকথিত মিলন বলতে বিশেষ আত্মার পক্ষে শুধুমাত্র 'জাগরণ' বুঝায় এবং এই জাগরণের ফলে বিশেষ আত্মা বুঝতে পারে সে পূর্ব হতেই সার্বিক আত্মার সাথে মিলিত অবস্থায় আছে। এ মিলন কোন দুইটি স্বতন্ত্র আত্মার একত্রিত হয়ে মিলন হওয়া

১. Dr. A.E. Affifi. Ibid, p. 116.
২. Futuhat. II. p. 88, 1.9.
৩. Palacios, Risalah on the Meaning of the Spirit and the Soul in the Acts of the 14th Oriental Congress III, Algiers 1905, p. 154.

নয়। তাঁর মতে কোন মরমী সাধকের সর্বশেষ উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়ে বা এক হয়ে যাওয়া নয়, পৃথিবীতে যে বিশেষ আত্মা ও সার্বিক আত্মা মিলিত অবস্থায় আছে তা উপলব্ধি করা। এই মতবাদ হতে কম পক্ষে দুইটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।[১] (ক) আসলে পরিবর্তন বলে কোন কিছু নাই। মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র হয় না বা আল্লাহ্ মানুষ হয় না। আক্ষরিক অর্থে হাল্লাজের 'আনাল হক' বা 'আমিই সত্য' এই বাণী তাঁর মতে সঠিক বাণী।[২]

(খ) সূফীদের তথাকথিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান 'বিশেষ আত্মা' হতে প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎসারিত হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকাশিত কিংবা অনু-প্রাণিত জ্ঞান নয়। 'জ্ঞান প্রেরণ' 'জ্ঞান যোগাযোগ স্থাপন' রূপক অর্থে বুঝতে হয়।[৩] কিন্তু তাঁর 'প্রতীকি ভাষা' মারাত্মক ভ্রমের উৎস। আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে দ্বৈত সত্তার অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত দেয়, জ্ঞানের প্রকাশকও যার কাছে প্রকাশিত হয় সে ব্যক্তি অথবা প্রেরক ও গ্রাহক ইত্যাদি বোঝায়। তিনি প্রথম বুদ্ধির এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এতে এমন সব গুণ আরোপ করেছেন যে, এটা বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি হতে ভিন্ন বলে চিন্তা করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হয় যে 'সার্বিক আত্মা' 'বিশেষ আত্মা' হতে ভিন্ন যেমন একটি 'সমগ্র' তার 'অংশ হ'তে ভিন্ন'। তিনি 'রূহ' বা আত্মাকে ফেরেস্তা জিবরাইলের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। জিবরাইল ও 'সার্বিক আত্মা' অভিন্ন, জিবরাইল আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক এবং তিনি বহু ঐশী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মতে 'রূহ' তার এক বিশেষ অবস্থায় প্রত্যাদেশ বা ওহী প্রকাশক, প্রত্যাদেশ বিশেষ আত্মার নিজের কাছে নিজের ঘোষণা মাত্র।[৪] তাঁর মতবাদ এক ধরনের 'ব্যক্তিগত ভাববাদ'।[৫] একজন মরমী সাধক সকল অবস্থায় জ্ঞান পেয়ে থাকেন, কিন্তু সেই জ্ঞান দেওয়ার কর্তা স্বয়ং আত্মা বা বিভিন্ন আকারের মধ্যে প্রত্যেক অবস্থার

১. A. E. Affifi. Ibid. p. 117.
২. R. A. Nicholson The Idea of Personality in Sufism, Lahore, 1964, p. 38.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 117.
৪. Futuhat II, p 750.
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 118.

প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে প্রকাশ করে। জিবরাইল নবী মুহম্মদকে কোরআনের বাণী দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এ কথা তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন।[১] তাঁর মতে নবী মুহম্মদের কাছে যে 'দিহ্য়া' আল কালবী আকারে[২] দেখা দিয়েছিল সে 'আকার' জিবরাইলের নয়, তা নবীর সক্রিয় কল্পনার সৃষ্টি একটি 'আকার' মাত্র। অন্য কথায় এটা নবী মুহম্মদের আত্মা যা তার কাছে ঐ আত্মায় আবির্ভূত হয়েছিল। প্লটিনাসের মতো তিনি বিশেষ আত্মা ও বিশ্ব আত্মার মূল ঐক্যে বিশ্বাস করেন। আর এর ফলেই 'জিবরাইল' ওহী ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন উক্তি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতবাদের মতে যৌক্তিক সংগতি রক্ষা হলেও লৌকিক ধর্মের মূল বিশ্বাস অস্বীকৃত হয়েছে।

তাঁর মতে সূফীর অন্তর বা হৃদয় বা প্রজ্ঞাবান আত্মা একটি চক্ষু যার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন[৩] এবং এটা এমন একটা বস্তু যার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে তাঁর প্রকাশিত অবস্থার বিভিন্ন আকারের মধ্যে নিজেকে জানেন, এটা আল্লাহ্‌র পরম অসীমতার জ্ঞান নয়, কেননা সে অবস্থার জ্ঞান সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত আছেন। যদি বলা হয় যে, মানব (পূর্ণ মানব) আল্লাহ্‌র ঐশী চেতনার আলোকচ্ছটা অথবা আল্লাহ্ মানব চেতনার সত্তা ও সত্তার আলোকচ্ছটা, তবে তা এই মতবাদ অনুসারে একই জিনিসের দুইটি দিকের কথা বলা হয়।

মরমী সাধকের হৃদয়ের পরিবর্তনশীলতা

হৃদয়ের পরিবর্তন সম্পর্কে ইবনুল আরাবী বলেন যে পরম সত্তা যে নিজকে অসংখ্য আকার ও বিভিন্ন অস্তিত্বের অসংখ্য স্তরের মধ্যে অবিরত প্রকাশ করে, প্রকৃত জ্ঞানীর আত্মায় অবিরত প্রতিফলিত হয় এবং তিনি তাকে সর্বত্র এবং সর্বস্তরে ও বস্তুতে দেখতে পান[৪] এ কথার অর্থ এই যে আত্মজ্ঞ বা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ের মাঝে আল্লাহ্ আছে বা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহ্‌কে অন্তর্ভুক্ত করে। এমন হৃদয় মাঝে আল্লাহ্ দুইভাবে থাকতে পারে (১) যে

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 118.
২. Futuhat II, p. 429, I. II.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p 119
৪. Ibid, p 119.

সকল ঐশী পূর্ণতা ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ভিন্ন ভাবে এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়, হৃদয় সে সকল ঐশী পূর্ণতা প্রতিফলিত করে।[১]

(২) হৃদয়ের মাঝে মানুষের সেই ঐশী বা আধ্যাত্মিক দিক আছে, যার জন্য মানুষকে আল্লাহ্ বলা যেতে পারে। এই দুইটির অর্থের প্রথমটির উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২] তাঁর মতে যে নিজকে জানে সে তার প্রভুকে জানে এই হাদীসের অর্থই হৃদয় ঐশী পূর্ণতা প্রতিফলিত করে এবং যে এই পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে সে আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। তাছাড়া তিনি আর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে, 'স্বর্গ কিংবা মর্ত কেউ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করতে বা পেতে পারে না, আমাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে আমার মুমিন বান্দার হৃদয়।' অন্য কথায়, বিশ্বাসী বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ্ আছে, আর এর অর্থ তিনি করেছেন এই ভাবে যে হৃদয় আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পূর্ণতাকে প্রতিফলিত করে।[৩]

আত্মার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ

আত্মার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় সকল সূফীই দুই-চার কথা বলেছেন। কিন্তু হাল্লাজই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর 'লাহুত' ও 'নাসুত' মতবাদ ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন যে আত্মা মানুষের দ্বৈত স্বরূপ বা প্রকৃতি গঠনকারী অংশ।[৪] এল মেসিনিও বলেছেন যে, অনেকদিন পরে হাল্লাজীয় আত্মা দার্শনিকদের প্রজ্ঞাবান আত্মার সাথে এক ও অভিন্ন বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এই ধারণা পরবর্তীকালে ইবনুল আরাবী ও আল-গাজ্জালীর মধ্যে দেখা যায়।

এরিস্টটলের অনুসারী মুসলিম দার্শনিকগণকে অনুসরণ করে ইবনুল আরাবী মানবের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র বস্তু দেখেছেন আর সেগুলো পিণ্ড বা দেহ, আত্মা এবং 'রূহ' বা শক্তি। এরিস্টটলের মতো তিনি তিনটি আত্মা বা এই আত্মার তিনটি দিকের কথা বলেছেন।[৫] সেগুলোর নাম উদ্ভিদ আত্মা, জীবাত্মা ও মানব আত্মা বা প্রজ্ঞাবান আত্মা। এরিস্টটলের মতো তিনি প্রজ্ঞাবান

১. Ibid. p. 119.
২. Futuhat I, p. 281.
৩. Fusus, p 220.
৪. Tawasin, pp. 136-137, Quoted by A.E. Affifi, Ibid, p. 120.
৫. Fusus, p. 322. Futuhat III, pp 313-314.

আত্মাকে বুদ্ধির সাথে অভিন্ন বলে চিন্তা করেন নি, দেহ একটি জড় আকার যার দেশের মাঝে বিস্তৃতি ও কালের মাঝে স্থিতি আছে। দেহের পরিবর্তন ও ধ্বংস আছে, এটা সার্বিক দেহের একটি বিশেষ রূপ বা প্রত্যংশ অথবা-স্পিনোজার ভাষায় তা বিস্তৃতি গুণের একটি বিশেষ রূপ বা প্রত্যংশ। তাঁর মতে আত্মা একটি প্রাণ-প্রবাহ, মানব দেহে অবস্থিত 'জীব আত্মা' 'সার্বিক আত্মার' একটি বিশেষ রূপ বা প্রত্যংশ।[১] এটাকে সার্বিক প্রজ্ঞার একটি রূপ বা প্রত্যংশ বলা হয়। স্পিনোজার ভাষায় এটা চিন্তাগুণের একটা বিশেষ রূপ বা প্রত্যংশ। ইবনুল আরাবীর মতবাদের মধ্যে আত্মা শব্দ দ্বারা কেবল-মাত্র প্রজ্ঞাবান আত্মাকে বোঝায়।[২] তিনি যখন অন্য কোন কিছুকে বুঝতে চেয়েছেন তখন আত্মার শব্দের পূর্বে কোন না কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন উদ্ভিদ আত্মা, জীবাত্মা ও প্রজ্ঞাবান আত্মা। তাঁর মতে উদ্ভিদ আত্মার প্রধান কাজ খাদ্য সংগ্রহ করা এবং তা দেহের সাথে মিশিয়ে দেওয়া। এই আত্মার চারটি প্রধান শক্তিও আছে, আর সেগুলো (ক) আকর্ষণ (খ) সংরক্ষণ (গ) হজম বা পরিপাককরণ এবং (ঘ) বিতাড়ন বা দূরীকরণ।[৩] মনে হয় তিনি এখানে 'পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের লেখকগণের' চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যদিও সেখানে তাঁরা আরও তিনটি শক্তি উদ্ভিদ আত্মায় আরোপ করেছেন। যেমন পুষ্টি সাধন, বৃদ্ধি বা বিকাশ ও গঠন। ইবনে সিনার মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অনুরূপ ভাবধারা দেওয়া যায়। সেখানে 'গঠন'-এর পরিবর্তে পুনরুৎ-পাদন বা পুনর্গঠন শব্দ দেখা যায়। ইবনুল আরাবী জীব আত্মাকে দৈহিক হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত একটি সূক্ষ্ম বাষ্প বলে মনে করেন। এর স্বরূপ জড়ের মতো এবং এটা জীব ও মানব উভয়ের মধ্যেই বর্তমান আছে। তাঁর মতে প্রজ্ঞাবান আত্মা বা মানব আত্মা একটি বিশুদ্ধ শক্তি। এটা মূলতঃ জ্ঞান-সম্পন্ন, জ্ঞানী আত্মাশুদ্ধ ও নির্মল। জ্ঞানী আত্মা জন্মের সময় সকল প্রকার পাপ হতে মুক্ত থাকে। মানব শরীরে অবস্থানকালে প্রজ্ঞাবান আত্মা ও জীবত্মার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার ফলেই পাপের উৎপত্তি হয় এবং প্রজ্ঞাবান আত্মায়

১. Mode.
২. Dr. A.E. Affifi, Ibid, p. 120.
৩. Futuhat III, pp. 313-315.

একটি পাপ আবরণ পড়ে।[১] তাঁর মতে প্রজ্ঞাবান আত্মা অবিনাশী, অবিনশ্বর, অবিধ্বংশী, চিরস্থায়ী, নিত্য, অক্ষয়, অমর ও অনন্ত। এখানে তিনি যদিও আত্মাকে অক্ষয়, চিরস্থায়ী ও অমর বলে বর্ণনা করেছেন, আত্মার অভৌতিক ও অক্ষয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছেন তবুও তিনি ইবনে রুশদের মতো আত্মার নৈর্ব্যক্তিক অমরতায়[২] বিশ্বাস করেন না। মৃত্যুর পরে আত্মা দেহ হতে মুক্তি লাভ করে এবং অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়।[৩]

আত্মার তিনটি দিকের মধ্যে সম্পর্ক

একটি প্রশ্ন জাগে যে, ইবনুল আরাবীর মতে উপরে বর্ণিত আত্মা, উদ্ভিদ আত্মা, জীবাত্মা ও মানব আত্মা মূলতঃ কি একটি আত্মা না সেগুলো স্বতন্ত্র তিনটি আত্মা? ইবনুল আরাবীর আলোচনার মধ্যে উদ্ভিদ আত্মা ও জীব আত্মাকে দেহের সাথে তুলনা করেছেন এবং এ দুটি দেহের মধ্যেই অবস্থিত। অন্য কথায়, এ দুটি দেহ হতে ভিন্ন কিছু নয়। এ দুটি আত্মার সমস্ত ক্রিয়া দেহের মাধ্যমে সম্পন্ন করে, তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য দেহের উপর নির্ভর করে। অতএব উদ্ভিদ আত্মা ও জীবাত্মা দেহ সে বিষয়ে তাঁর মতামত অস্পষ্ট। এখন দেহ ও আত্মা বা দেহ ও প্রজ্ঞাবান আত্মার মধ্যে সম্পর্ক কি? এ বিষয়ে তাঁর মতামত এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্ট নয়। মনে হয় তিনি ইবনে সিনার মতো দেহ ও আত্মার দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করেন, যদিও তাঁর সমগ্র দর্শন একটি অদ্বৈতবাদী দর্শন নামে পরিচিত। তাঁর মতে প্রজ্ঞাবান আত্মাকে বুদ্ধি বলা যায় না, যদিও বুদ্ধি প্রজ্ঞাবান আত্মার একটি অধীনস্থ শক্তি। এটা দেহ নয় যদিও এটা দেহের অধীনেই অবস্থান করে এবং এর সমস্ত ক্রিয়া দেহের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে, এটা দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল এবং দেহ হতে বিযুক্ত হওয়ার পরেও অস্তিত্বশীল থাকবে। তিনি আত্মার জড়বাদী ব্যাখ্যা অস্বীকার করেন এবং দার্শনিকদের সাথে একমত হয়ে বলেন যে, আত্মা অবিমিশ্র মৌলিক দ্রব্য এবং এই মৌলিক দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ যৌগিক বা মিশ্রদ্রব্য হতে ভিন্ন প্রকৃতির। যৌগিক দ্রব্যের ক্ষয় ও পরিবর্তন

১. Futuhat III, pp. 347-348.
২. Impersonal Immortality.
৩. Fusus, p. 327.

আছে। তিনি বলেন[১] 'আমি রূহ বা শক্তি অর্থে যকৃতে অবস্থিত খাদ্য সন্ধানী প্রবৃত্তি অথবা রাগ, ক্রোধ ও রিপু উত্তেজনাকারী মানবীয় শক্তি অথবা হৃদয়ে অবস্থিত প্রাণদানকারী শক্তি বা জীবাত্মা যা সব সময় সংবেদন, গতি, মানসিক প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয় তাকে বুঝি না।... ..

আমি শক্তি অর্থে পূর্ণ, অবিমিশ্র ও নির্মল দ্রব্য বুঝি যা জীবন্ত ও সক্রিয়, এটা এমন একটা দ্রব্য যার একমাত্র ক্রিয়া স্মরণ করা, ধারণার সংরক্ষণ করা, সুসংগঠিত করা, পৃথক করা, প্রতিফলিত করা বা অনুধ্যান করা, এই দ্রব্য সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং অমূর্ত ধারণা গ্রহণ করতে পারে। এই দ্রব্য তিনটি আত্মার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এটা অন্যান্য শক্তি-সমূহের উপর কর্তৃত্ব করে তাদের পরিচালনা করে এবং সে সব শক্তিসমূহ এর আদেশ মেনে চলে।' 'এই দ্রব্য কোন দেহ কিংবা গুণ নয়, 'আল-আমর' বা আধ্যাত্মিক জগতের একটি দ্রব্য। ঐশী আদেশ কোন দেহ নয়, গুণ নয়, এটা 'প্রথম বুদ্ধি' সার্বিক আত্মা ও অন্যান্য শুদ্ধ আত্মাসমূহের মতো।[২] এটা 'আমি' শব্দ দিয়ে যা বোঝায় সেই বাস্তব সত্তা।[৩]

তাঁর আলোচনা হতে যে জিনিসটা মনে করা যায় তা এই যে, স্পিনোজার মতো তিনি মানবের দুইটি দিক আছে বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে মানবের মধ্যে জৈব বৃত্তি বা মানসিক দিক ও ঐশী দিক আছে। আর এই হিসাবে তাঁকে স্পিনোজার মতো দ্বৈতবাদী বা দুই ধরনের গুণাবলীতে বিশ্বাসী বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁর মতবাদের মধ্যে এই দুইটি দিক একত্রিত হয়ে ঐক্য গঠন করে। হাল্লাজ ও স্পিনোজা দুইটি ভিন্ন ধরনের গুণাবলীতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁর মতে সেটা একই বাস্তব দুইটি দিক মাত্র।[৪]

মোট কথা, তাঁর সমগ্র তত্ত্ববিদ্যাকে অদ্বৈতবাদী দর্শন বলা হয়।[৫] তাঁর মতে দেহ ও মন দুইটি আত্মগত সত্তা। দুইটির ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করা হলে তাঁর অদ্বৈতবাদী মতবাদের মূল্য অনেকটা হ্রাস পায়। বিভেদ নির্ণয়কারী

১. Palacios Risalah, p.153. (Published by)
২. Palacios (Published by), Risalah, Ibid, p. 154.
৩. Ibid, p. 152.
৪. Dr. A. E. Affifi, Ibid. p. 123.
৫. Ibid p. 123.

গুণগুলোর আলোচনা করে আমরা তাঁকে দ্বৈতবাদী বলতে পারি। কিন্তু তাঁর মতানুসারে দেহ ও মন একই সত্তার বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ দুইটি দিক মাত্র। মৃত্যুর অর্থ ধ্বংস নয়, এটা কেবলমাত্র জড় আকারের অংশসমূহের পরিবর্তন।[১] মোটের উপর কথা এই যে, তাঁর মতে দেহ ও আত্মা দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা বা দ্রব্য নয়, কিংবা এই দুইটি অভিন্ন নয়, আত্মা দেহ নয়। দেহের ক্ষয় ও পরিবর্তন আছে, আত্মার তা নাই। দেহের আকার পরিবর্তন সাপেক্ষ, মানবদেহ ও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। মানব আত্মা মানবের আভ্যন্তরীণ বা গুপ্তসত্তা হওয়ায় তার কোন আকার নাই। এটা মানুষের সেই অংশ যার জন্য মানবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলা হয়। এই আত্মা নৈতিক কর্তব্য পালনকারী আত্মা।[২]

ইবনুল আরাবীর মনোবিজ্ঞান

ইবনুল আরাবীর মতে জ্ঞাতা একটি বোধ-শক্তিসম্পন্ন সত্তা। সেই সত্তার নাম নূর বা আলোক।[৩] আলোকের সাহায্যে সব কিছু দেখা যায়[৪] এবং এর অভাবে অন্য কোন কিছুকে দেখতে বা বুঝতে পারে না। মানুষের মধ্যে এটা প্রজ্ঞাবান আত্মার রূপ নেয়। তিনি এই আলোকনীতির ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই আলোক নীতি বিশ্ব-মন হিসাবে কেবলমাত্র সকল স্তরেই কার্য সম্পন্ন করে না বরং মানুষের দেহে অবস্থিত সকল শক্তি ও বৃত্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যান্য সকল সত্তার চেয়ে এই ঐক্য নীতি মানুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে। মানুষ শুনে, দেখে, স্বাদ গ্রহণ করে এবং অদৃশ্য জগৎ হতে জ্ঞানলাভ করে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে। যে-সকল ইন্দ্রিয় ও শক্তি বা বৃত্তি মানুষকে জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করে, তার ঐক্যে তিনি বিশ্বাসী। সকল ইন্দ্রিয় শক্তি বা বৃত্তি মিলে এক শক্তি আর সেই শক্তির নাম আলোক।[৫] যখন শব্দ শোনা যায়, তখন আলোক শ্রবণের আকার, যখন চক্ষুদ্বারা দেখা যায় তখন দৃশ্যের আকার-প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়শক্তি বা বৃত্তিগুলো কাজ করে যায়। শুধু তাই

১. Ibid p. 123.
২. Ibid. p. 124.
৩. Rom London, The Philosophy of Ibn Arabi, London, 1959. pp. 36-37.
৪. Futuhat III, p 365.
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid p. 125.

নয়। যে সকল বস্তু বা সত্তাকে দেখা যায়, সেগুলোর সাথে সেই আলোক নীতি বা আল্লাহুর একটি সম্পর্ক আছে। অন্য কথায়, আল্লাহুর একমাত্র সত্তা সেসব কিছু বুঝে এবং যা কিছু জানা বা বোঝা যায় তা 'আল্লাহুর'।[১] মানুষ যদি কোন সত্তা বা বস্তুকে জানতে না পারে, তবে তা কখনো বাস্তব সত্তা হতে পারে না। আর এরই উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাজাত—আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান গড়ে তুলেছেন। যে 'আলোকনীতি' বর্ণ, শব্দ দেখে বুঝে বা জানে, ধারণা গঠন করে এবং কল্পনাকে আকার দান করে সেই আলোক নীতিই প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিতভাবে পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করে। অনেক সময় তিনি বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞাবান আত্মা বা 'রূহ' মনন বা যুক্তিমূলক চিন্তা এবং প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই পার্থক্য বাহ্যিক, মূলতঃ এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এদের দুইটির মধ্যে যদি আদৌ কোন পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা এই যে এই দুইটির মধ্য দিয়ে আলোক ভিন্নভাবে প্রকাশিত, আলোক প্রকাশের বিভিন্নতাই এই দুইটিকে ভিন্ন দুইটি শক্তি বা বৃত্তিরূপে চিন্তা করতে সাহায্য করে। মরমী বা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে মূল আলোকনীতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু যুক্তিমূলক চিন্তার মধ্যে এই নীতি কিছুটা সীমিতভাবে প্রকাশ পায় এবং এর চেয়েও সীমিত আকারে প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যক্ষণের মধ্যে। তিনি অনেক সময় 'আলোক' এর স্থলে 'হৃদয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আলোক সমগ্র কিছু প্রত্যক্ষকারী দ্রব্য হিসাবে কল্পনা করার ফলে এ কথা বলা যায় যে, তিনি ইশরাকী আলোক মতবাদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন।[২]

ইবনুল আরাবীর প্রত্যক্ষণ ও জ্ঞানের ধারণা অর্জন

ইবনুল আরাবীর প্রত্যক্ষণ সম্পর্কীয় মতবাদ নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো সমগ্র প্রত্যক্ষকারী আলোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষণের বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করে।[৩] প্রত্যক্ষণের বস্তুগুলোর মূল সত্তা আলোক। বাহ্য জগৎ হতে ইন্দ্রিয় আলোর মাধ্যমে সংগৃহীত সংবেদন বা ধারণাগুলো অতি সত্বর হৃদয়ের কাছে

১. Ibid, p. 125, Rom Landon, Ibid, p. 37.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 125. foot note.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 125.

চলে যায়। হৃদয় তখন সেগুলো বুদ্ধির কাছে পাঠিয়ে দেয়। বুদ্ধির মান মন্দির মস্তিষ্ক তাই ধারণাগুলো যখন বুদ্ধির কাছে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে আসে তখন বুদ্ধি সেগুলো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের ধারণা বলে চিহ্নিত করে এবং সেগুলো কল্পনার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কল্পনা তখন সেগুলোকে বোধশক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়। বোধশক্তির কাজ সেই প্রত্যক্ষণ বা ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করা ও পৃথক করা। বিশ্লেষণ ও পৃথকীকরণের সময় বোধশক্তি তখন মনের কাছে ভাল লাগা কিছু প্রত্যক্ষণ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। স্মৃতি হৃদয়ের শক্তিগুলোর মধ্যে অতি নিকটতম শক্তি এবং আত্মা এই স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অনেক কাজ সমাধা করে থাকে। তবে বিভিন্ন বৃত্তি বা শক্তির বিভিন্ন সহায়ক ক্রিয়াশীল হলেও হৃদয় কিন্তু সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকে অর্থাৎ হৃদয়ের কার্যকারিতা কোন সময় বন্ধ থাকে না কেননা হৃদয়ই সব কিছুর মধ্যে অবস্থিত আদি নীতি। হৃদয়ের শক্তিতেই ইন্দ্রিয়গুলো ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলো প্রজ্ঞা-বৃত্তি বা যৌক্তিক ক্রিয়া লাভ করে কেননা হৃদয়ই মূল প্রজ্ঞা। অন্য কথায়, হৃদয়ের নিজস্ব আলো আছে, ইন্দ্রিয়গুলো অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলোর নিজস্ব আলো নাই। অনেক সময় যদি প্রত্যক্ষণের বস্তু সম্মুখে উপস্থিত না থাকে তবুও আত্মা তা প্রত্যক্ষণ করতে পারে। প্রত্যক্ষণের বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অনুপস্থিত থাকলেও হৃদয় তা প্রত্যক্ষণ করতে পারে। একটি বস্তু বা অনেক বস্তুকে আত্মা চিরন্তন ধারণার প্রতিরূপ হিসাবে নিজের হৃদয়ের মধ্যেই দেখতে পায়। তা হলে দেখা যায় যে তাঁর মতে ধারণাগুলো আত্মার সহজাত ধারণা।[১] বাহ্যিক জগতের বিশেষ দৃষ্টান্ত হতে এসব ধারণা সার্বিকীকরণ করা হয় নি। এ ধারণা মনে পূর্ব হতেই আছে। তাঁর মতে আত্মা দেহের সাথে আছে ও দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে আত্মা তার জ্ঞানকে বিস্মৃত হয়। আত্মা যে জ্ঞান অর্জন করে তা পূর্বের জ্ঞান। অন্য কথায়, আত্মা যে জ্ঞানলাভ করে তা নতুন কোন জ্ঞান নয়, পুরাতন জ্ঞানই নতুনভাবে স্মরণ করা হয়, আর এই জ্ঞানের নাম আত্মার অর্জিত জ্ঞান।[২] তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন যে অনেক আত্মা আছে, যেমন প্রেরিত পুরুষ, নবী, রসূল ও সাধু ব্যক্তিদের আত্মা যাদের জ্ঞানের বিস্মৃতি কোন সময় ঘটে না। দেহের

১. Ibid, p. 126.
২. Ibid, p. 127.

সংস্পর্শে আসার ফলে অজ্ঞাত আত্মার জ্ঞানের যেমন বিস্মৃতি ঘটে নবী ও সাধু পুরুষদের তেমন ঘটে না।[১]

এখানে তাঁর ধারণাগত জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদকে ইবনে রুশদের মতবাদের সাথে তুলনা করা যায়। ইবনে রুশদ সাধারণ ধারণার সার্বিকতায় বিশ্বাস করেন।[২] সার্বিক ধারণা প্রত্যেকটি মানবের আত্মার সহজাত ধারণা রূপে বর্তমান। তিনি সেই একই বিশ্বাস পোষণ করেন।[৩] এই দুইজন দার্শনিকের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও দুইজনের মতবাদ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এক নয়। ইবনুল আরাবীর মতে সার্বিক ধারণা মনে সহজাত ধারণারূপে বিদ্যমান। ইবনে রুশদ মনে করেন যে, 'মানবীয় বুদ্ধি' 'সক্রিয় বুদ্ধির' সংস্পর্শে আসে কেবলমাত্র তখনই যখন 'মানবীয় বুদ্ধি' 'সক্রিয় বুদ্ধির' মধ্যে অবস্থিত সার্বিক ধারণাগুলো প্রত্যক্ষণ করে। ইবনে রুশদের মতবাদ অনুযায়ী বলা যায় যে, মানবীয় বুদ্ধির জানার শক্তি সুপ্তরূপে বিদ্যমান। মানবীয় বুদ্ধি আসলে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু সক্রিয় বুদ্ধির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে উঠে। ইবনুল আরাবীর মতে ধারণাগত জ্ঞান মনে অবস্থিত ধারণাগুলোর মধ্যে একের সাথে অন্যের সম্পর্ক স্থাপন করা বোঝায়। এমনকি সম্পর্কও একটা সার্বিক ধারণা। তাঁর মতে, একদিকে জ্ঞাতা মন অথবা তার ধারণা ও বাহ্যিক জগতের বস্তুর মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলা, অন্যদিকে ধারণাগুলোর নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার নামই ধারণাগত জ্ঞান বা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান। আত্মা ও বাহিরের জগতের বস্তুর মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক আছে, সার্বিক বিচারে তা অপরিবর্তনীয়।[৪] আবার দুইটির ধারণার মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাও অপরিবর্তনীয়। যদি বলা যায় যে, দুইটি ধারণার মধ্যে অবস্থিত বিশেষ কোন সম্পর্ক পরিবর্তন হয় তখন তিনি বলেন যে, ধারণা দুইটি পুনরায় নতুন একটি সম্পর্ক সম্পর্কিত হয়েছে, পূর্ব সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয় নি। অতএব তাঁর মতে ধারণাগত জ্ঞানের মধ্যে চারটি জিনিস লক্ষণীয়।[৫]

১. Ibid p. 127
২. Universality of general Ideas.
৩. Dr. A. E. Affife, Ibid, p. 127.
৪. Futuhat. I, p. 53.
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 128.

(১) অমূর্ত সম্পর্ক, (২) যে বস্তুর সাথে এ স্থাপন করা হয়, (৩) যে গুণ সম্পর্কিত হয় এবং (৪) বিশেষ সম্পর্ক। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়। "একটি শিশু বা দেহ দাঁড়িয়ে আছে" এই বাক্যের শিশুও দাঁড়িয়ে আছে, এই দুইটি ধারণার মধ্যে আমাদের মন সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় এবং এই ধারণা দুইটি অপরিবর্তনীয় ধারণা। সঠিকতার দিক হতে এই ধারণা দুইটির মধ্যের সম্পর্কও অপরিবর্তনীয়। এমনকি শিশুটি এখন দাঁড়িয়ে আছে এই বিশেষ সম্পর্কও অপরিবর্তনীয়[১] কেননা এই সম্পর্ক অন্য কোন শিশু সম্পর্কে বলা যায় না যার সাথে এইভাবে শিশুটি সম্পর্কিত নয়। যদি বলা যায় যে, এই বিশেষ সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, কেননা পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুটি চলমান বা গতিশীল হতে পারে। তখন তিনি বলেন যে, শিশুটি পরমুহূর্তে একটি নতুন সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছে, আগের দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয় নি। তাঁর মতে স্পষ্ট ধারণাগত চিন্তার সবচেয়ে বড় বাধা বোধশক্তি কেননা বোধশক্তি সবসময়ে প্রতিরূপ সহকারে উপস্থিত হয় যা সার্বিক ধারণার সার্বিকভাবে সীমিত করে।

তিনি বলেন যে, মানব মন যখন বাহ্যিক জগতের মূর্ত বিষয় বা বস্তুকে জানতে চায় বা পেতে চায় তখন কামনা বা আকাঙ্ক্ষা[২] শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় এবং আত্মা যখন ধারণাগত বিষয়বস্তু, যেমন পূর্ণতা, সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, আল্লাহ্‌র সন্দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চায় তখন তা ইচ্ছা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা হয়। ইচ্ছা সকল জাগতিক কামনা ও বাসনা, ভাল-মন্দ, আনন্দ-সুখ ইত্যাদি ধারণা হতে মুক্ত। মোটকথা, ইচ্ছার সাথে মূর্ত বাস্তব জগতের সম্বন্ধ নাই এবং কামনার সাথে অমূর্ত ধারণার কোন সম্বন্ধ নাই।

কল্পনার অর্থ কি ?

ইবনুল আরাবী কল্পনা শব্দকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। দুইটি সত্তা বা বস্তুর মধ্যে অবস্থিত কোন কিছুকে তিনি কল্পনা বলে উল্লেখ করেছেন। 'আল-আমা'[৩] বা শূন্যত্ব বা অন্ধত্বকে তিনি কল্পনা বা খেয়াল বলেছেন কারণ এটা

১. Futuhat- II, p. 39. l. 18.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid p. 128.
৩. Futuhat II, p. 410.

পরম সত্তাসার এবং অবভাসিক জগতের মধ্যে অবস্থিত। মানসিক প্রতিরূপগুলো কল্পনা, কারণ সেগুলো আধ্যাত্মিক ও জড়জগতের মধ্যে অবস্থিত একটা মধ্যবর্তী অবস্থা। স্বপ্নও কল্পনা কারণ তা বাস্তব ও অবভাসিক জীবনের মধ্যে অবস্থিত একটা মধ্যবর্তী অবস্থা। দর্পণ প্রতিরূপও কল্পনা কেননা সেগুলো তাদেরই প্রজাতি, সেগুলো মূর্ত বা বাস্তব কিংবা অমূর্ত ধারণা নয়। এমন কি তাঁর মতে জিবরাইল ফেরেস্তাও কল্পনা, এই ফেরেস্তা শেষ নবী মুহম্মদের কাছে 'দিহয়া'-এর আকার ধরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১] ব্যাপক অর্থে কল্পনা শব্দ ব্যবহার করার জন্য এ কথা বলা মুশকিল হয় যে তিনি কল্পনা বলতে সঠিকভাবে কি বুঝেছেন। তাঁর কল্পনা শব্দের আর একটি অর্থ রয়েছে। তিনি বলেন যে যদি কোন প্রতীক কোন গুপ্ত অর্থ অথবা সত্তাকে প্রকাশ করে তবে তাকে কল্পনা বলা হয়। এই অর্থে সমগ্র বিশ্ব একটি কল্পনা মাত্র। স্বপ্নও একটি খেয়াল, কেননা বিশ্ব ও স্বপ্ন গুপ্তসত্তার প্রতীক।[২]

তাঁর কল্পনা তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত[৩] (১) মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা ও (২) পরাতাত্ত্বিক কল্পনা। স্বপ্ন, অধ্যাস, স্বাভাবিক প্রতিরূপগুলো মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা। মনের বাইরে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নাই। যে কল্পনার অস্তিত্ব বাইরের জগতে আছে অথবা প্রতীক হিসাবে কোন গুপ্ততত্ত্ব বা গুপ্ত সত্তাকে বোঝায় তা পরাতাত্ত্বিক কল্পনা। পরাতাত্ত্বিক কল্পনাকে কল্পনা বলা ঠিক নয়। কোন বাস্তব বস্তুর প্রতীক বা প্রক্রিয়াকে কল্পনা বলা যুক্তিসংগত নয়। তাঁর মতবাদের মধ্যে কল্পনা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কল্পনার মাধ্যমেই পরম সত্তা নিজেকে মানব আত্মায় প্রকাশ করে, আর এই দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করে তিনি প্রতীক বা প্রতিরূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ধারণা হতে অধিক বাস্তব বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে মানব হৃদয়ের অন্তর্চক্ষু আধ্যাত্মিক জগতের চাবিকাঠি। অনেক সময় স্বপ্নের আকারে প্রত্যাদেশ ও প্রেরণা মানবাত্মায় প্রতিফলিত হয়। এই ধরনের স্বপ্ন বাস্তব স্বপ্ন, অন্যান্য স্বপ্ন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তিনি বলেন যে, মানবের কল্পনা শক্তি জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত উভয় অবস্থায় সক্রিয় থাকে। জাগ্রত অবস্থায় এটা সম্পূর্ণ সক্রিয় রূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও অন্যান্য

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 130.
২. Ibid, p. 130.
৩. Ibid, p. 130.

ধারণা এতে বাধা সৃষ্টি করে। ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলোর ও অন্যান্য বৃত্তি-গুলো নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন কল্পনাশক্তি পূর্ণ ক্রিয়াশীল হয়। অনেক সময় কল্পনা শক্তি বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রতিরূপ নিয়ে কাজ করে এবং হৃদয়ের চক্ষু তখন দর্পণের ন্যায় সেইগুলোকে প্রতিফলিত করে। আর এইভাবে সাধারণ স্বপ্ন সংঘটিত হয়। সাধারণ স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার বা কামনার বস্তুর সাথে জড়িত ধারণা ও প্রতিরূপের সংযোগ মাত্র। অনেক সময় সার্বিক আত্মা বা' লাওহে মাহফুজ' তার সকল আদর্শ ধারণা সহকারে মানবাত্মায় প্রকাশিত হয়। আসলে মানব আত্মা, কিন্তু সার্বিক আত্মার একটি প্রত্যংশ বর্ণরূপ আর এই সার্বিক আত্মাই নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করে। কল্পনা সে ধারণাগুলো গ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায় সেগুলোর উপর ক্রিয়া করে। এই সময় মানব হৃদয় সার্বিক আত্মার সংস্পর্শে থাকে এবং সমগ্র সত্তা ও বস্তুর প্রতীকগুলো আত্মায় প্রতিফলিত করে। এই সময় মানব হৃদয়কে একটি নদী বা প্রবাহ বলা যায় এবং প্রতীকগুলোকে সেখানে গতিশীল অবস্থায় দেখা যায়। এই ধরনের স্বপ্ন যদিও বাস্তব তবুও এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়; কেননা এগুলো প্রতীকের আকারে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শেষ নবী যখন স্বপ্নে দুধ খেয়ে-ছিলেন তখন দুধ ছিল 'জ্ঞানের' প্রতীক।[১] আর এক ধরনের স্বপ্ন আছে। এই স্বপ্নের মধ্যে কোন প্রতীক দেখা যায় না।

এখানে কল্পনা কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে কল্পনা শক্তি প্রতীকের কোন অর্থ করার পূর্বেই মানব হৃদয় প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক প্রতিরূপগুলো প্রতিফলিত করে। তাঁর মতে এই ধরনের স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এর মধ্যে পরম সত্তা নিজকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে এবং তার সত্যতা বাইরের জগতের বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েক ধরনের প্রত্যাদেশ এবং প্রেরণা এই শ্রেণীর স্বপ্নের অন্তর্গত। এই ধরনের প্রত্যাদেশ ও অনু-প্রেরণার উৎস কোন 'বিশেষ আত্মা'। তিনি 'সার্বিক আত্মাকে' যদি প্রকাশক বলেন তবে তার অর্থ এই যে, এটা কোন একটি বিশেষ আত্মার প্রকাশিত সার্বিক আত্মা।[২]

ইবনুল আরাবী একজন সূফীর আত্মিক সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস করেন।[৩]

১. Ibid, p. 132.
২. Ibid, p. 132.
৩. Ibid, p. 133.

সাধকের ইচ্ছাশক্তি[১] যখন কার্যকরী রূপ নেয় তখন তাকে সৃজনশীল শক্তি, সৃষ্টিশক্তি বলা যায়।[২] সাবিক এ জগতে থেকেও অন্ত জগতের খবর বলতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সাথে তাঁর কথোপকথন হয় এবং ঐশী জগতের সন্ধান তিনি পান।[৩] তাঁর ইচ্ছাশক্তি ঐশী শক্তি, এটাকে অনেক সময় সত্য স্বপ্ন বলা হয়। ইচ্ছাশক্তি দুই ধরনের (১) সহজাত এবং (২) অর্জিত। এই ইচ্ছাশক্তিদ্বারা আল্লাহ্ আদিতে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, ইচ্ছাশক্তি নিজে কোন স্রষ্টা নয়। ইচ্ছাশক্তি তাঁর মতে, সংবেশনিক শক্তি বা আত্ম উপদেশের মত। তিনি ইচ্ছাশক্তি বা হিম্মতকে সাবিক রূপ দান করে তাকে 'সুপ্ত সম্ভাব্য শক্তি' রূপে চিন্তা করেছেন এবং এই বিশ্বের সকল গতি ও পরিবর্তনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মতে সত্তার পাঁচটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তর এক একটি দর্পণের ন্যায় এবং নিম্নতম স্তরে বা দর্পণে তার নিকটতম উর্ধ্ব স্তরের সত্তাগুলো প্রতিফলিত হয়, আবার যেটি প্রতিফলিত হয় সেটি নিজেও একটি দর্পণ। এতে এর নিকটতম উর্ধ্বস্তরের সকল কিছু প্রতিফলিত হয় এবং সর্বোচ্চ-স্তরে পরম সত্তার প্রতিফলন দেখা যায়।[৪] এই সব স্তরগুলো একটি অপরটি হতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। বাস্তব জগতে যে সকল বস্তু বা সত্তা প্রতিফলিত হয়, উপরের স্তরে সে সবের 'মূলের মূল ধারণা'কে দেখা যায়। আল্লাহ্ কিংবা মানব কেউ নতুন কিছু সৃষ্টি করে না, যা নতুন হয় তা কেবল প্রকাশ মাত্র। মানুষের হৃদয় বা পূর্ণ মানবের হৃদয় ঐশী সত্তার বিভিন্ন কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। এটা একটা দর্পণের মতো, এর মধ্যে পরম সত্তার বিভিন্ন রূপ ও আকার প্রতিফলিত হয়। যে কোন একটি বস্তুর আকারের উপর সাধক তার হৃদয়ের শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি মনোনিবেশ করে সে বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং এই বিশেষ ক্ষমতার বলে সেই বস্তুটিকে অস্তিত্বের যে কোন একটি অথবা একাধিক স্তরে সংরক্ষিত করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক ঐ বস্তুর উপর ইচ্ছাশক্তির মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারেন, ততক্ষণ ঐ বস্তুর অস্তিত্বের পাঁচটি স্তরের যে কোন

১. Fusus pp. 233-234.
২. Dr. A E. Affifi, Ibid, p. 133.
৩. R.A. Nicholson : Life of Muhiyyud Din Ibnul Arabi, (article) in Journal of Royal Asiatic Society, 1906, p. 816.
৪. (i) Qashani, Commentary on the Fusus, p. 166, (ii) Gibb, History of the Ottoman Poetry, pp. 54—58.

একটিতে অবশ্যই বিশেষ আকারে দেখতে পান। আর তাঁর মতে এই ক্রিয়ার নাম সাধকের সৃষ্টিক্রিয়া বা সৃজনশীল ক্রিয়া।[১] সাধকের হৃদয় কল্পনাশক্তির মাধ্যমে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিফলিত বস্তুকে উপস্থিত করে এবং যে ক্ষেত্রে যে বস্তুর উপর ইচ্ছাশক্তি মনোনিবেশ করা হয় তা বাহ্যিক বস্তুরূপে আবির্ভূত হয় এবং একমাত্র সাধকেরই গোচরীভূত হয়। সাধক তখন সে বস্তুকে জানতে পারেন এবং সেবস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। মৃত্যুর পর আত্মা, অস্তিত্বের কোন না কোন এক স্তরে অবস্থান করে এবং সাধক তার ইচ্ছাশক্তির মনোনিবেশ দ্বারা জানতে পারেন। এইভাবে সাধক মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। সাধক তিন অবস্থায় এই জ্ঞানলাভ করতে পারেন। (১) যে বস্তু বা সত্তাকে জানতে চাওয়া হয় তার উপরে ইচ্ছাশক্তির মনোনিবেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্বের উচ্চস্তর হতে নিম্ন স্তরে এনে প্রতীকরূপে দেখে, (২) স্বপ্নের মাধ্যমে দেখে অথবা (৩) সেই বস্তু বা সত্তার স্তরে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করে। এই ধরনের জ্ঞান লাভের কথা কেবল ইবনুল আরাবী নয়, অন্যান্য সকল সূফী সাধকই বলে থাকেন।

ইবনুল আরাবীর মতবাদের মধ্যে সাধকের সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। প্রশ্ন উঠে: মানব ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাশক্তি কি এই একই রকম? তিনি বলেন যে এই দুইটি শক্তি এক নয় তবে সমধর্মী। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী শক্তি সর্বকালে, সর্ব স্তরে ও সর্ব অবস্থায় থাকে, কিন্তু মানবের তা থাকে না, কারণ সে অনেক সময় অনেক স্তর বা সত্তার জ্ঞান সম্পর্কে বা তার সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্মৃত হয়। মানব এক বা অন্য যে কোন স্তরে তার সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারে, সর্বকালে সর্বস্তরে এবং সর্ব অবস্থায় পারে না। আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টিকে কোন সময়ই ভুলে থাকেন না এবং সর্বস্তরেই তাঁর সৃষ্টির অস্তিত্বকে রক্ষা করেন। মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে যখন মানুষ ভুলে যায় তখন তার সৃষ্টির সেই বিশেষ স্তর হতে অন্তর্ধান ঘটে, তার সৃষ্টি একেবারে নষ্ট হয় না, তার অস্তিত্ব বিভিন্ন স্তরের যে কোন একটিতে বর্তমান থাকে, কেননা কোন কিছুই ধ্বংস

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 134.

হয় না। তিনি সাধকের সৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আত্মগত ধারণার সাথে বস্তুগত ধারণার মিশ্রণ করে একটি ভুল করেছেন। অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর আত্মগত, যে সব বিভিন্ন আকার এখানে প্রতিফলিত হয় সেগুলোও আত্মগত। প্রশ্ন উঠে, আত্মগত আকার কিভাবে বাহ্য আকার লাভ করে বাহ্যিক বস্তু বা সত্তার সমতুল্য হতে পারে? এবং কি করে সাধক সেই আকার রক্ষা করেন। এটা তো মানসিক কল্পনার মতো নয় যে এটাকে মনে করে রাখা যায়। এটাকে মনে সংরক্ষণ করার প্রশ্ন উঠে। বিভিন্ন স্তরের কথা না বলে এ মতবাদকে অন্যভাবে বলা যায়। সাধনার তন্ময় অবস্থায় অর্থাৎ 'ফানা' অবস্থায় সাধক যখন মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন দেখতে পান, পরম আত্মার সাথে একাত্মতা অনুভব করেন, তখন ঐ অবস্থায় ঐশী নাম ও গুণকে সাধকের বলে দাবী করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌র মতো সৃজনশীল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হতে পারেন। এমন অবস্থায় সূফী সাধক একটা মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়, তার মধ্য দিয়ে ঐশী সত্তার বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পায়। মনে হয় এইরকম অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট কাদামাটি হতে পাখী সৃষ্টি করেছেন এবং বায়েজিদ মৃত ব্যক্তির জীবন দান করেছেন।[১] ইবনুল আরাবী অনেক সময় বলেন যে, তন্ময় অবস্থায় আত্মার ডাকে ঐশী সত্তা সাড়া দেয় এবং আমরা নিজেরা নিজেদের জেনে নেই।[২] যীশুখ্রীস্টের পাখী সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আত্মা যখন আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হয় তখন তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের সত্তার প্রতিফলন ঘটে এবং আত্মা ঐশী শ্বাসবায়ু বা জীবন গ্রহণ ক্ষমতা লাভ করে। যীশুখ্রীস্ট শূন্য থেকে পাখী সৃষ্টি করেন নি। পাখীর অস্তিত্ব ছিল, সমগ্র পাখীটি ছিল না। পাখীর আত্মা 'ঐশী শ্বাসবায়ু' বা 'জীবনের' মধ্যে ছিল এবং দেহ ছিল প্রকৃতির মধ্যে। খ্রীস্টের বাণী দেহ ও আত্মাকে একত্রিত করেছে।[৩] তিনি বলেন যে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি আছে তবুও তিনি দুইটি কারণে এর বাস্তব ব্যবহার করেন না। (১) তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র সেবক বা দাস

১. Fusus pp. 263-271.
২. Fusus, p. 304.
৩. Ibnul Arabi, Mawaqial Nujum, pp. 126—127, quoted by A.E. Affifi, Ibid, p. 136.

বলে মনে করেন এবং সৃষ্টির ইচ্ছা নিজে গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌র সত্তায় অর্পণ করেন। (২) তিনি জানেন যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন। তবে আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করেন তবে একজন সূফী অনেক সময় অলৌকিক কার্য করেন।[১]

মরমী অভিজ্ঞতা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উদ্দেশ্য কি?

একথা সাধারণভাবে বলা হয় যে, একজন সূফীর আধ্যাত্মিক জীবনের মূল কথা পরমাত্মার সাথে মিলন।[২] সূফীরা এই মিলনকে 'ফানা' বা 'আত্মা বিলুপ্তি সাধন' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নেতিবাচক দিক 'ফানা' আর ইতিবাচক দিকের নাম 'বাকা' বা 'চিরন্তন জীবন লাভ'। বিভিন্ন সূফী সাধক এই 'ফানা' বা 'বাকা' পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতামত হতে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ :

১। সূফী সাধকদের ফানা সম্পর্কে তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূলতঃ নৈতিবাচক অথবা মনস্তাত্ত্বিক। তাঁরা 'ফানা' অভিজ্ঞতা তত্ত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নি। তাঁদের ব্যাখ্যা আত্মগত অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা, আত্মগত অভিজ্ঞতার বাস্তব রূপ সম্পর্কে সে ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট কোন মতবাদ নয়।

২। সূফীরা আত্মগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময়ে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার সর্বেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বলে মনে হয়। যেমন কুশাইরী, বায়েজীদ, জুনায়েদ এবং হাল্লাজের মতো সূফী সাধকরা ফানার অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করার সময়ে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অদ্বৈতবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কোন সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ গড়ে তোলেন নি। ইবনুল আরাবী প্রথম সূফী, যিনি 'ফানা' অভিজ্ঞতাকে একটি সর্বেশ্বরবাদী মতবাদরূপে গড়ে তুলেছেন এবং সূফীবাদকে সর্বেশ্বরবাদী ধরনের এক দার্শনিক মতবাদে রূপান্তর করেছেন।

৩। 'ফানা' অভিজ্ঞতার সময়ে আত্মচেতনা ও বিশ্ব সম্পর্কে চেতনা অতি ক্ষীণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, আবার অনেক সময় তাও থাকে না।

৪। 'ফানা' একটা গতিপ্রবাহ, যেখানে পাশবিক আত্মার কামনা বাসনা

১. Fusus, p. 235, Futuhat I, p. 243, 1. 18.

২. R. A. Nicholson, Article in the Journal of Royal Asiatic Society, 1913, pp. 55-68.

হতে শুরু করে জগৎ জীবন ও আত্ম-চেতনার বিলুপ্তি সাধন করে এবং তখন সাধক আল্লাহ্‌র চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

৫। পঞ্চম শতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত সুফীরা 'ফানা' শব্দ দিয়ে অবতার বা মিলন বুঝেছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন দার্শনিক মতবাদ গড়ে তোলেন নি।

৬। সুফীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হয় বিশুদ্ধ নৈতিক মতবাদ বা মনস্তাত্বিক মতবাদ অথবা উভয়ের মিশ্রণজাত মতবাদ গঠন করা।

(ক) সুফীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পরম ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং পরম ইচ্ছাকে বিশ্বের আদি চালক বলে মনে করেন।

(খ) সুফীরা নিজেদের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন, এমনকি প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত মন্দ বলে উল্লেখিত সকল বস্তু হতে দূরে থাকেন। আর এটাই 'ফানা আল মাআসী' এবং 'বাকা আল তাআহ' বা পাপ হতে মুক্তি লাভ করা এবং আদেশ পালনে রত থাকা।

(গ) সুফীরা নিজেদের আত্মচেতনা পরিত্যাগ করেন এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন হন।

অতএব দেখা যায় যে, প্রথমের দিকে 'ফানা' শব্দ দিয়ে ত্যাগ বা পরিত্যাগ বুঝতে আত্মার 'ফানা' অর্থে আত্মচেতনা পরিত্যাগ বোঝাত বা "আত্মার কিছু সংখ্যক গুণ পরিত্যাগ করা বোঝাত।" যে সমস্ত সুফী আল্লাহ্‌র সাথে আত্মার 'মিশে যাওয়া' বুঝতেন অথবা 'অবতারে' বিশ্বাস করতেন তাদেরকে নাস্তিক বলা হতো। 'ফানা' শব্দ দিয়ে মানবীয় গুণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সাথে 'এক হয়ে যাওয়া' বোঝায় না। 'এক হয়ে যাওয়া' বোঝালে তা নাস্তিকতার সমান হয়। 'ফানা' হলো আল্লাহ্‌র পরম শক্তি ও ইচ্ছাকে স্বীকার করা আর আল্লাহ্ কখনো মানুষের আত্মায় অবতরণ করে না, যা অবতরণ করে তা 'আল্লাহ্‌র একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস' ও তার অবিরত স্মরণ। আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণ মানবীয় সত্তা ও গুণ হতে ভিন্ন ধরনের, অতএব 'মিশে যাওয়া' বা 'অবতাররূপী হওয়া' কখনো সম্ভব নয়। মানবীয় গুণের পরিবর্তন হতে পারে যে-গুণ অন্য মানবীয় গুণ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এ সকল কথা বলেছেন সাররাজ।

সাররাজের কথা হতে বোঝা যায় সে সময় কিছু সংখ্যক সূফী বিশ্বাস করতেন যে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলে বা মিশে 'এক হয়ে যায়। ইবনুল আরাবী কিন্তু এই মিলনের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১] কুশাইরী 'ফানা' ও 'বাকা' শব্দের একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি 'ফানা' ও 'বাকা' অর্থে কেবলমাত্র কিছু মানসিক অবস্থার অন্য কিছু মানসিক অবস্থার দ্বারা পরিবর্তন বুঝেছেন। তাঁর মতে 'ফানা' ও 'বাকা' আত্মার দুইটি দিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সূত্র। এটা মানবের অবভাসিক দিক পরিত্যাগ করে ঐশী ও আধ্যাত্মিক দিকের উপর বিশেষ মনোযোগ করা বোঝায়। এই দৃঢ় মনোনিবেশের ফলে আরাধ্য বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া যায় এমনকি সেখানে আত্মচেতনার পূর্ণ বিলুপ্তি হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ আত্মবিলুপ্তি সাধন নয়। এটা প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের মতো, 'দুই মন' মিলে 'এক মন' হয়ে যায়, দুইটি ভিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব এতে লোপ পায় না। তাঁর পূর্বের সূফীরা 'ফানা' ও 'বাকা' সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা করতেন। হাল্লাজ প্রথমে মানবাত্মা পরমাত্মায় 'মিশে যাওয়া' 'অবতাররূপী হওয়া' মতবাদে বিশ্বাস করতেন। সাধনার অতি উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ গভীর আবেগ-মূলক মরমী অভিজ্ঞতার মাঝে তন্ময় অবস্থায় মানবাত্মা ও পরম আত্মার মিলন ঘটে বলে বিশ্বাস করা হতো।

যে সকল সূফী এই ধরনের কথা বলেন, তাঁদের সাথে আমরা তর্ক করতে পারি না, হয় তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয় অথবা অর্থহীন বলে বাদ দিতে হয়।[২] ইবনুল আরাবীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই বিষয়টির একটি তাত্ত্বিক রূপ দান করেন এবং এমন একটি ব্যাখ্যা দেন যা বর্ণনামূলক নয় কিংবা কোন অভিজ্ঞতাভিত্তিক নয়। প্লাটিনাসের মতো তাঁর অদ্বৈতবাদী দর্শনে দেখা যায় যে 'অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা' এই 'দার্শনিক মতবাদ' থেকে বেরিয়ে আসে, 'দার্শনিক মতবাদ' সৃষ্টির জন্য কোন বাক্য 'অভিজ্ঞতা' হতে নিতে হয় না। এটা পুরোপুরি জ্ঞানমূলক না হওয়ায় 'মরমী অভিজ্ঞতা' কোন অনুমানের ভিত্তি হতে পারে না। তিনি সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ দিয়ে তাঁর দার্শনিক আলোচনা শুরু

১. Futuhat II, p. 675.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 140.

করেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ সূফীবাদের সাথে মিলিত হয়। এক ও বহু বা আল্লাহ্ ও বিশ্বের মধ্যে প্রভেদ দূর করতে না পেরে তিনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই এই দুইটির বিরোধের সমাধান খুঁজে পান বলে মনে করেন। অবশ্য তিনি যে ধরনের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের কথা বলেছেন, তা হতে অতি সহজেই মরমীবাদে পৌঁছানো যায়। অপরপক্ষে হাল্লাজ যখন তন্ময় অবস্থার মধ্যে 'আনাল হক' বা 'আমিই সত্য' বাক্য উচ্চারণ করেন, তখন তিনি এক বলিষ্ঠ ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং এই অনুভূতির মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন। কিন্তু হাল্লাজ যখন অতীন্দ্রিয় মিলনের কথা বলেন, তখন তিনি একটি অবস্থার কথা বলেন, যার মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক মিলন বা পূর্ব-স্থাপিত মিলনকে উপলব্ধি করা যায় বা সত্য বলে পরীক্ষা করা যায়।[১]

সূফী বা অতীন্দ্রিয়বাদী কখনো আল্লাহ্ হয়ে যায় না,[২] কেননা তাঁর অদ্বৈতবাদী দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পরিবর্তন বলে কিছু নাই, অন্যান্য সত্তা ও বস্তু যেমন আল্লাহ্‌র সাথে এক, তেমনি সূফী বা অতীন্দ্রিয়বাদীও আল্লাহ্‌র সাথে এক ও অভিন্ন। তিনি যা জানেন এই অবস্থায় তাই অনুভব করেন এবং তারই অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ঐশী সত্তা অতীন্দ্রিয়বাদীর মধ্যে পূর্ব হতেই আছে। তবে হাল্লাজ উল্লেখিত এটা কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এটা ঐশী সত্তার একটি দিক মাত্র। একজন সূফী তাঁর সকল মানবীয় গুণ ত্যাগ করে আল্লাহ্ হতে পারেন—এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না।[৩]

'ফানা' শব্দের অর্থ

ইবনুল আরাবী 'ফানা' শব্দের অর্থ নিম্নরূপ বুঝেছেন।[৪]

১। অতীন্দ্রিয় অর্থে 'ফানা' শব্দ দিয়ে তিনি অজ্ঞানতা হতে দূরে চলে যাওয়া বা মুক্তিলাভ করা এবং 'বাকা' শব্দ দিয়ে সমগ্র ঐক্যের একত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান লাভ করা ও ঐশী জ্ঞানের মাঝে চিরন্তনরূপে বিরাজ করা বুঝেছেন।

---

১. Ibid, p 140.
২. Ibid, p. 140.
৩. Ibid, p. 141.
৪. Ibid, p. 141.

'ফানার' মধ্যে সাধক নিজ আত্মার বিলুপ্তি সাধন করে না বা নিজ আত্মা ত্যাগ করে না. বরং একটি 'আকার' হিসাবে তার অনস্তিত্বকে বুঝতে পারেন।

২। তিনি 'ফানা' শব্দের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তাত্ত্বিক অর্থে 'ফানা' বলতে অবভাসিক জগতের বিভিন্ন আকার হতে চলে যাওয়া বা মুক্ত হওয়া এবং এক সার্বিক দ্রব্যের মধ্যে অবস্থান করা বোঝায়। এটা এক সার্বিক অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্যে অবভাসিক সত্তার 'লয়প্রাপ্ত হওয়া' বা 'মিশে যাওয়ার' একটা চিরন্তন প্রবাহ এবং এটাই নতুন সৃষ্টি। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন যে. একটা আকারের 'লয়প্রাপ্ত হওয়া' বা পরিবর্তন হওয়ার নামই 'ফানা'। অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজেকে যখন একটি আকার হতে অন্য একটি আকারের মধ্যে প্রকাশ করতে চান তখন প্রথম আকারটির পরিবর্তন করে নতুন আকার ধারণ করেন। এই প্রথম আকারের পরিবর্তন সাধনের নাম 'ফানা'।[১]

তিনি বলেন যে, অতীন্দ্রিয় 'ফানা' অসম্পূর্ণ কেননা এর মধ্যে একজন সাধক একটি 'আকার' হিসাবে তার অন-অস্তিত্বকে বুঝতে পারেন, কিন্তু আকারের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকায় সে আকার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয় না এবং সাধকও অন্য আকার লাভ করতে পারে না। তখন সাধকের পক্ষে একই সাথে 'নিজ আত্মার কাছে মরে যাওয়া'ও আল্লাহ্‌কে এক সর্ব-ব্যাপী সত্তা মনে করা সম্ভব হয় না, কেননা চেতনা প্রমাণ দেয় যে আত্মা সম্পূর্ণ মরে যায়নি, তখনও আত্মা বেঁচে আছে। তাঁর পূর্বের মরমী সাধকরা 'ফানার' দুইটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেন নি, তিনি সে পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

১। 'ফানা'র এক অর্থ আত্মা সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন।[২] এই অবস্থার 'ফানা'-কে নিদ্রার সাথে তুলনা করা যায়। মরমী সাধক তখন নিজ আত্মা কিংবা পরমাত্মার কারো সাথেই থাকে না। সে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, সে যেন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। ২। 'ফানার' দ্বিতীয় অর্থ স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের এক তন্ময় অবস্থার মধ্যে আত্মার বিলুপ্তি-সাধন।[৩] এই অবস্থায় সাধকের কাছে পরমাত্মার সামগ্রিক ঐক্য প্রকাশ পায়।

১. Fusus, p. 230.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid. p. 143.
৩. Ibid, p. 143.

তিনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এটা তাঁর মতবাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। এই অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে এক হয়ে যাওয়া বা নিজ আত্মার কাছে মরে যাওয়ার কথা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা এবং 'ফানার' মধ্যে বা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে কেবলমাত্র নিজের আত্মাকে দর্শন করার নাম দেবতাবাদ। একজন পূর্ণ সুফীসাধক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে নিজ আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কে দেখতে পান, এ দুইটি মূল ঐক্যকে অনুধাবন করতে পারেন। অতএব, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে আল্লাহ্ বা পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করেন ও নিজ আত্মাকে সন্দর্শন করেন। অন্য কথায়, একজন পূর্ণ সাধক সত্তাসার ও আকার উভয়কে বুঝতে পারেন। এই দুইটির মূল ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং আকারের পূর্ণ অন-অস্তিত্বকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই সকল দেখা, অনুভব করা ও উপলব্ধি করার নামই পূর্ণ 'ফানা' বা সর্বশ্রেষ্ঠ 'ফানা'। ইহজগতে একজন সাধক এই প্রকার 'ফানা' লাভ করতে পারেন না। 'আকার' সম্পূর্ণভাবে লোপ পাওয়ার পর সাধক আসল 'ফানা'প্রাপ্ত হন। এই প্রকার 'ফানা' ইহজগতে সম্ভব নয়, পরজগতে সম্ভব। তাঁর 'ফানা' সম্পর্কীয় এই মতবাদ তাঁর পরম সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদের সংগে সংগতিপূর্ণ। অতীন্দ্রিয় বা মরমীবাদ পরম সত্তার জ্ঞান লাভের জন্য সাধকের প্রচেষ্টার চরম ফল। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে মানবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম অনুভব করে। মানবাত্মা এই সময়ে আর পরমাত্মা হতে ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না; বরং পরমাত্মার মধ্যেই সে সন্ধান করে, পরমাত্মার সাথে একাত্মতা অনুভব করেই পূর্ণ ঐক্য ও পরম আনন্দ লাভ করে। সুফী সাধকের এইসব কথা সাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, প্লাটিনাসের সাথে তাঁর এ বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে যদিও দুইজন চিন্তাবিদ দুই প্রকার তাত্ত্বিক মতবাদে বিশ্বাস করেন। এ দুইজনের দর্শনের সংগতির কথা বিচার করলে তাঁর মতবাদকে অধিক যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। প্লাটিনাসের মতে আত্মা পরমাত্মা হতে আগত একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং এই সত্তা, পরমাত্মার সাথে একাত্মতা অনুভব করে। ইবনুল আরাবীর মতে মানবাত্মা পরমাত্মার একটি

দিক মাত্র। প্লটিনাসের দুইটি উক্তির মধ্যে সংগতি স্থাপন করার যৌক্তিক অসুবিধা আছে, কিন্তু ইবনুল আরাবীর দর্শনে মানবাত্মা পরমাত্মার একটি দিক হওয়ার ফলে একাত্মতা অনুভব করার মধ্যে যৌক্তিক অসংগতি নাই। তাই দুইজনের মধ্যে ইবনুল আরাবীর মতবাদকে অধিক সংগত বলে মনে হয়।

'ফানা' একটি ধারাবাহিক প্রবাহ

ইবনুল আরাবীর মতে 'ফানা' একটি ধারাবাহিক প্রবাহ এবং এই প্রবাহে আল্লাহর জ্ঞান লাভের পথে সাতটি স্তর আছে।

১। সকল প্রকার পাপ হতে 'ফানা' হওয়া অর্থে তাঁর পূর্বেকার সুফীরা পাপ কার্য হতে বিরত থাকা বুঝতেন। তাঁর সর্বেশ্বরবাদী দর্শনে এই কথার একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে আল্লাহ্ সকল কিছুর উৎস এবং মানবের কৃত সকল কার্যই ভাল কার্য।[১] কেননা সেই অবস্থায় মানব ও আল্লাহ্ উভয়ের কার্য ভিন্ন নয়। সঠিক এই অবস্থায় নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে তার কার্যের ভাল-মন্দ বিচার করে না, সে আল্লাহর 'পাক নূরের' উপস্থিতি অনুভব করে। 'পাক নূর' বা শুদ্ধ নূরের অন্য নাম 'পূর্ণ কল্যাণ'। এবং 'পাক নূরের' উপস্থিতি অনুভব করতে থাকায় সাধক আর অন্য কোন ভালমন্দের কথা চিন্তা করতে পারে না বা সেই সময় অন্য কোন কিছু অনুভূত হয় না। এই অবস্থায় নিজের কৃতকার্যকে নিজের বলে মনে করলে তা পূর্ণ অন্ধকারের উপস্থিতি অনুভব করার মত হয় আর এমন করলে তা দেবতাবাদ ছাড়া আর কিছু হয় না। এখানে তাঁকে একজন পুরাদস্তুর যুক্তিবাদী বলে মনে হয়।

২। দ্বিতীয় প্রকারের 'ফানা' সকল কার্য হতে বিরত থাকা।[২] এই অবস্থায় একজন সাধক আল্লাহ্কে একমাত্র পরম সত্তা ও বিশ্বের একমাত্র প্রতি-নিধি রূপে দেখেন। আল্লাহ্কে একমাত্র পরম সত্তা ও প্রতিনিধি মনে করার এই অবস্থায় তাঁর মতবাদ মুতাজিলা ও আশারীয়দের আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদের সমালোচনামূলক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে মুতাজিলারা মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে স্বীকার

১. Futuhat, II, p. 675.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 143.

এবং আশরীয়রা তাকে আল্লাহ্‌র হাতের পুতুল বলে মনে করে উভয়েই ভুল করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আসল প্রতিনিধি একমাত্র আল্লাহ্ নিজে।

৩। তৃতীয় প্রকার 'ফানা' অনিয়ত সত্তাসমূহের গুণাবলী হতে 'ফানা' হওয়া। তাঁর মতে এই ধরনের 'ফানা' হওয়ার অর্থ পরম সত্তাকে নিয়ত সত্তার উৎস মনে করা, মানুষের কার্যকে আল্লাহ্‌র কার্য মনে করা, মানুষের অভিজ্ঞতা লাভের শক্তিকে আল্লাহ্‌র শক্তি মনে করা। তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্‌রই শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি আছে[১] মানুষের সকল গুণাবলীর সত্তাসার আল্লাহ্‌র মধ্যে নিহিত আছে। এইজন্য বলা হয় "আল্লাহ্ তোমার মধ্য দিয়ে ও তোমার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখেন।" সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন, একজন প্রকৃত সাধক তিনিই যিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে আল্লাহ্‌কে দেখেন, আল্লাহ্‌র মধ্যেই আল্লাহ্‌কে দেখেন এবং আল্লাহ্‌র চোখ দিয়েই আল্লাহ্‌কে দেখেন, যিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে আল্লাহ্‌কে জানেন এবং আল্লার মধ্যেই আল্লাহ্‌কে দেখেন; কিন্তু যিনি আল্লাহ্‌র চোখ দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখেন না, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী নন এবং যিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে আল্লাহ্‌কে জানতে চান না ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্‌কে দেখতে চান না, কিন্তু নিজের চোখ দিয়েই আল্লাহ্‌কে দেখতে চান, তিনি অজ্ঞ এবং তাঁর চোখ পর্দায় আবৃত।[২] এই ধরনের 'ফানা'র দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যই এই অবস্থাকে অন্যান্য অবস্থা হতে পৃথক করে। এই ধরনের 'ফানা' যে জ্ঞানী ব্যক্তি লাভ করেছেন তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া নিজের ব্যক্তিত্ব বা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আর সচেতন থাকেন না। জ্ঞানী-ব্যক্তির জ্ঞান লাভের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তি মিলে এক হয়ে যায় এবং এই শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ একক শক্তির সাহায্যে তিনি সব কিছুর জ্ঞান লাভ করেন।[৩]

(৪) 'ফানার' চতুর্থ স্তর সাধকের নিজের ব্যক্তিত্ব হতে 'ফানা' হওয়া।[৪] তাঁর মতে ব্যক্তিত্ব হতে 'ফানা' হওয়ার অর্থ সাধকের 'অবভাসিক সত্তা' বা 'পাশবিক

১. Futuhat II, p. 676, 1. 9.
২. Fusus, 198, 147.
৩. Futuhat II, p. 677.
৪. Dr. A. E. Affifi, Ibid. p. 144.

আত্মা' হতে অপরিবর্তনীয় চিরন্তন পরম সত্তা বা সর্বব্যাপী এক পরমাত্মার মধ্যে অবস্থান করা বা 'বাকা' অবস্থা লাভ করা বোঝায়।

(৫) 'ফানার' পঞ্চম স্তরে সাধক বাহ্য জগৎ ত্যাগ করে।[১] এই কথার অর্থ এই যে, সাধক অবভাসিক জগতের সত্তা ও বস্তুকে সত্য বলে স্বীকার না করে ও তাদের আরাধনা না করে সকল সত্তা ও বস্তুর অন্তরালে যে এক সর্বব্যাপী সত্তা আছে তার সন্ধান করে। অবভাসিক সত্তা ও বস্তুর অন্তরালে অন্তর্নিহিত সত্তারূপে যে এক মহাপরাক্রমশালী প্রাণ-জীবন-মন দানকারী আদি-দ্রব্য আছে, প্রার্থনার সময়ে যিনি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক আকারে আত্মপ্রকাশ করে সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই স্তরে সাধক তাঁরই চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একমাত্র তাঁরই ধ্যান করেন।

(৬) ষষ্ঠ স্তরে 'ফানা' অবস্থায় সাধক 'আল্লাহ্ হতে ভিন্ন' এমন সকল বস্তুকেও ভুলে যান, এমন কি 'ফানা' হতেও 'ফানা' হন।[২] এই অবস্থায় সাধক নিজে যে উপাসক বা সাধক সে সম্পর্কে তার কোন চেতনা থাকে না। এই অবস্থায় যেন আল্লাহ্ স্বয়ং উপাসক ও উপাস্য, আল্লাহ্ নিজেই নিজেকে আল্লাহ্ বলে ডাকেন, আল্লাহ্ স্বয়ং আরাধনা করেন। এখানে আল্লাহ্র অসংখ্য অবস্থা বা বিভিন্ন প্রকাশের প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্র উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

(৭) সপ্তম স্তরে আল্লাহ্র সকল গুণাবলী হতে 'ফানা' হতে হয়,[৩] অর্থাৎ আল্লাহ্কে বিশ্বের কারণ হিসাবে চিন্তা না করে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তারূপে ধ্যান করতে হয়। এ বিশ্ব 'পরম স্রষ্টারূপী কারণ' এর 'ফল' নয়। সাধকের কাছে এই বিশ্ব পরম সত্তার প্রকাশ স্থল। আল্লাহ্ অবভাসের মাঝে সত্তারূপে দেখা দেয়। এখানে আল্লাহ্কে স্রষ্টা, শিল্পী বা দাতা হিসাবে চিন্তা করা হয়। তাঁর মতে আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ স্তর এইটি কারণ এখানে সামগ্রিক সত্তা ও বস্তুর ঐক্যকে ঐক্যরূপে অনুভব করা যায়। অদ্বৈতবাদী দর্শনের এইটাই সর্বশেষ রূপ।

---

১. Ibid, p. 144.
২. Ibid, p. 145.
৩. Ibid, p. 145.

'ফানা' মতবাদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করা যায়

১। সাধারণভাবে সূফীবাদের মধ্যে 'ফানা' বলতে যা বোঝায় ইবনুল আরাবীর 'ফানা' তা হতে ভিন্ন। এটাকে আধ্যাত্মিক 'ফানা' না বলে যৌক্তিক 'ফানা' বা বুদ্ধিগত 'ফানা' বলা অধিক যুক্তিসংগত। এখানে ফানা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর হিসাবে কল্পিত হয়েছে।

২। তাঁর 'ফানা' আত্মার ঊর্ধ্বগমনের বিভিন্ন স্তর তবে এই স্তরগুলো ও আত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক হওয়ার চাইতে যৌক্তিক রূপ ধারণ করেছে এবং ফানার সপ্তম স্তরে পরম সত্তা ঐক্যরূপে বিশ্বের সকল সত্তা ও বস্তুর ঊর্ধ্বে রয়েছেন। তাঁর মতে এটাই আল্লাহ্‌র অতিবর্তী ধারণা।

৩। 'ফানার' বিভিন্ন স্তরে সাধক আল্লাহ্‌কে তাঁর বিভিন্ন নাম ও গুণের বিভিন্ন দিকের যে কোন এক বা একাধিক দিকের মাধ্যমে জানতে পারেন। আল্লাহ্ সাধকের কাছে পরম নিয়ম, পরম ইচ্ছা ; পরম সত্তা, পরম সৌন্দর্য, পরম আলোক ইত্যাদিরূপে দেখা দেয়।

'ফানার' প্রত্যেক স্তরের সাথে সাথে এক একটি করে 'বাকা'র স্তর আছে। যা ত্যাগ করা হয় তা অবভাসিক ও 'ফানা' যে অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায় তাই তখনকার 'বাকা'। তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদের চরম লক্ষ্য পরম সত্তা সম্পর্কে সত্য জ্ঞানলাভ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে একমাত্র সত্য বলে জানা, জাগতিক সত্তা ও বস্তুর মাঝে অনুস্যূত পরম সত্তা হিসাবে জানা এবং জাগতিক সত্তা বস্তুকে অলীক মনে করা। এখানে আল্লাহ্ কোন ব্যক্তি বা পুরুষ নন, তিনি জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা। কেবলমাত্র এই ধারণায় বিশ্বাস করলে আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, নৈতিকতার মান অনেকখানি নিকৃষ্ট হয় এবং ধর্মের ভিত্তি ও নিয়ম অনেকখানি শিথিল হয়।

'ফানা' ও 'বাকা' একই জিনিসের দুইটি দিক মাত্র। 'ফানা' বাহ্যিক দিক, 'বাকা' আভ্যন্তরীণ দিক। বাহ্যিক দিকের পরিবর্তনের ফলে আভ্যন্তরীণ দিক বা সত্তার দিক সাধকের কাছে দেখা যায়। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুরই 'ফানা' হয়। সর্বশেষে 'বাকা' বলতে একমাত্র আল্লাহ্‌কে বোঝায়। 'ফানার' একটি স্তর অতিক্রম করার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া বা আল্লাহ্‌কে জানার পথের একটি পর্দারূপ অন্তরায় দূর হওয়া। একের পর এক যখন সকল স্তর

অতিক্রম করা হয়, সকল বাধা বা পর্দা তখন উন্মোচিত হয় এবং পরম সত্তাকে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী পরম ঐক্য সত্তারূপে দেখা যায়। অন্য কথায়, পর্দা দূর হলে পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে এবং মরমী সাধক তাঁর সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। এমন কথা বলা যাবে না যে সাধক আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছেছেন কেননা যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন সেই তো আল্লাহ্‌র মূর্ত প্রকাশ। সাধকের পূর্ণ শান্তি একাত্মতা উপলব্ধি করার মধ্যে অবস্থিত। নিশ্চয়তা সম্পর্কে জ্ঞান বা 'ইলমুল একিন'-ই নিশ্চয়তার সত্তার জ্ঞানদান করে বা 'আয়নুল একিন' অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়, যখন তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত অবস্থা অতিক্রম করেন, তখন তিনি সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন আর এইটাই নিশ্চয়তার আদি সত্য-রূপ। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর 'ফানা' ও 'বাকা' অনেকাংশে যৌক্তিক 'ফানা' ও 'বাকা', পুরাপুরি আধ্যাত্মিক নয়। সুফীবাদের মধ্যে সর্বোচ্চ 'ফানা' দিয়ে পরমাত্মাকে যেমন জগতের সব কিছুর অন্তর্নিহিত সত্তারূপে দেখা যায়, তেমনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্রষ্টা, দয়াল, দাতা, ইত্যাদিরূপে দেখা যায়।

সমালোচনা

ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্বের সমালোচনায় এ কথা বলা যায় যে, তিনি কেবল-মাত্র বস্তুর অন্তরালে অন্তর্নিহিত সত্তারূপে যে এক আদি দ্রব্য আছে, তার জ্ঞানলাভের কথা বলেছেন। অন্তর্নিহিত আদি সত্তার জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে লাভ করা যায়, কিন্তু দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের অভিজ্ঞতার মধ্যেও যে জ্ঞান অর্জন করা যায় সে দিকে তিনি বিশেষ নজর দেন নি। তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষজাত অবধারণের বস্তুর সত্যতা বাহ্যজগতে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও তিনি সেগুলোকে সত্য বলে মনে করেছেন এই অর্থে যে সেগুলোর অনুরূপ একটা কিছু আছে। কিন্তু তাঁর এই কথা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ বিজ্ঞান বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে কার্য পরিচালনা করে। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে আল্লাহ্‌কে একমাত্র সত্য ভেবে জাগতিক বস্তুসমূহ অলীক মনে করা হয়েছে। তাঁর এই মতবাদ এক ধরনের বিশ্বমিথ্যাবাদ। আবার আল্লাহ্‌কে জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা বলে বিচার করলে নৈতিকতার মান, ধর্মের ভিত্তি ও নিয়ম-সমূহ অনেকখানি শিথিল হয়। তাঁর মতে সত্তাকে জানার অর্থ প্রত্যক্ষভাবে

দেখা। কিন্তু চিন্তাভাবনা করেও জ্ঞানলাভ করা যায় তা তিনি ভাবেন নি। তাছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শব্দ দুটির তুলনামূলক অর্থ করলে প্রত্যক্ষ মানে স্বচক্ষে দেখা, অনুভব করা, জানা, সম্যক পরিচয় জ্ঞান বা স্বীয়ভাবে ধারণায় জানা বোঝায়। আল্লাহ্‌কে কখনো আমরা চক্ষু দিয়ে দেখিনি বা তাঁর আকার বা আকৃতি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা নাই, কারণ তিনি নিরাকার। তা হলে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিভাবে লাভ করা সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে বাহ্যিক প্রত্যক্ষ ও আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ। তিনি আভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাথে যুক্তি প্রক্রিয়ার সংযোগ সাধনের ফলে তাঁর অতি-ন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞাবাদ বার্গসঁর বৌদ্ধিক সজ্ঞাবাদ এবং স্পিনোজার বৈজ্ঞানিক স্বজ্ঞাবাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তার ফলে বার্গসঁ ও স্পিনোজোর মত-বাদের বিরুদ্ধে যে সব সমালোচনা আরোপ করা যায়, তাঁর মতবাদ তা হতে মুক্ত নয়। বাস্তব জগতের জ্ঞান কি সম্ভব? সম্ভব হলে তা কি সত্য নয়? এ দিক হতে বিচার করলে বলা যায় যে, তাঁর মতবাদ এ বিষয়ে স্পষ্ট নয়। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার সর্বশেষ সিদ্ধান্তে এ কথা বলা যায় যে, ভাষায় দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে ইবনুল আরাবীর জ্ঞানতত্ত্ব অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি যে ইন্দ্রিয় অনুভূতি, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞালব্ধ—এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে অতিন্দ্রিয় জ্ঞানকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন, তা তাঁর ইসলামী অদ্বৈতবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইবনুল আরাবীর ধর্মীয় দর্শন

ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদির আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিভংগী নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মানব সৃষ্টির আদিম যুগ হতে শুরু করে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধর্ম মানুষের জীবনে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ধর্ম যেন মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে ঘিরে আছে। মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা ধর্মীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয়। ধর্মীয় দর্শন খণ্ড জ্ঞানের চেয়ে সামগ্রিক বা অখণ্ড জ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, ধর্মকে বিশ্বজনীন রূপ দান করে, বিশ্বাস ও বুদ্ধির মধ্যে বিরোধ দূর করে একটা সামঞ্জস্য ও সংগতি স্থাপন করে, নৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে মানব অভিজ্ঞতা ও কার্যকলাপের মূল্য নির্ণয় করে, মানবের আকাঙ্ক্ষিত এক আদর্শের প্রতি ইংগিত দেয় ও অতীন্দ্রিয় জগতে অসীম, অনন্ত, অক্ষয়, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, দয়াশীল, দাতা, প্রেমময়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্বব্যাপী এক পরম সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁর সাথে মানব প্রার্থনা, ত্যাগ, সংযম, সৎকর্ম ইত্যাদি দ্বারা ভাল সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম হয় ও নিজ সাহায্যে প্রার্থনা করে শান্তি লাভ করে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানব অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হওয়ায় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দার্শনিক ব্যাখ্যা ধর্মীয় দর্শনে অপরিহার্য। ইবনুল আরাবী ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দার্শনিক ব্যাখ্যা দান করে, ইসলাম ধর্মের মধ্যে সকল ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে, ইসলাম ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সকল ধর্মই সত্য এবং সকল ধর্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে একটি 'সোজা — পথে'[১] নিয়ে যায় যা সর্বশেষে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়। তাঁর 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে নিম্নতম দেবতাবাদ হতে শুরু করে সর্বোচ্চ অমূর্ত ধর্মীয় দর্শনও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ফলে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।[২] খোদাবাদ, দেবতাবাদ ও

১. (I) Fususul Hikam, p. 8 (II) Dr. Tarachand : Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1954, p. 74.

২. Ibid, p. 405.

অন্যান্য মতবাদ সর্বেশ্বরবাদী ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করলে এক বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়। তাঁর মতে খোদাবাদ ও দেবতাবাদের মধ্যে পার্থক্য এক ও বহুর মধ্যে যৌক্তিক পার্থক্যের অনুরূপ। দেবতাবাদীরা সমগ্র সত্তার পরম ঐক্যকে না বোঝার ফলে দেবতাবাদে বিশ্বাস করে এবং দেবতার সংখ্যা বহু বলে স্বীকার করে। তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কোন অংশীদার নাই[১] কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং সবকিছুর অন্তর্নিহিত সত্তারূপে বিদ্যমান। উপাসনার প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্‌র এক একটি বিশেষ দিক।[২] কোন বস্তুকে উপাসনা করলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা করা হয় না। পরম ঐক্যে বিশ্বাস করে বহু দেবদেবী ও প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করা তাঁর মতে খারাপ নয়। বিভিন্ন বস্তুর আকার পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যান্য বস্তুর মত দেবদেবীর মূর্তি প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন। দেবতাবাদীরা নিজেদের দেবদেবীদের অপূর্ণতা ও অসহায়তার কথা জানে এবং তাঁরা কেবল আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আল্লাহ্ সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা।[৩] এই শ্রেষ্ঠ দেবতা সকল অবস্থায় জীবকে সকল প্রকার সাহায্য[৪] করে কারণ সকল জীব প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকৃতি মাত্র।

ইবনুল আরাবী বলেন যে আল্লাহ্‌র একত্বে তিনভাবে বিশ্বাস করা যায়[৫] (১) একজন নবীর পথ অনুসরণ করে, (২) দার্শনিক ও যুক্তিচিন্তাবিদদের পথ অনুসরণ করে এবং (৩) একজন প্রকৃত জ্ঞানীর বা সুফীর পথ অনুসরণ করে। নবীর পথ, বিশ্বাসের পথ, দার্শনিকের পথ, যুক্তি বা বুদ্ধির পথ এবং প্রকৃত জ্ঞানীর পথ প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পথ। বিশ্বাসী, দার্শনিক ও সুফী তিন জনের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্ সম্পর্কে একটা নিজস্ব ধারণা আছে এবং পরজগতে যখন আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করবেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার 'আকার' অনুসারে আল্লাহ্‌র সন্দর্শন লাভ করবেন। কেবলমাত্র পরজগতে তাঁরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা গঠন করতে পারবেন। তখন একই পরম সত্তার

১. Ibid, p. 380.
২. Ibid, p. 387.
৩. Futuhat I, p. 317, Fusus, p. 87.
৪. Fusus, p. 220.
৫. Dr. A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, pp. 149-151, Lahore, Reprint, First Published in 1938, Cambidge.

আলোক বিভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত অবস্থায় দেখা যাবে এবং আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা গঠন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুসারে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সসীম আকারে বিশ্বাস করলে আল্লাহ্‌কে সে সসীম আকারে জানতে পারবে, অন্য কোন আকারে নয়। ইবনুল আরাবী বলেন যে, মুতাজিলারা আল্লাহ্‌কে শক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করেন বলে তাঁরা আল্লাহ্‌কে এ আকারে দেখতে পাবেন, দয়াশীলরূপে দেখতে পাবেন না। তাঁর মতে একমাত্র অতীন্দ্রিয়বাদী বা সূফীরা আল্লাহ্‌র সার্বিকরূপ দেখতে পাবেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যে আল্লাহ্‌ সকল আকারের অন্তর্নিহিত পরম সত্তা। তাঁরা জানতে পাবেন যে একজন সূফীই তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের আদিম বস্তু, যার মধ্য দিয়ে পরম সত্তা নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাসের বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসও বিভিন্ন ধরনের হয় এবং যে বিশ্বাস আল্লাহ্‌কে পরম সার্বিকভাবে দেখে না বা আল্লাহ্‌কে অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয় প্রকার সত্তা হিসাবে দেখে না, সে-বিশ্বাস অনুসারে পরম সত্তা হয় আংশিক ও অপূর্ণ সত্তা। একটা নক্ষত্র বা একটা বৃক্ষকে উপাসনা করার অর্থ একটা দেবতাকে উপাসনা করা। সেই দেবতা পরম সত্তা আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ আকারের প্রকাশ, আর আল্লাহ্‌কে সকল আকারের সত্তা হিসাবে উপাসনার করার অর্থ সমগ্র সত্তার উপাসনা করা। তাঁর মতে উপাসনার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌কে একমাত্র পরম ও সামগ্রিক ঐক্য সত্তারূপে জানা, কারণ আল্লাহ্‌ একমাত্র উপাস্য। অন্যান্য দেবতা বা 'আকার' বিশ্বাসের বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু। বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুগুলো আমাদের মনের সৃষ্টি বস্তু। প্রত্যেকের বিশ্বাসই ঠিক[১] তার বিশ্বাস যতই আংশিক হোক না কেন। তবে এই কথা চিন্তা করা ভুল যে তার বিশ্বাসের বস্তুই পরম সত্তা বা আল্লাহ্‌। সূফী সাধক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে সার্বিক সত্তারূপে চিন্তা করেন এবং তাঁর উপাসনা করেন, তাঁর পরম সত্তার নাম 'আল্লাহ্‌' এবং এ নাম সার্বিক নাম এবং এর মধ্যে অন্যান্য ঐশী নাম লুকিয়ে আছে। সূফীদের 'ইবনুল ওয়াক্ত' বা 'কাল' এর উপাসক বা কাল উপাসনাকারী বলা হয়, কারণ তাঁরা কালের

১. (i) Dr. R A. Nicholson : The Tarjuman Al Ashwaq, Oriental Translation Fund, News series, Vol. XX London, Royal Asiatic Society, 22 Albemarle street 1911 (ii) Dr. Tarachand, Ibid, p. 74.

প্রতি মুহূর্তে পরম সত্তার প্রকাশিত নতুন নতুন আকারের উপাসনা করেন।[১] তাঁদের বিশ্বাস এক অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস। তাঁদের বিশ্বাসের মধ্যে দার্শনিকদের আল্লাহ্ সম্পর্কে শুধু অতিবর্তী ধারণা ও দেবতাবাদীর শুদ্ধ অন্তর্ব্যাপী ধারণার মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁদের ধারণা এইভাবে গড়ে উঠেছে কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে দেবতা বা আল্লাহ্ শুধুমাত্র অতিবর্তী কিংবা অন্তর্ব্যাপী মূর্ত ধারণা নয়, এ দুইটির কোনটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করেন না। এক-দিকে একমাত্র অন্তর্ব্যাপী ধারণা দেবতাবাদের সৃষ্টি করে, আবার অন্যদিকে অতিবর্তী ধারণা আল্লাহ্ ও বিশ্বের দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা দ্বারা দ্বৈতবাদের জন্ম দেয়। তিনি এককভাবে দুইটিকে অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই দুইটি সার্বিকভাবে মিশ্রিত হলে আল্লাহ্ সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা মাত্র করতে পারে। তাঁর ধর্মমত সার্বিক ধর্মমত, এই ধর্মের মধ্যে সকল ধর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর ধর্মকে তিনি ইসলাম ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই ধর্ম হযরত মুহাম্মদ প্রচারিত হুবহু একত্ববাদী ইস-লাম ধর্ম নয়, এটা ভাববাদী একত্ববাদ, অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। তিনি বলেন যে, ইসলাম শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদের ধর্ম নয়, এটা সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের একত্রিত রূপ, এটা একটা সার্বিক ধর্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম।[২] বিভিন্ন লোকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন আর তিনি সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন।[৩]

তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রেমের মাধ্যমে সার্বিক ধর্মের ধারণায় পৌঁছা যায়। কারণ, তাঁর মতে প্রেম সকল প্রকার উপাসনার মূল ভিত্তি।[৪] উপাসনা করার অর্থ উপাসনার বস্তুকে ভালবাসা। প্রেম মানুষসহ সকল জীবের মধ্যেই দেখা যায় এবং সকল জীব ও মানুষকে প্রেম আপন বন্ধনে একত্রিত করতে পারে। প্রেম বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও এর প্রকৃত রূপ, এটা মূলতঃ এক, এটা স্বয়ং ঐশী সত্তা। বার্গস'র মতো তিনি বলেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসত্য বস্তু প্রেম। কারণ প্রেমের মাধ্যমেই আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন,

১. Fusus, p. 392.
২. Futuhat I, p. 174. Futuhat II, p. 369.
৩. Futuhat III, p. 175.
৪. (i) A.E. Affifi, Ibid, p. 151. (ii) Reuben Lely, Persian Literature, Oxford University Press, Lodon, Reprinted in 1955, p. 72.

প্রেম সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। তিনি বলেন যে, "আমি প্রেমের নামে শপথ করে বলছি যে 'পরম প্রেম'ই সকল প্রেমের উৎস, যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকতো তবে প্রেম (আল্লাহ্)-কে উপাসনা করা হতো না'।[১]

তাঁর মতে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু যেমন অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয় মানুষও তেমনি পূর্ব নির্ধারিত বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বিশ্বাস চিরন্তন অব্যক্ত সম্ভাবনা যা বাস্তব জগতে বাস্তবায়িত হয়। সেগুলো নির্দিষ্ট এবং পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তির প্রকৃতি হলেও শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয় ও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। খোদাবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী, প্রকৃত জ্ঞানী ও অজ্ঞেয়তাবাদী, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী, বিশ্বাসী ও মুক্ত চিন্তাবিদ সকলেই আদিকাল হতে তেমন প্রকৃতির এবং তাঁদের প্রকৃতি তাঁদের বিশ্বাসকে নির্ধারিত করে। "পাত্রের আকারই জলের আকার"—জুনায়েদের এই উক্তিটি উপরোক্ত মতবাদের সমর্থনে তিনি ব্যবহার করেন।[২] এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ একজন সর্বজ্ঞানী সত্তা, যিনি অনন্তকাল হতে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত, এমন কি আল্লাহ্‌র জ্ঞান বিশ্বাসের প্রকৃতি ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। "আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দার প্রতি অবিচার করেন না" কোরানের এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ কখনো দেবতাবাদীদের দেবতাবাদে বিশ্বাস করতে বলেন নি, কারণ এ ধারা অনির্দিষ্টকারী ধারণা এবং তাঁদের প্রকৃতির বাইরের কোন কিছু তাঁদের নিকট থেকে আল্লাহ্ দাবী করেন না। আল্লাহ্ তাঁদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করেন, যা তিনি জানেন এবং তাঁরা যে প্রতিদান তাঁকে দেন সেই আলোকেই তিনি তাঁদের জানেন, তাঁদের প্রকৃতি অনুসারেই তাঁরা প্রতিদান দেন। যদি সেখানে কোন অন্যায় হয় তবে তাঁরাই অন্যায়কারী। তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা যেমন আছে, তার বেশী আল্লাহ্ কখনো তাঁদের কাছ থেকে দাবী করেন না এবং আল্লাহ্ তাঁদের মধ্য থেকে তাঁর সত্তাকেও জেনে থাকেন। আল্লাহ্ আদেশকর্তা, এখন এ আদেশ মান্য অথবা অমান্য করার শক্তি তাঁদের আছে।[৩]

১. Fusus, pp. 387, 390.
২. Fusus, p. 456.
৩. Fusus, p. 237.

সংক্ষেপে এটাই ইবনুল আরাবীর ধর্মমত। আপাতঃদৃষ্টিতে এই ধর্ম কঠোর, অনমনীয়, দৃঢ়, স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে হয় কিন্তু একটি ধর্মীয় দর্শন হতে যতখানি ভাল জিনিস আশা করা যায় তা তাঁর মতবাদের মধ্যে আছে। এই ধর্ম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং এই ধর্মেরও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে সেখানে মানুষ তার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সৎগুণ উপলব্ধি করে ঐশীগুণে গুণান্বিত হয়ে পরম সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করতে পারে। এই ধর্মের নৈতিক উদ্দেশ্যও অতি মহৎ। নৈতিকতার দিক হতে আল্লাহ্‌কে প্রেমনীতি বলা হয় কারণ তাঁর মতে আল্লাহ্ স্বয়ং প্রেমসত্তা এবং এই প্রেমসত্তা সর্বব্যাপী, সমগ্র বিশ্বের সত্তা ও বস্তুকে ঘিরে আছে এবং সকলকে একত্রিত করে। তাঁর ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিসত্তা নয়, আল্লাহ্ নৈর্ব্যক্তিক সত্তা-রূপে বিরাজমান, বিশ্বের সমগ্র জীব ও বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তারূপে বিদ্যমান। যদি কেউ পরম সত্তাকে বিশ্বের সমগ্র বস্তুর অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্তারূপে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয় তবে সেভাবে সে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে পারে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হয় যে তার কল্পিত কোন বিশেষ মূর্তি বা বস্তু আরাধনার বিষয়বস্তু নয়, আরাধনার বিষয়বস্তু মূর্তি বা বস্তুর ও আকারের অন্তরালে অবস্থিত এক ঐক্য শক্তি বা আল্লাহ্। তাঁর মতে মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করা বা হৃদয় দিয়ে স্মরণ করাই আল্লাহ্‌র উপাসনা করা নয় এবং প্রত্যেকটি সত্তা ও বস্তুর মধ্যে এবং সবচেয়ে বেশী মানুষের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্‌র সত্তার অনুধ্যান করাই প্রকৃত উপাসনা।[১] নূরময়, শক্তিময় এবং ইচ্ছাময় এক সর্বব্যাপী আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্ম।

তিনি এক সার্বজনীন মতবাদকে স্বাতন্ত্র্য দান করেন। তিনি বলেন যে, পরস্পর বিরোধী সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের অন্তরালে একই মহাসত্য আছে। সকল ধর্ম সকল বিশ্বাস সেই একই মহাসত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের বাহ্যিক গণ্ডী উঠিয়ে দিলেই এক সার্বিক ও বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হওয়া যায়। বৈচিত্র্যময় বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ যে স্রষ্টার প্রতি ইংগিত দেয়, বিশ্বের প্রতি কাজে, প্রতি ঘটনায় যে মহাশক্তির স্পন্দন অনুভব হয় তার জ্ঞানলাভ করাই চরম ধর্ম এবং এটাই সার্বজনীন ধর্ম। এখানে

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 153.

সকল ধর্মাবলম্বী, বিশ্বাসী, দার্শনিক, দেবতাবাদী, জড়বাদী, অধ্যাত্মবাদী, সর্বেশ্বরবাদী, খোদাবাদী একত্র হতে পারেন। এই ধর্ম কোন এক বিশেষ ধর্মের নিয়মাধীন নয় বলে বিশ্বের সাধারণ নীতিশাস্ত্রই এর নীতির পক্ষে প্রশস্ত, সকল ধর্মের মূল সত্য প্রেম, আর প্রেম এই ধর্মের মূল কথা।

মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা

মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদ ইসলাম ধর্ম ও দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। খারেজীয়া, মুরজীয়া, জাবারিয়া, কাদেরিয়া, মুতাজিলা ও আশারীয়া সম্প্রদায় এই সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে মানব ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। খারেজীয়া, কাদেরীয়া ও মুতাজিলারা মানব ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। অপরপক্ষে, মুরজিয়া, জাবারিয়া ও আশারীয়া সম্প্রদায় মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন। দুই পক্ষই কোরান হতে পরস্পর বিরোধী অনেক উক্তি বা আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আপন আপন মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। ইবনুল আরাবীর পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। তিনি নিজেও এ সমস্যার একটা সার্বিক সমাধান দিতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক, আর একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের মতবাদের মধ্যে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সন্ধান পাওয়া বেশ মুশকিল। কারণ তিনি এক মরমী ধর্মে বিশ্বাস করেন[১] এবং মরমী ধর্মের আল্লাহ্ সকল সত্তা ও বস্তুর উৎস, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সকল প্রকার কার্যের একমাত্র কর্তা। অদ্বৈতবাদী মতবাদের মতে কর্তা ও কর্ম বিচারক ও আসামী যেহেতু অভিন্ন নয়; সেহেতু অদ্বৈতবাদের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় না। তিনি খোলাখুলিভাবে নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি[২] তবে মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন উক্তি হতে সেই রকম একটা ধারণার আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, মানুষ তার সকল কার্যের জন্য দায়ী এবং সে নিজেই তার ভাগ্য স্রষ্টা, তাই বলে তার নৈতিক অর্থে কোন স্বাধীনতা নাই, সে নিজের ইচ্ছামত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সব কিছু করতে পারে

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 153.
২. Ibid, p. 153.

না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষ বিশেষ এক অর্থে দায়ী কারণ তার কার্যের বাইরের কোন বস্তু বা ব্যক্তি কর্তৃক সে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা প্রত্যক্ষভাবে তার প্রকৃতি ও স্বভাব হতে উৎপত্তি হয় এবং তার নিজের মধ্যে অবস্থিত নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম আল্লাহ্ নিজেও পরিবর্তন করতে পারেন না কারণ সে নিয়ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দ্বারা পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়ে আছে। পূর্ব নির্ধারণের রহস্য এই যে, যা কিছু সম্ভাবনা ও অব্যক্তরূপে বিদ্যমান তা কালে ব্যক্ত হয়। তিনি জাবারিয়া সম্প্রদায়ের নির্ধারণবাদ-এর সাথে একমত হতে পারেন নি। জাবারিয়াদের মতে মানুষের ইচ্ছা বাইরের কোন সত্তা বা ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; আল্লাহ্ সব কিছুর উৎস, তিনিই ভাল ও মন্দ কাজের একমাত্র কর্তা। মুতাজিলা সম্প্রদায় মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে মানবের নৈতিক দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করেছেন। নৈতিক দায়িত্ব আছে বলেই ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। তিনি মুতাজিলাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত হতে পারেন নি। আশারিয়াদের মতে মানব ও তার সকল কার্যের উৎস আল্লাহ্। তিনি বাইরের কোন কর্তা কর্তৃক আরোপিত নির্ধারণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তিনি মুতাজিলাদের মতো মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, মানবের পছন্দ বলে কিছু নাই। মানবের একটি মাত্র বিকল্প আছে যা তাকে অবশ্যই পছন্দ করতে হয়। কারণ তা পূর্ব হতে নির্ধারিত। মানব এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন মানব তাই করে, অন্যরূপ করার ক্ষমতা মানুষের নাই এবং তার প্রকৃতিও তেমনভাবে গঠিত হয়নি। তাঁর ইচ্ছার পূর্ব নির্ধারণবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে দার্শনিক লাইবনিজের পূর্ব সংস্থাপিত শৃঙ্খলা মতবাদের যথেষ্ট মিল আছে।

তাঁর মতে মানুষ ভাল মন্দ যা কিছু করে সব নিজের আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসারেই করে। যদি প্রশংসার কিছু থাকে তবে তা তার নিজের প্রাপ্য, যদি দোষের কিছু থাকে তবে তাও তার নিজের প্রাপ্য। ভাল ও মন্দ উভয় কার্যের জন্য মানুষ দায়ী। অমুক অমুক কার্য বাস্তবায়িত হোক—আল্লাহ্‌র এই জ্ঞানের দ্বারা এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞান সত্তা ও বস্তুর আভ্যন্তরীণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হয়। আর এই রকম চিন্তাধারা তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই এবং মানুষকে তার কৃতকার্যের জন্য দায়ী করা যায় না। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকায় ধর্মীয় দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। একদিক দিয়ে তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কীয় মতবাদকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণবাদ বলা হয়।[১] তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে (আধুনিক নিয়ন্ত্রণবাদীদের মত আভ্যন্তরীণ বাহ্যিক নিয়ম)[২] আল্লাহ্‌র নিয়ম ও মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিয়মকে মানুষের প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিয়ম বলে উল্লেখ করেন। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা বা তার মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্‌র নিয়ম দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব আছে। তাঁর এই যুক্তি ভ্রান্ত যুক্তি। তাঁর মতবাদের মধ্যে মানুষের একটা যুক্তিগত দায়িত্ব দেখা যায়, সে-দায়িত্ব কোন নৈতিক দায়িত্ব নয়। আল্লাহ্‌কে সকল কিছুর নিয়ন্তা ও কর্তা বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, যুক্তিগতভাবে মানুষ তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী, কারণ মানুষের কাজ কর্তব্য পালন করা এবং আল্লাহ্‌র কাজ আদেশ করা।[৩] তাঁর মতবাদে এক ও বহুর মধ্যে যে পার্থক্য আছে এখানে তা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্‌ সকল কাজের একমাত্র কর্তা—এই কথার অর্থ এই যে আল্লাহ্‌র সত্তা মানুষের সত্তা এবং মানুষের মধ্যে সেয় সত্তার উপরই কর্তব্য আরোপিত হয়েছে।[৪] মানুষ তার ভাগ্যনিয়ন্তা ও সকল কাজের কর্তা—এই কথা বলার সময় তিনি এই সমস্যাটিকে 'একের' দৃষ্টিকোণ হতে না দেখে 'বহুর' দৃষ্টিকোণ হতে দেখেছেন। একদিকে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ও অন্যদিক হতে অস্বীকৃতি তাঁর সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের একটা বৈশিষ্ট্য। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব বোধ না থাকার ধারণা তাঁর সর্বেশ্বরবাদী মতবাদেরই একটা অঙ্গ। এখানে নৈতিক দায়িত্বকে একটা যৌক্তিক দায়িত্বরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি বলা হয় মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী তবে তা ঠিক। আবার আল্লাহ্‌ মানুষের কাজের জন্য দায়ী তবে তাও ঠিক. কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হয় কোন দৃষ্টিকোণ হতে কথা বলা হয়, 'বহুর' দৃষ্টিকোণ

১. Ibid. p. 155.
২. Ibid. p. 155.
৩. Fusus. p. 124.
৪. Futuhat II. p. 286. 1.10. Fusus. p. 291-292.

হতে, না 'একের' দৃষ্টিকোণ হতে। তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের মধ্যে মানুষ ও আল্লাহ্‌ উভয়ের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন এই অর্থে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তাঁর জানা অমুক অমুক জিনিস অবশ্যই ঘটবে এই আদেশকর্তা হিসাবে তাঁর ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। যা কিছু ঘটে তা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ঘটে, আল্লাহ্‌ নিজে তা কখনো বদল করতে পারেন না কেননা তা তিনি পূর্ব হতে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাঁর প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব নিয়ম বা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন তবে অমুক অমুক জিনিস করতে পারতেন বা অমুক অমুক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন—এমন কথা বলা ঠিক নয়, কেননা যা কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে নাই তা আল্লাহ্‌ করতে পারেন না। মানুষের নিজের প্রকৃতিগত নিয়মই মানুষকে ভাল মন্দ কাজের জন্য দায়ী করে।[১]

ভালমন্দ সমস্যা

ইবনুল আরাবীর মতে ঐশী সত্তার জগতে ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সেখানকার সবকিছুই ভাল ও কল্যাণকর। জড় জগতে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন উঠে। অন্য কথায়, 'এক' এর জগতে কেবল মাত্র ভাল ও কল্যাণ আছে। 'বহু'-এর জগতে ভাল ও মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই আছে।[২] একের জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ পূর্ণ কল্যাণের জগৎ। অবভাসিক জগৎ ভালমন্দ মিশ্রণের জগৎ। এখানে প্লেটোর ভাবধারার কিছুটা প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে বলে মনে হয়। তিনি বলেন যে, বাহ্য জগতে যদি ভাল ও মন্দের মধ্যে আদৌ কোন প্রভেদ করা হয় তবে 'ভাল' আল্লাহ্‌র প্রতি এবং 'মন্দ' মানুষের প্রতি যেন আরোপ করা হয়। মানুষ 'মন্দ কাজ করে' এই অর্থে মানুষের প্রতি মন্দ আরোপ করা হয় না, মানুষের অনেক কাজ 'মন্দ বলে বিবেচিত হয় বলেই মানুষের

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 156.
২. (i) Fusus, p 447. (ii) Rom Laudan, The Philosophy of Ibn Arabi, London, 1959, p. 44.

প্রতি 'মন্দ' আরোপ করা হয়। মানুষের জগৎ নৈতিক মূল্যের জগৎ, নৈতিক আইনের জগৎ, এখানে মানুষের কাজকে বিশেষ নীতির মানদণ্ডে ভাল বা মন্দ বলে বিচার করা হয়। মন্দ বা অকল্যাণ বাস্তব কিছু নয়।[১] শুদ্ধ মন্দ, অকল্যাণ, অ-সত্তা ও শুদ্ধ অন্ধকার একই সমান, শুদ্ধ মঙ্গল বা ভাল, শুদ্ধ সত্তার ও শুদ্ধ আলোকের সমান। ইবনুল আরাবী ও সোহরাওয়ার্দী আল মকতুলের মতে 'বিপরীত' সম্পর্ক অস্তিত্বশীল বস্তুর সম্পর্ক নয়, এটা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সম্পর্ক, আলো অস্তিত্বশীল আর অন্ধকার অস্তিত্বহীন। স্পিনোজার মতো তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব সত্তা সকল ভাল ও কল্যাণের উৎস এবং অবাস্তব সত্তা সকল মন্দ ও অকল্যাণের উৎস।[২]

ইবনুল আরাবীর ভাল মন্দ বা কল্যাণ অকল্যাণের ধারণা শুধুমাত্র নৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়।[৩] এই ধারণা অতি ব্যাপক এবং এর মধ্যে পার্থিব দুঃখ, দুর্বলতা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, পাশবিক নিষ্ঠুরতা বা নির্দয়তা ইত্যাদি ধারণা অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে নৈতিক মন্দ বা অকল্যাণ ও অন্যান্য সকল প্রকার অকল্যাণ আপেক্ষিক। কোন বস্তু বা কার্যকে নিম্নলিখিত কারণে মন্দ বা অকল্যাণ বলা হয়[৪] :

(১) কোন ধর্মের নীতি অনুসারে, (২) কোন নৈতিক নিয়ম বা প্রচলিত প্রথা অনুসারে, (৩) কোন ব্যক্তির স্বভাব, মেজাজ অথবা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে এবং (৪) কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক নৈতিক বা যৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হয় বলে। বস্তু বা কার্যের ভাল মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণ বিচারের নিয়মাবলী বা মানদণ্ড ছাড়া এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য মানদণ্ড এবং বস্তুগুলোর সত্তা ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই যাকে ভাল বা মন্দ অথবা কল্যাণ বা অকল্যাণ বলা যায়।[৫] মন্দ বা অকল্যাণ শ্রেণীভুক্ত বলে উপরোল্লিখিত কার্য ছাড়াও অকল্যাণ বা মন্দের শ্রেণীতে অজ্ঞতা, মিথ্যা, অমিল, অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা, কুৎসিত, পাপ,

---

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 157.
২. Futuhat I, p. 520. I. 5.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 157.
৪. Ibid, p. 157.
৫. Futuhat II, p. 760. Fusus, p. 446.

দেবতাবাদিতা, অধৈর্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[১] কেননা, এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছুর অভাব আছে এবং সে অভাব পুরণ করলে তখন আর এগুলোকে মন্দ বা অকল্যাণ বলা যায় না।[২] জালালউদ্দীন রুমীও এ বিষয়ে প্রায় একই কথা বলেছেন। অতএব দেখা যায় যে সম্পূর্ণ মন্দ বা অকল্যাণ বলে কিছু নাই। যা আছে তা কল্যাণ বা ভাল[৩] মন্দ বা অকল্যাণ, আপেক্ষিক ও আত্মগত।[৪] এর বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। ভাল বা কল্যাণকে যখন মন্দ বা অকল্যাণের সাথে তুলনা করা হয়, তখন তা আত্মগত ও আপেক্ষিক হয়। একমাত্র শুদ্ধ সত্তাই পরম কল্যাণ বা পরম মঙ্গল।[৫] অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ পরম কল্যাণ।

ভাল মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে ইবনুল আরাবী আর এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কোন জিনিস, বস্তু বা অন্য কোন কিছুর ভাল মন্দ আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।[৬] অনেক সময় একটি জিনিস, বস্তু বা কার্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তাকে মন্দ বলা হয়। প্রত্যেকটি বস্তু বা কার্যের দুইটি দিক আছে—একটি ভিতরের দিক এবং অন্যটি বাইরের দিক।[৭] আল্লাহ্ বা স্রষ্টার আসল উদ্দেশ্য বস্তুর ভিতরের দিকেই প্রতিফলিত হয়, আর এই ভিতরের বিষয় না বুঝে তাকে মন্দ বা অকল্যাণ বলে উল্লেখ করা ঠিক নয়।[৮] তাঁর অভিমত ঔষধের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায়। ঔষধের উদাহরণের সাহায্যে ভাল-মন্দের বা কল্যাণ-অকল্যাণের আপেক্ষিকতা ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলেন ঔষধ সম্পর্কে অজ্ঞ একজন রোগী ঔষধকে মন্দ বলে। রোগী ঔষধকে মন্দ বলে কারণ (১) রোগীর কাছে যে কারণে ঔষধ সুস্বাদু হতে পারে সে গুণ ঔষধের নাই, (২) ঔষধের মধ্যে যে ভাল গুণ আছে সে সম্পর্কে রোগী অজ্ঞ। তাছাড়া আসলে ঔষধ ভাল ছাড়া মন্দ নয়। তিনি বিশ্বাস

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 158.
২. Rom Laudan, Ibid; p. 44.
৩. Ibid, p. 44.
৪. Ibid, p. 44.
৫. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 158.
৬. Ibid, p. 158.
৭. Ibid, p. 158.
৮. Ibid, p. 158.

করেন যে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আগত। অন্য কথায় ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল সকল কিছুই আল্লাহ্‌র প্রকাশ এবং সকল কার্যই আল্লাহ্‌র কার্য, সেগুলোর মধ্যে কিছুকে ভাল বা কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক বলা হয়, অন্যগুলোকে মন্দ বা অকল্যাণ অথবা অমংগল বা অশুভ বলা হয়। আল্লাহ্‌র দয়া সকল বস্তু ও ক্রিয়ার মধ্যেই প্রকাশ পায়। কারণ তাঁর দয়ার ফলেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়।[১] বস্তুগুলো ঐভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্তিত্ব বা পূর্ণতার বিভিন্ন মাত্রা প্রদর্শনের জন্য এবং সেগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অবধারণ সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভাল ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, মংগল ও অমংগল, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা, মান্যতা ও অমান্যতা, পাপ ও পুণ্য, সৎ ও অসৎ, মিল ও অমিল, সংগতি ও অসংগতি, সামঞ্জস্য, ও অসামাঞ্জস্য, ঐক্য ও অনৈক্য ইত্যাদির ধারণা দিয়ে আল্লাহ্‌র স্বরূপ ও মানুষের নিজেদের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা দান করা কারণ এগুলোর সাহায্যেই তাঁকে পূর্ণভাবে জানা যায়। আল্লাহ্ 'আল হাদী' নামে সৎ পথের পরিচালক আবার 'আল-মুজিল' নামে কুপথের পরিচালক।[২] এসব বিপরীত অর্থের নামগুলো অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া মানব জাতির ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সেগুলো বিচার করার মানদণ্ড থাকা উচিত।[৩] যে জাতির এই ধরনের কোন নীতি ও মানদণ্ড নাই সে জাতি সভ্য জাতি হতে পারে না। সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের সাথে নৈতিক দায়িত্বের ধারণার মিশ্রণের ফলে তাঁর এই ধরনের মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে।[৪] এখন দেখা যাক তিনি কি ভাবে ধর্মীয় আইনের সাথে নৈতিক নিয়মাবলীর সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন এবং কি সমাধান দেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অর্থ: ইবনুল আরাবী আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে দুইভাবে বিভক্ত করেন।[৫] (১) আল্লাহ্‌র এক প্রাণের ইচ্ছাকে ঐশী চেতনা বা আল্লাহ্‌র চিরন্তন শক্তি বলা হয়, যা সকল বস্তু ও সত্তার মধ্যে বর্তমান। ধর্মীয় ভাষায় এটাকে 'ঐশী

১. Ibid, p. 159. Fusus, p. 448. Futuhat III, p. 563, 1. 1.
২. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 159.
৩. Ibid, p. 159.
৪. Ibid, p. 159.
৫. Ibid, p. 160.

আজ্ঞা,' 'পূর্ব নির্ধারণ' বলা হয়। বৈজ্ঞানিকরা এটাকে বস্তুর অন্তর্নিহিত নিয়ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে থাকেন।[১] সূক্ষ্মভাবে বলতে হলে এটাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলা যুক্তিসংগত নয়। ইবনুল আরাবীর মতে এর অন্য নাম ঐশী 'সত্তাসার'। আবু তালিব আল মক্কীর মতে এটা 'সত্তাসারের সিংহাসন'।[২] (২) আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকে সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছা বলা হয়।[৩] ইবনুল আরাবীর মতে সৃষ্টি-ধর্মী ইচ্ছা আল্লাহ্‌র এমন এক শক্তি যা দিয়ে তিনি সকল সুপ্ত ও অব্যক্ত সত্তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটান। কোন একটি বস্তুর সত্তা আছে কি না তা আল্লাহ্‌র আজ্ঞা বা প্রথম প্রকার ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত হয়, আর সে বস্তুর বাহ্যিক প্রকাশ হবে কিনা তা আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বহির্জগতের কোন একটি বস্তু বা কর্মের সংঘটন বা অসংঘটন আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।[৪] আল্লাহ্‌র চেতনা বা শক্তি বা আজ্ঞা এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে যে পার্থক্য তিনি দেখান, তাঁর জন্য তিনি হাল্লাজের কাছে ঋণী, যদিও হাল্লাজের মতে প্রথম প্রকার ইচ্ছা আল্লাহ্ হতে আগত 'কিছু একটা'। এটা অনেকটা প্লটিনাসের প্রথম বুদ্ধির মত আগত কিছু একটা। প্রশ্ন উঠে আল্লাহ্‌র প্রথম প্রকার ইচ্ছা ও দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার মধ্যে প্রভেদ কি? এ বিষয়ে তিনি হাল্লাজকে অনুসরণ করেছেন। হাল্লাজের মত তিনি বিশ্বাস করেন যে সকল কার্যই প্রথম প্রকার ইচ্ছা বা ঐশী আজ্ঞা মতে হয়ে থাকে, যদিও পাপ কার্যের মত অনেক কার্য আল্লাহ্‌র আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত।[৫] পাপ কার্যের অর্থ এই যে আল্লাহ্ একটি কার্যের আদেশ দেন কিন্তু পাপ কার্য ঘটুক এটা তিনি ইচ্ছা করেন না। অথবা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে একটি কার্য ঘটুক, কিন্তু তাঁর বান্দা এ কার্য করুক এটা তিনি চান না।[৬] একটি কার্যের আজ্ঞা হলে তা অবশ্যই ঘটবে, অন্যথা হবে না।

তিনি ফেরাউন ও ইবলিশ শয়তানের বাধ্যতাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলে উল্লেখ করেন যদিও তা আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন মাত্র।[৭] আল্লাহ্‌র আজ্ঞা বা

১. Ibid, p. 160.
২. Ibid, p. 160.
৩. Ibid, p. 160.
৪. Fusus, p. 374.
৫. Rom Laudan. Ibid, p. 46, Fusus, p. 164.
৬. Fusus, p. 164.
৭. Tawasin, p. 50. Quoted by. A. E. Affifi, Ibid, p. 161.

প্রথম প্রকার ইচ্ছা অনুসারেই সেই সকল অবাধ্য কার্য ঘটে থাকে, সেগুলো কার্য হিসাবে ঘটে থাকে, নৈতিক বা ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে নয়। আল্লাহ্ কোন সময় কুকার্য সংঘটনের জন্য আজ্ঞা দেন না অথবা তিনি কখনো মন্দ, অন্যায়, অমংগল সৃষ্টি করেন না। তিনি সেগুলোই সৃষ্টি করেন, যা নৈতিক অথবা ধর্মীয় নীতি অনুসারে ভাল বা মন্দ, সৎ বা অসৎ, মংগল বা অমংগল, ন্যায় বা অন্যায় বলে বিচার করা হয়। তিনি সেই-সকল বস্তু বা কার্য সৃষ্টি করেন যাকে ভাল বা মন্দ বলা হয়। কোন কার্য সংঘটিত হোক আল্লাহ্ এমন ইচ্ছা করেন, কার্যের ভাল মন্দ সম্পর্কে ইচ্ছা করেন না। বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশের মধ্যে যখন কার্য সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে ভাল বা মন্দ বলা হয়।[১] কার্য হিসাবে কার্যকে আল্লাহ্ অনুমোদন করেন। যে আল্লাহ্র সমর্থক বা অনুমোদন পায় সে ধন্য বা আশিস প্রাপ্ত, আর এমন কেউ নাই যে আল্লাহ্র কাছ থেকে আশিস প্রাপ্ত হয় না।[২] কিন্তু আইন বা নিয়মের চোখে সকল কার্যই সমান নয়, সেগুলোর মধ্যে কিছু কার্য ভাল এবং কিছু কার্য মন্দ। কিছু কার্যকে ভাল বলে অনুমোদন করা হয় আর কিছুকে মন্দ বলে অনুমোদন করা হয়।[৩] আল্লাহ্ সকল কার্যেরই অনুমোদন দান করেন কারণ প্রকৃতপক্ষে সকল কার্য তাঁরই কার্য। কার্য ও আইনের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তা সাময়িক ও বাহ্যিক।[৪] অজ্ঞতার জন্যই এটাকে বিরোধপূর্ণ বা বিপরীতধর্মী বা অবাধ্য কার্য বলা হয়। এটা বিরোধপূর্ণ নয়, কারণ ভাল-মন্দ সকল কার্যই আল্লাহ্র কার্য এবং সেগুলো আল্লাহ্র আজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর আল্লাহ্র আজ্ঞাই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বৈধ আইন। পাপ কার্য আল্লাহ্র ইচ্ছার অবাধ্যতা বা অমান্যতা নয়, আল্লাহ্র সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছার অবাধ্যতা নয়, এটা পরোক্ষ ধর্মীয় আদেশের অবাধ্যতা মাত্র।[৫]

তাঁর মতে ঐশী আদেশ প্রকৃতপক্ষে কোন আসল আদেশ নয়, এটা মানুষের পক্ষে অগ্নিপরীক্ষা। আল্লাহ্ কোন মানুষকে একটি কার্য করতে আদেশ করবেন আবার তিনিই ইচ্ছা করবেন যে আজ্ঞা দানের কার্য যেন

১. Fusus, p. 319.
২. Fusus, pp. 145 146, Futuhat II, p. 290.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 161.
৪. Ibid, p. 161.
৫. Fusus, p. 319.

সংঘটিত না হয়। অথবা তিনি আজ্ঞা দিবেন যে একটি কার্য সংঘটিত হওয়া উচিত কিন্তু কোন ব্যক্তিকে সেই কার্য করতে নিষেধ করবেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিদের পাপী বলে উল্লেখ করবেন—এমন কথা চিন্তা করা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র আদেশ আসল আদেশ নয়, এটা বিচার বা অগ্নি পরীক্ষা—এ কথা মনে রাখলে ইবনুল আরাবীর মতে আর কোন বিরোধ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নৈতিকতার কথা না বলে মানবিক নিয়ম কানুনের উপর জোর দেন।[১] তিনি নৈতিক নিয়মাবলী ও ধর্মীয় আইনের সামঞ্জস্য স্থাপনের বিষয়ে কোন সংগতিপূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না, তবে তাঁর সমাধান তাঁর মতবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ।

তাঁর মতে আল্লাহ্‌ ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুরই উৎস। আর মন্দ ও অকল্যাণ সংঘটিত হওয়া তাঁর জ্ঞানের[২] পরিপন্থী নয়। বরং যদি আল্লাহ্‌ যাকে মন্দ বা পাপ বলা হয় তা সৃষ্টি না করতেন তবে তা তাঁর জ্ঞানের পরিপন্থী হতো, বিশ্বও পূর্ণ হতো না[৩] কারণ মন্দ, অকল্যাণ বা পাপ ভাল, কল্যাণ ও পুণ্যের সাথে একত্রিত হয়ে বিশ্বের পূর্ণতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বিশ্বের মাঝে পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। মন্দ, অকল্যাণ ও পাপ আছে বলেই মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে এবং দয়াশীল, দাতা ইত্যাদির মতো আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নামের মহিমা মানুষ বুঝতে পারে বা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর নীতিশাস্ত্রের মূলকথা আত্মোপলব্ধি করা'। প্রত্যেকটি বস্তু বা কাজের একটি উদ্দেশ্য আছে আর সে-উদ্দেশ্য নিজেকে উপলব্ধি করা বা জানা, আর এই উপলব্ধি করতে গিয়েই আল্লাহ্‌র অসংখ্য পূর্ণতার একটি বা অন্যটিকে অনুভব করা বা বোঝা যায়। তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন ধারাবাহিক নৈতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করেন নি। এ কথা বলা যায় যে তিনি নির্ধারণ সম্পর্কে নৈতিক মতবাদের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর নীতিশাস্ত্র কোন আদর্শভিত্তিক নীতিশাস্ত্র নয়। এখানে 'কি করা উচিত' সে-সম্পর্কে কিছু না বলে 'কিভাবে কাজ করা হয়' এবং কার্যের "আসল কর্তা কে" ? এই সব কথা বলা হয়েছে।[৪]

১. Rom Laudan, Ibid. p 47.
২. Wisdom on Province.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 162.
৪. Futuhat III, pp. 568-70.

বেহেস্ত-দোজখ, শাস্তি ও পুরস্কার : ইবনুল আরাবীর দার্শনিক আলোচনার মধ্যে পরজগৎ, শাস্তি, পুরস্কার, দোজখ, বেহেস্ত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিজের পছন্দ মতো তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর উল্লেখিত বেহেস্ত ইসলাম ধর্মে বর্ণিত বেহেস্ত নয় বা তাঁর দোজখও ইসলাম ধর্মে বর্ণিত দোজখ নয়। তাঁর নৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ অনুসারে বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তিনি কোরআনে বর্ণিত পরজগৎ, বেহেস্ত, দোজখ, শেষ বিচারের দিন, ফেরেস্তা সহকারে আল্লাহুর আবির্ভাব, দাঁড়িপাল্লা, বড়জোখ, বেহেস্তের সুখ, দোজখের শাস্তি, বেহেস্ত ও দোজখের বিভিন্ন স্তর, হযরত মুহাম্মদের সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার পর বলেন যে, সাধারণ মুসলমানগণ এসবগুলো যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সে-অর্থেই যে তা গ্রহণ করতে হবে এমন কথা নয়। তিনি বলেন যে 'হাশর' বা শেষ বিচারের দিন, বরজোখ বা মধ্যবর্তী অবস্থা, 'মিজান' বা পাপ-পুণ্য ওজনের দাড়িপাল্লা, 'আজাব' বা শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক অবস্থার প্রতীক এবং ধারণার মূর্ত রূপ মাত্র। তাঁর মতে হাদীস থেকে শুধুমাত্র বিভিন্ন শব্দ জানা যায়।[১] শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে দেখতে হয়। তিনি নিজেও তাই করেছেন। তাঁর মতে শেষ বিচারের দিনে সুপারিশের জন্য মধ্যস্থকারী কোন ব্যক্তি নাই।[২] 'শাফায়ত' শব্দ দয়াশীল ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী—এই দুইটি ঐশী নামের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধ বিশেষ। 'পুলসিরাত' ঐশী সত্তা-সারে ভ্রমণ করার সোজা পথ, সেই পথে সব কিছুই ভ্রমণ করে কারণ সেই পথ ধরেই সব কিছু উৎপত্তি হয়েছে এবং সেই পথ ধরেই ফিরে যাবে। দোজখের শাস্তি মানুষের কার্যের প্রতীক মাত্র, বেহেস্ত 'জান্নাত' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে, এর অর্থ 'গোপন করা' এবং সব কিছু গোপনকারী বস্তু ঐশী সত্তা। এই সত্তার মধ্যে সকল প্রকার বহুত্ব ও বৈচিত্র্য গোপন রয়েছে। 'দোজখ' শব্দ দিয়ে আল্লাহুর নিকট হতে 'দূরত্ব' বোঝায়। মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একাত্মতা বুঝতে অক্ষম হওয়াই প্রকৃত দোজখ। 'হাশর' বা সমবেত

১. Futuhat I, p. 412, 1-4.
২. Fusus, pp. 186-187, Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 165.

হওয়ার অর্থ এক সার্বিক পথে আত্মার মধ্যে সকল আত্মার সমবেত হওয়া।[১] 'কিয়ামত' বা পুনরুত্থান অর্থে তিনি মৃত্যুর পর সকল আত্মার গৃহে প্রত্যাগমন বুঝেছেন।[২] তাঁর মতে বেহেস্ত ও দোজখ কাল্পনিক অস্তিত্ব মাত্র। সেগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই।[৩] বেহেস্ত ও দোজখ দুইটি মানবিক অবস্থা। আত্মাকে 'বান্দা' বা দাস মনে করাই দোজখ আর নিজ আত্মায় ঐশী আত্মার প্রাধান্য উপলব্ধি করাই বেহেস্ত।[৪] পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সকলেই মুক্তি পাবে, অতএব তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে বেহেস্ত ও দোজখের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। দোজখবাসীরা বেহেস্তবাসীদের মতো সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করবে, তাদের ভাগ্যে কেবল আল্লাহ্‌র সন্দর্শন লাভ হবে না। বেহেস্তবাসীরা আত্মার 'প্রথম প্রকাশ অবস্থা' সন্দর্শন করবেন[৫] এবং প্রথম সাক্ষাতেই চিনতে পারবেন, দোজখবাসীরা তা পারবে না। সেখানে বহু পর্দা থাকবে এবং সর্বশেষে সকল পর্দা উঠিয়ে নেওয়ার পর বেহেস্তবাসী ও দোজখবাসী উভয়ের অবস্থা এক সমান হবে। তিনি বলেন যে ইহজীবন ও পরজীবন একই জীবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য বা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুইটি দিক মাত্র। যেহেতু পরম সত্তা এক, সেহেতু জীবনও এক হবে, ইহকাল ও পরকালের দুইটি স্বতন্ত্র জীবন নয়।[৬] পরজীবন বলতে যদি কোন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন বোঝায় তবে তিনি সে পরজীবন অস্বীকার করেন। মৃত্যুর পরে আত্মা পরম আত্মায় ফিরে যায় অর্থাৎ তার উৎসস্থলে প্রত্যাগমন করে। তাঁর মতে শারীরিক শাস্তি বলে কোন শাস্তি নাই। তাছাড়া তাঁর মতে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে এমন কথাও কোরানে নাই, কোরানে দোজখের 'অনন্ত জীবনের' কথা আছে, অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করা এবং দোজখে অনন্তকাল ধরে বাস করা এক কথা নয়। তিনি মনে করেন যে দোজখের জীবন শাস্তিহীন হবে।[৭] যদিও পাপী দোজখে শাস্তি পায় তবুও সেখানে পাপীরা ভিন্ন ধরনের শাস্তি পায়।[৮] বেহেস্ত ও দোজখের শাস্তি প্রায় একই রকম, তবে

১. Ftuhat I, p. 391, 1-5.
২. Futuhat I, p. 328.
৩. Fusus, p. 328. Dr A. E. Affifi, Ibid, p. 166.
৪. Fusus, pp 286-287.
৫. Fusus, p. 153.
৬. Dr. A E. Affifi, Ibid, p 167.
৭. Futuhat III, p. 100, 1-9.
৮. Fusus, p 153.

দুই স্থানে দুই ধরনের আল্লাহ্‌র নুর প্রকাশ পায়। দোজখবাসীরা আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সাময়িকভাবেও একাত্মতা অনুভব করতে পারে না। একাত্মতা অনুভব করা তার তত্ত্ববিদ্যার মূল কথা। এই একাত্মতা যে অনুভব করে সে ঐক্যে পৌঁছায়, যে উৎস হতে উৎপত্তি সে উৎসে ফিরে যাওয়া বোঝায়, মৃত্যুর পর মানবাত্মা পূর্ণভাবে সেখানে ফিরে যায়। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মানুষ এ জগতে যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করে, পরজগতে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে সেখানে ফিরে গিয়ে সে সেই পরিমাণ বা মাত্রায় বৌদ্ধিক সুখ অনুভব করবে।[১] অন্য কথায়, এ জগতের জ্ঞানের অনুপাতেই পরজগতের জ্ঞান নির্ধারিত হয়। এ জগতের আল্লাহ্‌র জ্ঞান, পরজগতের আল্লাহ্‌র জ্ঞান নির্ধারণ করে। ইবনুল আরাবী এশী জ্ঞানের বা মারফতের উপর বিশেষ জোর দেন এবং এই জ্ঞানই বেহেস্তবাসী ও দোজখবাসীর মধ্যে প্রভেদ রচনা করে, দোজখবাসীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে পূর্ণ একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হয় না। অপরপক্ষে বেহেস্তবাসীদের জ্ঞান সম্পূর্ণ। তাঁরা আল্লাহ্‌কে পূর্ণরূপে জানেন এবং তাঁর সাথে একাত্মতা অনুভব করেন।[২] প্রকৃত জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁর বর্ণিত বেহেস্তের চাবিকাঠি। অপরপক্ষে অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস দোজখের চাবিকাঠি। মানুষের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পর্ক নিরূপিত হয়। মানুষ যখন পরম ঐক্যের কাছে ফিরে যায় তখন সে তার বিশ্বাসের সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারে। ঐ বিশ্বাসের সত্য-মিথ্যার উপরে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের ভাল বা মন্দ সম্পর্ক নির্ভর করে। একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র সংস্পর্শে আসতে পারে আর এটাই বেহেস্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বৌদ্ধিক শান্তি। দোজখে কোন শারীরিক শাস্তি নাই, সেখানে 'পর্দা' এবং 'অজ্ঞতা' হয় চরম শাস্তি। প্রকৃত জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দোজখের পর্দা ও অজ্ঞতার শাস্তি ভোগ করে।[৩]

তিনি বিশ্বাস করেন যে পরজগতে প্রত্যেক আত্মা তার আধ্যাত্মিক উন্নতির মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে একত্রে সমবেত হবে এবং নিজ

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 168.
২. Futuhat, III, p. 568, 1.13.
৩. Futuhat III, p. 577 1.3.

নিজ স্থান অনুসারে সুখ ভোগ করবে। একটি আত্মা তার জ্ঞানের পরিমাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাত্রা অনুপাতে পরজগতে সুখ ভোগ করবে, তার কম কিংবা বেশী সুখ ভোগ তার পক্ষে অসম্ভব। তখন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সকল বাধা দূর হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটি আত্মা সর্বদ্রষ্টা ও সর্ব শ্রবণকারী সত্তায় পরিণত হবে কেননা প্রত্যেকটি আত্মাই তখন পরমাত্মা ভিন্ন কিছু নয়। তাঁর এই কথা হতে বোঝা যায় যে, পরজগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-পরিচয় থাকবে[১] এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে সুখ ভোগ করার জন্য স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকবে। পরজগতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করার ফলে তিনি একটি উভয়সঙ্কট যুক্তির সম্মুখীন হন। যদি পরজগতে সুখ ভোগের জন্য আত্মার বহুত্বকে স্বীকার করা হয় এবং আল্লাহ্‌কে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা হয় তবে তাঁর সমগ্র অদ্বৈতবাদী দার্শনিক মতবাদ উলট-পালট হয়ে যায়। কারণ সেখানে আল্লাহ্‌ ও বিভিন্ন আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাঁর মতে সব কিছু মিলে এক পরম ঐক্য। আল্লাহ্‌ বা পরমাত্মা কেবলমাত্র একটি। আত্মার বহুত্বকে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করলে মানবাত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈত মতবাদকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। যদি আত্মাকে আত্মগত বা মনোগত মনে করা যায় তবে বিভিন্ন আত্মার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা বলে কিছু থাকে না। সকল আত্মা এক সার্বিক আত্মায় পৌঁছানোর পর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সত্ত্বেও পরম ঐক্যের মধ্যে ঐক্য গঠন করে, যেমন করে পার্থিব জগতের বিভিন্ন বস্তুর বহুত্ব থাকা সত্ত্বেও সেখানে পরম আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বহুত্ব ও ঐক্যের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে পরজগতে আত্মার অস্তিত্বের বাস্তবতা, তাদের বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ, সুখ ভোগ ও আল্লাহ্‌র ঐক্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। একজন সূফী বা অতীন্দ্রিয়বাদী এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী।

প্রেমতত্ত্ব

ইবনুল আরাবী 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' দর্শনে পরম সত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দেখা হয়েছে। তাঁর তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে পরম সত্তা এক সর্বব্যাপী সত্তা।

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 169.

এই সত্তা অন্যান্য সকল সত্তা ও বস্তুর অস্তিত্বের উৎস। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে এই পরম সত্তা সর্বসক্রিয় ও সর্বইচ্ছা প্রকাশক নীতি। ধর্মের মধ্যে এই পরম সত্তা একমাত্র উপাস্য সত্তা। সুফীবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমীবাদের মধ্যে সেই সত্তাই সর্বব্যাপী চেতনা। তাঁর সৌন্দর্যবিজ্ঞানের মধ্যে এই পরম সত্তাই সর্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্য বা পরম সুন্দর।[১]

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ দেখা যায় তা পরম সত্তারই প্রেম প্রকাশ। তাঁর পূর্বে অন্যান্য সুফী-সাধকরা এবং বিশেষ করে হাল্লাজ, আল্লাহ্‌কে 'পরম প্রেম' এবং বিশ্বকে 'সর্বব্যাপী প্রেমনীতি'র প্রকাশ বলে মনে করতেন। তিনি তাঁদের সাথে একমত প্রকাশ করে বলেন যে 'প্রেমই পরম বস্তু', পরম ধন, সাধকের পরম কাম্য বস্তু।[২]

তাঁর মতে প্রেম তিন প্রকার[৩] (১) স্বাভাবিক প্রেম বা মানবীয় প্রেম, (২) আধ্যাত্মিক প্রেম এবং (৩) ঐশী প্রেম। ঐশী প্রেম পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহ্‌র প্রেম। এই প্রেম সবকিছুর উৎস। এই প্রেম হতে অন্যান্য প্রকার প্রেমের উৎপত্তি হয়। কোন বিশেষ রূপ গ্রহণের পূর্বে পরম সত্তা নিঃসঙ্গ বা একাকী অবস্থায় নিজেকে নিজে ভালবাসেন, নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা তাঁর মনে জাগে এবং তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রেমই সৃষ্টির মূল। নিজেকে ভালবেসে পরম সত্তা নিজ সত্তায় সুপ্ত অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান সকল কিছুর আদর্শ সত্তা ও রূপ বা 'আয়ান'কে ভালবেসেছেন। সেই কারণে সে সকল আদর্শ সত্তা ও বস্তু ঐশী প্রেম লাভ করে এবং বিভিন্নভাবে সে প্রেমনীতি প্রকাশ করে। বিভিন্ন বস্তু ও সত্তার সত্তা ও আকার সৃষ্টির পূর্ব হতে সেগুলোর প্রেম শুরু হয়েছে অর্থাৎ যখন সেগুলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী শব্দ 'হও' শুনেছে তখন হতে তাদের প্রেম প্রকাশ পেয়েছে।[৪]

তিনি বলেন আধ্যাত্মিক প্রেমই মরমী প্রেম বা অতীন্দ্রিয় প্রেম। তার মূল উদ্দেশ্য প্রেমিক ও পরম প্রেমিকার আধ্যাত্মিক মিলন সাধন।[৫] মানবীয়

১. Dr. A.E. Affifi, Ibid, p. 170.
২. Ibid, p. 171.
৩. Ibid p. 171.
৪. Futuhat, II, p. 437, I. 8. from Footnote.
৫. Futuhat II, p. 441, 1. 16.

প্রেম কখনো একজন সাধককে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যায় না এবং আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা অনুভব করতে সাহায্য করে না। কেবলমাত্র ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায় ও সমগ্র সত্তায় ঐক্য অনুভব করায়। প্রেমিক তখন বুঝতে পারে যে, সব কিছু মিলে এক, সব কিছুর মূলে এক, সকল সত্তার মূল সত্তা এক, সকল প্রেমের মূল প্রেম এক, আর সেই একই 'পরম আত্মা, বা 'পরম সত্তা' বা আল্লাহ্।[১] তাঁর মতে ঐশী প্রেম ও ঐশী সত্তা ভিন্ন বস্তু নয়, প্রেমের উদ্দেশ্য প্রেমের বস্তুকে জানা এবং প্রেমের বস্তুই স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তা। তিনি প্রেম বলতে সত্তা হতে ভিন্ন কোন অমূর্ত ধারণা বা অমূর্ত গুণ বুঝেন নি, এটা প্রেমিকার মধ্যে অবস্থিত কোন সম্পর্ক নয়, এটা আল্লাহ্‌র প্রেম বা স্বয়ং আল্লাহ্। প্রেমিক যখন কোন বিশেষ আকার বা রূপকে ভালবাসেন তখন তিনি সে আকার বা রূপের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রকাশ দেখতে পান। যখন তিনি বিভিন্ন বস্তু বা সত্তাকে ভালবাসেন তখন তিনি মনে করেন যে, তিনি বিভিন্ন আকার বা রূপের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন। যদি কেউ বলে যে সে কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষকে ভালবাসে তবে তা সে তার অজ্ঞতার ফলেই বলে, কেননা সেই ব্যক্তি বা বস্তুই সম্পূর্ণ 'পরম সত্তা' নয়, অন্যত্রও পরম সত্তার প্রেমের প্রকাশ বর্তমান আছে। আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসা হয় না যেমন আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা হয় না।

তিনি 'অবতার', সম্পূর্ণভাবে একের আত্মায় মিশে যাওয়ায় বিশ্বাস করেন না এবং এই রকম ধারণার সাহায্যে তিনি মরমী প্রেম ব্যাখ্যা করেন নি। হাল্লাজের মতো যাঁরা অবতারে বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁদের কাছ থেকে শব্দ চয়ন করেছেন এবং বিশেষ এক দিক হতে তাঁদের মতবাদ স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁদের সাথে সম্পূর্ণ একমত হন নি। তিনি 'অবতার' বা 'এক আত্মায় মিশে যাওয়া' ধারণার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সর্বেশ্বরবাদী দর্শন সৃষ্টির আলোকে নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেছেন।[২] হাল্লাজ অবতার ও এক আত্মায় মিশে যাওয়ার ধারণায় বিশ্বাস করতেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইনে তা প্রকাশ পেয়েছে :

১. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 171.
২. Futuhat II, p. 445, Futuhat III, p. 155.

আমিই সে যাকে আমি ভালবাসি, আমি যাকে ভালবাসি সেই আমি।
আমরা দুইটি আত্মা একই দেহে বসত করি।
যদি আপনি আমাকে দেখেন, তবে আপনি তাঁকে দেখেন,
এবং যদি আপনি তাঁকে দেখেন তবে আপনি আমাদের দুইজনকেই দেখেন।[১]

স্পিনোজার প্রেমতত্ত্বের সাথে ইবনুল আরাবীর প্রেমতত্ত্বের যথেষ্ট মিল আছে। যখন বলা হয় যে আমরা আল্লাহ্‌ বা অন্য কিছুকে ভালবাসি তখন আমরা মনে করি যে আমাদের মধ্যে অবস্থিত অথবা অন্য যে কোন আকারের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ নিজেকেই নিজে ভালবাসেন। স্পিনোজাও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা অনন্ত প্রেমের সাহায্যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসি কারণ আমাদের আল্লাহ্‌কে ভালবাসার অর্থ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্ নিজেকে নিজে ভালবাসেন, যেমন আমরা অনন্ত আকারের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌কে জানি, কারণ আমাদের আল্লাহ্‌কে বুঝতে পারার অর্থ আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে নিজে চিন্তা করেন'।[২]

তৃতীয় প্রকার প্রাকৃতিক প্রেম এবং মানবীয় প্রেম, পার্থিব প্রেম, দৈহিক প্রেম ইত্যাদি এই প্রাকৃতিক প্রেমের অন্তর্ভুক্ত।[৩] এই প্রেমের উদ্দেশ্য, তাঁর মতে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করা, ব্যক্তিগত কথা চিন্তা করা, পার্থিব বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা এবং ইহজগতের সকল প্রকার উন্নতি কামনা করা। এই প্রেমের মাঝে মানুষের পরম-কাম্য বস্তু পরম সত্তা, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিংবা আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভ সম্পর্কে কোন চিন্তা করা হয় না। মানুষ আধ্যাত্মিক প্রেমের মধ্যে পার্থিব আত্মা ও তার সকল প্রকার পার্থিব ও বৈষয়িক চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ত্যাগ করে পরম প্রেমিকা আল্লাহ্‌কে জানতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রাকৃতিক প্রেমের মধ্যে প্রেমের কাম্যবস্তু আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে অন্যান্য বস্তুর উপর মনের আসক্তি জন্মায়। অবশ্য অন্যান্য বস্তু বা সত্তার প্রতি যে প্রেম, সে প্রেমও ঐশী প্রেমেরই নিম্নশ্রেণীর প্রকাশ মাত্র। তিনি মনে করেন যে, সৌন্দর্য সকল প্রকার প্রেমের উৎস ও কারণ। তাঁর বহু পূর্বে ইবনে সিনা বলেন যে, প্রেম সবকিছুর মূল পরিচালক, এই প্রেম সকল বস্তু ও সত্তাকে পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি

১. Tawasin pp. 134., Quoted by Dr. A. E. Affifi, Ibid, P. 172.
২. Joachin, Study in Spinoga's Ethics, p. 305.
৩. Dr. A. E. Affifi, Ibid, p. 172.

ইবনে সিনার মতো বলেন যে, আমরা আল্লাহ্কে ভালবাসি কারণ আল্লাহ্ পরম সুন্দর, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এবং সৃষ্টির সবকিছুকে ভালবাসেন। কারণ তিনি সুন্দর জিনিস ভালবাসেন। এক হাদীসে আছে, "আল্লাহ্ পরম সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন।" ইবনুল আরাবী এই হাদীস অনুসরণ করে বলেন যে, আল্লাহ্ পরম সৌন্দর্য, সকল সৌন্দর্যের মূল উৎস। পরম সৌন্দর্য সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক প্রেমের উৎস, পরম সৌন্দর্যই বিভিন্ন আকারের সৌন্দর্যের উৎস। আল্লাহ্ যদিও নিজেকে বিভিন্ন আকার ও রূপের মধ্যে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করেন, তবুও তিনি এ সকলের বহু উর্ধ্বে। তিনি আকারের সৌন্দর্য ভালবাসেন কারণ আকারের সৌন্দর্য তাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশ। সকল প্রকার অমূর্ত ও মূর্ত আকারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সৌন্দর্য ভালবাসতে হয়, অনুভব করতে হয় এবং তাঁর মাধ্যমে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একজন প্রকৃত জ্ঞানী বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত সূফী আল্লাহ্কে এমনিভাবে জানেন, ভালবাসেন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন।

তিনি বলেন যে, প্রেমের মাধ্যমেই সবকিছু পূর্ণতা লাভ করে, কারণ প্রেম সৃষ্টি ও প্রকাশের মূল কারণ এবং উৎসে ফিরে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি। প্রেমের মাঝে মানবাত্মা পরমাত্মাকে জানে, পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করে, পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। সৃষ্টির সর্ব নিম্নস্তর হতে শুরু করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের সকল বস্তু, সত্তা ও জীবের মধ্যে এক পরম সত্তার প্রেম প্রকাশিত হয়েছে এবং এই প্রেমই সৃষ্টির মাঝে একমাত্র কার্যকরী নীতি। মানব বা পূর্ণ মানবের মধ্যে এই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বা প্রকাশ হয়। পূর্ণ মানব সকল প্রকার প্রেম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সকল প্রকার প্রেমের সমন্বয় সেখানে হয়। প্রেমের মাঝে সমগ্র সৃষ্টি প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সৃষ্টির সকল কিছু বাস্তবতা লাভ করে, সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে জানে, মানবাত্মা পরমাত্মাকে জানে, উভয় আত্মার মিলন হয়, মানবের আসল উদ্দেশ্য সাধন হয়, পরম কাম্যবস্তু লাভ করে, মানব পূর্ণ শান্তি লাভ করে।

তাঁর প্রেমতত্ত্বের সাথে স্পিনোজা, বার্গসঁ ও ইবনে সিনার প্রেমতত্ত্বের মূল বক্তব্যের যথেষ্ট মিল আছে। জালালউদ্দীন রুমী এই প্রেমতত্ত্বের ব্যাপক ভাবিত্ত ব্যাখ্যা দান করেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর মতো ইবনে রুশদ (১১২৭-১১৯৮ খ্রীস্টাব্দ) বলেন, খ্রীস্টান, ইহুদী, ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম একই মহাসত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ধর্মের দুইটি অঙ্গ আছে—আভ্যন্তরীণ সত্য ও বাহ্যিক রূপ।[১] আভ্যন্তরীণ সত্য ধর্মের প্রাণ আর বাহ্যিক রূপ তার দেহ। সত্যের অভাবে ধর্মের বাহ্যরূপ আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ইবনে রুশদ ধর্মের বাহ্যিক রূপ উঠিয়ে দিয়ে সার্বিক ও বিশ্বজনীন ধর্মে উপনীত হতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ স্রষ্টার নিদর্শন, বিশ্বের প্রতি কার্যে প্রতি ঘটনায় যে মহাশক্তির স্পন্দন অনুভব করা হয়, তার উপর নির্ভর করা চরম ধর্ম আর এটাই সার্বজনীন ধর্ম। এখানে সকল ধর্মাবলম্বীই একত্র হতে পারে আর এ ধর্ম বিশেষ কোন ধর্মের নিয়মাধীন নয় বলে বিশ্বের সাধারণ নীতিশাস্ত্র এর নীতিশাস্ত্র ও বিধানের পক্ষে প্রশস্ত।

ইবনে রুশদ ধর্মের সত্যকে মানেন, কিন্তু বিশেষ আকার বা রূপকে নয়। তিনি ইহুদী, খ্রীস্টান অথবা ইসলাম ধর্মের কোন নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ হতে চান না। যে অনন্ত ও অনাদি পরম সত্তা এই বিশ্বের বিভিন্ন অণু পরমাণুতে অবিরাম তরংগায়িত হয়, প্রতি আত্মার নিভৃত প্রদেশে যার স্পন্দন জাগে, তার জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর প্রয়োজন নাই। তিনি চান সেই ধর্ম যা অনাড়ম্বর নিছক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিরাট, মহীয়ান ও সার্বজনীন। মানুষের অন্তরে যিনি বিরাজ করেন, যাঁর চেতনায় মানবাত্মা সতত সচেতন থাকে, তাঁকে সন্ধানের জন্য কোন মন্দির, গীর্জা বা মসজিদের প্রয়োজন নাই, অন্তরের ধনকে অন্তরেই সন্ধান করতে হয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আজীবন একটি ধর্মের ভিতর নিমজ্জিত থাকে, তার চিন্তা সেই ধর্মের বাইরে পৌঁছাতে পারে না, বাইরের কথা, অন্য ধর্মের কথা সে চিন্তা করতে পারে না। যে ব্যক্তি বহু ধর্মের একত্র সমাবেশ দেখেছে, সে সীমার লঘু বুকে কোন একটি ধর্মের মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্বজগৎ বিশ্বস্রষ্টার মূর্ত বিকাশ বা প্রকাশ। বিশ্বস্রষ্টা সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তর্যামী সত্তা, বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মধ্যে বিরাজিত, তাঁরই জীবনে জীবিত বিশেষ বস্তু, আকার বা রূপের সীমা অতিক্রম করলেই অনন্তের সন্ধান পাওয়া

১. মোঃ বরকতুল্লাহ: পারস্য প্রতিভা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, ষষ্ঠ মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ: ৩৪।

যায়। আল্লাহ্‌র সিংহাসন পৃথিবীর ঊর্ধ্বদেশে মানব চিন্তার অতীত কোন প্রদেশে নয় এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাস করেন না, এই বিশ্বই তাঁর বিরাট আধার। তিনি বিশ্বের ভিতর ও বাহির সর্বত্র সর্বব্যাপী আত্মারূপে অবস্থান করেন। আল্লাহ্ কিছু সৃষ্টি করেন না, অপ্রকাশকে প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই সেই অনন্ত শক্তির ভিতর বিদ্যমান। সৃষ্টির অব্যক্ত বস্তু পরম সত্তার মধ্যে অব্যক্তভাবে বিরাজ করে। যেদিন তিনি অব্যক্ত সত্তাকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করেন সেদিন বলা হয় যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। অতীতও এক সময় অব্যক্ত ছিল, এখন আবার অতীতরূপে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে আছে। মোটের উপর বিশ্বজগতের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নাই, যদিও প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ জীবন এখানে উৎপত্তি হয় ও এখান হতে বিলীন হয়। বিশ্বের প্রস্ফুট ও অস্ফুটের সমাহার করলে দেখা যায় সমষ্টি বরাবর একই রয়েছে। দৃশ্যমান জগতকে ব্যষ্টির দিক হতে যেমন বহুধা বিভক্ত বলে মনে হয়, সমষ্টির দিক হতে দেখলে তা একটি গোটা অখণ্ড প্রাণময় সত্তা। যে বিরাট শাশ্বত শক্তি বিশ্বকে নিষিক্ত করে অবিরাম উজ্জ্বলিত হয়; তারই এক সসীম প্রকাশ জীবাত্মা। সীমার বাঁধ ভেঙ্গে অসীমের সন্ধান নিতে হয়, অসীমের সাথে পরিচয়ই সকল ধর্মের আভ্যন্তরীণ সত্য। তিনি বলেন যে, অন্ধবিশ্বাস ব্যতিরেকে জগতের দ্বারা ও ধর্ম দ্বারা ধর্মের সত্যকে বুঝতে পারা যায়। তিনি জ্ঞানের দ্বারা মহাসত্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। লৌকিক ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক দার্শনিক ধর্ম প্রচার করেন। ইবনুল আরাবীও ইবনে রুশদের মতো লৌকিক ধর্মের আড়ালে এক দার্শনিক ধর্মমত প্রকাশ করেন। কিন্তু দার্শনিক ধর্মমত কোন কালেই লৌকিক ধর্মের স্থান গ্রহণ করতে পারে না—একথা চিরন্তন সত্য। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পনীত হতে পারে কিন্তু শুধু জ্ঞান বা শুধু ধারণা কখনো ধর্ম হয় না। জ্ঞানের দ্বারা যাকে বোঝা যায়, প্রেম ও আসক্তির দ্বারা তাকে অনুভব করতে হয়। ইবনুল আরাবী অবশ্য প্রেম ও আসক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তার "ওয়াহদাতুল ওজুদ" বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরম সত্তার সন্ধান পাওয়া মুশকিল। আর এই কারণে তাঁর মতবাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। দার্শনিক ধর্মমত ধর্ম নয়, সুচিন্তিত মত মাত্র। দর্শন বা ধর্মীয় দর্শন

হিসাবে এর মূল্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু ধর্ম হিসাবে এটা লৌকিক ধর্মের সমান নয়। তাই ইবনে রুশদের মতো বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ও ইবনুল আরাবীর মতো সুফী দার্শনিকের পরিকল্পিত সার্বজনীন ধর্মমত ভক্তিপ্রবণ মানুষের অন্তরে সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি। মানুষের অন্তরের চাহিদা মিটিয়েছে সাধনামূলক সুফীবাদ।

তাপসী রাবেয়া আল্লাহ্‌কে জানার জন্য ভক্তিপথ অনুসরণ করে বিপুল আনন্দ লাভ করেন। মহাকবি হাফিজ জ্ঞানপথ না ধরে ভাবপথে অগ্রসর হন এবং তাঁর জীবন প্রেমাস্পদের বাসর শয্যায় পরিণত হয়। আল-ফারাবী, আল কিন্দি, ওমর খৈয়াম, ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষী ছিলেন জ্ঞানপথের পথিক, তাঁরা ছিলেন বুদ্ধির রাজ্যে তাই আনন্দের পূর্ণ রূপ তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা আকারে ইংগিতে পরম সত্তার উপস্থিতি বুঝিয়েছেন কিন্তু মিলন অনুভূতির তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হন নি। ইবনুল আরাবীর মধ্যে ভক্তিপথ, ভাবপথ, ও জ্ঞানপথ সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। আর সে কারণেই তাঁর কাছ থেকে আমরা যেমন মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের বাণী শুনতে পাই তেমনি কোরানে উল্লেখিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা তাঁর নিজস্ব মতের পরিচয় পাই। ইবনুল আরাবীর সুফী দর্শন তাই চিন্তার জগতে তাঁকে একটি বিশিষ্ট আসনে আসীন করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

জালালউদ্দীন রুমী

ইসলামী জগতের প্রাণ, সুফীকুলের শ্রেষ্ঠ সাধক, ফারসী সাহিত্যের মহাকবি ও সৃজনশীল দার্শনিক মতবাদের জনক জালালউদ্দীন রুমী পারস্যের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত বলখ নগরে ৬০৪ হিজরী/২৯শে মতান্তরে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১২০৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭২ হিজরী/১২৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মতান্তরে ১৭ই ডিসেম্বর প্রাণ ত্যাগ করেন।[১] পিতার দিক দিয়ে তিনি প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক এবং মাতার দিক দিয়ে খোরাসানের শাসক মোহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের বংশধর। তাঁর পিতামহ মৌলানা হোসেন বলখী এবং পিতা মৌলানা বাহাউদ্দীন উভয়েই ইসলাম ধর্মের খ্যাতনামা সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পিতার নিকট হতে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা, কোরআন, তফসির, হাদীস, ফিকাহ, ইলমুল-কালাম, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করেন।

জালালউদ্দীন যখন শিশু, তখন তাঁর পিতা বাহাউদ্দীনের সাথে খোরাসানের শাসকের সাথে মতান্তর ঘটায় পিতা-পুত্র উভয়ে দেশ ত্যাগ করেন। তাঁর পিতা প্রায় পনেরো বছর ধরে নিশাপুর, বাগদাদ, মক্কাশরীফ, মালটা, লারিন্দা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে অবশেষে কুনিয়ায় ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই স্থানের নামানুসারে তিনি 'রুমী' উপাধি ধারণ করেন এবং ন মগ্র বিশ্বে জালালউদ্দীন রুমী নামে পরিচিত হন। তিনি গভীর স্মৃতিশক্তি

১. (I) অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী, পৃঃ ৪০ ও ৪১। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, বগুড়া। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য প্রতিভা, ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ ১৫৮।

(II) Dr. Khalifa Abdul Hakim : The Metaphysics of Rumi, Lahore, 1965 p. 1.

(III) Dr. R A. Nicholson : A, Literary History of the Arabs, London, 1907. p. 404.

(iv) Dr. A J. Arberry : Classical Persion Literature, George Allen and Unwin Ltd. London, 1958, pp. 214-241.

(v) Syedur Rahman : An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, 3rd, edition, 1963 p. 205-275.

ও তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির অধিকারী এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শরিয়তী ও মারেফতী জ্ঞানের উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। পিতার নিকটে তাঁর সূফী শিক্ষা শুরু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার যোগ্যতম শিষ্য বোরহান-উদ্দীনের নিকট সূফীতত্ত্বে উচ্চজ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি আলেপ্পো ও দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনন্যমনে জ্ঞান সাধনা করেন এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠেন। বোরহানউদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি প্রথম 'শেখ' উপাধি ধারণ করেন। তারপর হতে তিনি কুনিয়ায় অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।[১]

আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভের পূর্বে অর্থাৎ প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত শরীয়ত-পন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু ওস্তাদ শামস্ তবরেজীর সংস্পর্শে আসার (১২৪৪ খ্রীস্টাব্দ) পর হতে তাঁর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি গজল ও কবিতা রচনা, ধর্মনৃত্য ও ধর্ম-সংগীতের একান্ত ভক্ত হন এবং 'মৌলবী সম্প্রদায়' নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দিওয়ান-ই-শামস্ তাবরীজ' 'মসনবী' ও 'রুবাইয়াত' 'ফীহি মা ফীহি' সুপ্রসিদ্ধ।[২] দিওয়ানে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় লিখিত আড়াই হাজার গজলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্লোক আছে।[৩] এই গ্রন্থে তিনি শামস তবরেজীর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ গজল আকারে প্রকাশ করেন। মসনবী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। রাত্রিকালে গভীর ভাবাবেগের মধ্যে তিনি মসনবীর শ্লোক আবৃত্তি করতেন এবং হিশামউদ্দীন তা লিখতেন। আবদুল মওদুদ সাহেব সঠিকভাবে বলেন যে, "সাহিত্য ও আর্টের দৃষ্টিভংগীতে রুমীর 'দিওয়ান' আরও উচ্চাংগের কিন্তু তাঁর মসনবী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র, সূফীতত্ত্বের মধ্যমণি।" মসনবীর আধুনিকতম অনুবাদক নিকলসন বলেন যে, রুমী সর্বকালের সর্বোত্তম মরমী কবি। ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান

১. (I) শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইসহাক বিশ্বপ্রেমিক রুমী, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪, পৃঃ তিন।
(II) E. G Browne : A Literary History of Persia, Vol. III, Cambridge, 1951 pp. 139, 302

২. Dr. A. J. Arberry : Classical Persian Literature, p. 225, 229.

৩. (I) Ibid, p. 230. (II) F. Hadland Davis : The Persian Mystries, Jalaluddin Rumi, Lahore, 1907 (London edition) p. 31.

পেয়েছে এবং মসনবীকে 'ফারসী কোরআন' বলা হয়। যুনমুন মিশরীর সময় হতে সূফী মতবাদে যে তত্ত্ব ও দর্শন সম্বলিত নবযুগের আরম্ভ হয় তা রুমীর মধ্যে একটা অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ লাভ করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের তিনজন শ্রেষ্ঠ সূফীর মধ্যে রুমী একজন। অপর দুইজন সূফী ইবনুল আরাবী ও আল-গাজ্জালী। ফরিদউদ্দীন আত্তার, হাকিম সানাই ও জালালউদ্দীন রুমী এই তিনজন সূফী কবি হিসাবে পরিচিত। মোটকথা, রুমী সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানসম্পদকে আপন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করেন। পারস্যের জ্ঞানীকুলের মধ্যে জালালউদ্দীন রুমীর গ্রন্থে সৃজনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ কল্পনার প্রসারে, গভীর রসানুভূতির সূক্ষ্মতায়, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির বিশালতায় তিনি ছিলেন অসাধারণ।

এই সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক জালালউদ্দীন রুমী তাপসগুরু ও কবিশ্রেষ্ঠ ফরিদ-উদ্দীন আত্তার ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সাধক কবি আবুল মাজদ মজদুদ বিন আদম সানায়ীকে অনুসরণ করে পারসী ভাষায় 'কোরআন'[১] 'মসনবী' 'দীয়ান-ই-শামস্ তাবরীজ' 'ফীহি মা ফীহি' ইত্যাদি প্রধান প্রধান গ্রন্থ রচনা করে তার মধ্যে যে সূফী দর্শন সৃষ্টি করেছেন তা (১) আত্মাতত্ত্ব, (২) সৃষ্টিতত্ত্ব, (৩) বিবর্তনবাদ ও প্রাণপ্রবাহ (৪) প্রেমতত্ত্ব, (৫) মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা, (৬) আদর্শ মানব, (৭) আল্লাহ্, (৮) সর্বেশ্বরবাদ বা ওয়াহদাতুল শহুদ' ইত্যাদি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়।

আত্মাতত্ত্ব

সূফীদের মতে আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের মূলকথা। এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে জানে সে ব্যক্তি তার প্রভুকে জানে।" যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হয়। জালালউদ্দীন রুমী এ বিষয়ে অন্যান্য সূফীদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর 'মসনবী' শুরু হয়েছে আত্মার বিলাপের মধ্য দিয়ে।[২] মূল উৎস হতে বিচ্ছিন্ন

১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ: পারস্য প্রতিভা, ষষ্ঠ ও মুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃঃ ২৭৮।
২. (I) মনিরউদ্দীন ইউসুফ: রুমীর মসনবী।
(II) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৯।

হওয়ার পর আত্মা দেহের মধ্যে বন্দী হয়েছে এবং তার ফলে বিলাপ শুরু হয়েছে, সে নিজ উৎসে ফিরে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। প্রশ্ন উঠে আত্মার স্বরূপ কি? আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সোজাসুজি উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর সে কারণে আল গাজ্জালীর মত সূফীরাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর দেন নি, যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

অধ্যাপক নিকলসন সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সূফীবাদের মূল ভিত্তি কোরান ও হাদিস। এই দুইটি উৎসের উপর ভিত্তি করে সূফীবাদ গড়ে উঠেছে যদিও অনেক সময় বাহির হতে অনেক দেশী ও বিদেশী প্রভাব এর উপরে পড়েছে এবং এর উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।[১] কোরানের মধ্যে অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা হতে প্রত্যক্ষভাবে সূফীবাদ উৎপত্তি হতে পারে, আবার অনেক শব্দ ও উক্তি আছে যা ব্যাখ্যা করলে সূফী-বাদের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদকে সমর্থন করে। আত্মা সম্পর্কে রুমীর মতবাদ কোরান ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁর মতবাদের উপর বিদেশী প্রভাব তথা প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ মনীষীর প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছে।

আল্লাহ্র সর্বশক্তিশালী ক্ষমতা ও আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোরানে 'খাল্‌ক' ও 'আমর' এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'খাল্‌ক' শব্দের অর্থ সৃষ্টি এবং 'আমর' শব্দের অর্থ আদেশ। একমাত্র আল্লাহ্‌ সৃষ্টি ও আদেশের মালিক। ডঃ খলিফা আবদুল হাকিম সাহেব 'খাল্‌ক' ও 'আমর' শব্দ দুইটিকে দর্শনের পরিভাষা অনুসারে যথাক্রমে প্রকৃতি ও ইচ্ছা হিসাবে ভাষান্তর করে বলে-ছেন যে, শব্দ দুইটি সৃষ্টির জগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ বা আত্মার জগৎ বোঝায়।[২] শেষ নবী হযরত মুহাম্মদকে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কোরানে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, "আত্মা প্রভুর আদেশ।" "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে বলুন যে, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ হতে উদ্ভূত"। (কোরান: ১৭ : ৮৫) সূফীদের মতে কোরানের এই আয়াত আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছে এবং 'আদেশ-জগৎ' বা আধ্যাত্মিক

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim : The Metaphysics of Rumi, Fourth impression, 1965, p. 11.
২. Ibid p. 11.

জগৎ বা 'আত্মার জগৎ' যে আত্মার উৎপত্তিস্থল সে কথা উল্লেখ করেছে। এই আদেশের জগতই ইচ্ছার জগৎ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী আত্মার উৎপত্তি হয়েছে। সকল সুফী দার্শনিক কোরানের এই আয়াতকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে আত্মার স্বরূপ, এমন কি আল্লাহ্‌র স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। রুমী এ বিষয়ে বলেন যে, "হে বন্ধু আদেশ জগৎ দেশহীন। সুতরাং আদেশ-কর্তা অধিক রূপে দেশ হতে মুক্ত।" কোরানের অন্যত্র 'কুন' বা 'হও' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আল্লাহ্‌ কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে 'কুন' বা 'হও' শব্দ দিয়ে আদেশ করেন আর সব কিছু শূন্য হতে সৃষ্টি হয়। এই ধারণা হতে রুমী মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র আদেশ স্বগতরূপে অবিভক্ত ঐক্য। এই ঐক্য হতে প্রকৃতি ও তন্মধ্যস্থ সব কিছুর উৎপত্তি হয় এবং এই অবিভক্ত ঐক্যই অবিভক্ত পরম ঐক্যের প্রতি ইংগিত দেয়। অন্য কথায় প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্তারূপে মানবাত্মা এক হিসাবে সৃষ্ট বস্তু এবং অন্য হিসাবে অসৃষ্ট বস্তু। রুমীর বহু পূর্বে মুসলিম যুক্তিবাদী দার্শনিক আল-ফারাবী কোরানের 'খাল্‌ক' ও 'আমর' শব্দ দিয়ে আত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব দেখা যায় দার্শনিক এবং সুফী উভয়েই কোরানের শব্দ ব্যবহার করেছেন আত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁদের মতে আত্মা সৃষ্টজগতের বস্তু হয়েও অসৃষ্ট, আত্মা এই সৃষ্টজগতে মানবদেহের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু সৃষ্টবস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য আত্মায় আরোপ করা যায় না। সৃষ্টজগৎ দেশ-কালের অধীন, আত্মা দেশ কালের বহু ঊর্ধ্বে, দেশ কালের কোন বৈশিষ্ট্য আত্মায় আরোপিত হয় না। সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য আছে। আল-ফারাবী হতে শুরু করে ইবনে রুশদ পর্যন্ত সকল দার্শনিক আত্মাকে প্রজ্ঞা বা 'লগস' অথবা সার্বিক বুদ্ধির সাথে তুলনা করেছেন। সুফীরা আত্মাকে কেবলমাত্র প্রজ্ঞা বা 'লগস' এর সাথে তুলনা করেন নি, 'লগস' এর জগতের বহু ঊর্ধ্বে উঠে পরম সত্তার সাথেও তুলনা করেছেন। জালালউদ্দীন রুমীর মতে কেবলমাত্র একটা পরম সত্তা আছে, পরম সত্তা বহু নয়। পরম সত্তা মাত্র এক এবং কেবলমাত্র একটি হয়, পরম সত্তা কখনো বহু নয়। মানবাত্মা সত্য এবং সত্য হওয়ার ফলে আত্মা সংখ্যায় বহু হলেও মূলতঃ এক। বহুত্বের উপলব্ধি হয় দেশ-কালের কাঠামো হতে আর সে কারণে

সৃষ্টজগতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়। আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা, আত্মা দেশ-কালের অধীন নয়। সুতরাং আত্মার বহুত্ব গুণ আরোপ করা যায় না। রুমীর মতে মানবাত্মা এক সত্তা বা এক পরম আত্মা হতে সৃষ্টি হয়েছে, আর কোরান এর সত্যতা স্বীকার করে।

রুমীর মতে সকল আত্মা মূলতঃ এক। তিনি আত্মার ঐশী একত্বের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, ঐশী একত্বই সকল আত্মা বা বহুত্বের মূল সত্তা। আত্মার ঐশী একত্বের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে এই মতবাদ আপাতঃদৃষ্টিতে অতি সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদ বা ভারতীয় বেদান্তের নির্গুণ অদ্বৈত-বাদের মত মতবাদ সৃষ্টি করে। রুমী কোন যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি বরং কোন যৌক্তিক বিরোধিতার সম্মুখীন হলে তিনি এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্য গ্রহণ করে সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন উভয়ই মনে করেছেন।

পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার ঐক্যকে তিনি 'আলোক'-এর উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রদীপের সংখ্যা বহু হওয়া সত্ত্বেও আলো কিন্তু এক, সকল প্রদীপের আলো মিলে এক আলো। কোরানে বলা হয়েছে আমরা একজন নবীকে অন্য নবী হতে ভিন্ন মনে করি না। রুমী বলেন যে, ঘরে যদি দশটি প্রদীপ থাকে এবং একটি অন্যটি হতে আকার ও গঠনে ভিন্ন ধরনের হয় তবুও একটির আলো অন্যটির আলো হতে ভিন্ন করতে পারা যায় না।[১] আধ্যাত্মিক রাজ্যে আমরা সকলে মিলে আদি অন্তহীন একটি বিস্তৃত দ্রব্য ছিলাম; সূর্যের মতো একই দ্রব্য, পানির মতো স্বচ্ছ ও ঘনিষ্ঠ ছিলাম। রুমী এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সকল ধর্মের মূলে একই সঠিক সত্যের আলো দেখতে পান এবং উদারনীতি ও সহনশীল মতবাদ গড়ে তোলেন। সকল প্রদীপের আলো মিলে যেমন এক আলো সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য যেমন এক সত্য, ঠিক তেমনি সকল আত্মা মিলে এক ঐক্য। আত্মা চিরন্তন বাস্তব সত্তা, যা বাস্তবতাই সত্য এবং যা সত্য তাই বাস্তব এবং সত্য বস্তু চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, ক্ষয়হীন ও অনন্ত। আল্লাহ্ বলেছেন যে, পরম সত্তা কখনো দুইটি হতে পারে না।

---

১. (I) Mathnawi : I, Verse—678-689.
(II) The Metaphysics of Rumi, p. 14.

এই পরম সত্তা কখনো সৃষ্ট বস্তু নয়। অতএব স্বগতরূপে আত্মা অসৃষ্ট, অনন্ত ও চিরন্তন। কোরানে অনেক আয়াত আছে, যা দিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীরা আল্লাহ্‌র একটি আধ্যাত্মিক ধারণা গঠন করতে পারেন। কিন্তু আত্মার অসৃষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে তেমন কোন ধর্মীয় ভিত্তি নাই বললেই চলে। কোরানের মতে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তার কাছে ফেরেস্তাগণ মাথা নত করেছেন, তবুও সে একজন মানুষ, আল্লাহ্‌র সমান অথবা আল্লাহ্‌র মত কোন চিরন্তন সত্তা নয়। মানুষের আত্মা অসৃষ্ট সত্তা—এই ধারণা আপাতঃদৃষ্টিতে কোরানের শিক্ষার বিপরীত বলে মনে হয়। সূফীরা আত্মা অসৃষ্ট এই ধারণাকে কোরানের সৃষ্টি ধারণার সাথে সংহতি বা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন, মাটি দিয়ে আদমের দেহ তৈরী করে তার মধ্যে আল্লাহ্ নিজ আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আদমকে চেতনাপূর্ণ জীবে পরিণত করেন। আদম যদি শুধু মাটির দেহ-ধারী জীব হতো তবে তাকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ কখনো ফেরেস্তাদের আদেশ করতেন না। সূফীরা বিশ্বাস করেন যে, ফেরেস্তা কর্তৃক আদমকে সেজদা করাই প্রমাণ করে যে আদমের দেহের মাঝে ঐশী সত্তা আছে, আদম কেবলমাত্র কাদামাটির মানুষ নয়, আদমের মাঝে যে ঐশী শক্তি আছে তা আল্লাহ্‌র আত্মা। আল্লাহ্‌র আত্মা অসৃষ্ট ও চিরন্তন। সূফীরা মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে তুলনা করেন এবং অসৃষ্ট ও চিরন্তন বলে বিশ্বাস করেন। মানবাত্মা সৃষ্টি হয়েছে এ কথা অস্বীকার করার ফলে সূফীরা এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যেহেতু আত্মা অসৃষ্ট, সেহেতু আল্লাহ্ আত্মার স্রষ্টা নন। এ সম্পর্কে রুমী বলেন, একজন স্পষ্ট বক্তা মরুভূমিতে বলেছিলেন "এক-জন সূফীর আল্লাহ্ নাই, সে সৃষ্ট জীব নয়।"[১] ডক্টর খলিফা আবদুল হাকিম সাহেব বলেন যে, রুমীর মস্‌নবী শরীফ এই ধরনের উক্তিতে পরিপূর্ণ।[২] মানুষের ক্ষেত্রে 'সৃষ্টি' শব্দ ব্যবহার করে রুমী তৎক্ষণাৎ এ শব্দকে সংশোধন করে বলেন যে 'পরম সত্তা' বা 'সত্য' সৃষ্ট নয়। সূফীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাদের আত্মা সৃষ্টি অথবা উৎপত্তি হয় নি। এছাড়াও মসনবীতে এই ধরনের বহু উক্তি আছে।

১. The Metaphysics of Rumi, p. 15, উদ্ধৃত।
২. Ibid, p. 16.

জালালউদ্দীন রুমীর দর্শনে আত্মা সম্পর্কে এই ধারণা অনেকটা গ্রীক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীক দর্শনে আত্মার স্বরূপ নয় বরং 'লগস' বা প্রজ্ঞার স্বরূপই ছিল গ্রীক তাত্ত্বিক সমস্যার মূল কথা। লগস বা প্রজ্ঞা চিরন্তন—এই ধারণা ইহুদী বা সেমিটিকদের জন্মগত ধারণা। সেখান হতে এই ধারণা খ্রীস্ট ধর্মে প্রবেশ করেছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত আত্মার চিরন্তনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামী হিজরীর প্রথম দুই শতাব্দী ধরে মুসলমানেরা আল্লাহ্র ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল।[১] মানুষের নৈতিক উন্নতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল. কোন দার্শনিক মতামত প্রকাশের প্রয়াস সেখানে দেখা যায় না। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে অসীম ও সসীম, নিত্য ও অনিত্য, চিরন্তন ও সম্ভাব্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ইসলামে শুরু হয় এবং ইসলাম ধর্মে একত্ববাদী নিরঙ্কুশ সর্বশক্তিশালী আত্মার ধারণার স্থলে অস্তিত্ব ও অনিবার্য অস্তিত্বের আলোচনা শুরু হয়। সৃষ্ট ও অসৃষ্ট সমস্যার আলোচনা একবার শুরু হওয়ার পর এই সমস্যা 'কোরানের' চিরন্তনতা, বিশ্বের চিরন্তনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে। কোরান কি চিরন্তন বা আল্লাহ্র সৃষ্ট বাণী। বিশ্ব কি সৃষ্টি হয়েছে না আল্লাহ্র মত চিরন্তন বস্তু? এরিস্টটলের দর্শনে বিশ্বের চিরন্তনতা স্বীকৃত হয়েছে এবং আল-কিন্দি হতে শুরু করে ইবনে রুশদ পর্যন্ত সকল মুসলিম দার্শনিক এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে বিশ্বের চিরন্তনতা কোরানের শিক্ষার পরিপন্থী। আবার অনেকে এরিস্টটলের শিক্ষা ও কোরানের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। আল-ফারাবী দৃঢ়ভাবে এরিস্টটলের মতবাদকে স্বীকার করেছেন। ইসলামী দর্শনে ইবনে রুশদের হাতে গ্রীক দর্শন পরিণত রূপ লাভ করেছে এবং এরিস্টটলের বিশ্বের চিরন্তনতা সম্পর্কীয় মতবাদ ও কোরানের সৃষ্ট মতবাদের সমন্বয় সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইবনে রুশদের মতে বুদ্ধি ও চিরন্তন এক। তিনি বুদ্ধিকে আল্লাহ্র সাথে অথবা বিশ্ব-আত্মার সাথে তুলনা করেছেন। ইসলামের সূফীবাদ মুসলিম দার্শনিকদের সার্বিক বুদ্ধির ধারণা হতে আরও এক ধাপ বেশী অগ্রসর হয়ে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে তুলনা করেছেন

১. Dr. R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, London, 1963, Introduction, p. 4.

এবং মানবাত্মা অসৃষ্ট ও চিরন্তন বলে বিশ্বাস করেছেন। এই রকম ধারণা হতে আলোচনা শুরু করলে যুক্তিগতভাবে আত্মার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। আল-গাজ্জালীর মতে উপরোক্ত ধারণার যুক্তিগত ফলাফল ইবনুল আরাবী বা স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের মত অদ্বৈতবাদ কারণ তিনি যুক্তির পথ ত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রুমী আল-গাজ্জালীকে অনুসরণ করেন। মানবাত্মা অসৃষ্ট ও চিরন্তন এবং মানবাত্মা ও পরমাত্মা একই সমান। এই সমস্যা হতে উদ্ভূত সকল বিরোধ সমাধানের জন্য এবং সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি যুক্তির পথ ত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রুমী পরমাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ দূর করার জন্য বলেন যে এক ও বহু, আল্লাহ্ ও বিশ্ব বা আল্লাহ্র অন্তর্বর্তী ধারণা দেশের সাথে জড়িত ধারণা হতে উৎপত্তি হয়। দেশের ধারণা বহুত্ব সৃষ্টির মূল উৎস, আল্লাহ্র সত্তার মাঝে 'বহুত্ব 'সংখ্যা' ইত্যাদি কোন ধারণা নাই। দেহ দেশ, 'সংখ্যা, ও বহুত্ব সৃষ্টি করে। মানুষের দেহ দিয়ে বিচার করলে মানুষকে বহু সংখ্যায় বিভক্ত করা যায় ও বহুত্ব বলা যায়, কিন্তু আত্মা দিয়ে বিচার করলে বিভিন্ন সংখ্যা ও বহুত্ব থাকে না, এক হয়ে যায়। মানবাত্মা মূলত এক ও অভিন্ন। কোরানের বাণী "তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের এক আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন।" কোরান ৬ : ৯৯)এবং হাদীস 'তিনি (আল্লাহ্) তাদের আপন আলোক দ্বারা আলোকিত করেছেন।' যে সকল ব্যক্তি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে রুমী বলেন : যখন তাদের মধ্য হতে আপনি দুই বন্ধুকে দেখেন, তখন তারা একই সময়ে একজন এবং ষাট লক্ষ জন। তাদের বহুত্ব বাতাসে সৃষ্ট বিভিন্ন ঢেউয়ের মত। আত্মাগুলোর সূর্য বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন জানালায় ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়েছে। জীবাত্মার মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়, মানবাত্মা কেবলমাত্র একটি। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তিনি তাদের উপরে আপন আলোক দান করেছেন' এবং ঐশী আলোক কখনো ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় না।[১]

তাঁর মতে দেশ ও কাল অবভাসিক ও মানসিক, এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব

---

১. (I) Mathnawi, Vol. II, verses 184-189.
(II) The Metaphysics of Rumi, p. 15.

নাই। দেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আপনি দেশের মধ্যে আছেন কিন্তু আপনার সত্তা দেশহীন জগতের বাসিন্দা। এখানে ব্যবসা বন্ধ করে সেখানে শুরু করুন। এই দেশগত বিশ্ব দেশহীন সত্তা হতে উৎপত্তি হয়েছে এবং দেশ শূন্য অবস্থা হতে দেশের মাঝে একটা স্থান করে নিয়েছে।"[১] কাল সম্পর্কে তিনি বলেন, "আপনার চিন্তা কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা, যখন চিন্তা এই দুইটি হতে নিষ্কৃতি পায় তখন সকল সমস্যার সমাধান হয়।[২] "দেশহীন আত্মার আলোক জগতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কিছু নাই। অতীত ও ভবিষ্যৎ আপনার সাথে সৃষ্টি সম্পর্ক হতে সৃষ্টি হয়, প্রকৃত-পক্ষে সেগুলো এক।"[৩] এই দেশকালগত দৃশ্যমান জগৎ দেশকালহীন আলোকময় সত্তা হতে উৎপত্তি হয়েছে, দেশকালের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, দেশ-কাল ও বহুত্বের ধারণা এই বাহ্যিক জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় জগত ঐশী সত্তায় এগুলো আরোপ করা যায় না। সেখানে সবকিছু মিলে এক। ঐশী জগতে দেশ বলে কিছুই নাই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলে এক অনন্তকাল।

তাঁর মতে মানবাত্মা দেশকালহীন জগতের অনন্ত সত্তা, দেশকাল সৃষ্টি ও পরিবর্তনের কারণ। ঐশী জগতে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না। কেমন করে সৃষ্টি হয়? কেন সৃষ্টি হয়? এইসব প্রশ্ন ঐশী জগতে অবান্তর। অতীন্দ্রিয় জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ সত্তার জগৎ। সত্তার জগতে দেশ, কাল, অতীত, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নাই। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা সত্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি দেশ-কাল সম্পর্কে যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, "যখন আমি নির্বাচিত দলের ব্যক্তিদের সাথে ধ্যান শুরু করলাম, তখন আমার আত্মা আমার বাইরে বের হয়ে কালের প্রভাবমুক্ত হয়ে নবীন যুবকের রূপ লাভ করল। সকল পরিবর্তন কাল হতে উৎপত্তি হয়, যে ব্যক্তি কাল হতে মুক্ত সে সকল পরিবর্তন হতে মুক্তিলাভ করে। হে আমার আত্মা, ক্ষণকালের জন্য কালের ঊর্ধ্বে উঠ এবং 'কেমন' ও 'কেন' প্রশ্ন হতে মুক্ত হও। কাল বা সময়

১. (I) Mathnawi, Vol. II, verse 687:
(II) Metaphysics of Rumi, p. 18.
২. Mathnawi, Vol. II, verse. 177.
৩. Ibid, Vol. III. verses, 1151-1152.

কালহীন সত্তার স্বরূপ বা প্রকৃতি জানে না, কারণ একমাত্র বিস্ময়ই তা জানতে পারে।[১]

দেশকালের মাপকাঠিতে বাহ্যিক জগতের সবকিছু বিচার করা হয়, সীমা নির্ধারণ করা হয়, বর্ণনা করা হয়, ধারণা গঠন করা হয়। পরম সত্তা দেশ-কালের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত বলে সে সত্তা সম্পর্কে এই ধরনের কিছু বলা যায় না। অতীন্দ্রিয়বাদী ও সূফীরা এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকতে ভালবাসেন। শুধু অতীন্দ্রিয়বাদ ও সূফীবাদই নয়, কান্টের বিচারবাদী দর্শনও পরম সত্তা বা স্বগত বস্তু সম্পর্কে নিশ্চুপ। এ সম্পর্কে কান্ট কোন বাস্তব উক্তি করেন নি, কেননা তা দেশকালের অধীন নয়। দর্শন ও অতীন্দ্রিয়বাদ বা সূফীবাদ যদিও ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করে তবুও অতি উচ্চ স্তরে সবগুলো প্রায় এক রকম হয়ে যায়। চিন্তা একদিকে দ্রব্য ও গুণ এবং অপরদিকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হতে আলোচনা শুরু করে। রুমী দ্রব্য ও গুণ এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্য হতে আলোচনা শুরু করে শুদ্ধ আত্মার ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করেন। তিনি দ্রব্য ও গুণের পুরাতন সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে, পরম দ্রব্য স্বয়ম্ভু সত্তা, গুণ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে আত্মাই একমাত্র দ্রব্য আর বিশ্বজগৎ ও তার সকল বস্তু বিভিন্ন গুণের সমষ্টি মাত্র। দৃশ্যমান জগৎ শুধু বিভিন্ন বস্তুরই সমষ্টি নয়, এর মধ্যে আত্মা আছে। শুদ্ধ আত্মার ধারণায় পৌঁছাতে হলে অমূর্তকরণের সাহায্যে জড়জীবন হতেও মুক্ত হতে হয়। শুদ্ধ আত্মাকে জড় জীবনের সাথে তুলনা করা যায় না। জড়-বাদী দার্শনিকেরা জড় বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, নিজেকে জড়বস্তু ও জড়বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার সাথে তুলনা করেন এবং অনেক সময় আত্মাকে বৌদ্ধিক জ্ঞান অথবা লগস বা প্রজ্ঞার সাথে তুলনা করেন। প্রায় সকল দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বাদের মূলে এই ধরনের অমূর্তকরণ প্রক্রিয়া বর্তমান। শংকরাচার্য তাঁর বেদান্ত ভাষ্যের মধ্যে এবং প্লাটিনাস তাঁর দর্শনে অনির্বচনীয় ও অসংজ্ঞায়িত একক সত্তার ধারণায় পৌঁছানোর জন্য একই ধরনের অমূর্তকরণ প্রক্রিয়া অনু-সরণ করেছেন। যারা নিজেদেরকে জড়বস্তু বা তার বিভিন্ন অবস্থা বা আকারের

১. (I) Ibid, Vol. III, verses, 2072-2076.
(II) Metaphysics of Rumi, p. 19.

সাথে তুলনা করেন, রুমী তাদের সম্পর্কে বলেন যে, আপনি নিজেকে অনাত্মার মাঝে হারিয়ে ফেলেছেন, আপনার আত্মা হতে অনাত্মাকে পৃথক করে দেখেন নি। আপনি প্রত্যেক আকারের কাছে থেমে গিয়ে মনে করেছেন এবং বলেছেন "এটাই আমি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি তা নন।"[১] আল্লাহ্ সকল নাম ও গুণের অতীত।* গুণ ও সংজ্ঞা হতে ধারণার উৎপত্তি হয়, আল্লাহ্ সকল ধারণার অতীত।[১]

রুমীর মতে জড় জগৎ আত্মা হতে ভিন্ন, কিন্তু তা মিথ্যা বা মায়া নয়। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, জীব ও মানুষ সকলেই আত্মার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় মাত্র। মানবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একই, কিন্তু সৃষ্টি প্রবাহে মানবাত্মা পরমাত্মা হতে পৃথক হয়ে পড়েছে। জড় দেহের সংস্রবে এসে মানবাত্মা নিজের পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু তার স্বভাবগত আকর্ষণ রয়েছে তার মূল উৎস পরমাত্মার সাথে। মানবাত্মা সংসারের বিপুল কলরোলের ভিতর আপনার অজ্ঞাতে স্বীয় জন্মস্থানের অজানা বিরহে আকুলি ব্যাকুলি করে ঘুরে, কিন্তু মানব তা বুঝতে পারে না। প্রথমেই রুমী বলেছেন, "শুন বাঁশী (মানবাত্মা তার বেদনায়) কি গান গায়, যে বেণু বন হতে তাকে আলাদা করা হয়েছে সেই বনের বিরহে সে কাঁদে। আর তারই সমবেদনায় কাঁদে সকল নরনারী।"[২] মানুষ আত্মা ও দেহ, আলো ও আঁধারের সমাহার, অবিনশ্বর আত্মার সে অধিকারী। সেই আত্মা ঐশী নূর হতে আগত সত্তা আর এই জ্যোতির্লোকের আলোক তরংগ তার সুপ্ত অন্তরে জাগায় ঐশী অনুভূতি। আবার জৈব দেহের কারণে সে জড় রিপুর অধীন। হিংসা, কাম ও জীঘাংসা তাকে সর্বদা নিচের দিকে টানে। এক দিক দিয়ে জ্ঞানের শুভ্র রজত ধারা, অপরদিকে বিবেকহীনতার গাঢ় কৃষ্ণ কুহেলিকা। মানুষের মধ্যে এই দুইটি বিপরীত শক্তির উপযুক্ত সমন্বয় ঘটলে সে শান্তি লাভ করতে পারে।

*মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভিতরকার শাশ্বত ঐক্য রুমীর দর্শনের মূলকথা। আত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে মানবাত্মা আপনার ভিতর আত্মার প্রকাশ অনুভব করেন এবং অবস্থা নিবিড়তম হলে কখনো কখনো নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে হাল্লাজ মনসুরের মতো "আনাল হক" (আমিই সৃজনশীল সত্য) বলেন।

১. The Metaphysics of Rumi, p. 15, উদ্ধৃতি।
২. মনির উদ্দীন ইউসুফ : রুমীর মসনবী।

রুমী তাঁর 'ফীহিমাফীহি' গ্রন্থে হাল্লাজের 'আনাল হক' বাণীর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, যখন একটি মৌমাছি মধুর মধ্যে পড়ে তখন তার সকল অংগ-প্রত্যংগ একই অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং কোন অংশই আর নড়তে পারে না।[১] তেমনি খোদার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ অবস্থায় নিজের অস্তিত্বের কোন খেয়ালই মানুষের থাকে না। এটাই 'আনাল হক'-এর প্রকৃত অর্থ। যে ব্যক্তি 'আমিই সত্য' বলে দাবী করে, সে এক খোদার অস্তিত্বেই কেবল স্থির বিশ্বাস করে এবং তার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করে দেয়, 'আমার কোন অস্তিত্ব নাই' কেবল এক তিনিই আছেন, আর তাছাড়া কিছুই নাই। এই কথা বিনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। আল্লাহ যেমন এক; মানবাত্মাও তেমনি মূলত এক ঐক্য।

'আসলে আমাদের মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ। মন ও দেহ দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা কিন্তু ঘটনাচক্রে একসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। মানবদেহে পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী জ্ঞান আহরণের পাঁচটি দ্বার আছে; যথা—কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে আত্মার পাঁচটি শক্তি বা বৃত্তি কাজ করে, যা না থাকলে ইন্দ্রিয়গুলো নিজে নিজে কোন তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হতো না। আত্মাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে এবং সহজাত প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি, স্মৃতি, চেতনা ইত্যাদি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সর্বোচ্চ স্তরে "আসল আত্মা" বা আত্মচেতনা নামে উল্লেখিত হয়। আত্মাই ক্রমশঃ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে ও বিভিন্ন নাম ধারণ করে। অবশ্য বিভিন্ন নাম ধারণ করলেও আত্মা মূলত পরমাত্মার মতো এক ঐক্য আর এই কথাই রুমী তাঁর মসনবীর মধ্যে বারবার উল্লেখ করেছেন।

আত্মার অমরতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটি সূফীতত্ত্ববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। একদিকে বলা হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস-শীল, সবকিছুই আল্লাহ্‌র সত্তা ও অস্তিত্ব দ্বারা অস্তিত্বশীল হয়; আবার অন্যদিকে বলা হয় যে মানুষের আত্মা অমর। এমন উভয়সংকট সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয় এই বলে যে, যদিও সত্তা ও অস্তিত্বএকমাত্র আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য, তবুও তার অসীম দয়া ও বদান্যতা গুণে মানুষের 'আত্মা' অমর হয়। রুমী বলেন যে, "এক-মাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল, যখন আপনি তাঁর মাঝে বাস করেন

১. ডক্টর হরেন্দ্রনাথ পাল : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০ কলিকাতা, পৃ ১০৪।

না, তখন আপনি বেঁচে থাকার আশা করতে পারেন না। যিনি 'আমাদের' অস্তিত্বে 'ফানা' হন তিনি সার্বিক মরণশীল নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি 'ফানা' হতে 'বাকায়' পৌঁছান এবং যিনি 'বাকায়' পৌঁছান তিনি মৃত্যুর অধীন নন।' আল্লাহ্ অপূর্ণ, অসীম, স্রষ্টা, জীব মানুষকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম। পরম আত্মায় 'ফানা' হওয়ার অর্থ ধ্বংস হওয়া নয়, এটা পরিবর্তন মাত্র। তাই রুমীর মতে প্রতিপালকের পরম সত্তায় অস্তিত্বশীল অবস্থায় বেঁচে থাকা যেন লোহা সোনায় পরিবর্তন হওয়া। পরশ মণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়, পরম সত্তার সংস্পর্শে এসে মানবাত্মাও অমর হয়।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সূফীরা পাপ মনে করেন, আবার আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করেন। এটা যেন অবোধগম্য। সূফীবাদ বুদ্ধিজাত অতি জ্ঞানের অতীতে উঠে অতিবৌদ্ধিক জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং উভয়সংকট সমস্যার সম্মুখীন হয়।[১] মানব বুদ্ধি 'গুণের' সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তুর 'সত্তাসারের' কল্পনা করতে পারে না। রুমী বলেন যে, আত্মার 'সত্তাসার' বেঁচে থাকে বা অমর হয়, কিন্তু গুণাবলী ধ্বংস হয়।[২] তাঁর এমন উক্তি বেশ হেঁয়ালী বলে মনে হয়, যদিও তিনি অনেক উপমার সাহায্যে এটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, আত্মা দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত হয়েও 'ফানা' হয়ে পরমাত্মার মধ্যে বাস করতে সক্ষম হলেই অমরতা লাভ করে। দেশ ও কাল বহুত্বের সৃষ্টি করে, কিন্তু আত্মা 'ব্যক্তিত্ব, ধ্বংস না করে, পরমাত্মায় অমর হতে পারে।

বায়েজিদ বুস্তামী বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সূফীবাদে 'ফানা' মতবাদ প্রচলিত করেন এবং পরবর্তীকালে মনসুর হাল্লাজ, জুনায়েদ প্রমুখ সূফী 'বাকা' মতবাদের প্রচলনের দ্বারা সূফীবাদের উৎকর্ষ সাধন করেন।' 'ফানা'র অর্থ নৈতিক পরিবর্তন সাধন, আত্মার নিম্ন প্রবৃত্তির নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ। আত্মিক শুদ্ধতা অর্জন মিলনের সহায়তা করে। প্রেমিকের আত্মা শুদ্ধ, নির্মল ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়, তিনি যেন 'জ্যান্ত মরা'। নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নিম্ন প্রবৃত্তির গুণাবলী ত্যাগ করে উচ্চ প্রবৃত্তির গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হলে একজন প্রেমিক

১. Mathnawi, Vol. Iv, verse 68.
২. Mathnawi, Vol. V, verse 104.

প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্মায় 'ফানা' হতে পারেন এবং পরম চিরন্তন সত্তায় অমরতা লাভ করেন। আর রুমীর মতে এরই নাম দ্বিতীয় জন্মলাভ। সাধু পলও ঠিক একই উক্তি করে বলেন যে "আমি নিজে নয় বরং যীশুখ্রীস্টই আমার মধ্যে বাস করেন।" যীশুখ্রীস্টের বাণী : 'জীবন লাভের জন্য জীবনকে হারাতে হয়' অথবা যেহেতু লাভ করতে হলে পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়—রুমীর কথার সত্যতা প্রমাণ করে। রুমী বলেন, দ্বিতীয় জন্মের সময়ে মানুষ সকল কার্যকারণের মাথার উপরে পা দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেন। প্রথম কারণের বিশ্বাসের ঊর্ধ্বেও তিনি উঠেন এবং শেষ কারণেরও বিরুদ্ধে তার বলার কিছু থাকে না।[১] তিনি যে-সকল উপমা দিয়ে 'ফানা' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তার অর্থ কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন আত্মার নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্রবৃত্তি অর্জন, আর সে কারণে তিনি বলেন যে, পরম পালনকর্তার অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল হওয়া যেন স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া মাত্র।

রুমী আত্মার বিবর্তন, উৎকর্ষ সাধন ও অমরতায় দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তিনি বলেন যে, "আল্লাহ্ পরম সার্বিক ঐশী দেহধারী জীব, আর মানুষ এই সজীব দেহের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ। এই সার্বিক ঐশী দেহধারী জীবের অংগ-প্রত্যংগ হতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হওয়া উচিত। সমগ্র হতে অংশের বিচ্ছেদ হলে তা অর্থহীন হয়, দেহ হতে অংগ বিচ্ছেদ করলে তা মৃত হয়। অংগ দেহের সংগে পুনরায় সংযুক্ত না হলে তা জীবনহীন বা মৃত হয়। কিন্তু অসীম ঐশী দেহধারী জীব এমন নয় যে, অংশ হতে বিচ্ছেদ হওয়ার ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়। এই বিচ্ছেদ ও সংযোগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; এখানে একটা অপূর্ণ সাদৃশ্যানুমান দেওয়া হয়েছে মাত্র।[২] রুমী উপমা বা সাদৃশ্য অনুমানের সাহায্যে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কারণ এর কোন যৌক্তিক বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ এমন দেহধারী জীব নয়, যার দেহ হতে কোন অংগ বিচ্ছেদ হলে তার পূর্ণতার ক্ষতি হয়, 'অংশ' ছাড়াই তাঁর 'সমগ্র' সব সময়ে পূর্ণ। পূর্ণ ঐশী দেহের সাথে অংগ বা অংশের সম্পর্ক 'অতিবৌদ্ধিক সম্পর্ক।' দিনের বেলায় সূর্যা-

১. Mathanwi, Vol. III, verse 88.
২. Mathnawi, Vol. III, verse 50.

লোকে নক্ষত্ররাজি যেমন অস্তিত্বহীন বলে মনে হয়, পরমাত্মার সাথে মিলনের ফলে পরমাত্মার জ্যোতিতে মানবাত্মা তেমনি অস্তিত্বহীন মনে হয়।[১] লৌহ যেমন অগ্নি উত্তাপে অগ্নিরূপ লাভ করে, মানবাত্মা পরমাত্মায় বাস করে অমরতা লাভ করে। উত্তপ্ত অবস্থায় লৌহদণ্ড যেমন নিজেকে অগ্নি বলে দাবী করতে পারে, তেমনি পরমাত্মায় অস্তিত্বশীল আত্মা নিজেকে অমর বলে দাবী করে, আর এ দাবী মিথ্যা নয়, এর সত্যতা বহু পরীক্ষিত। তবে উত্তপ্ত অবস্থায় লৌহদণ্ড অগ্নি একথা যেমন সত্য, আবার তা কেবলমাত্র 'লৌহদণ্ড একথাও সত্য। 'ফানার' অর্থ ধ্বংস নয়, পরিবর্তন মাত্র, এবং এইভাবেই আত্মা অমরতা লাভ করে। তিনি বলেন 'তার সত্তা' অমর অবস্থায় বেঁচে থাকে, কিন্তু তার গুণাবলী আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে মিশে যায়। সূর্যের উপস্থিতিতে একটি প্রদীপের আলো যেমন অস্তিত্বশীল, তেমনি অস্তিত্বহীন। প্রদীপের আলো অস্তিত্বশীল, কারণ আলো-শিখায় তুলা ধরলে পুড়ে যায়; আবার অস্তিত্বহীন এই কারণে যে এটা তখন কোন আলো দান করে না, সূর্যের আলো এর আলোকে স্তিমিত করে রাখে।[২]

রুমী এইভাবে শেষ নবী হযরত মুহম্মদের মিরাজ বা স্বর্গারোহণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, জড় দেহধারী জীব কখনও স্বর্গে উঠে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতলাভ করেনি; কারণ আল্লাহ্‌ স্বর্গে বাস করেন না। মানুষের মিরাজ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক। কুপ্রবৃত্তির রূপান্তরের মাধ্যমে সুপ্রবৃত্তির উন্মেষের ফলে চিরন্তন ও অপ্রকাশিত জগতে মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম। তিনি বলেন, লৌহের বর্ণ অগ্নির বর্ণের মধ্যে হারিয়ে যায়, লৌহ অগ্নি বর্ণ ধারণ করে বা অগ্নিরূপ ধারণ করে এবং অগ্নির মত হয়। লৌহ যখন স্বর্ণের মত লোহিত বর্ণ ধারণ অবস্থায় গর্বের সাথে বলতে পারে 'আমি অগ্নি'। অগ্নির বর্ণ ও রূপে গৌরবান্বিত হয়ে এটা বলে 'আমি অগ্নি' 'আমি অগ্নি'। সন্দেহ করলে এস, হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখ এবং আমার মুখে মুখ রেখে চুম্বন কর'। মানুষের অবস্থাও ঠিক এই রকম। আল্লাহ্‌র আলোকে আলোকিত হয়, আর এর জন্যই ফেরেস্তাগণ তাকে সম্মান করেন। নিশ্চুপ থাক, লৌহ এবং অগ্নি কি? সাদৃশ্য অনুমান বিভ্রান্তিকর।

১. Mathnawi Vol. III, verse 113.
২. Mathnawi, Vol. III, verse 113.

তারপর তিনি বলেন যে, জড়দেহ নিয়ে স্বর্গে উঠে আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের কথা সূফীতত্ত্ববিদ্যার বিপরীত, আর সে কারণে সূফী সারমাদ এক সময় বলেন, 'যিনি তাঁর বাস্তব সত্তার গুপ্তভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি স্বর্গের চেয়েও বিস্তৃত। ধর্মতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, নবী স্বর্গারোহণ করেন, কিন্তু সারমাদ বলেন যে, স্বর্গই তাঁর মধ্যে নেমে এসেছিল। রুমী বলেছেন যে, দেশের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় না, অবভাসিক অস্তিত্ব হতে মুক্তিলাভ করেই নৈকট্য লাভ হয়। অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্তার আগে ও পরে এবং নিকটে ও দূরে এবং উচ্চ ও নীচ বলে কিছু নেই। সত্যের ধনভাণ্ডার 'অন-স্তিত্বের' মধ্যে দেখা যায়, আপনি আপনার অস্তিত্বের গর্বে গর্বিত হয়ে জানেন না যে অনস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ কি? (লক্ষ্য করুন, পরম বাস্তব সত্তা একই সময়ে অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল, একথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করুন)।[১]

রুমীর মতে অতীন্দ্রিয় জগৎ শুদ্ধত্বের জগৎ, আদেশ-জগৎ বা ইচ্ছার জগৎ। এই জগৎ ঐক্যের জগৎ, অবভাসিক জগতের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত জগৎ। এই আদেশ বা ইচ্ছা অবিভাজ্য অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্তা, কিন্তু কথা ও ক্রিয়ার জগতে প্রবেশ মাত্র এটা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির কাছে বোধগম্য হওয়ার জন্য অসংখ্য বহুত্বে বিভক্ত হয়।

"হে আল্লাহ, যেখানে কোন শব্দ উচ্চারণ না করেই কথা বলা হয় আত্মাকে তুমি সেই জগৎ দেখাও যেন সে অতীন্দ্রিয় সত্তার বিস্তৃতির মাধ্যমে সত্যের জগতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। চিন্তা অতীন্দ্রিয় সত্তার চেয়ে সংকীর্ণ, সুতরাং তাকে অস্বীকার করে, পুনরায় মূর্ত অস্তিত্ব চিন্তার চেয়ে সংকীর্ণ এবং দ্রষ্টা 'অস্তিত্বের' একটা আংশিক দৃশ্য উপস্থাপিত করে। ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থাপিত 'অস্তিত্ব' তার চেয়েও সংকীর্ণ, এটাকে বদ্ধ কারাগার বলা যায়। এই সংকীর্ণতা সংখ্যা, বহুত্ব ও ইন্দ্রিয়সমূহের পদার্থিক সংযুক্তিকরণ হতে উৎপত্তি হয়। ঐক্যের জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত, আপনি ঐক্যের জগতের আগ্রহী হলে সেই দিকেই লক্ষ্য করুন। পরম ইচ্ছা-ক্রিয়া 'হও' কেবলমাত্র অবিভাজ্য ঐক্য ক্রিয়া, কথায় দুইটি অক্ষরে বিভক্ত হয়, এবং এর অর্থ প্রকাশ হয়।"[২]

---

১. Mathnawi. Vol. III, verse 105

২. Mathnawi, Vol. I. verse—79-80.

অতএব দেখা যায় যে, আমার অমরতা সম্পর্কীয় রুমীর মতবাদ অতীন্দ্রিয় আত্মার ধারণা ও তার ভাববাদী মূল আশ্রয় বাক্যসমূহ হতে অনুগমন করে। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কারণ সে নিজেকে জন্ম, বৃদ্ধি, ধ্বংস গুণ বিশিষ্ট অবভাসিক জগতের একজন মনে করে। রুমী মানুষকে এই আশার বাণী শুনান যে, তার বাস্তব আত্মা প্রকৃতির কোন বস্তুর মতো সৃষ্ট বস্তু নয়, বরং প্রকৃতি-সৃষ্টিকারী সত্তা। জড় দেহ ও সমগ্র বিশ্ব মানুষের এই অতীন্দ্রিয় আত্মা হতে সৃষ্টি হয় এবং এটাকে আত্মার প্রতিফলন বা প্রকাশ বলা যায়। তিনি বলেন যে, উন্মত্ততা মদের মধ্যে নাই, তা আমাদের তন্ময়তার মধ্যে এবং বিভিন্ন স্তরের আবর্তন আমাদের চেতনার উপর নির্ভরশীল। দেহ আমাদের অস্তিত্ব হতে অস্তিত্বশীল হয়, আমরা দেহ হতে নই।[১]

যে ব্যক্তি বিশ্বজগতকে তার আত্মার চেয়ে অধিক বাস্তব বলে মনে করে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে। দেহ আত্মার ছায়া, আত্মা দেহের ছায়া নয়। আত্মা দ্রব্য এবং বিশ্ব তার গুণাবলী। এই সত্য উপলব্ধি মানুষকে মৃত্যুভয় হতে মুক্ত রাখে।[২]

অধিকন্তু বিবর্তনের দিক হতেও রুমী আত্মার অমরতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। অতীন্দ্রিয় দিক হতে মানুষ চিরন্তন ও অমর, কিন্তু দেশ-কালের জীব হিসাবে সে ক্রমিক উন্নতিশীল অমরতার দাবীদার। রুমীর বহু পূর্বে নৈর্ব্যক্তিক অমরতার ধারণা সূফীবাদে জন্ম লাভ করে কিন্তু তিনিই প্রথমে ক্রমিক উন্নতিশীল অমর-তার ধারণা প্রবর্তন করেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মানুষের আত্মা অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্তা, সত্য, চিরন্তন ও অমর।

১. Mathnawi, Vol. I. verse, 48.
২. Mathnawi, Vol. III, verses. 45, 57.

ষষ্ঠ অধ্যায়
রুমীর দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব

সৃষ্টিতত্ত্ব

জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাববাদী সুফী দার্শনিক। তাঁর মতে আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আত্মপ্রকাশের বাসনা মনে উদয় হওয়ায়, আল্লাহ 'একখানি দর্পণ সৃষ্টি করেন যার সম্মুখভাগ আত্মা এবং পশ্চাদভাগ জড়-জগৎ'।[১] 'হৃদয়ই দ্রব্য এবং বিশ্বজগৎ তার গুণ, হৃদয়ের ছায়া বা প্রতিফলন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হবে কি করে?[২] জড়জগতের কোন স্বতন্ত্র বাস্তব অস্তিত্ব নাই।[৩] সমস্ত জড়জগৎ যেন একটি বৃহৎ দেহ আর আল্লাহ্ সেই দেহের আত্মা। আত্মা হতে দেহের উৎপত্তি হয়, দেহ হতে আত্মার উৎপত্তি হয় না।[৪] দেহ আত্মার কার্য সম্পাদনের একটি উপায় বা যন্ত্র বিশেষ। রুমীর এই মতবাদ অদ্বৈতবাদ নয়[৫], কারণ তিনি আল্লাহ্ ও অসংখ্য আত্মা বা লাইবনিজের ভাষায়, অসংখ্য চিৎপরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। প্রশ্ন উঠে: এক সার্বিক আত্মা হতে কিভাবে অসংখ্য বিশেষ আত্মার উৎপত্তি হয় এবং সার্বিক আত্মা ও বিশেষ আত্মার মধ্যে সম্পর্ক কি? অন্যান্য দার্শনিকদের মতো রুমী 'এক' হতে 'বহু'র সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, বুদ্ধির সাহায্যে এই ধরনের প্রশ্নের সমাধান বোঝা যায় না। উপমা ও রূপকের সাহায্যে কিঞ্চিৎ বোঝা যায়, তবে উপমা ও রূপকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে 'সার্বিক আত্মা' ও 'বিশেষ আত্মার' মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কগুলো সৃষ্টিতত্ত্ব,[৬] সামঞ্জস্য মূলক উৎপত্তিতত্ত্ব[৭]

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim: The Metaphysics of Rumi, p. 23. Quoted from Mathnavi.
২. Mathnawi III, 2266.
৩. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 23.
৪. Mathnawi, I, 1812.
৫. Dr. R. A. Nicholson: The Idea of Personality in Sufism.
৬. Creation.
৭. Generation.

নির্গমন তত্ত্ব।[১] এই তিন প্রকার সম্পর্কের সাহায্যে 'সার্বিক আত্মা' ও 'বিশেষ আত্মা' অথবা পরমাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে অবস্থিত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব আরব সেমিটিকদের ধারণা, সামঞ্জস্যমূলক উৎপত্তি-তত্ত্ব খ্রীস্টানদের ধারণা এবং নির্গমন তত্ত্ব নব্য প্লেটোবাদীদের ; বিশেষ করে, প্লটিনাসের ধারণা। দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে সাধারণতঃ এই তিনটি সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক। রুমীর মতে, এই সম্পর্কগুলো পরস্পর বিরোধী নয়, একটি অন্যটির সম্পূরক মাত্র, পরমাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে অবস্থিত একই সম্পর্কের তিনটি দিক মাত্র। তিনি বলেন, "পরম দ্রব্য একটি ডিমের মতো ফুটে উঠে, একটি সমুদ্রে পরিণত হয়, তা হতে ফেনার উৎপত্তি হয়, ফেনা হতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং তা হতে ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। আসলে একটি গুপ্ত সৈন্যদল বাদশার সাথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে'।[২]

সাধারণতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টিজীবের মধ্যে পার্থক্য করে বলেন যে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক একজন সূত্রধর ও তার নির্মিত বস্তু, একজন কর্মকার ও তার নির্মিত লৌহ সামগ্রী, একজন কুম্ভকার ও তার নির্মিত মাটির পাত্র এবং একজন ঘড়ি নির্মাতা ও তার নির্মিত ঘড়ির সম্পর্কের অনুরূপ।[৩] সামঞ্জস্য-মূলক উৎপত্তিতত্ত্ব অনুসারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জীবের মধ্যে সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের মতো। খ্রীস্টধর্মে এই সম্পর্ক ঈশ্বর ও যীশুখ্রীস্ট-এর সম্পর্কের মত, এ যেন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। নির্গমন তত্ত্বকে অন্যকথায় উদ্ভূতি তত্ত্ব, 'আগত তত্ত্ব' ও উপচানো তত্ত্ব, বলা যায়। নির্গমন তত্ত্ব অনুসারে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক উৎস ও উৎসারিত বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে। এই মতবাদের মধ্যে উৎস হতে আগত বস্তু ও উৎসের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এখানে পর-মাত্মার ইচ্ছানুক্রমে মানবাত্মার উৎপত্তি হয় না, স্রষ্টার কোন ইচ্ছাশক্তির ফল 'সৃষ্টি' নয়। যেমন সূর্য হতে আলোক বেরিয়ে আসে অথবা জলপূর্ণ-পাত্র হতে জল উপচায়ে পড়ে, অথবা গাছের মরা পাতা ঝরে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে

১. Emanation.
২. D. R. A. Nicholson. Divani-Shams-i-Tabriz, p. 334.
৩. Dr. K M. gaanil jalal uddin Rumi,s Lheory of E , Pdblished in the Bulletin of the college of Arts, Vol III, University of Baghdad, 1654, p. 1.

পরম উৎস হতে জীবাত্মা, মানবাত্মা, এমন কি সমগ্র বিশ্ব উৎপত্তি হয়। আগত, সত্তা' প্রাকৃতিক প্রয়োজনে 'পরম সত্তা' হতে বেরিয়ে আসে, এটা কোন স্রষ্টার ইচ্ছা ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টিতত্ত্ব, সামঞ্জস্যমূলক উৎপত্তি তত্ত্ব ও নির্গমন তত্ত্বের কথাগুলো একটু ঘুরিয়ে বলা যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে আল্লাহ বিশ্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তিনি বিশ্বের অতিবর্তী সত্তা, নির্গমন তত্ত্ব অনুসারে আল্লাহ্ বিশ্বের মধ্যে অবস্থিত, তিনি বিশ্বের সবকিছু ঘিরে আছেন, তিনি বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী সত্তা এবং সামঞ্জস্যমূলক উৎপত্তি তত্ত্ব অনুসারে আল্লাহ্ বিশ্বের ভিতর ও বাহির উভয় স্থানে আছেন, তিনি বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী সত্তা। আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্ব ও মানবাত্মার সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য উভয়ই আছে।

কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মাত্র। বাইবেল দুই খণ্ডে বিভক্ত, পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থগুলো ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করা হয়। পুরাতন নিয়মের একটি অংশের নাম 'জেনেসিস'। এই অংশটি ইহুদী ও খ্রীস্টান উভয় সম্প্রদায় সমভাবে গ্রহণ করেন। স্রষ্টার ইচ্ছাক্রমে পৃথিবী ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়। স্রষ্টার নাম জিহোবা। তিনি জীবজন্তু উদ্ভিদাদি সমন্বিত পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, "উপরের দিকে লক্ষ্য কর, যিনি এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে দেখতে পাবে" (ইশিয়া, ১১ : ২৬) 'জেনেসিস' গ্রন্থে সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "জিহোবা ইলোহিম যখন পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করেন, পৃথিবীতে তখন তৃণ শস্য বৃক্ষলতাদি কিছুই ছিল না। কারণ জিহোবা ইলোহিম তখন পৃথিবীতে বারিবিন্দুপাত করেন নি এবং ভূমি কর্ষণের জন্য কোন মানুষ ছিল না। পরিশেষে যখন জলপ্রবাহ উত্থিত হয়ে ভূমিতল সিক্ত করেছিল, সেই সময় জিহোবা ইলোহিম ধূলি নিয়ে একটি মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তার নাসারন্ধ্রে জীবনবায়ু সঞ্চারিত করেন। তার ফলে সেই মানুষ জীবন শক্তি লাভ করে। জিহোবা ইলোহিম পূর্বদিকে ইডেন উদ্যান রচনা করে আপন সৃষ্ট মানুষকে সেই উদ্যানে রাখেন। (জেনেসিস : ২, ৪৬-৪৮)। হিব্রু ভাষায় লিখিত পুরাতন নিয়ম ইংরাজীতে অনুবাদ বা ভাষান্তরের সময় জিহোবা ইলোহিম শব্দকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা হয়। পুরাতন নিয়মের অন্যত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন আকৃতিহীন শূন্যময় ছিল।

তখন সবকিছুই জলপূর্ণ ঘোর অন্ধকারময় ছিল। ঈশ্বরের আদেশে জলরাশির মধ্যে অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয়, স্বর্গের নীচে অবস্থিত জলরাশি একত্রীভূত হয়। ঈশ্বর তখন দুইটি আলোকপিণ্ড তথা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করে দিন ও রাত্রিকালে আলোক দানের ব্যবস্থা করেন। তারপর ঈশ্বর নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টি করেন। বাইবেলের মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনার সময়ে বলতে হয় যে ঈশ্বর প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রথম দিনে ইশ্বর আলোক সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় দিনে অন্তরীক্ষ, তৃতীয় দিনে তৃণলতা, উদ্ভিদ, চতুর্থ দিনে সূর্য ও চন্দ্র, পঞ্চম দিনে মৎস্য ও পক্ষী এবং ষষ্ঠ দিনে জলচর জন্তু ও মানুষ। অবশ্য কোন্ দিন ঈশ্বর কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেন, সে সম্পর্কে জেনেসিস অংশে তিন রকম মতবাদ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থের মোজেসের মতে :—ঈশ্বর প্রথম দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় দিনে জল ও অন্তরীক্ষ, তৃতীয় দিনে শুষ্ক ভূ-খণ্ড, তৃণ, পক্ষী ও ফলোৎপন্নকারী বৃক্ষাদি, চতুর্থ দিনে আলোক সমস্ত—সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ, পঞ্চম দিনে গতিশীল প্রাণী, জলচর পক্ষী ও মৎস্য, ষষ্ঠ দিনে গৃহপালিত পশু, হিংস্র জীবজন্তু, সরীসৃপ ও মানুষ।[১] (জেনেসিস ১. ১. ২৬)। জেনেসিসের অন্যত্র দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর আপনা থেকে আপনার প্রতিরূপ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তিতে পরিণত করেন।[২] জেনেসিস, ১. ২৭) তাদের নাম আদম ও ইভ। তারপর ঈশ্বর তাদের স্বর্গীয় ইডেন নামক বাগানে বাস করার আদেশ দেন। তিনি তাদের জ্ঞান বৃক্ষের ফল ব্যতীত সমস্ত বৃক্ষের ফল খেতে আদেশ দেন। শয়তানের ইচ্ছায় ও সর্পের প্ররোচনায় তারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন। এটাই সংক্ষেপে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব। ইহুদী ধর্ম ও খ্রীস্ট ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা প্রায় একই রকম। উভয় ধর্মের মধ্যে সৃষ্টি কার্য ছয় দিনে সম্পন্ন হয় এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

কোরানের মতে আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই ছয় দিনের বর্ণনা ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার অনুরূপ। এখানে এক একটি ঐশীদিন এক হাজার বছর (কোরান ২২ : ৪৭) অথবা পঞ্চাশ হাজার বছর (কোরান ৭০ : ৪) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্ যেহেতু

১, ধর্মপুস্তক আদিপুস্তক, ১,-১-২৬, পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃঃ ১-২

২. আদিপুস্তক, ১. ২৭, পৃঃ ১।

ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন (কোরান, ৪১ : ৮, ৭ : ৫৪ ; ১০ : ৩ ; ৩১ : ১০ ; ৫৭ : ৪ ; ৩২ : ৪)। 'কুন' বা 'হও' শব্দ উচ্চারণে কোন সময়ের প্রয়োজন হয়নি ; কিন্তু যেহেতু পৃথিবী ইত্যাদি ভিন্নভাবে সৃষ্টির মাঝে দেখানোর জন্য ছয়দিন সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। 'হও' শব্দ দিয়ে সব কিছুর বীজ সৃষ্টি হয়েছে, অপ্রকাশ্য, অব্যক্ত অবস্থা হতে, ব্যক্ত, প্রকট ও বাস্তব আকার ধারণ করতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে। স্বর্গীয় এক একটি দিন মানবীয় চব্বিশ ঘণ্টা বা এক হাজার বছর বা পঞ্চাশ হাজার বছর মনে না করে বিবর্তনের এক একটি দীর্ঘকাল মনে করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদের মধ্যে সকল বিতর্কের অবসান হয়।

কোরানের মতে মানবাত্মা কোন জড় বস্তু নয়, কুম্ভকারের সৃষ্ট মৃৎপাত্র অথবা সূত্রধরের নির্মিত কোন বস্তুর মতো নয়। সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানবাত্মা আল্লাহ্‌র প্রতিরূপ। এই মতবাদ সৃষ্টিতত্ত্ব ও সামঞ্জস্যমূলক উৎপত্তি তত্ত্বের একটি মিশ্রণজাত মতবাদ। এই মতবাদের মধ্যে পরমাত্মা ও মানবাত্মা বা উৎস ও উৎ-সারিত বস্তুর মধ্যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র-যীশুখ্রীস্টের সামঞ্জস্যমূলক সম্পর্কের মতো সম্পর্ক আছে। এই মতবাদের মধ্যে ইসলাম, ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মের মিলন হয়েছে। এই মতবাদ ইহুদী ধর্মে উৎপত্তি হয়ে খ্রীস্ট ধর্মে "যীশুখ্রীস্ট আল্লাহ্‌র পুত্র"—এই ধারণার মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করে ইসলাম ধর্মের এক হাদীস "আল্লাহ্ আদমকে আপন সুরতে সৃষ্টি করেছেন"—এই ধারণার মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে।

একজন সুফীর কাছে পরমাত্মা ও মানবাত্মার সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে মানবাত্মা সৃষ্ট ও অসৃষ্ট উভয়ই। মানবাত্মা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানবাত্মাকে অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করা যায় না। মানুষের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি জীব বলা যায় না। মানবাত্মা বা মানবের অন্ত-র্নিহিত সত্তা অসৃষ্ট। এই আত্মা ঐশী আত্মা বা পরমাত্মা হতে আগত সত্তা এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করলে পরমাত্মা ও মানবাত্মাকে এক সমান ও অভিন্ন বলা যায়। রুমী বলেন যে, "যখন কোন 'নাম' অথবা কোন 'নাম-প্রাপ্ত' বস্তু ছিল না তখন আমি ছিলাম এবং 'সৃষ্টির আদিতে আমি' ও 'আমরা' বলে কিছু ছিল না, আমার দ্বারা 'নাম' ও 'নামপ্রাপ্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে।"[১]

১. Ode 17 in Nicholson's selection.

মানবাত্মা সৃষ্ট ও অসৃষ্ট উভয়ই—এই মতবাদের উৎস কি কোরানে আছে? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোরান এই মতবাদ সমর্থন করে। কোরানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানবাত্মা সৃষ্টি করেছেন আবার এ কথাও আছে যে আদমের দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ আদমের দেহে আপন আত্মা প্রবেশ করান (কোরান ১৫ : ২৯), আদমের দেহে আল্লাহ্‌র আত্মারই ফুৎকার প্রদান করা হয়েছে (কোরান ৩২ : ৯)। অর্থাৎ আদমের দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ আপন জীবন বায়ু দান করে আদমকে সচেতন করেন। মানবাত্মা পরমাত্মার দান, এই দুই আত্মা এক ও অভিন্ন, এ বিষয়ে সূফীদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কোরান মানুষকে এত বেশী সম্মানের চোখে দেখেছে যে, মানুষকে আল্লাহ্ হতে ভিন্ন কল্পনা করা কঠিন হয়েছে। ইসলামী মতে এক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপাস্য নাই, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন জীবকে সেজদা করা পাপ। আল্লাহ্‌র আদেশে এক আজাজীল ব্যতীত সকল ফেরেস্তা আদমকে সেজদা করেন। আবার মানুষের কার্যকে আল্লাহ্‌র কার্য বলে উল্লেখ করা হয়। বদরের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত মুহম্মদকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, "আপনি নিক্ষেপ করেন নাই, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন।" তাছাড়া সমগ্র বিশ্ব মানুষের অধীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে (কোরান ১৬ : ১২, ৩৮ : ২০)। কোরানের এইসব উক্তি ও ইংগিত সূফীবাদে মানুষের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে অভিন্ন বলে চিন্তা করতে সাহায্য করেছে। মানুষ ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অভিন্নতা হতে মানবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্বের অভিন্নতা কেবলমাত্র এক স্তর উপরে। সূফীরা ইচ্ছার অভিন্নতা হতে অস্তিত্বের অভিন্নতা অনুমান করেন। "ঐশী গুণে গুণান্বিত হও" "বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র আলোকে সব কিছু দেখেন"—ইত্যাদি হাদীসের উপর ভিত্তি করে সূফীবাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতার ধারণা।

বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, এ কথা স্বীকার করতে হয় যে মানবাত্মার সৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের চাইতে সামঞ্জস্যমূলক উৎপত্তিবাদ ও অবতারবাদের সাথে তার যথেষ্ট মিল আছে।[১] সূফীবাদের ইতিহাসে হাল্লাজ মনসুরই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যভাবে 'আনাল হক' বাণী উচ্চারণ করে মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা অবতারবাদের আলোকে দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid. p. 28.

করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাল্লাজের 'আনাল হক' বা 'আমিই সত্য' বাণী সূফীদের কাছে সত্য বলে গৃহীত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তবে সূফীরা বলেন যে, হাল্লাজ গুপ্তভেদ ব্যক্ত করে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। মানবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যময় সম্পর্ক প্রকাশ করা উচিৎ হয় নাই।[১]

নব্য প্লেটোবাদের অন্যান্য ধারণার সাথে সাথে নির্গমনবাদ সূফীবাদে প্রবেশ করে আরব সেমিটিকদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মিশ্রিত হয়ে একটি হাদীসের রূপ লাভ করে।[২] নির্গমনবাদে বলা হয় যে, সার্বিক প্রজ্ঞা পরম একক সত্তা হতে আগত প্রথম সত্তা। হাদীসের মধ্যে এই কথা একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে—'আল্লাহ সর্বপ্রথম সার্বিক প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেন।' পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের লেখকগণ নব্য প্লেটোবাদী-এরিস্টটলীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা প্রকাশ করেন এবং কোরানে উল্লেখিত 'আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছি এবং পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যাব' —এই সাধারণ উক্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান করে মানবাত্মার পরম উৎস পরমাত্মায় প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করেন।[৩] রুমী বলেন যে, উৎস হতে বিচ্ছিন্ন বস্তু পুনরায় মিলনের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়।[৪]

রুমীর সৃষ্টিতত্ত্ব কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব, খ্রীস্ট ধর্মের সামঞ্জস্য তত্ত্ব, নব্য প্লেটোবাদীদের নির্গমনতত্ত্ব ও অবতারবাদীদের অবতারতত্ত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণ তত্ত্ব। রুমীর সৃষ্টিতত্ত্বের উপকরণ পরস্পর বিপরীত ধর্মী অনেকগুলো মতবাদ হতে সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও যে কোন একটি মতবাদের সাথে তুলনা করা বা সমান বলে মনে করা যায় না। তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তা বা মূল সত্তা অস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট সত্য ও বাস্তব বলেই তা ঐশী সত্তা।[৫] ঐশী সত্তা বা আল্লাহ্‌র সত্তা হতে মানবাত্মা কিভাবে ভিন্ন অবস্থা লাভ করে তা অজ্ঞাত। তিনি এই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। তবে তাঁর ধর্মীয় চেতনার মূল কথা মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা।[৬] মানবাত্মা পরমাত্মা হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে এই সম্পর্কে তিনি সজাগ।

১. Ibid, p. 28.
২. Ibid, p. 28.
৩. Ibid, p. 28.
৪. Mathnawi 1,4 Quoted by Dr Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 29, footnote.
৫. Ibid, p. 29.
৬. Ibid, p. 29.

মানবাত্মার পরম উৎস স্বয়ং আল্লাহ্, আল্লাহ্ হতেই মানবাত্মার উৎপত্তি হয়েছে, এই দুই আত্মার স্বরূপ এক ও অভিন্ন। তাঁর মতে মানবাত্মা পরমাত্মা হতে আগত সত্তা, মানবাত্মা এ সম্পর্কে সজাগ আছে। মানবাত্মা তার উৎস সম্পর্কে সচেতন এবং পরমাত্মা হতে বিচ্ছেদ হওয়ার ব্যাথা অনুভব করে। মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করতে চেষ্টা করে আর তাঁর মতে পরমাত্মার সাথে তার অভিন্নতা উপলব্ধির মাধ্যমেই অথবা মূল উৎসে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। জীবনের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য, পরম উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়া। মানবাত্মা বিশেষ এক ধরনের অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের মাধ্যমে ঐশীগুণ সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। জীবন পরম উৎস আল্লাহ্ হতে উৎসারিত হয়ে অজৈবিক ও জৈবিক পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রাণ বা জীবন যাত্রা শুরু করে গাছপালা, জীব জন্তু, মানব, অতিমানবের স্তর অতিক্রম করে মূল উৎসের দিকে ফিরে যায়। কোরানে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ এবং আল্লাহ্র কাছেই আমরা ফিরে যাই। রুমী বাঁশবন হতে বিচ্যুত বাঁশের বাঁশরীর সাহায্যে মানবাত্মার পরমাত্মা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাথা ও পরমাত্মায় ফিরে যাওয়ার আকুলতা প্রকাশ করেছেন। মানবাত্মা আল্লাহ্র কাছ থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার পর এই জগতে দেহরূপ পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। এই জড় জগৎ আত্মার নিজ দেশ নয়, তার দেশ ঐশী দেশ, সে যেন এই দেশ ভ্রমণ করে পুনরায় নিজ দেশে ফিরে যেতে সর্বদা আগ্রহী, বাঁশের বাঁশরীর করুণ সুরের মধ্যে সেকথাই তিনি প্রকাশ করেছেন।

পরমাত্মা এক, আত্মার সংখ্যা বহু, পরমাত্মা উৎস, আত্মা পরমাত্মা হতে আগত সত্তা। এক ও বহুর সমস্যা ধর্মীয় চেতনার একটি বিরাট সমস্যা। বহুত্বের ধারণা সৃষ্টি হয় পরমাত্মা হতে আগত মানবাত্মাসমূহের স্বাতন্ত্র্য লাভের ফলে। সুফীবাদের মধ্যে আত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা এক ধরনের পাপ।[১] তাঁদের মতে পরমাত্মার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না কারণ একমাত্র 'সত্য বস্তু' আল্লাহ্। আল্লাহ্ হতে সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে, আল্লাহ্ একমাত্র সত্য আর এই সত্যকে উপলব্ধি করাই সুফীবাদের মূল কথা। এই প্রকারের

১. (I) Dr. Khalifa Abdul Hokim, Ibid, p. 29, (II) Mathnawi 1,517.

ধারণা লক্ষ্য করেই সুফীবাদের সমালোচকগণ বলেন যে, সুফীবাদ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। এখানে সকল অস্তিত্বকে ঘিরে একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়। নির্গমন তত্ত্বের মাঝে একটি নিম্নক্রম বা আত্মার অবতরণ এবং একটি ঊর্ধ্বক্রম বা আত্মার পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এ যেন পরম সত্তা হতে যাত্রা শুরু করে পুনরায় পরম সত্তায় ফিরে যাওয়া। জীবন যেন বৃত্তস্বরূপ: জীবন যে বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করে পুনরায় সেখানে ফিরে যায়। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে শূন্য হতে যাত্রা শুরু করে শূন্যতে ফিরে যায়, পরম সত্তায় কোন প্রকার বহুত্ব কিংবা গুণ আরোপ করা যায় না। পরমাত্মা সকল প্রকার গুণের অতীত। আল্লাহ্ পাক 'জাত' বা সত্তাসার সকল প্রকার বহুত্ব থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌র সত্তাসার সম্পর্কে অতি চমৎকারভাবে বলা হয়েছে যে, পরম ঐক্য সকল সম্পর্কের অতীত। রুমীর মতে পরমাত্মা দেশ-কালের ঊর্ধ্বে, তবুও মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি তাঁর জ্ঞান-তত্ত্বের মাঝে বলেছেন যে, মানবাত্মার বহুত্ব, আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপিতা বা বিশ্বলীনতা, অতিবর্তিতা ইত্যাদি ধারণা দেশ, কাল, কার্যকারণ ইত্যাদি সম্পর্কের ফলেই আমাদের মনে উদয় হয়। দেশ, কাল, কার্যকারণ ইত্যাদি ধারণা এই অবভাসিক জগতের ধারণা, আধ্যাত্মিক জগতের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নাই। দেশ-কালের ধারণা মানবাত্মা ও পরমাত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেশের মাঝে একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণ বা মিলন ও বিচ্ছেদের যে ধারণা তা আত্মার ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় না। রুমীর মতে, মানবাত্মা এই জীবনেও অনেক সময় তার জীবনের দেশ-কাল হীন অবস্থা উপলব্ধি করে থাকে। 'সৃষ্টিজগতই দিক ও দেশ দ্বারা চিহ্নিত, ঐশী আদেশ ও গুণের জগৎ দিকহীন।[১] কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁর সাথে সম্পর্কহীন নয়, যদিও সে সম্পর্ক অবর্ণনীয়।[২]

আধ্যাত্মিক জগতে 'এক' যেমন সত্য, 'বহু'ও তেমন সত্য, এক ও বহুর সম্পর্ক অভিন্নতার সম্পর্ক এবং এর সত্যতা আধ্যাত্মিক জীবনে উপলব্ধি করা যায়। দেশের মাঝে একই স্থানে দুইটি জিনিস থাকতে পারে না, আত্মার জগতে দুইটি ইচ্ছা একই স্থানে অবস্থান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রেমিকের ইচ্ছা প্রেমাস্পদের ইচ্ছার সাথ মিশে যায়, উভয় ইচ্ছার

১. Mathnawi, IV. 3692.
২. Mathnawi, IV. 3696.

মিলন ঘটে ও তাদের অস্তিত্বের ভিন্নতা সত্ত্বেও ইচ্ছার অভিন্নতা সম্ভব হয়। 'কারণ আত্মার জগতে মিলন ও বিচ্ছেদ বলে কিছু নাই, যদিও আমাদের চিন্তা মিলন-বিচ্ছেদ ছাড়া চিন্তা করতে পারে না।'[১]

রুমীর দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদে দেখা যায় যে, তিনি সৃজনবাদ ও বিবর্তনবাদকে পরস্পর বিপরীতধর্মী মনে করেন নি এবং উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের দেহ যদিও কাদামাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সৃষ্ট জীব তবুও তার আকৃতি সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। কারণ আল্লাহ্ আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেন। আদমের দেহ সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, যার এক একটি দিন হাজার বছরের অথবা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, অর্থাৎ বিবর্তনের দীর্ঘ কালের সমান।

কোরানে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য বস্তুর মত মানুষও নিয়মের অধীন। মানব সৃষ্টি বা মানবের বিবর্তন সম্পর্কে কোরানের আলোকে কিছুটা আলোচনা করা যায়।

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করার সময়ে মানব জীবনের প্রথম স্তরের প্রতি লক্ষ্য করে কোরানে বলা হয়েছে যে, মানবকে 'মৃত অবস্থা' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। "আল্লাহ্‌কে আপনি কেমন করে অস্বীকার করবেন—আপনি তো মৃত অবস্থায় ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ আপনার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপরে জীবন দান করবেন এবং তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন (কোরান ২ : ২৮)। পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে মানুষ প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল। জড়বাদী দার্শনিক, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদী দার্শনিক ও জীববিজ্ঞানীরা নির্জীব ও জড়বস্তু হতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার আলোচনা শুরু করেন। মানব সৃষ্টির পরমাণুরূপী আদিম উপাদান আধ্যাত্মিক শক্তি বা 'নূর' বা জলন্ত অ... জড় জগতে প্রবেশের ফলে জড়রূপ গ্রহণ করে মহান সৃষ্টিকর্তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে অর্থাৎ একটি আদর্শের দিকে এগিয়ে যায়।

কোরানে বর্ণিত মানবের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর পানি বা জল। পৃথিবী সৌরমণ্ডলের নিহারিকা, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি অগ্নি গোলকপিণ্ড থেকে ভিন্নতা

১. Mathnawi, IV. 3696.

লাভের পরে নিজ স্বভাব অনুসারে কয়েক হাজার বছর তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়। তারপর এমন অবস্থায় পৌঁছে যখন পৃথিবীর সৃষ্ট গ্যাস ও অন্যান্য রাসায়নিক ও বায়বীয় পদার্থ থেকে পানির উৎপত্তি লাভ হয় এবং তার মধ্যে জীব উদ্ভবের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কার্বন ও অন্যান্য বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাগরের লবণাক্ত পানির সাথে ও জীব সৃষ্টির অনুকূল অন্যান্য সবরকম বস্তুর সাথে একত্রিত হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে সূর্যের আলো পাওয়ার বিশেষ এক সময়ে অতি নিম্নস্তরের এক শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব হয় এবং পরে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে এক বা একাধিক জীব-কোষের সৃষ্টি হয়। একবার অর্জিত বা উদ্ভূত জীব কোষ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বংশ-পরম্পরার মধ্য দিয়ে সংক্রমিত হতে থাকে। পরবর্তী বংশধররা সহজাত উপায়ে সেইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন পরিবর্তন লাভ করে। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এইভাবে দীর্ঘদিন চলার পরে নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্ভব করে। প্রথম গ্রীক দার্শনিক থেলিস পানিকে সৃষ্টির আদিম উপাদান বলে স্বীকার করেন।

তিনি পানির মধ্যে সচলতা ও সজীবতা লক্ষ্য করলেও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন নি। স্রষ্টা নিজেকে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তাঁর একটি অতিবর্তী সত্তা আছে এবং কোরানে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রাকৃতিক ও স্বর্গীয়" (কোরান : ৫৭ : ৩)। মানুষ তাঁকে যেন বুঝতে পারে এই উদ্দেশ্যে মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে (কোরান : ৩০ : ২৮)। বিশ্ব ও স্বর্গের মধ্যে অবস্থিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপমা দিয়ে (কোরান : ৩০ : ২৭) আল্লাহ্‌র গুণাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের চিরন্তন আলোক (কোরান : ২৪ : ৩৫)। এই আলোক সৃষ্টিধর্মী আলোকে অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত নিজেকে রক্ষা করতে পারে (কোরান : ২ : ২৫৫ ; ২০ : ৩)। সব কিছুর মূল (কোরান : ১০ : ৪ ; ৩০ : ১১), বিশ্বজগতের সবকিছু স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র নিয়ম মেনে চলে (কোরান : ৩ : ৮২; ১৩:১৫)। আল্লাহ্ সব কিছুর আকার ঠিক করে দেন (কোরান ৫৯ : ২৪)। আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে (কোরান : ১৩ : ৩) একখানা মাদুরের (কোরান : ২০ : ৫৩) মতো বিছিয়ে দেন, আসমান থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ

করেন (কোরান : ৪৩ : ১১) যেন সেখানে ফল মূল, শস্য ও বৃক্ষলতাদি (কোরান : ১৬ : ১০-১ ; ৫৫ : ১০-১৩) আবির্ভাবে সুশোভিত বা পুনর্জীবিত হয় (কোরান : ২৯ : ৬৩)। তিনিই মৃতপ্রায় পৃথিবীকে জীবন দান করেন, গাছপালা সৃষ্টি করেন, গাছে ফলফুল সৃষ্টি করে বিশ্বকে সুন্দররূপে সাজিয়ে তোলেন। তিনি আসমান জমিন ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সব কিছুর মালিক (কোরান : ২ : ২৫৫ ; ৩ : ২ ; ৪০ : ৬৫ ; ৪৩ : ৮৫)। কোরানের এই ধরনের উক্তি হতে বোঝা যায় যে, পানি নয় বরং আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা। দার্শনিক থেলিস পানিকে সৃষ্টির আদি পদার্থ বলে আল্লাহ্র সৃষ্টির কিয়দংশ ব্যাখ্যা করেছেন।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার তৃতীয় স্তরে কোরানের মতে জীব সৃষ্টি হয় কাদা-মিশ্রিত ঘোলাটে পানি অথবা নরম কাদা হতে। ঘোলাটে পানি বা আর্দ্র মাটি অর্থে হয়তো বা মাটি, পানি ইত্যাদি উপাদানের মিশ্রণের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে। এই মতানুসারে কতকগুলো উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়। দার্শনিক এম্পেডকলস—এই এর 'রাগ' ও বিরাগের 'সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছা সংযোগ করলে বলা যায় যে, এগুলো জড়বস্তু সৃষ্টির সহকারক। কোরানে বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ্) এমন একজন যিনি আপনাদের (মানুষ) আর্দ্র-কাদা হতে সৃষ্টি করেছেন (কোরান : ৬ : ২), 'নিশ্চয় আমরা (আল্লাহ্) মানব জাতিকে দলে দলে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধযুক্ত কাদা হতে সৃষ্টি করেছি (কোরান : ৩৭ : ১১) এবং নিশ্চয় আমরা (আল্লাহ্) মানুষকে নরম কাদা থেকে সৃষ্টি করেছি (কোরান : ৩২ : ১২ ; ৩১ : ৭১)। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়া পানি হতে শুরু হয় এবং জড়বস্তু বা নরম মাটির মধ্য দিয়ে জীব সৃষ্টি হয় এবং এইসব জীব নর্দমায় বাস করে উপযুক্ত দেহ লাভ করে। কোরানে এই বিষয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা নাই তবে পাশ্চাত্য দার্শনিক ও জীব বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ের আলোচনা কোরানের সৃষ্টিতত্ত্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার চতুর্থ স্তরে জলজীব বা জলচর প্রাণী স্থলে বাস করার উপযোগী দেহ কোষ লাভ করে। অনেক প্রাণী উভচর হয়, অনেকে শুধু জলে বাস করে, আবার অনেকে স্থলে বাস করার উপযোগী দেহকোষ ও জননকোষ লাভ করে। মনে রাখতে হয় যে, জড়জগতের বিবর্তন আধ্যাত্মিক আদর্শ

বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। বিশ্বের বিভিন্ন জড়বস্তু, মন ও প্রাণ ভালভাবে পরীক্ষা করলে তাদের মধ্যে নির্বাচন, সংযোগ ও স্তরভেদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এইগুলো উদ্দেশ্যমূলকতার প্রধান লক্ষণ। বিবর্তন প্রক্রিয়া এক বুদ্ধিময় সত্তার আত্মপ্রকাশ। আল্লাহ্ জাগতিক ক্রমবিবর্তনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, এই প্রাণপ্রবাহ থেকে সৃষ্টি হয় জড়বস্তু, প্রাণ, মন ইত্যাদি। প্রাণের বিবর্তন প্রথমতঃ মৃতপ্রায় জড়বস্তু বা মাটি হতে শুরু হলেও তা পানি, আর্দ্র মাটি, 'ক্রমোজোম' ও 'ওভাম' বা শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের সংযোগের স্তরে ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়, নতুন প্রজাতির জন্ম হয়। ডারউইন ও লামার্ক প্রমাণ করেছেন যে, দেহকোষের পরিবর্তনের উপর জৈবিক গুণের সংক্রমণ নির্ভরশীল; কিন্তু ম্যাণ্ডেলের মতে, জনন কোষের পরিবর্তনের উপর তা নির্ভরশীল। এই দুই মতবাদই অংশত সত্য। মানুষ দেহ কোষ ও জনন কোষের অধিকারী এবং উভয় কোষের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মরগ্যানের জিনিবাদ ক্রমোজোমকে বিভক্ত করে প্রমাণ করেছে যে, ক্রমোজোম নয়, 'জিনি' সমষ্টির উপর নির্ভর করে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য তার বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হবে। ক্রমোজমের সাহায্যে জীবের উৎপত্তি হলেও তা বিশেষ বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। শুক্র ও ডিম্ব উপযুক্ত সময়ে একত্রিত না হলে সন্তান সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকে না। মিশ্রণের সময়ে এক পরস্পর বিরোধী সংগ্রাম লক্ষণীয়। একবারে নিঃসৃত একাধিক শুক্রের মধ্যে কেবলমাত্র একটি শুক্রকীট ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়। এখানে মিলন ও জীবন ধারণের জন্য রয়েছে এক চরম সংগ্রাম। ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে যায়। কোরানে বলা হয়েছে, "কেমন করে তাঁকে অস্বীকার করবেন যিনি আপনাকে মাটি থেকে, তারপর শুক্র-ডিম্ব থেকে একজন সম্পূর্ণ মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন" (কোরান : ১৮ : ৩৭ ; ৩৫: ১১। ম্যাণ্ডেল ও মরগ্যানের জৈবিক বিবর্তনবাদ জীব বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করেছে এবং কোরানে উল্লেখিত ক্রমোজোমবাদের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাকে অনেকাংশে গ্রহণ করা যায়।

মানুষের জন্ম ইতিহাস ভালভাবে পরীক্ষা করলে মানুষের বিবর্তনের মধ্যে জড় জগৎ ও মনোজগতের সমস্ত বস্তুর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ

দেখা যায়। মাতৃগর্ভে নয় বা দশমাস অবস্থানকালে মানব সন্তান অতীত সমস্ত স্তরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যদিয়ে ভ্রূণ অবস্থা থেকে নবে উন্নীত হয়। মানুষের ভ্রূণ প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর মাছের ভ্রূণের মত দেখায়, তারপর সরীসৃপের ভ্রূণের আকার ধারণ করে, তারপর স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণের আকার লাভ করে, তারপর বানর বা শিম্পাঞ্জীর ভ্রূণের আকার পায়। মানুষের ভ্রূণ এক কোষ থেকে শুরু করে বিবর্তনের প্রতি স্তরে প্রয়োজনীয় একাধিক কোষ সৃজন ধর্মী প্রাণ প্রবাহের ফলে লাভ করে, প্রতি স্তরের জীবের ভ্রূণের আকার ধারণ করে এবং উন্নততর প্রজাতির দিকে অগ্রসর হয় এবং শেষে মানব শিশু হিসাবে জন্মলাভ করে। "আমরা (আল্লাহ্) আপনাদের আর্দ্র মাটি হতে, তারপর শুক্র ডিম্বের মিশ্রণ হতে, তারপর জমাটবাঁধা রক্ত হতে, তারপর একখণ্ড মাংসপিণ্ড হতে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করি এবং আমরা আপনাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাতৃগর্ভে রাখি; তারপর ছোট শিশু হিসাবে সৃষ্টি করি, তারপর আপনি বড় হয়ে মানবীয় শক্তির অধিকারী হন, আপনাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আর সকলকে ভুলে যাওয়া উৎসে ফিরিয়ে আনি" (কোরান: ২২ : ৫)। পুনরায়, "এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে একখণ্ড আর্দ্র কাদা হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে শুক্র ডিম্ব আকারে এক সংরক্ষণশীল স্থানে (মাতৃগর্ভে) রেখে দেই। তারপর শুক্র-ডিম্বের মিশ্রণ হতে জমাটবাধা রক্তপিণ্ডে পরিণত করি, রক্ত পিণ্ড হতে মাংসপিণ্ড এবং মাংসপিণ্ড হতে অস্থিখণ্ডে পরিণত করি। তারপর আমরা অস্থিখণ্ড পেশী দিয়ে ঢেকে দেই, তারপর আমরা তাকে নতুন জীবরূপে সৃষ্টি করি। সুতরাং সমস্ত কিছুই সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর স্রষ্টার আশীর্বাদ (কোরান ২৩ : ১২-১৪)। কোরানে বর্ণিত মানুষের সৃষ্টি ও বিবর্তন প্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়। বিবর্তন প্রক্রিয়া অনুসারে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে (কোরান ৬ : ২)। মানুষের বিবর্তন মাটি (কোরান ৭২ : ৭; ৫৫ : ১৪) বা মাটির অংশ বিশেষ থেকে (কোরান ২২ : ৫) শুরু হয় এবং আল্লাহর দেয়া বিবর্তনের শক্তির সাহায্যে (কোরান ১৭ : ৭০; ৭৫ : ৩৬-৩৯), অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রাণ লাভ করে (কোরান ২১ : ৩০), পানি (কোরান ১৬ : ২৬), ঘোলাটে পানি বা আঠালো কাদার রূপ ধারণ করে (কোরান ৩৭ : ১১) নিয়মিত ও

প্রয়োজনীয় আকার লাভ করে (কোরান ১৫: ২৬), মিশ্রিত রক্ত (কোরান ৯৬ : ২) বা জমাট রক্ত হতে অস্থি ও অস্থির আবরণ মাংসপেশির সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে সৃষ্টিনধর্মী প্রবাহের ফলে নতুন মানুষ (কোরান ২৩ : ১৪) স্ত্রী অথবা পুরুষ (কোরান ৩৬ : ৩৬; ৪৩ : ১২ ; ৫১ : ৪৯) হিসাবে দৃষ্টি শক্তি, অনুভব শক্তি; বুদ্ধি (কোরান ১৬ : ৭৮) প্রভৃতি লাভ করে জন্মগ্রহণ করে। পরে সংচিন্তা, সংকাজ, প্রার্থনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে বিশ্বে আল্লাহর প্রতিনিধি (কোরান ২ : ৩০) হয়। জালালউদ্দীন রুমী কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করে একটি সুন্দর বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তী অধ্যায়ে রুমীর বিবর্তনবাদ আলোচনা করে বিষয়টি অধিক স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

রুমীর দর্শনে বিবর্তনবাদ ও প্রাণপ্রবাহ

বিবর্তনবাদ

আধুনিক দার্শনিকদের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে দুইটি পরস্পর বিপরীতধর্মী মতবাদ। সৃষ্টিতত্ত্বের মতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপন মহিমা প্রকাশের জন্য 'কুন' বা 'হও' শব্দ উচ্চারণ করে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঐশী ও জাগতিক বস্তু শূন্য হতে একই সাথে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি-তত্ত্বের সমর্থকরা জাগতিক বস্তুর ক্রমবিবর্তনের কথা অস্বীকার করেন। সৃষ্টি-তত্ত্ব ধর্মভিত্তিক দার্শনিক মতবাদ। বিবর্তনবাদের সমর্থকরা সৃষ্টিতত্ত্বের এ সব কথা অস্বীকার করে বলেন যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, জড় বস্তু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ ইত্যাদি একই সময়ে কোন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টি হয়নি, বরং পুরাতনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। গতি জাগতিক বস্তুর ধর্ম, আর এই হিসাবে বিবর্তন সমস্ত জাগতিক বস্তুর প্রকৃত পরিচয়। বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদ হওয়ায় বর্তমান কালের চিন্তাবিদরা বিচার-বিযুক্ত সৃষ্টিবাদ বা সৃষ্টিতত্ত্বের পরিবর্তে বিবর্তনবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, বিবর্তন অব্যক্তকে ব্যক্ত, প্রচ্ছন্নকে প্রকট করে এবং অপ্রকাশিত বস্তুর আত্মবিকাশ ঘটায়। বিবর্তন এক সময়সাপেক্ষ ও চিরন্তন প্রক্রিয়া। সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তনের তুলনায় অনেক প্রাচীন মতবাদ হলেও আধুনিক যুগের বেশীর ভাগ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। রুমী সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদকে দুইটি পরস্পর বিপরীত-ধর্মী মতবাদ বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে একটি অপরটির সম্পূরক। আল্লাহ্ বিশেষ এক সময়ে আপনাকে ব্যক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবনশক্তির বিবর্তন হতে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির সব কিছুই বিবর্তন নিয়মের অধীনে আসে, ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অব্যক্ত, অস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্যক্ত, পরিস্ফুট ও জড়জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জীবজগৎ, সৌরজগৎ ইত্যাদির ক্রমবিকাশ বোঝায়। সৃষ্টির দ্বারা পরম

সত্তা বস্তু, জীব, আত্মারূপে প্রকাশ পায়, আর বিবর্তনের দ্বারা সেগুলো পূর্ণতা লাভ করে। পরম সত্তার আত্মোপলব্ধি পূর্ণ হয়। বিশ্ব স্রষ্টার উদ্দেশ্য সফল হয়। রুমীর দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম এবং তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর বিবর্তনবাদী দার্শনিক।

বিবর্তনবাদের সপক্ষে রুমীর উক্তিগুলো তাঁর আগের বহু দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায়।[১] তিনি বিভিন্ন দার্শনিকদের দর্শন হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে পুরাতন বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যা দান করে একটি মৌলিক মতবাদ সৃষ্টি করেন। বিবর্তনবাদের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথম গ্রীক দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য গ্রীক দার্শনিকরা এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে এরিস্টটলের দর্শনে বস্তুর 'জড়' ও 'আকার' সম্পর্কে যে সব উক্তি করা হয়েছে বিবর্তনবাদের পক্ষে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এরিস্টটলের মতে ক্রমোন্নতির প্রত্যেকটি স্তরই যেন 'জড়' ও 'আকারের' সংমিশ্রণ। একটি স্তরকে তার উপরের স্তরের সাথে তুলনা করলে প্রথম স্তরকে 'জড়' ও উপরের দ্বিতীয় স্তরকে 'আকার' বলে মনে হয় এবং প্রথম স্তরকে নিম্ন স্তরের সাথে তুলনা করলে প্রথম স্তর আকার এবং নীচের দ্বিতীয় স্তরকে 'জড়' বলা যায়। এরিস্টটল পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরবর্তী-কালের দার্শনিক প্লটিনাসের দর্শনে বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। প্লটিনাস নিম্নতর স্তরের অবস্থা হতে উচ্চস্তরের অবস্থায় উন্নীত হওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে, মানবাত্মা পরম উৎস হতে আগত সত্তা। প্লেটোর আত্মিক জগতের অনুসরণ করে তিনি বলেন যে, বিশ্ব এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক ধারার উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশ। এই প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে পুনরায় সেই মূল ধারার সংহত হয়। সব কিছুই এক আদি কারণ হতে উদ্ভূত হওয়ার জন্য তাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা অব্যক্ত অপ্রকাশিত টান রয়েছে সেই পরম উৎসে ফিরে যাওয়ার জন্য। আত্মার নিম্নগতি ও ঊর্ধ্ব-গতির মধ্যে তাঁর বিবর্তনের কথা বলাই হয়েছে। তিনি ধারাবাহিক নির্গমন বা বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাস করেন, যেমন আত্মার জগৎ, প্রাণীজগৎ, জড়বস্তুর জগৎ, তেমন ঊর্ধ্ব গতি দ্বারা পরমাত্মায় প্রত্যাবর্তনের কথাও বলেন। পরম উৎস

১. M. M, Sharif : Muslim Thought, Its origin & Achievements, Lahore, 1951, p. 96.

হতে প্রথমে 'নাউস' বা 'চেতস' আগত হয় এবং 'চেতস' আদির উৎসের প্রতিরূপ। শেষ স্তরে আত্মার আবির্ভাব হয় এবং আত্মা হতে সবকিছুর উৎপত্তি হয়, যদিও আত্মা 'চেতস'-এর চেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থিত তবুও এর উৎস পরম সত্তা হওয়ায় এটা এর উৎসে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। আত্মার প্রত্যাবর্তনের পথে কতকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়, নিম্নস্তর হতে যাত্রা শুরু করে কতকগুলো উচ্চস্তর অতিক্রম করে সর্বোচ্চ স্তরের পরম উৎসের সাথে মিলিত হয়। আত্মা পরম উৎসে পৌঁছানোর পর পুনরায় চক্রাকারে নিম্নস্তরের দিকে ধাবিত হয়। আত্মার ঊর্ধ্বগতিতে নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে, উচ্চস্তর হতে উচ্চতর স্তরে, আবার নিম্নগতিতে উচ্চতর স্তর হতে উচ্চ স্তরে এবং উচ্চ স্তর হতে নিম্নস্তরে এই যাতায়াত প্রক্রিয়া চিরন্তন। আত্মার এই অবতরণ ও প্রত্যাবর্তন চক্রাকারে পৌনঃপুনিকভাবে ঘটে, মনে হয় এর যেন কোন শেষ নাই। এক একটি স্তরের সত্তা তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত নিকটতম উচ্চস্তরের সত্তা হয়ে শক্তি লাভ করে অর্থাৎ পরবর্তী স্তরের সত্তা পূর্ববর্তী স্তরের সত্তা হতে উদ্ভূত হওয়ায় পরবর্তী সত্তা পূর্ববর্তী সত্তা হতে শক্তিলাভ করে। প্লটিনাসের মতে, এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতির উৎপত্তি হয় না, প্রত্যেক সত্তার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলে। আত্মার আগমন ও প্রত্যাবর্তন পৌনঃপুনিক নিয়মে ঘটে; তবে এটা কোন কালিক পরিবর্তন নয়। পৌনঃপুনিক আগমন ও প্রত্যাগমনের কথা বলায় প্লটিনাসের মতবাদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মতবাদ হয়নি। তাছাড়া এক প্রজাতি হতে উন্নতমানের অন্য প্রজাতির উৎপত্তির কথা এই মত-বাদের মধ্যে স্বীকার করা হয়নি।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করা হলেও তা স্বীকার করা হয়নি। ফলে বিবর্তনের মূল কথাই যেন বাদ পড়েছে। পুনরাবৃত্তিমূলক বা পৌনঃপুনিক বা চিরন্তন আগমন ও প্রত্যাগমনের ধারণা গ্রীকদের মজ্জাগত ধারণা, আরব সেমিটিকরা এই ধারণায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ ছয় দিনে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন। খ্রীস্টান ধর্মেও ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে এবং ইসলাম ধর্ম খ্রীস্টান ধর্মের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ঘটনার আংশিক পরিবর্তন করে স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিকরা জড় পদার্থের চিরন্তনতায় বিশ্বাস করতেন, কিন্তু জীবনের একমুখী উন্নতি সেখানে নাই।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে আত্মার দেহান্তরবাদ বা জন্ম জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উক্তি দেখা যায় না। সৎ ও অসৎ কর্ম অনুসারে আত্মার উন্নতি ও উর্ধ্বগতি এবং অবনতি ও নিম্ন-গতি হয়। সৎকর্মের ফলে আত্মা উচ্চতম প্রজাতিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তন হয়। বিবর্তনের কিছুটা অস্পষ্ট ছাপ এখানে দেখা যায়। কিন্তু অসৎ কর্মের ফলে আত্মা উচ্চ প্রজাতি হতে নিম্ন প্রজাতিতে এমন কি কীট-পতংগের প্রজাতিতেও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের আত্মার দেহান্তরবাদ-এর মধ্যে সৎ কর্মের ফলে আত্মার উন্নতির কথা বলা হলেও ক্রম বিবর্তনের একমুখী উর্ধগতি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা হয়নি। ডক্টর রমা চৌধুরী এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন।[১]

ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের লেখকগণ সর্বপ্রথম বিবর্তন সম্পর্কে একটা মতবাদ দেন। তাঁদের মতে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত বস্তুজগৎ ও জীবজগতের বিভিন্ন সত্তার উন্নতি হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের বস্তু ও সত্তাগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতির মধ্যে বিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে এই বিবর্তন বস্তুর উপর বাহ্যিক কোন শর্ত অথবা আভ্যন্তরীণ কোন সাংগঠনিক নিয়ম অনুসারে হয় না বরং বিবর্তন বস্তুর উপর নক্ষত্রের প্রভাবের ফলে হয়। মানুষের মধ্যে এই বিবর্তন তার কর্ম অনুসারে হয়। মানুষের নিকটতম প্রজাতি হস্তী। আধুনিক কালের বিবর্তন-বাদীরা হস্তীকে মানুষের নিকটতম প্রজাতি বলে মনে করেন না। পবিত্র ভ্রাতৃ-সংঘের লেখকগণ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা দেন নি, 'নক্ষত্র প্রভাব' বলতে কি বুঝেছেন সে কথাও বলেন নি। অনেকের মতে তাঁরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রবর্তক এবং ডারউইন ও স্পেন্সারের পথ প্রদর্শক। 'আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছি আবার আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যাব' কোরানের এই বাণী দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

বুদ্ধিবাদী মুতাজিলা দার্শনিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল-নাজ্জাম বিবর্তনবাদের সমর্থক। তাঁর মতে অনন্ত অসীম ও অসংখ্য সম্ভাবনা সহকারে আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। সমগ্র বিশ্বের যত বস্তু ও সত্তা পূর্বে

১. (1) A Critical Study of Dara Shikuh's Samudra Sangam, Calcutta, 1954 p. p. 21, 29.

সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানে সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে তার সব কিছুই একই সাথে সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির বস্তু ও সত্তাগুলো সম্ভাবনামূলক অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থা হতে ব্যক্ত ও প্রকাশিত অবস্থায় আসছে। আল-নাজ্জামের মতে জড় বস্তু, উদ্ভিদ জীবজন্তু, মানুষ ইত্যাদি আল্লাহ্ তাঁর সৃজনী শক্তি দিয়ে একেবারে সৃষ্টি করে প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্ত অবস্থায় রেখেছেন, সেগুলো কালের মাঝে আস্তে আস্তে প্রকাশিত হয়।[১] সৃষ্টি হওয়ার অর্থ প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্ত অবস্থা হতে প্রকট ও ব্যক্ত হওয়া অবস্থায় আসা। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝেই আছে। বিবর্তন অতীতকে বর্তমানরূপে প্রকাশ করে। আল-নাজ্জাম তাঁর বিবর্তনবাদের দ্বারা আশারীয়দের অবিরাম ও ধারাবাহিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করেন। আশারীয়দের মতে আল্লাহ্ অবিরত নতুন নতুন পরমাণু বা বস্তু সৃষ্টি করেন। আল-নাজ্জাম বলেন যে, আল্লাহ্ কেবলমাত্র একবারই সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টির সকল সম্ভাবনা অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান আছে। জড় বস্তু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ ইত্যাদি প্রথম সৃষ্ট অফুরন্ত সম্ভাবনা হতে ব্যক্ত হয় ও হচ্ছে। সুতরাং তাঁর মতে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়ার অর্থ নতুন সৃষ্টি হওয়া নয়, বরং অপ্রকাশিত অবস্থা হতে প্রকাশিত হওয়া বা পূর্ব সৃষ্ট বস্তুরই বিবর্তন হওয়া বোঝায়। ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অব্যক্ত ও অস্ফুট শক্তির ব্যক্ত, পরিস্ফুট ও প্রকাশিত হওয়ার নামই বিবর্তন।

আল-নাজ্জামের বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তনের প্রথম স্তরে জড় জগৎ অর্থাৎ জড় জগৎ হতে বিবর্তন শুরু হয়। জগতের যাবতীয় বস্তু সহজ ও সরল অবস্থা হতে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জটিল অবস্থায়, সদৃশ ও সমসাত্ত্বিক অবস্থা হতে অসদৃশ ও বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় পৌঁছায়। বিবর্তন প্রবাহ জড় জগতের জড় বস্তু হতে শুরু হয়ে উদ্ভিদ জগৎ, জীবজগতের মাধ্যমে মানব জগতের মানুষের পর্যায়ে পৌঁছায়ে পরিণতি লাভ করে। আল-নাজ্জামের বিবর্তন প্রক্রিয়া কোন্ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় সে কথা তিনি বলেন নি, কিন্তু তাঁর বিবর্তনবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কয়েকটি

১. A. B. Macdonald: Development of Muslim theolog, Lahore, 1960, p. 41. Dr. T. J. Deboer, History of Philosophy in Islam London, 1961, p. 52, tr. by E. R. Jones.

ক্রমিক স্তর—জড়বস্তু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইবনে মিশকাওয়াহ্, ডারউইন, স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিকের দ্বারা এই ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বিবর্তনের ইতিহাসে পরিবর্তী বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে মিশ-কাওয়াহ্।[১] তাঁর মতে আদিম উপাদানগুলোর সংমিশ্রণের ফলে জড় জগতের উৎপত্তি হয়। বিবর্তন ঐক্যবিধান, পৃথকীকরণ ও নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়, অজৈবিক জড় বস্তুর বিবর্তনের ফলে নিম্নস্তরের লতাপাতার উদ্ভব হয় আর এটাই জৈবিক বিবর্তনের প্রথম স্তর। বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় নতুন সৃষ্টির জন্য লতাপাতার ক্ষেত্রে কোন বীজের প্রয়োজন হয় না ও বংশ বিস্তারের জন্য সেগুলো কোন ফল ধারণ করে না। এই স্তরে স্বতঃ সঞ্জাতরূপে সেগুলোর উৎপত্তি হয় এবং এই স্তরের লতাপাতা জড় বস্তুর মতো। লতাপাতা অতি সুক্ষ্ম মাত্রায় গতি সম্পন্ন হওয়ার লতাপাতা ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব হয়। উদ্ভিদ জগতের উচ্চতর অবস্থায় শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হলে গতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বংশ বিস্তারের জন্য ফল ও বীজ ধারণকারী গাছ অধিক উন্নত মানের এবং সেগুলোর গতিও অধিক। যে সকল লতাপাতা গাছপালা উৎপাদনের জন্য উন্নত মানের ভূমির, সার ইত্যাদি প্রয়োজন হয় সেগুলো বিবর্তনের ক্ষেত্রে আরও উন্নতমানের। আংগুর গাছ ও খেজুর গাছের মধ্যে উদ্ভিদ জগতের বিবর্তন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। ইবনে মিশকাওয়াহ্‌র মতে এইসকল লতাপাতা, গাছপালা প্রাণী জগতের অতি নিকটতর প্রজাতি এবং সেগুলোর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ দেখা যায়। সেগুলোর দেহে প্রাণী জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাঁর মতে সমুদ্রে অবস্থিত প্রবালদেহের মধ্যে লতাপাতা, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বিভিন্ন বস্তুর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে; সুতরাং প্রবালকে দুইটি ভিন্ন জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী দেহধারী বস্তু বলা যায়।

ইবনে মিশকাওয়াহ্ বলেন[২] যে প্রাণীজগতের প্রথম বিবর্তনিক গুণ প্রাণীর

১. M. M. Sharif: Muslim Thought: Its Origin and Development, Quoted from Shibli Numani's Ilm-al-Kalam, Lahore, 1951, p. 94.

২. Dr. K. M. Jamil, Modern Theories of Evolution and the Problem of Creation in the Holy Quran, Bagdad, 1963. p. 15.

চলাফেরা করার জন্য গতিশক্তি অর্জন। সচেতনভাবে চলাফেরা করা বিবর্তনের আর একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। প্রাণীজগতের বিবর্তনের প্রথম স্তরে প্রাণী বা জীবদেহে স্পর্শ গুণের আবির্ভাব হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শন ইন্দ্রিয় সবশেষে দেখা যায়। ইন্দ্রিয়গুলোর ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন হয় এবং স্বাধীন-ভাবে কাজ করার ফলে প্রত্যেকটি অংগ ও ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী লাভ করে। কীট-পতংগ, সরীসৃপ, পিপিলিকা, মৌমাছি ইত্যাদি প্রাণীর বিবর্ত-নের এই স্তরে আবির্ভাব ঘটে। প্রাণীদের মধ্যে শ্যেনপাখী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অশ্ব বা ঘোড়া প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ। বিবর্তন ঐক্যবিধান, পৃথকী-করণ ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে এবং উপরের স্তরের জীবের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বুদ্ধি প্রকাশ পায়। বানর, বন-মানুষ, গেরিলা প্রভৃতি জীবের ভিতর বুদ্ধির প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এইসকল প্রাণী বুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেকটা মানুষের নিকটতম প্রাণী এবং তারা একদিকে মানুষ ও অপরদিকে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যবর্তী প্রজাতি। আরো অধিক বিবর্তনের ফলে প্রাণীর মধ্যে দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাণী প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, ভাল-মন্দ, কল্যাণকর-অকল্যাণকর, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বোঝার শক্তি অর্জন করে, আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি শক্তিলাভ করে। বিবর্তনের ফলে জড়বস্তু বা এক প্রকার অংগ-প্রত্যংগহীন জীব হতে মাছ ও জলজ উদ্ভিদ, মাছ হতে জলচর প্রাণী, উভচর প্রাণী, পাখী, স্তন্য-পায়ী প্রাণী, বানর, গেরিলা বনমানুষ ও সবশেষে মানুষ উদ্ভূত হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমাজের নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দীর্ঘকালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। কাজেই বলা যায় যে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ অসভ্য বর্বর যুগ হতে সভ্যযুগে এসেছে এবং উন্নতমানের আচার, ব্যবহার, নৈতিকতা ইত্যাদি শিখেছে।

ইবনে মিশকাওয়ার বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা তাঁর পূর্বেকার অন্যান্য দার্শনিকদের মতবাদের ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক উন্নতমানের এবং তাঁর মতবাদ সুধীজনের নিকট অধিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু আদিম উপাদানগুলো কি এবং কিভাবে বা কোন্ শক্তির সাহায্যে বিবর্তন সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। ডি বুয়েরের মতো অনেক চিন্তাশীল লেখক

তাঁকে ডারউইন ও স্পেনসারের মতো দার্শনিকদের পূর্বসূরী দার্শনিক বলে উল্লেখ করেন।

দার্শনিক আল-জাহিজ স্থান পরিবর্তনের ফলে পাখির দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলেন যে, জীবদেহের উপর পরিবেশের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডারউইন, স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুসলিম দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জালালউদ্দীন রুমী তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বিবর্তনবাদ হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে তার সাথে তাঁর সৃজনশীল মননশক্তির ভাবধারা যোগ করে কোরান ও হাদীসের আলোকে এক সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ সৃষ্টি করেন। তিনি পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের লেখকগণ, আল-নাজ্জাম, আল-জাহিজ, ইবনে মিশকাওয়াহ্ প্রমুখ মনীষীর বিবর্তনবাদী মতবাদ অতি সাবধানতার সাথে গ্রহণ করে কোরানের মতবাদের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তারজন্য তাঁকে বার্গস'র[১] পূর্বসূরী দার্শনিক বলা যায়। তাঁর পূর্বেকার দার্শনিকরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের কথা জীবদেহের উপর পরিবেশের প্রভাবের কথা, ঐক্যবিধান, পৃথকীকরণ, নিয়মানুবর্তিতার কথা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মরক্ষা, আত্মসম্প্রসারণের কথা বলেছেন। কোন্ শক্তিবলে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্তরে এইসকল বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটায় তা উল্লেখ করেন নি। রুমী এই শক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন যে, এই শক্তি কোন যান্ত্রিক শক্তি নয়, এটা জীবনী-শক্তি। প্রেম আকর্ষণে এই জীবন শক্তি অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বগতিতে পরম উৎসের নিকটে ফিরে যায়। বিবর্তন সম্পর্কে রুমীর মতবাদ তাঁর পূর্বেকার সকল বিবর্তনবাদী দার্শনিকদের মতবাদের চেয়ে বলিষ্ঠতর ও ব্যাপকতর মতবাদ।

রুমী বলেন যে, পরম সত্তা সৃষ্টির পূর্বে নিজের কাছে নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পরম সত্তার নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। সৃষ্টি প্রক্রিয়া একদিনে সম্পন্ন হয়নি। এই প্রক্রিয়া সৃষ্টির আদি দিন হতে শুরু হয়েছে

১. Henri Bergson, Creative Evolution, London, 1954, tran. by Arthur Mitchell, ph. D.

এবং এখনও অব্যাহত আছে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে বুদ্ধিময় সত্তা বর্তমান। পরম সত্তা নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশিত করার জন্য বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশ্বজগতের উৎপত্তি করেন। নিজেকে প্রকাশের বাসনায় আল্লাহ্ একখানি দর্পণ সৃষ্টি করেন, যার সম্মুখভাগ আত্মা ও পশ্চাদভাগ বিশ্বজগৎ। আত্মা হতে দেহ সৃষ্টি হয়। দেহ থেকে আত্মা সৃষ্টি হয় না।[১] সম্পূর্ণ নির্জীব জড়বস্তু বলে কিছু নাই, জড় অতি নিম্নস্তরের জীবন কণিকা এবং জড় জগতে আত্মা জড় পরমাণু বা শক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব জগতের সর্বত্র জীবনের চিহ্ন বর্তমান, বিবর্তন প্রক্রিয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত যার বিশ্ব জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এক চেতনাময় পরম সত্তা আছে। বিশ্বজগতের বিবর্তন পরম সত্তার আত্মপ্রকাশ, আর জীবনের বিবর্তন পরম উৎসে প্রত্যাবর্তন মাত্র।

রুমীর মতে, আত্মা বা জীবন প্রথমে অগ্নি বা নিহারিকা মণ্ডলের মতো মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত অগ্নিময় দ্রুতগতিসম্পন্ন বাষ্পরূপে প্রকাশ পায়। দীর্ঘদিন এই অবস্থায় অবস্থানের পর উত্তপ্ত বাষ্পরূপী অগ্নিকণা ক্রমশঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি রূপলাভ করে। বিবর্তন প্রক্রিয়া সর্বদা সহজ, সদৃশ, সমসাত্ত্বিক, অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ অবস্থা হতে জটিল, অসদৃশ, বিষমসাত্ত্বিক, নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয় বলে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ বা অগ্নিকণা বা আধুনিক বিজ্ঞানের মতে 'শক্তি' বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন জড় উপাদান হিসাবে অবস্থানকালে জীবন সক্রিয় ছিল, কিন্তু কোন ইচ্ছাশক্তি ছিলনা এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না। তারপর বিবর্তনের মাধ্যমে একের পর এক জড় জগতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে জীবন উদ্ভিদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। একটি সজীব, সতেজশক্তি বিবর্তন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী প্রেরণা ; এই শক্তি বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরে নতুনের আবির্ভাব ঘটায়। জড় বস্তুর স্তরে এই শক্তিকে জড় শক্তি বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা নির্জীব বা অচেতন শক্তি নয়, এটা প্রাণপ্রবাহ বা তেজশক্তি। বিবর্তন উদ্দেশ্যমুখী হওয়ার জীবন এক সত্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যায়।

রুমী বলেন, বিবর্তন অজৈবিক জড় বস্তু বা পদার্থ হতে শুরু হয়,[২] অজৈবিক

১. Dr. Abdul Hakim. Ibid, p. 35.
২. M. M. Sharif, Ibid, pp. 94-95.

জড় বস্তু জৈবিক জড় বস্তু বা জৈব জড় রূপ লাভ করে এবং উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাব হয়। পরবর্তীকালে ডারউইন বলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদবর্তন নীতিই নতুনের জন্ম দেয়। রুমীর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক কোন অন্ধ জড়শক্তি নয়[১] বরং এক আধ্যাত্মিক সত্তা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি। এই শক্তি বস্তু বা জীবের আভ্যন্তরীণ প্রেরণা শক্তি। জীবের 'অন্তর্নিহিত আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মূল কারণ। এই বিবর্তন যান্ত্রিক বিবর্তন নয়, কোন আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল নয়। এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তি বিবর্তনের সকল স্তরে ক্রিয়াশীল। এই বিবর্তনে ঐক্য, শৃঙ্খলা, সংহতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি লক্ষণীয়। সৃজনশীল আধ্যাত্মিক শক্তি জৈবিক বস্তুকে তার নিজের চেয়ে উন্নতমানের জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং জৈবিক বস্তুকে অস্তিত্বের নতুন স্তরে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করে। মৃত্যুর মাধ্যমে জীবন এক স্তর হতে পরবর্তী উন্নত স্তরে প্রবেশ করে। বস্তুর এক আকার ধ্বংস না হলে নতুন আকার সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ বস্তুর এক আকার ধ্বংস হয়, নতুনভাবে উপাদানের সংমিশ্রণ হয়, আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন অনুসারে উন্নত স্তরের জীবনে প্রবেশ করে জীবন নিজেকে অধিকরূপে ব্যক্ত করে এবং পূর্ববর্তী জীবনের সব কিছু বিস্মৃত হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ জগতের জীবন প্রাণীজগতে প্রবেশ করে এবং নিজেকে আরো অধিক স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বা মানসিক অস্থিরতার প্রভাব অধিক হওয়ার ফলে জীবন একই অবস্থায় থাকতে পারে না। জীবন এক স্তর হতে অন্য স্তরে, অস্তিত্বের নিম্নতর অবস্থা হতে উচ্চতর অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নত হতে হতে বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাসম্পন্ন মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। পরম শক্তির আত্মোপলব্ধি বিশ্বজগতের বিবর্তনের মূল প্রেরণা হওয়ার জড় রূপী আধ্যাত্মিক আদিম উপাদান হতে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণের ফলে ঐক্য বিধান, পৃথকীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া অনুসারে সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ জড়বস্তু, বিভিন্ন শ্রেণীর জীব ও মানুষের উদ্ভব হয়। উন্নত জীবনলাভ এবং নিজেকে ব্যক্ত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তায় বিবর্তন সম্ভব হয় এবং জীবন এক স্তর হতে অন্য স্তরে

১. Dr Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 37.

পরিবর্তিত হয়। বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য একই আদিম উপাদানের বিবর্তিত রূপ। নতুনের আবির্ভাব কোন আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে ঘটে না, এর পিছনে কোন অন্ধ জড়শক্তি ক্রিয়াশীল নয়। উদ্দেশ্যমূলক এক আধ্যাত্মিক শক্তি বিবর্তনের সকল স্তরে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ ও প্রয়োজন অনুসারে ক্রিয়াশীল হয়, বস্তুর আকার, প্রাণীর দৈহিক গঠন ও মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, চেতন ও আধ্যাত্মিক শক্তি ইত্যাদির উদ্ভব সম্ভব করে।[১]

বিবর্তনবাদী দার্শনিক[২] রুমী বলেন, শক্তি জীবনকে অস্তিত্বের এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত করে বিবর্তনকে ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, জীবনকে পরম উৎসের সাথে মিলিত হতে সাহায্য করে। প্রেম সজীব শক্তি। প্রেম বিবর্তনের মূল প্রেরণা শক্তি। এই শক্তি মানুষকে মৃত্যুর মাধ্যমে ফেরেস্তাদের স্তরে উন্নীত করে এবং সর্বশেষে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায়। রুমী বলেন, 'আমি' অজৈব জগৎ হতে মৃত্যুবরণ করে একটি প্রাণী হিসাবে জন্ম লাভ করি। প্রাণীজগৎ হতে মৃত্যুর পর আমি মানুষ জীবন লাভ করি। সুতরাং আর এক মৃত্যুর মাধ্যমে আমি উন্নত স্তরের জীবন লাভ করতে ভয় করব কেন? পরবর্তী পর্যায়ে মানব জগৎ হতে বিদায় নিয়ে ফেরেস্তাদের মতো ডানাযুক্ত জীবে পরিণত হবো। পুনরায় আমি আমার ফেরেস্তা জীবন ত্যাগ করে কল্পনাতীত একটি জীবে পরিণত হবো। ঐশী বাণী মতে 'আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করি'—এই শব্দ উচ্চারিত হলে আমি অনস্তিত্বে পরিণত হবো।[৩]

রুমীর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে অজৈবিক জড় বস্তু হতে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত ব্যাখ্যা অনেকটা আল-নাজ্জাম, ইবনে মিশকাওয়াহ, ডার-উইন ও স্পেন্সারের মতো। ডারউইনের মতবাদ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন-সংগ্রাম, আকস্মিক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অস্তিত্ব রক্ষা সম্পর্কে রুমী একটা স্পষ্ট ধারণা দেন। প্রত্যেকটি জীবনই এক একটি যুদ্ধক্ষেত্র, এ যেন প্রত্যেকের যুদ্ধ সকলের সাথে, প্রত্যেকটি জীবন যা ডেমোক্রিটাসের পরমাণু নয় বরং আধুনিক বিজ্ঞানীদের

১. Mathnawi IV. verses, 3637-3641 ; 3646-3649.
২. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 32.
৩. Ibid, p. 37. quoted from Mathnawi III, 1-3, 5, 6.

শক্তি-রূপী পরমাণু বা সিবলিজের চিৎপরমাণু, একে অপরের সাথে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। পরস্পর বিরোধী শক্তির সংগ্রামের পরিণতি নতুনের আবির্ভাব। সংগ্রামই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব করে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব। সংগ্রাম জীবনের মূলকথা, সংগ্রামহীন জীবন নিরর্থক।[১] রুমী আকস্মিক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন-সঞ্জাত যান্ত্রিক বিবর্তনে বিশ্বাস করেন না। উচ্চ স্তরে জৈবিক দেহের সাথে মিলন আকাঙ্ক্ষায় জীবনের মধ্যে সৃষ্ট অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার ফলে উদ্ভূত নতুন জীবনের বিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী। জীবনের দীর্ঘ পথে বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের অসংখ্য জাতি ও প্রজাতির স্তর আছে এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার অপ্রতিরোধ্য আভ্যন্তরীণ প্রেরণা জীবনকে অস্তিত্বের এক স্তর হতে পরবর্তী উন্নত স্তরে উন্নীত করে। সৃষ্টির সকল সৃজনশক্তি সবসময় ক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও এই ক্রমোন্নতি বা ক্রম-পরিবর্তন জীবনের নিজ প্রচেষ্টার ফল। আকস্মিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, অন্ধ যান্ত্রিক গতিশক্তি ইত্যাদি ধারণার কোন মহলে স্থান তাঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে নাই। তাঁর মতবাদ সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ।

তিনি একজন উদ্দেশ্যবাদী বা পরিণতিবাদী দার্শনিক[২] এবং তাঁর বিবর্তনবাদ বার্গস'র সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের পূর্ববর্তী মতবাদ। তাঁর মতে, বিবর্তন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। বিবর্তন অন্ধ জড়শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। প্রাণপ্রবাহ বা প্রাণশক্তিই বিবর্তনকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন যে, উচ্চস্তরের জাতি ও প্রজাতির সাথে মিলনের জন্য জীবদেহে যে আকাঙ্ক্ষা বর্তমান আছে তাই নতুন জীব ও জীবের অংগ-প্রত্যংগ সৃষ্টির উৎস। উচ্চতর জীবনে উন্নীত হওয়ার ইচ্ছাশক্তি নতুনের উদ্ভব সঞ্চার করে। তিনি একজন ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, সম্পূর্ণ নির্জীব জড় পদার্থ বলে কিছু নাই, জড় জগতের অণু-পরমাণু জীবনেরই বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। সকল অণু-পরমাণুর মধ্যে জীবনী শক্তি আছে এবং এই জীবনী শক্তি নিম্নস্তরের অণু-পরমাণু হতে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য জাতি ও প্রজাতির মাধ্যমে মূল উৎসে ফিরে যেতে

১. Ibid, p. 39. quoted from Mathnawi V1. verse 36 sq. Mathnawi I. 3873-3875.

২. Ibid, p. 38, quoted from Mathnawi II, verse, 3274, 3277-3280.

উদগ্রীব। জীবন অস্তিত্বের এক স্তরে কিছুকাল বাস করার পর মৃত্যুবরণ করে উন্নত প্রজাতিতে জন্মলাভ করে এবং পূর্বজন্মের সকল ক্রিয়াকলাপ বিস্মৃত হয়। কেবলমাত্র পরম উৎসে ফিরে যাওয়ার প্রেরণাই তার স্মরণ থাকে। মৃত্যু জীবনকে এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতিতে উন্নীত করে। আধুনিক বিবর্তনবাদীরা এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রুমীর সৃজনবাদের মধ্যে তেমন কোন স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না। অজৈবিক পদার্থ হতে শুরু করে মানুষ উৎপত্তি হওয়া পর্যন্ত তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যা অনেকটা বৈজ্ঞানিক ও সন্তোষজনক[১]; কিন্তু মানুষের উর্ধ্বে ফেরেস্তা ও আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানোর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা জড়বাদী দার্শনিকদের নিকট বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন যে, জীবন আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ফলে মানুষের জগৎ হতে ফেরেস্তাদের স্তরে এবং সেখান হতে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়।[২] এই স্তরের বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি উপমা ও রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, স্থলে অনেক পথের চিহ্ন দেখা যায়, জলে পথের কোন চিহ্ন থাকে না। পার্থিব জগতের 'দেহবিশিষ্ট বস্তুর' মতো আধ্যাত্মিক জগতে 'আধ্যাত্মিক দেহ বিশিষ্ট' ফেরেস্তাদের অস্তিত্ব আছে. এমনকি আল্লাহ স্বয়ং 'আধ্যাত্মিক দেহবিশিষ্ট জীব'।[৩] মানব জগৎ হতে মৃত্যুবরণ করে জীবন ফেরেস্তাদের দেহ লাভ করে এবং সর্বশেষে সার্বিক আধ্যাত্মিক দেহবিশিষ্ট জীব বা পরম সত্তায় পৌঁছায় এবং পরম সত্তার সাথে মিলিত হয়। মিলনের মাধ্যমে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ও ঐক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তিগতভাবে তাঁর এই ধারণা সিদ্ধ নয় বলে তিনি যৌক্তিক পদ্ধতি বা যৌক্তিক পথ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। দেহ ও বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের মিলন, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ও ঐক্য যৌক্তিক বিশ্লেষণের বহু উর্ধ্বে।

সৃজনবাদী রুমীর মতে, প্রেম মানবাত্মাকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটায়। প্রেমই গতি, প্রেমহীন গতি অসম্ভব। একত্রীকরণ, মিলন, উন্নতি-সাধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পুনরুৎপাদন ইত্যাদি প্রেম ব্যতিরেই

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 40.
২ Ibid, p. 40.
৩. Spiritual Organism.

বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। পরম সুন্দরের প্রেম মানবাত্মাকে উর্ধ্বগতিতে পরিচালিত করে, পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে সাহায্য করে। প্রেম জীবনের মূল সত্তা, উৎস ও গন্তব্যস্থল উভয়ই। প্রেমহীন জীবন মূল্যহীন।

আধুনিককালের অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থকে নির্জীব, অবিচল ও নিষ্ক্রিয় বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, জীবন জড় পদার্থ বা নিরপেক্ষ বস্তু সত্তা হতে উৎপত্তি হয়েছে। ডারউইন, স্পেন্সার, লামার্ক, ভাইওম্যান ও মেণ্ডেলের মতো বিবর্তনবাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সমর্থক। লয়েড, মর্গান, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ চিন্তাবিদরা উন্মেষবাদের সমর্থক হলেও এই উন্মেষবাদ ছদ্মবেশী যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ মাত্র।

মার্টিনো, হেগেল, হেণ্ডারসন, বোসানকোয়েট প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিক পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের প্রধান সমর্থক। পরিণতিবাদের মতে, বিশ্বজগতের ক্রমবিবর্তন অন্ধ ও অচেতন যান্ত্রিক নিয়মের ক্রিয়া নয়, তা এক পরিণতি বা উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন। জাগতিক বস্তুর শৃঙ্খলা, স্তরভেদ, জড় ও জী: জগতের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য, সুষমা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে বিবর্তন প্রক্রিয়া এক বুদ্ধিময় আধ্যাত্মিক সত্তার মহাপরিকল্পনার ক্রমিক বাস্তবায়ন। পরিণতিমূলক কার্যকারণবাদ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে বলে যে, অতীত বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং আদর্শ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্টিনোর মতে নির্বাচন, সংযোগ, প্রাণীর অংগ-প্রত্যংগের সামঞ্জস্য, নক্ষত্র জগতের গঠন, বিশ্ব জগতে জড় বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্রমিক স্তর ভেদ ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হেণ্ডারসন বলেন যে, নিহারিকা মণ্ডল হতে গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টির মূলে স্থির পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলার প্রস্তুতি, আর জড় জগতের বিবর্তন এক আধ্যাত্মিক আদর্শ বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ। হেগেলের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া পরম সত্তার গৌরবময় আত্মপ্রকাশ; আর বোসানকোয়েটের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য জড় জগত ও জীব জগতের মধ্যে মূল্য উপলব্ধি। যান্ত্রিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে পরিণতিমূলক বিবর্তন প্রক্রিয়ার তাৎপর্য সংক্রান্ত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পরিণতিবাদের সাথে জাগতিক ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর কোন বিরোধ নাই। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র বার্গসঁ

সৃজনবাদ বা সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠা করে বলেন যে, জগৎ গতি বা কাল প্রবাহ বা প্রাণপ্রবাহের বিবর্তন প্রক্রিয়া। এই প্রাণপ্রবাহ অন্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, অজ্ঞাতপূর্ব, কিন্তু সৃজনধর্মী হওয়ায় জগতের ক্রমবিবর্তন ও সুসামঞ্জস্য ও সুন্দর গঠন বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। নিরপেক্ষবাদী দার্শনিক নিরপেক্ষ সত্তা বা যৌক্তিক পরমাণু হতে জড় জীবন, মন ইত্যাদি উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। রুমীর মতে, মূল উৎস কোন যান্ত্রিক বা যৌক্তিক পরমাণু বা জড় পরমাণু নয় বরং তা হচ্ছে সজীব, গতিসম্পন্ন, সৃজনশীল পরমাণু বা জীবন শক্তি, অনেকটা লাইবনিজের চিৎপরমাণু বা মনাডের মতো। রুমী প্রথম হতে একই কথা বলেন যে, আদি সত্তা ও মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিক। তাঁর মতে, প্রতিটি পরমাণু এক একটি জীবন। এই জীবন আল্লাহ্‌র নিকট হতে আসে এবং তাঁর কাছে ফিরে যায়। তাঁর এই মতবাদ কোরান হতে গৃহীত হয়েছে।

কোরানের মতে, আল্লাহ্‌ শূন্য হতে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্‌ এক-মাত্র স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তিনি ইচ্ছামত সৃষ্টিতে সবকিছু যোগ করেন। সৃষ্টির শুরুতে তিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন, উভয়কে একখণ্ড ধুম বা মেঘরূপী বস্তুতে পরিণত করেন। এক হিসাবে তিনি মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেন, আর এক হিসাবে ছয়দিনে। গাণিতিক নিয়মের গণনা অনুসারে এক একটি ঐশীদিন এক হাজার বছর বা পঞ্চাশ হাজার বছর বলে উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একটি ঐশী দিন বিবর্তনের একটি দীর্ঘকাল বলে মনে করা যায় এবং এইরূপ ছয়টি দীর্ঘকালের মধ্যে সৃষ্টি ক্রিয়া ও বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে যদিও ঐশী দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করলে এটা 'কুন' বা 'হও' শব্দ বলা মাত্র অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা যায়। কোরানের মতে, বিবর্তনের প্রথম স্তর জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ; ধুম বা মেঘ হতে বিবর্তন শুরু হয় (কোরান : ৪১ : ১৯), তারপর বিবর্তনের মাধ্যমে পানির উৎপত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে পানি হতেই জীবন শুরু হয় এবং পানি হতে প্রথমে বুকে হাঁটা জীব, দ্বি-পদ জীব ও পরে চতুষ্পদ জীবের আবির্ভাব হয়েছে (কোরান : ২৪ : ৪৭), সবকিছু একই বস্তু হতে সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাকে মাটি (কোরান : ৩২ : ৭, ৪০ : ১৪) অথবা কাদামাটির কণা-অনুকণা (কোরান : ৬ : ২

২২ : ৫) হতে উৎপত্তি করা হয় এবং অন্যান্য জীবের মতো সে ঐশী সাহায্য ও জীবনশক্তি (কোরান : ২২ : ৩০) পায়, সে পানি (কোরান : ১৫ : ২৬) অথবা কাদামাটি পূর্ণ পানির মতো (কোরান : ৩৭ : ১১) হয়েছে, রক্ত (কোরান : ১৬ : ২) অথবা জমাটবাধা রক্তের আকার (কোরান : ৯৬ : ২) ধারণ করেছে, নির্দিষ্ট আকার ও অনুপাতে ক্রমোন্নোয়ন জীবন লাভ করে (কোরান : ১০ : ২৬) একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, অস্থিপিণ্ড বা হাড়, মজ্জা ইত্যাদি উৎপত্তির সাথে সে নতুন জীবের আকার (কোরান ২৩ : ১৪) বা স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই প্রকার মানুষ (কোরান : ৩৬ : ৩৬; ৪৩ : ১২ ; ৪০ : ৪৯) আকার লাভ করে, তার মধ্যে শ্রবণ শক্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞাশক্তি, অন্যান্য প্রকৃতির (কোরান : ১৬ : ৭৮) উদ্ভূত হয় এবং কোন একজন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্তরূপে গড়ে উঠে (কোরান : ২ : ৩০), তারপর এক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে (কোরান : ২৩ : ১৫) এবং শেষ বিচারের দিনে তার পুনরুত্থান হবে (কোরান : ২৩ : ১৬ ; ১১৫ ; ৩৬ : ৭৯)। কোরানে সৃষ্টি ও বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র এই জগতে নয় বরং পরজগতেও মানুষের বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কোরানে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে জীব উৎপত্তির বহু পূর্বে আল্লাহ্ আদমকে মাটি হইতে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে নিজ আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটান (কোরান : ৩৮ : ৭২), তাঁকে ফেরেস্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (কোরান : ১৫ : ১০ ; ৩০ : ৭২) করেন। পার্থিব জগতের দেহ বিশিষ্ট জীবের মতো আদমের কোন দেহ না থাকলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়দেহের বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ছিলেন না। সৃষ্টির পর আদমকে শুদ্ধ আত্মা ও পার্থিব জগতের মধ্যবর্তী স্থান বেহেস্তে বাস করতে দেওয়া হয় এবং 'হাওয়া' বা 'ইভকে' সাথীরূপে সৃষ্টি করে একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ফলে বেহেস্ত হতে উভয়ে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে স্থান লাভ করেন। কতগুলো স্তর অতিক্রম করে এই পৃথিবীতে আদম-হাওয়া আগমন করেন, তা জানা যায় না। অনেকের মতে, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেই তাঁরা পৃথিবীর মানবরূপে দেহ লাভ করেন।

কোরানের মতে বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক বা পরিণতিমূলক। বিশ্বজগত উদ্দেশ্য-হীনভাবে সৃষ্টি করা হয় নি। খেলার জন্য আল্লাহ্ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি

(কোরান : ২১ : ১৬), একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (কোরান : ৪৬ : ১৬) পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ মহাপরিকল্পনাকারী সত্তা (কোরান : ৩ : ৫৪), তিনি আইন প্রবর্তন করেন, সৃষ্টি পরিচালনা করেন (কোরান : ৮৭ : ৩) এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নিয়ম ও আকার মতো সবকিছু সৃষ্টি করেন (কোরান : ২৫ : ২ ; ৫৪ : ৪৯), উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত রূপে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন (কোরান : ২০ : ৫০)। আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা (কোরান : ১ : ২ ; ৬ : ১৬৪ ; ১০ : ৩২), অনুমোদন কর্তা (কোরান : ৭ : ৫৪ ; ১১ : ৬ ; ২৭ : ৬৪ ; ২৯ ; ৬০ ; ৫১ : ৫৮), রক্ষা কর্তা (কোরান : ২ : ২৫৭ ; ৩ : ১৫০ ; ৪৬ : ২ ; ৯৬ : ৬) সাহায্যকারী কর্তা (কোরান : ৩ : ১৫০ ; ৪ : ৪৫ ; ৪০ : ৫১) এবং পরিচালনকর্তা (কোরান : ৬ : ৭১, ৮৮ ; ২৭ : ৬৩ ; ৯২ : ১২ ; ৯৩ : ৭)। তিনিই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মহাপরিচালক এবং নিজ পরিকল্পনা অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। বিশ্বের মতো মানুষও বিবর্তনের অধীন, কারণ সে একই মহা উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকের একই লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্। ঐশী গুণে গুণান্বিত হওয়ার মধ্যেই মানুষের পূর্ণতা নিহিত আছে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে ঐশীরূপ পূর্ণভাবে অর্জিত হয়। সুতরাং মানুষের প্রধান লক্ষ্য ঐশী গুণ অর্জন করা। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা কেন বিবর্তন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নি, কোরান এ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছে এবং রুমী সে উত্তর তাঁর বিবর্তনবাদে উল্লেখ করেছেন। জীবন আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে চায়, বিবর্তন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। 'আল্লাহ্ আদি এবং আল্লাহ্ অন্ত, অথবা আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই (কোরান : ৫৭ : ৩)। কোরানের এসব উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে ধর্মীয় সৃষ্টিবাদ এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সমন্বয় সাধন করে রুমী বিশ্বজগতে অমর হয়ে আছেন। এখন প্রাণপ্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। আধুনিককালের প্রাণ-বাদীদের মত রুমী বলেন যে, বিবর্তনবাদকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে প্রাণপ্রবাহ বা জীবন প্রবাহ বা বার্গসঁর ভাষায় 'এলান ভিটাল' এর জ্ঞান অপরিহার্য।[১]

১. Dr. K. M. Jamil : Jalaluddin Rumi's Theory of Evolution Baghdad, 1964, p. 14.

প্রাণ প্রবাহ

সাধারণ লোকে স্বাভাবিক চিন্তা দ্বারা দৃশ্যমান জগতকে প্রকৃত জগৎ মনে করে ; কিন্তু দার্শনিকদের মতে, এটা অবভাসিক জগৎ এবং তাঁরা এই অবভাসিক জগতের আড়ালে এক প্রাণপ্রবাহ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বহু দার্শনিক এই প্রাণপ্রবাহ সত্তা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। এই সত্তার প্রকৃতি কি, এই সত্তা কি ? জড় না আধ্যাত্মিক ? দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোকে এর একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করা যায় এবং এ সম্পর্কে জালালউদ্দীন রুমীর অভিমত জানা যায়।

একই বিদ্যুৎ প্রবাহ যেমন শহরের লক্ষ লক্ষ বাড়ী-ঘরের বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে, তেমনি একই জীবন প্রবাহ সমগ্র বিশ্বের সকল বস্তু ও জীবনের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে ছুটে চলে। এই জীবন প্রবাহ জগতের প্রতিস্তরে প্রকাশিত হয়, যুগ-যুগান্তর ধরে সম্মুখের দিকে ছুটে চলে আর এর বহিঃপ্রকাশই সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য। জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও জীব জগতে এই জীবন প্রবাহের বহিঃপ্রকাশ অনন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। এই প্রবাহ বহুত্বের ভিতর দিয়ে নিজের পথ কেটে সম্মুখের দিকে চলে নানা বর্ণে নানা গঠনে, শত-সহস্র রূপে নিজের রূপ প্রকাশ করে।

জড়বাদী ও যান্ত্রিকবাদী দার্শনিকদের মতে, এই জীবনপ্রবাহ প্রকৃতির তাড়না বা অন্ধ যান্ত্রিক প্রেরণা। জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাববাদী দার্শনিক এবং তাঁর মতে, এই জীবন প্রবাহ একটা উদ্দেশ্যময় প্রেরণা,[১] একটা সচেতন অভিব্যক্তি।[২] জড় জগতের এক একটি অণু-পরমাণু যেন এক একটি শক্তি কেন্দ্র।[৩] রুমীর এই উক্তির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। একটি ছোট ইট বা পাথরকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেষ্টা করলে দেখা যায় যে, অগণিত অণুরাশির এই ছোট ইট বা পাথরটি একটি সমষ্টি। সেগুলো কিছুতেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কোন এক অলক্ষ্য শক্তি যেন তাঁদের ভিতর থেকে বাধা সৃষ্টি করে, মনে হয়, তাদের ভিতর এক অবচেতন ও অবলুপ্ত আত্মা বর্তমান আছে। লোহার সান্নিধ্যে নিয়ে আসলে চুম্বকের ভিতর একটা অনুভূতি জাগে, সচেতন

১—২. Mathenawi III, 2266.
৩. Mathnawi I. 1812. I, 838, Mathnawi VI. 220.

প্রাণীর মতো লোহাকে চেপে ধরে। দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটা সর্বদা সুমেরুর দিকে মুখ করে থাকতে চায়, পুর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরের জলে জোয়ার ভাটা ঘটে, সূর্যের আকর্ষণে সৌরমণ্ডলের বিশাল গ্রহ-উপগ্রহগুলো নির্ধারিত কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে। উদ্ভিদ জগতে জীবন প্রবাহের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। সামান্য একটা লতা কোন কিছুর সান্নিধ্যে আসলে তার কোমল তন্তুগুলো ডানা মেলে তাকে জড়ায়ে ধরে। কোন তৃণের নবজাত অংকুর নিজের অপেক্ষা সহস্রগুণ ভারী মাটির বোঝা ঠেলে অন্ধকার মাটির গহ্বর হতে আলোকের জগতে বেরিয়ে আসে। যে শক্তি ঐ আশ্রয়হীন লতার অগ্রতন্তুগুলোর ভিতর অজানা লক্ষ্যের দিকে অনুভূতি জাগায় এবং যে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধি প্রবাহ সেগুলোকে চালিত করে আশ্রয় গ্রহণ করতে সাহায্য করে তা প্রাণ প্রবাহ।[১] জীব জগতে এই প্রাণপ্রবাহের চিহ্ন অধিকতর সুস্পষ্ট। জীব শুধু বেঁচে থাকতে চায় না, সে যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রসারিত করতে চায় এবং জীব জগতের প্রকৃতিতে তেমনি একটি প্রেরণা বা প্রাণপ্রবাহ বর্তমান। জীবে আভ্যন্তরীণ জৈবশক্তি তার ভিতর দিয়ে লীলা করে, দেহ হতে দেহান্তরের গমন করে অনন্তকাল ধরে নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষও এই নিয়মের অধীন। তবে অন্য প্রাণী হতে মানুষের শুধু একটু পার্থক্য আছে; কারণ সে কেবল জৈব শক্তির অভিব্যক্তি নয়, তার মধ্যে আত্মা নামক একটি নতুন শক্তির বিকাশ ঘটে; যার ফলে সে সত্যকে লাভ করার জন্য বাস্তবকে ছাড়িয়ে সম্মুখের আদর্শের দিকে, সত্যের দিকে ছুটে চলে, যতই আদর্শ এসে বাস্তবে পরিণত হয় ততই নতুন আদর্শে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। আদর্শের দিকে এই যে প্রবল প্রেরণা, আপতকে ছাড়িয়ে অনাস্তরের ভিতর দিয়ে আত্মা প্রসারণের এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা জীবন প্রবাহ ব্যতীত কিছু নয়। এই জীবন প্রবাহ আপন মুখ গোপন রেখে বস্তুরূপের ভিতর দিয়ে মুখ দেখায়, নিজেকে প্রকাশ করে। এই প্রেরণা নিজের সম্মুখটা উত্তোলন করে অনাগত কাল ও অতনুদেশকে রূপায়িত করে অগ্রগতির পথ করে চলে।

রুমীর মতে, বিশ্বজগতের মূল যদি শক্তি হয়, আর সে শক্তি যদি মনন-বিশিষ্ট হয়, তবে তা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিছু না হোক, অন্তত সে যে একটা সচেতন

১. Mattenawi, III, 1-3, 5, 6, Mathnawi II 3274, 327-3280, Mathnawi VI, 36.

জীবন প্রবাহ তাতে সন্দেহ নাই ; আর জীবন প্রবাহেই চেতনা ও শক্তি উভয়ের সমন্বয় ঘটে। রুমীর মসনবীতে এ ধরনের উক্তি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দৃশ্যমান জগতের বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্য, প্রাণী, জড়, উদ্ভিদ ও জীবের বহু রকমের প্রকারভেদ, জাতিভেদ, এ সমস্ত সৃষ্টিধর্মী চেতনার বহুমুখী প্রকাশ ও তারই সৃজন বিলাস। আর সে কারণে বহুত্বের মূলে রয়েছে একই উদ্দেশ্যের ঐক্য বা যোগসূত্র। চেতনা যখন হংসরূপে জলকেলী করতে চায় তখন চেতনা জড় দেহটি এমন করে গড়ে যে, তা জলের উপর ভেসে বেড়াতে পারে। আবার চেতনা যখন দুর্দান্ত শার্দূলরূপে মাংস চিবিয়ে খেতে চায় তখন তার দন্ত ও তীক্ষ্ণধার নখরের প্রয়োজন হয় এবং শার্দূল দেহে সেগুলোর উৎপত্তি হয়। তাছাড়া প্রাণীবিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদে বলা হয় যে, মানুষের অংগ-প্রত্যংগ চিরকালই এমনি সুসম্পন্ন ছিল না। অনেক অংগই বহু পূর্বে অসম্পূর্ণ ছিল এবং তা জীব শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ইত্যাদি অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা, কি উদ্ভিদ জগৎ, কি জীব জগৎ, সর্বত্রই একটা জীবনের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। এই জীবন প্রবাহ দেহকে আশ্রয় করে আপনাকে ব্যক্ত করে ও আপনার ভাব মত ও প্রয়োজন মত দেহটিকে আকার দান করে।[১]

প্রশ্ন উঠে : জীবন প্রবাহ জড়ের সহায়তা গ্রহণ করে কেন? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে মনে রাখতে হবে যে, জড় বলতে কি বোঝায়? আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে একটি জিনিস অতি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, জগতের বস্তু আর নিরেট জড় নয়, তা এক প্রকার শক্তি কণা। সে শক্তি নিজের নিষ্কর্ম, অপরিবর্তনীয় অবিচলনীয়, বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ উপাদান নয়। তা সজীব, সক্রিয়, পরিবর্তনীয়, সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলাপূর্ণ, ঘুমন্ত বা অসাড় চেতনা। এ যেন লাইবনিজের অসাড় বা অচেতন 'মনাড' বা চিৎপরমাণু। চেতনা অসাড় হতে পারে। দার্শনিক লাইবনিজ এ কথা বলেছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদের ভিতর যে মৌন চেতনা আছে তা প্রমাণ করেছেন। তেমনি-ভাবে মাটি ইট, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি পদার্থের ভিতর চেতনা যে আড়ষ্ট অবস্থায় নাই তা কে অস্বীকার করতে পারে? যে-সকল বস্তুকে জড় মনে করা হয় যদি তারা যথার্থ নির্জীব হয়, তবে সেগুলো খাদ্যরূপে প্রাণী

১. Mathnawi, III, 1—3, 5, 6.

বা উদ্ভিদ জীবের পুষ্টি সাধন করতে পারত না। জড় পদার্থের মধ্যেও যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তা বিজ্ঞানের নিকট ধরা পড়েছে। জড় ও চেতনার মেশামেশি ও একে অন্যতে রূপান্তর—এ হতে অনুমান করা যায় যে, জড় ও চেতনা এই দুইটির প্রকৃতি ভিন্ন নয় বা ডেকার্টের দ্রব্যের মত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট নয় বরং স্পিনোজার মত বলতে হয়, এ দুইটি একই মূল হতে উদ্গত দুইটি বিভিন্ন স্তরের গুণ। গণিতের রাশি যেমন এক সীমাশূন্য আর এক সীমা অনন্ত চেতনাও তেমনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে হতে বিদ্যুৎ অবস্থা বা তার চেয়েও সূক্ষ্মতর অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। শূন্য সীমায় চেতনা প্রায় অসাড় ও নিরেট শক্তি। উদ্ভিদের স্তরে জীবন ও মানুষের স্তরে চেতনা এবং মানুষ অপেক্ষা উচ্চস্তরে এই চেতনা আরো অধিক সূক্ষ্ম ও প্রকটরূপে প্রকাশ পায়। এই পৃথিবীতে কোন কোন মানুষের ভিতর এমন উন্নত ধরনের চেতনা দেখা যায় যার ফলে তাঁরা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পান, মানুষের ভিতরেই প্রেমের আধারকে খুঁজে পান। মানুষের ভিতরকার সেই শাশ্বত সত্যকে, সেই বিশ্বপ্লাবী প্রেরণাকে অনুভব করেন যা জীবনের ভিতর দিয়ে জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্যমের ভিতর দিয়ে উচ্চ হতে উচ্চতর আদর্শের পানে ছুটে চলেছে। এই প্রেরণাই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র, স্পিনোজার পরম দ্রব্য, ইবনুল আরাবীর পরম ঐক্য, বার্গসঁর প্রাণপ্রবাহ ও রুমীর জীবনী শক্তি[১] বা নূরে মুহাম্মদী বা পরম প্রজ্ঞা বা 'লগস'।

সাধারণতঃ আমরা জড় ও চেতনাকে পরস্পর বিপরীতধর্মী বস্তু বলে মনে করি। চেতনা কি, তা বর্ণনা করে বোঝাতে না পারলেও আমরা প্রত্যেকে তা অন্তরে অনুভব করি। আর যেখানে চেতনার কোন লক্ষণ দেখি না তাকে জড় বলি। আসলে স্থূল হিসাবে চেতনার অভাবই জড় বস্তুর জড়ত্বের প্রধান পরিচয়। একটু সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করলেই জড় ও চেতনার ভিতর একটা নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। আর এই সম্পর্ক না থাকলে জড় কখনো চেতনার ক্ষেত্রে কোন অনুমতি জাগাতে পারত না এবং জড় পৃথিবীকে জানাও সম্ভব হত না। চেতনা যে জড়কে ইচ্ছামত রূপান্তরিত[২] বা অভিভূত

১. Mathnawi, II, 3258. Mathawi IV, 1852-1855
২. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid p. 37. Mathnawi VI. verse-36.

করে তার কারণও এ দুটি মূল সত্তার ঐক্য, জড় ও চেতনা একই পরম সত্তার দুটি প্রকাশ।

যাকে জড় বলা হয় তাকে যথার্থরূপে চিনতে না পারার ফলেই তাকে ধারণা, সংবেদন, সম্ভাব্য ধারণা, সংবেদনউপাত্ত, বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান, আবার অনেক সময় নিরপেক্ষ সত্তা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। চেতনাকে অনেকাংশে চিনা যায়, কেননা আমাদের অন্তরে আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু জড়কে চিনবার তো তেমন কোন সহজ উপায় নাই। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সন্দেহ জাগে, জড়ে যে রূপ, যে চেহারা, যে ধারণা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা তার যথার্থ স্বরূপ বা কেবল আভাস। এ বিষয়ে হল্ট, মারভিন, মনটেগ, পেরী, পিটারকিন, স্পলডিং প্রমুখ আমেরিকান নব্য বস্তুবাদী, সান্তায়না, স্ট্রং, রোজার্স, লাভজয়, সেলার্স, প্রাট, ড্রেক, স্ববিচার বস্তুবাদীরা, লক, হিউম, ব্রড, ডিউজ, হিক্স, লেয়ার্ড, আলেকজাণ্ডার, রাসেল প্রমুখ বৃটিশ দার্শনিক আপন আপন মত ব্যক্ত করেছেন।

মন-মস্তিষ্কের মান-মন্দিরে বসে বহির্জগতের একটি বস্তু সম্পর্কে কোন অনুভূতি বা সংবেদন লাভ করতে চাইলে মনকে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হতে হয়। ইচ্ছা, অনুভূতি ও অবহিতি মনের এই তিনটি মুখ্য বৃত্তিকে সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হয় এবং পারিপার্শ্বিক বস্তু ও শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে হয়। মন একটি মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা বেশী কিছু জানতে পারে না। কোন একটি বস্তুকে স্পর্শ করে তার কাঠিন্য ও বিস্তার মাত্র অনুভব করতে পারে। তাছাড়া তার ধ্বনি, ঘ্রাণ, স্বাদ, তাপ এবং ভর বা ওজন ইত্যাদি বহু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো একে অন্যের সমর্থন যোগায় এবং তাদের পক্ষের সংগতি হতে মন বস্তুজগৎ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা লাভ করে। ইন্দ্রিয়গুলো যদি মিথ্যা বা ভুল সংবাদ দেয় তবে মন নিরুপায়, আবার অধ্যাসের ঘটনাও ঘটতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলো অনবরতই বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে নানা প্রকার সংবেদন ও অনুভূতি বা ধারণা মনের সদর দফতর মস্তিষ্কে পাঠায়। কিন্তু মন সে সবগুলোকে একই সময়ে একত্রে জানতে পারে না। মনের প্রয়োজন মত কিছু সংবেদন ও অনুভূতি বা ধারণাকে ভালভাবে জেনে নেয়। মোটকথা শুধু যেগুলো আমাদের মনের কোনও না কোন প্রয়োজনে

আসে সেগুলোই মনকে আকৃষ্ট করে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয় যে, কোনও সংবেদন বা ধারণা অর্জন মনের পক্ষে একটা স্বার্থগত নির্বাচন এবং এই নির্বাচন প্রক্রিয়া মনের পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হতে পারে। মন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী সেইসব ইন্দ্রিয়ও নিখুঁত বা আশানুরূপ শক্তিশালী নয়। আর এ কারণেই অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের জনক জন লক যে অভিজ্ঞতা-বাদ শুরু করেন তা দার্শনিক বার্কলের হাতে আত্মগত ভাববাদ ও হিউমের হাতে আত্মধ্বংসী সংশয়বাদে পরিণত হয়েছে। তাই কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে বস্তু জগতের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন।

মানুষের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষ বিশ্বের রূপ বা অবভাস দেখতে পায়। কিন্তু এই দেখার জন্য চোখ, আলো, বাতাস, ইথার জড় বস্তুর দূরত্ব, নৈকট্য ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। যদি যন্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করা যায় তবে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল এ কথা বলা যায় না, যন্ত্রের কাঁচে নৈসর্গিক নানা উৎপাত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। চোখের গঠন, ত্রুটি, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার উপরও বস্তুর দর্শন লাভের সামর্থ্য অসামর্থ্য অনেকটা নির্ভর করে। চোখ দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে কেমন ভুল সংবাদ দেয় সূর্যের বাহ্যিক সাদা আলো তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিউটনের প্রিজম আবিষ্কারের পূর্বে সূর্যের আলোর ভিতর যে, সাতটি বর্ণ আছে তা জানা যায়নি। তাছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যে কয়েকটি সৌর জাগতিক আলোর সন্ধান মিলেছে বা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এতকাল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা জানতে পারি নাই। সুতরাং বাহ্য জগতের যেরূপ বা অবভাস আমরা দেখি তা অসম্পূর্ণ এবং বাস্তব জগতের যথার্থ প্রতিকৃতি নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যেসকল সংবেদন ও ধারণাগুলো মস্তিষ্কের কাছে পাঠায় তা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুতে বিভিন্ন প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করে এবং সেখানে এক প্রকার স্বস্তি, আনন্দ বা বেদনাকর অনুভূতির উৎপত্তি হয়। মন ও বস্তুর মাঝখানে সংবেদন বা উপাত্ত এবং মস্তিষ্ক আছে, মন এদের বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বস্তুকে জানতে পায় না। লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হয়, জগৎ ঠিক তাই। লৌকিক বস্তুবাদ জ্ঞানের সমস্যাকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই

মতবাদ গ্রহণ করলে অধ্যাস, অমূল প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নের মধ্যে দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব সত্য বলে স্বীকার করতে হয়। বৈজ্ঞানিক বস্তু গঠনের গুণগুলোকে মূলগুণ ও উপগুণ হিসাবে বিভক্ত করে। যেসমস্ত গুণ বস্তুকে জড়বস্তু হিসাবে প্রতিভাত করে এবং সেই জড়বস্তুর মধ্যে থাকে, তাকে মূলগুণ বলা হয়। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আকৃতি, সংখ্যা, ঘনত্ব, গতি ইত্যাদি বস্তুর মূলগুণ, কিন্তু শব্দ, বর্ণ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা উষ্ণ, শীতল প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিগত ও মনের উপর নির্ভরশীল বলে তা গৌণগুণ বা উপগুণ নামে পরিচিত। জন লকের মতে, আমরা প্রত্যক্ষভাবে বস্তুকে জানি না। ইন্দ্রিয় পথে বস্তুর মূল-গুণের দ্বারা সৃষ্ট যে প্রতিরূপ মনের উপর প্রতিফলিত হয় তাই আমরা বস্তুর প্রতীক বলে মনে করি। বস্তুকে সরাসরি না জেনে প্রতিরূপকে সরাসরি জানা যায় বলে এ মতবাদকে প্রতিরূপবাদ বা প্রতীকবাদ বলা হয়। জর্জ বার্কলে বস্তুর মূলগুণ ও উপগুণ উভয়কেই মনের উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন ও আত্মগত ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন যে, যা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি তা আমাদের মনের ধারণা, বস্তু নয়। আর মননিরপেক্ষ কোন জড়বস্তু নাই। আত্মগত ভাববাদ ও বস্তুগত ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একদল আমেরিকান নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক হল্ট, মারভিন, মন্টেগু, পেরী, স্পলডিং নব্য বস্তুবাদ বা প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করে বলেন যে, বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং মন প্রতীকের সাহায্য ছাড়াই বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে। বিচারমূলক বস্তুবাদের মধ্যে সান্তায়ানা, স্টং রোজার্স, লাভজয়, সেলার্স, প্রাট, ড্রেক প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন যে, জগৎ বস্তু ও ধারণার সমন্বয়ে গঠিত। ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, বস্তুর জ্ঞান ধারণা হতে অনুমিত হয়। অনুমিত জড়বস্তু সবসময়ে সংখ্যা ও অস্তিত্বের দিক দিয়ে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু বা ধারণা হতে পৃথক। অনুমিত বস্তু প্রত্যক্ষীভূত বস্তু বা ধারণা হতে শ্রেণীগত বা প্রকৃতিগতভাবে অন্ততঃ-পক্ষে আংশিক পৃথক। বিচারমূলক বস্তুবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বস্তুকে জানা যায়। বস্তুর গুণাবলী আংশিক বস্তুগত ও আংশিক ব্যক্তিগত। মনের উপস্থাপিত ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলো স্বভাব মিশ্র বা আন্তর সত্তা

বা সত্তাসার। এই স্বভাব মিশ্র বা আন্তর সত্তা জড় কিংবা চেতন নয়। এইগুলো যৌক্তিক সত্তা। মন প্রত্যক্ষভাবে এইসকল স্বভাব মিশ্র বা অন্তর সত্তাকেই জানে এবং এর মাধ্যমেই বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই মতবাদ ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা আন্তর সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে এবং আন্তর সত্তা ও সংবেদনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না আর বস্তুকে সরাসরি না জেনে আন্তর সত্তা বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বস্তুকে জানার কথা বলে নিজেদের অলক্ষ্যে বিচারমূলক বস্তুবাদীরা ভাববাদীদের মতবাদ গ্রহণ করে।

মোটকথা, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে বস্তুকে দেখি সে দেখাতে ও মনের সাথে পূর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় না। আমাদের চোখের পর্দায় বস্তুর যে প্রতিরূপ পড়ে সেই প্রতিরূপ বা সংবেদন বা উপাত্ত সরাসরি মস্তিষ্কের ভিতর চলে যায় না। মস্তিষ্কের ভিতর যে কেন্দ্রটিতে বস্তুর আকৃতি ও বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি জন্মে, সেখানে যায় এক প্রকার স্নায়ু তরঙ্গ বা কম্পন। প্রথমতঃ আলোকরশ্মির দ্বারা 'রেটিনায়' দৃশ্য বস্তুটির একটা উল্টা প্রতিরূপ প্রতিফলিত হয়। আর তার ফলে সেই অক্ষিগোলকের পশ্চাৎ প্রাচীরে এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি হয়, যার তরঙ্গদোলা স্নায়ু পথ বয়ে মস্তিষ্কের শীর্ষভাগে পৌঁছায়। সেইখানে হয় বস্তু সম্বন্ধে যত রূপানুভূতি, কিন্তু বাইরের যে বস্তুটি এই রূপানুভূতির বা উপাত্তের উৎস, তার আসল রূপ বা চেহারা কেমন, তা কোন দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণরূপে বলতে সক্ষম হন নাই। পৃথিবীর যত বস্তু, যত রূপ, যত সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি, সে রূপের বা সৌন্দর্যের আবাস এই পৃথিবী নয়; তা মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাজমান—বাইরে আছে তার 'কারণ' বস্তু যা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলিতে কতকগুলো তরংগ জাগায়। আমাদের মন রূপহীন, কারণ বস্তুর পাঠানো কতকগুলো সংবেদন বা তরঙ্গায়িত স্পন্দন হতে এক সৌন্দর্যরাজ্য গড়ে তুলে। এইভাবে বলা যায় বাহ্য জগতের যত সুখ, সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য আমরা উপভোগ করি, তার সমস্তই রূপায়িত হয় আমাদের মনে, বাইরের কতকগুলো সংবেদন বা উপাত্ত হতে। মোটকথা এই দৃশ্যমান বাহ্য জগতটাই আমাদের চেতনা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, বাইরে আছে শু তার কারণস্বরূপ জড়বস্তু ও শক্তির বিভিন্নমুখী প্রকাশ মাত্র। এই প্রকার

বিশ্লেষণী অনুসরণ করে বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট বলেন যে, আমাদের বোধ শক্তি প্রকৃতিকে গঠন করে।[১] কিন্তু তিনি বিশ্বের আদি কারণ সত্তাকে অজ্ঞাত বা চির অজ্ঞেয় বা 'স্বগতবস্তু'[২] বলে উল্লেখ করেন। এই আদিসত্তা বা স্ব-গতবস্তু জ্ঞানের অতীত হলেও অস্তিত্বহীন নয়। তিনি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হতে হতে পরিশেষে নির্গুণ নিরাকার ইন্দ্রিয়াতীত বা অতীন্দ্রিয় সত্তার সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা, গতিহারা ও অজ্ঞেয়তাবাদী দার্শনিকরূপে নির্বাক হয়েছেন।

বাহ্যিক জগতের বস্তু হতে ইন্দ্রিয় পথে মনের অবিরত যে সংবেদনের ছাপ পড়ে সেগুলোর সমষ্টিই বস্তু সম্পর্কিত ধারণা নয় বরং বস্তুগত ধারণাগুলো এক একটি যৌগিক ধারণা, এই যৌগিক প্রক্রিয়ার ভিতর একটি ঐক্যসূত্র সর্বদা কার্যকরী শক্তিরূপে ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন বা অনুভূতিগুলোকে সমন্বয় সাধন করে। সংবেদন বা অনুভূতির বহুত্ব আমাদের মনে বাইরের জগৎ হতে আসে, কিন্তু মনের ঐক্য গঠন শক্তিটি জন্মগত শক্তি। এই শক্তি ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তা বা ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়গুলোই আমাদের বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে সংবেদন প্রেরণের পথ। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তি বা ঐক্য সাধন শক্তি আছে তা সর্বদা ইন্দ্রিয় পথে চতুর্দিক হতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে জ্ঞানলাভ করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয়গুলোর আহরিত কয়েকটি মৌলিক ধারণা বা অনুভূতি হতে বিরাট দৃশ্যমান জগৎ গড়ে তোলে এবং কান্ট এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

স্মৃতি একটি পরমাশ্চর্য শক্তি এবং এই শক্তি মনকে সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে। প্রকৃতির সাথে সংযোগ বা বাদ-প্রতিবাদে মন অবিরাম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ঐ মিলন বা সংঘাত কালক্রমে অতীতের গর্ভে মিলিয়ে যায়, কিন্তু মনে যে ছাপ রেখে যায় তা মনের অবচেতন এলাকায় জেগে থাকে। প্রয়োজন মত মন অবচেতন স্তর হতে পূর্ব-স্মৃতির চিত্রগুলো নিজের সম্মুখে সাজাতে পারে। সেগুলো অতীত ঘটনার এক একটি প্রতিরূপ, স্মৃতিই আমাদের আত্মপরিচয় এবং অহমজ্ঞান দান করে। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। আমাদের মনে যে দৃশ্যমান জগতের অবতারণা করি তার মূলে স্মৃতির অবদান অপরিসীম। গতকালের স্মৃতি ও আজকের স্মৃতির

১. Understanding makes nature.
২. Thing-in-itself.

মধ্যে যে একই অবিচ্ছিন্ন সত্তা স্মারকরূপে বিদ্যমান আছে। এ ধারণাই আমার আমিত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের বাহ্যিক রূপ আমরা চোখে দেখি ও যা আমাদের সৃজিত এক রঙীন জগৎ, তার বাহ্যিক কারণ পদার্থস্বরূপ যে বাস্তব জগৎ আমাদের চারপাশে আছে, তা জ্ঞাত পদার্থের বর্ণহীন, গন্ধহীন এক কংকাল জগৎ। আইনস্টাইন বলেন, একটি পরিচিত মানুষের কংকাল আমাদের কাছে যতটা অপরিচিত, বিশ্বজগতের আসল রূপ হয়ত তার চেয়ে বহুগুণে বেশী অপরিচিত ও অজ্ঞাত। মানুষ তার নিজের জৈব দেহের ভিতর কি আছে তারই খবর ভালভাবে জানেনা, মহাবিশ্বের আদি স্বরূপ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কিভাবে জানবে? বিশ্বের মূল সত্তা বা মৌলিক ঐক্যকে জানতে হলে আমাদেরকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি ও সংবেদনের উর্ধ্বে উঠতে হবে। সংবেদন অনুভূতি ও উপাত্ত আহরণ ও জ্ঞানার্জনের পক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এবং বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট নয় স্বয়ং সম্পূর্ণতা নয়ই। তাই ইন্দ্রিয় পথে সংবেদন, অনুভূতি ইত্যাদি সংগ্রহ করে, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সেগুলোর ঐক্য সাধন করে, এই ঐক্যের উর্ধ্বে উঠে পরম সত্তার সন্ধান করতে হয়। ইবনুল আরাবীর ঐক্য শক্তি এবং রুমীর 'নূরে মুহম্মদী' আমাদের ভিতর প্রাণ-শক্তিরূপে অনুভব করি। বার্গসঁর মতে, সমস্ত বিশ্বের ভিতর আমরা এই শক্তিকেই অনুভব করি। এই শক্তি সার্বিক, চিরন্তন, আত্মিক জীবন এবং এর মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয় সাধন হয় এবং ঐক্যরূপে বিরাজ করে। এবং প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, প্রকৃতিবাদী, জড়বাদী, যান্ত্রিকবাদী বিজ্ঞান ও দর্শন ক্রমে ক্রমে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পারমাণবিক জড়বাদ কোন ক্রমে মননশীল প্রাণ শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারছে না, সকল বস্তু ও প্রাকৃতিক কার্যাবলীর ব্যাখ্যা সম্ভবপর হলেও সজ্ঞান প্রাণ শক্তির প্রশ্নটি অব্যাখ্যাত থেকে যায়। জড়বাদী ও যান্ত্রিকবাদীর কাছে মনের সচেতনতা ও তার বুদ্ধিবৃত্তি একটা অভেদ্য সমস্যা। কিন্তু বস্তু জগতে জড় সমাবেশের মধ্যে মন পরমাত্মীয়ের মত একাত্মবৎ হয়ে কাজ করে।

কান্ট মনের কার্য প্রণালী ও বুদ্ধির সীমা নিয়ে আলোচনা করেন। মনন শক্তির দ্বিবিধ দিকের কথা পর্যালোচনা করে সংবেদন ও অনুভূতিগুলোর উৎপত্তি রহস্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তি বিবৃত করেছেন। কিন্তু বুদ্ধির বেলায়

বলেছেন এটা একটা জ্ঞানাতীত সত্তা, এক রহস্যময় নিয়ন্তা হতে উৎপত্তি হয়। এটা জ্ঞানাতীত রহস্যময়, অবভাসিক কোন কিছু নয়। এটা স্ব-গত-সত্তা। বুদ্ধি জড়ের সৃষ্ট কোন কিছু নয়, বুদ্ধি সার্বিক বুদ্ধের চেতনা হতে আগত ও তা হতে আলোকপ্রাপ্ত সত্তা। বুদ্ধি জড় সত্তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা হওয়া সত্তেও জড়-বস্তুকে কিভাবে উপলব্ধি করে, কিভাবে বুদ্ধি ও জড়ের মধ্যে জানাজানি সম্ভব হয়, কান্ট তার ব্যাখ্যা করেন নাই। এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গস*। তিনি বলেন, এই দৃশ্যমান জগৎ বুদ্ধির সৃজিত একটি মানসিক চিত্র হলেও তা বাস্তব জগতের আলেখ্য। এই বাস্তব জগৎ মায়ার জগৎ নয়, এর বাস্তবতাও কেবলমাত্র মনের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের বুদ্ধি ও জড় পরমাণু হতে উৎপত্তি কোন দীপ্তি নয়। বুদ্ধি জড়ের আশ্রিত, কিন্তু জড়কে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী এক বিস্ময়কর শক্তি। আবার প্রকৃতির মধ্যে যে নিয়ম দেখা যায় তা আমাদের মন বা বুদ্ধির আরোপিত কোন নিয়ম নয়, সে নিয়ম বাস্তব ও চিরন্তন। বুদ্ধি এ নিয়মকে উপলব্ধি করে, সৃষ্টি করে না। এই নিয়মের ধারণা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে এবং যা সত্য বলে বিশ্বাস করি সে ধারণাগুলো প্রতিরূপ বা মানসচিত্র হিসাবে সত্য। আবার এই নিয়ম বাস্তবে আছে বলে আমরা তা উপলব্ধি করি। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-শৃংখলা একাধারে বাস্তব সত্তা ও আত্মগত বা মনোজগতীয় সত্তা, দুই-ই। বস্তুতঃ চেতনা ও জড় একই অখণ্ড জীবন প্রবাহের দুইটি দিক মাত্র। চেতনা ও জড়ের মূলে একই সত্তা বর্তমান। সে কারণে চেতনা ও জড় একে অপরের বিপরীত বলে মনে হলেও চেতনার কাছে জড় অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত নয়। আর এই কারণেই মন একদিকে তার উৎসমূল পরমসত্তার নিকট ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়; কিন্তু জড়ের মায়াও সহজে কাটাতে পারে না। চেতনার পক্ষে জড় যেমন বাধা তেমনি আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে সহায়কও বটে।[১] এই ধারণাতীত বিরাট মননশক্তিই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন নাম ধারণ করে। আল্লাহর 'নূরে মুহম্মদী' বা 'নফস,' 'প্রাণ প্রবাহ' বা 'জীবন প্রবাহ', 'জীবাত্মা' 'উদ্ভিদ-আত্মা', 'জড়' ইত্যাদি। এই মন শক্তিই অফুরন্ত কর্ম প্রেরণা জীবন

১. Mathnawi IV, Verse : 88, Mathnawi II, Verse, 80.

প্রবাহরূপে আদিকাল হতে অগণিত ধারায় অসংখ্য শ্রেণী ও অনন্ত রূপ বিন্যাস ঘটিয়ে অবিরাম গতিতে উচ্চ হতে উচ্চ স্তরের জীবনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তারই ফলে এক হতে 'বহু' উৎপত্তি হয়, আবার 'বহু' পরিশেষে 'এক'-এর দিকে যায়। বিশ্বজগতের এই যে অসংখ্য প্রকার প্রাণী, উদ্ভিদ ও কীট-পতংগ দেখা যায় তারা আপন আপন শ্রেণীগত রূপ, আকার ও প্রকৃতি বজায় রেখে চলেছে।

ফরাসী দার্শনিক লামার্কের মতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ জীব দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে প্রাণী দেহে বা জীবদেহে পরিবর্তন সাধিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আপন আপন জীবনধারাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রাণী বা জীবের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা রয়েছে। জগতে বেঁচে থাকতে হলে এর একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহের বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হলেও আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন হয় না; কিন্তু জীবদেহের অর্জিত পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। লামার্কের মতে, জৈবিক প্রয়োজন হতে উদ্ভূত ইচ্ছা জীবদেহে নতুন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করে। জীবদেহের উপর পরিবেশের প্রভাবের ফলে জীবদেহে অভাববোধ, পরে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য পরিবর্তন ও অংগ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। জীবদেহের প্রয়োজনই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎস। লামার্কের একথা আংশিক সত্য, পুরাপুরি নয়; কারণ কোন ইন্দ্রিয় উদ্ভবের পূর্বে জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অভাব অনুভূত হয়েছে তা কিভাবে সম্ভব, তা জানা যায় না। জীবদেহের অংগ-প্রত্যঙ্গের বিকাশে কোন চেতনার অস্তিত্ব অনুমান না করলে কেবলমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না।

চার্লস ডারউইন বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভিতর যে অসংখ্য উপশ্রেণী, অনু-শ্রেণী ইত্যাদি দেখা যায় এই বিবর্তনের মূলে একটা বিভাগ স্পৃহা আছে এবং এই স্পৃহা জীব বা উদ্ভিদ কোষের মধ্যেই আছে। তাঁর মতে, জীবকোষের আত্মবিভাজন ও তার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ও নানা-রূপ পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ই হতে পারে। পরিবর্তন জীবের স্থায়িত্ব আনে এবং প্রতিকূল পরিবর্তন ধ্বংস নিয়ে আসে। জীবকোষে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, তা জীবদেহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এই জগতে বেঁচে থাকতে হলে

জীবকে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়। একদিকে প্রকৃতির বিরোধী শক্তির সাথে জীবের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে জীবে জীবে দ্বন্দ্ব। এই জীবন সংগ্রামে যে জীব সাফল্য অর্জন করে বা জয়ী হয় সে-ই বেঁচে থাকে। রুমীও একই মত পোষণ করেন। আবার জীবকোষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তার সেই পরিবর্তন অংগ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে এবং সেগুলো সৃষ্টির পর তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াবলী প্রকাশ পায়। এই ভাবেই বানর হতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। ডারউইনের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন জৈবিক ক্রমবিবর্তনের মূল কথা, আর জীবন সংগ্রাম এই নির্বাচনের অন্যতম নিয়ম। আত্মসংরক্ষণ ও আত্ম-উন্নয়নের জন্য জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যেকোন প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন সংগ্রাম জীবজগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; কারণ প্রজাপতির ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে জীবন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের উপর সমভাবে নির্ভর করে। আবার জীবকোষের পরিবর্তনের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা প্রকৃতির খামখেয়ালী নীতি, আর এই হিসাবে তা প্রাণীর ইচ্ছা বা পরিবেশের ফল নয়। জীবকোষের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে এক জাতি হতে অন্য জাতির উদ্ভব হয়, কিন্তু কিভাবে তা হয় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই। জীবকোষের পরিবর্তন কেন হবে, ডারউইন তার কোন কারণ দেখান নি। পরিবর্তন বা বিবর্তন কি প্রকারে হয়, এই কথা ডারউইন বলেছেন; কিন্তু তা কেন হয় এবং জীবকোষে বিভাগ স্পৃহা কোথা হতে আসে, তার উত্তর দিতে তিনি সক্ষম হন নি। চিন্তার মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি, তথ্য নির্ভরতা, একনিষ্ঠ সাধনা ইত্যাদি গুণের জন্য তিনি সত্যই অতুলনীয় ও প্রশংসনীয়। অগাস্ট ভাইসম্যান, ডারউইন ও লামার্কের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, প্রাণীর দেহে দুই রকম কোষ আছে—দেহ কোষ ও জনন কোষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অথবা কোন আকস্মিক কারণে দেহকোষে যে পরিবর্তন ঘটে তা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় না, বরং জননকোষের পরিবর্তন বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয়। ভাইসম্যান জননকোষের ধারাবাহিকতার কথা প্রমাণ করে বিবর্তনবাদের ইতিহাসে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তিনি জৈবিক বিবর্তনের যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জীব জগতের বৈচিত্র্য ও সুষম আত্মবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারে না ও স্বতঃস্ফূর্ত

পরিবর্তনের কথা আবিষ্কার করে পরোক্ষভাবে পরিণতিমূলক বিবর্তনের পথ সুগম করেছেন।

পাদ্রী গ্রেগর মেনডেল তাঁর ক্রমোজোমবাদ দ্বারা দেখান যে দেহকোষের পরিবর্তন নয় বরং ক্রমোজোমের সকল গুণের উপর জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ নির্ভর করে। সন্তান তার পিতামাতার কাছ থেকে নয় বরং পিতামাতার মাধ্যমে তার পিতামাতাসহ বিভিন্ন পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর পিতামাতার কোন কোন বৈশিষ্ট্য সন্তানদের জীবনে সংক্রামিত হবে তা ক্রোমোজোমের সকল গুণের উপর নির্ভর করে। মেণ্ডেলের ক্রোমজোমবাদ জৈবিক ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা যোগ করে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণের ধারা অনুধাবন করতে সাহায্য করছে। মার্কিন জীববিজ্ঞানী মরগান বলেন যে, একটি প্রাণীর কোন কোন বৈশিষ্ট্য তার বংশধরদের জীবনে সংক্রামিত হবে তা জনন কোষ অথবা ক্রোমোজোমের উপর নয় বরং কেবল মাত্র সবল 'জিনি'-এর উপর নির্ভর করে এবং এক এক জোড়া জীব সন্তানদের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে নির্ণয় করে। লামার্ক, ডারউইন ও মেনডেলের মতবাদের তুলনায় মরগ্যানের এই জিনিবাদ নিঃসন্দেহে একটি উন্নততর মতবাদ। এ মতবাদ প্রাণী জগতের সবরকম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দান করতে পারে। ডাচ জীব বিজ্ঞানী হিউগো ডিভ্রাইজ মেনডেলের ক্রমোজোমবাদের উন্নতি সাধন করে বলেন যে, জীব জগতের ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তন দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—শ্লথগতিসম্পন্ন অবিরাম একটানা পরিবর্তন বা পরিবৃত্তি এবং মধ্যবর্তী স্তরকে অতিক্রম করে আকস্মিকভাবে নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি। বংশগতি অনু-সারে সদৃশ হতে সদৃশ্যের উদ্ভব হয়। আর পরিস্থিতি অনুসারে সদৃশ হতে সদৃশ্যের উদ্ভব হয়, তবে অবিকল নয় ; মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অসদৃশ্যেরও উদ্ভব হয়। পরিবৃত্তি একটানা পরিবর্তন আর পরিব্যক্তি বা উল্লম্ফনই জৈবিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম। ডিভ্রাইজের মতবাদ উপশ্রেণীর বা প্রজাতির আবির্ভাবে যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করে, কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন ঘটে তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা আকস্মিতার মাধ্যমে জগতের নিয়ম, শৃংখলা, সামঞ্জস্য ও উপশ্রেণীর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কিন্তু এই আকস্মিকতা জগতের ঐক্য, শৃংখলা, নিয়ম, সামঞ্জস্য যথার্থরূপে

অব্যাখ্যাত রয়ে যায়। কারণ একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সৃষ্টি পরিকল্পনায় এক বুদ্ধিময় শক্তি বা সত্তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা বিবর্তন কি প্রকারে হয় তার ব্যাখ্যা দেন, কিন্তু কেন হয় সে বিষয়ে নিরুত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর জালালউদ্দীন রুমীর কাছে পাওয়া যায়[১]। যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বার্গস'র মধ্যে। তিনি বলেন শাশ্বত জীবন প্রবাহের আপন স্বভাবের ফলেই বিবর্তন ঘটে। জীবন প্রবাহ সৃজনশীল ও নিত্য পরিবর্তনশীল। সৃষ্টির আদি হতেই এমন এক উদ্যম, প্রেরণা বা প্রাণ প্রবাহ এর মধ্যে সক্রিয় আছে তা চূড়ান্ত প্রকাশের দিকে অগ্রসর না হয়ে পারে না। এই সৃজনশীল জীবন প্রবাহের ভিতর জৈব দেহ একটি অতি উন্নত সৃষ্টি। জৈব দেহ জড় ও চেতনার মিলন সেতু এবং জড় দেহে নানা অঙ্গ-প্রত্যংগের উদ্ভব সম্ভব করে তার আভ্যন্তরীণ চেতনা বা প্রাণ শক্তি। কেবল তাই নয় চেতনার সাথে বুদ্ধিবৃত্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, ভবিষ্যত-দৃষ্টি, স্মৃতি ও পুনরুৎপাদন শক্তি। বুদ্ধি মানুষকে বুঝার শক্তি, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, উচিৎ-অনুচিৎ বিচার ক্ষমতা ও সৃজনী-শক্তি, এক কথায়, ব্যক্তিত্ববোধ জাগায়, তেমনি মানবেতর প্রাণীর ভিতর জাগায় আত্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে বুদ্ধিমান সত্তা বা প্রাণ-প্রবাহ বর্তমান থাকায় বিশ্বজগতের সর্বত্র নির্বাচন, সংযোগ, ক্রমিক স্তরভেদের বিস্ময়কর লক্ষণ, উপায় ও উদ্দেশ্যের সংগতি বিধান দেখা যায়। এই বিবর্তন এক অতীন্দ্রিয় সত্তার আত্মপ্রকাশ ব্যতীত কিছু নয়। ডঃ মার্টিনো বলেন যে, জগতের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে নির্বাচন, সংযোগ ও ক্রমিক স্তরভেদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখীনতার ইংগিত দেয়। প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ প্রাণীকে পরিবেশের সাথে সংগতি বিধানের সহায়তা করে। বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের বিন্যাস ও বৃক্ষলতা গুল্মের সৃষ্টি পরিকল্পনায় নির্বাচন ও সংযোগ সাধন ও ঐক্যবিধানের সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। তাছাড়া জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ক্রমিক স্তরভেদ আছে—জড় বস্তু, উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী ও মানুষ। এসব স্তর ভেদ অস্বীকার করা যায় না। কোন পরিবর্তন আপনা আপনি আসে না, এর পিছনে কারণ অবশ্যই থাকে, আর সে কারণ এক অন্তর্নিহিত চেতনার ইচ্ছার

১. Mathnawi II, Verse 78, Mathnawi VI, Verse 96. Mathnawi IV, Verse 88.

প্রকাশ। ডঃ মার্টিনো, হেগেল, হেণ্ডারসন, বোসানকোয়েট প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন যে, জগতের ক্রমবিবর্তন অন্ধ এবং অবচেতন বা যান্ত্রিক নিয়মের খেলা নয় বরং তা এক পরিণতিমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন, এক চেতনাময় পরম সত্তা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে।

আসলে জাগতিক বস্তুর শৃংখলা ও স্তরভেদ, জড় ও জীব জগতের বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য সুষমা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে বিশ্ব জগৎ একটা বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বিবর্তন প্রক্রিয়া, এক বুদ্ধিময় ও চেতনাময় সত্তার মহাপরিকল্পনার ক্রমিক বাস্তবায়ন বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[১] পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদী দার্শনিকরা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিণতিমূলক বা উদ্দেশ্যমুখী বলে স্বীকার করলেও পরিণতির স্বরূপ সম্বন্ধে বাহ্য পরিণতিবাদ বা অতিবর্তী পরিণতিবাদ ও আন্তর পরিণতিবাদ বা অনুস্যূত পরিণতিবাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম প্রকার পরিণতিবাদের মতে, এক পরম বুদ্ধিময় আধ্যাত্মিক সত্তা জগতের মধ্যে থেকে গোটা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।[২] দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, 'পরম বিশুদ্ধ আকার' বা বিশ্বাতীত এক পরম সত্তা সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়ার আদর্শ, আর ক্রমবিবর্তনশীল বিশ্বজগৎ এই আদর্শ বাস্তবায়নের পরিকল্পিত পথ পরিক্রমা মাত্র। বিশ্বাতীত অবিচল ও নিশ্চল সত্তা জাগতিক পরিবর্তনের নিয়ামক। এই 'আকার' বা সত্তাই উপাদান বা জড়ের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করে তার মহা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করে। মোট কথা, এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার আদর্শ এক বাহ্যিক আদর্শ, এখানে পরম সত্তার উদ্দেশ্য সাধন হয়, জাগতিক বস্তুর উদ্দেশ্য সাধন নয়। অপরপক্ষে হেগেল, ব্রাডলী প্রমুখ চিন্তাবিদগণ বলেন যে, এই জগৎ এক চেতনাময় পরম সত্তার প্রকাশ। এই পরম সত্তার জগতের আন্তর সত্তা যা অন্তর্নিহিত প্রেরণা বা জীবন প্রবাহ রূপে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার নিজ পূর্ণতা উপলব্ধি করে। এই অন্তর্নিহিত প্রেরণা বা সৃষ্টির প্রবণতা জাগতিক ক্রমবিবর্তনের শৃংখলা, স্তরভেদ, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ এই প্রেরণা এক চেতনাময় শক্তি, জগতের অন্তর্নিহিত আদর্শ।

১. Mathnawi III, 2266, Mathnawi I, 1812.
২. Mathnawi III 1-3, 5, 6, Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 37, Mathnawi VI, 220.

জাগতিক ক্রমবিবর্তনের প্রকৃতি বিচার করলে জগতের সর্বত্র আন্তর পরিণতি-বাদের নিদর্শন দেখা যায়। জগতের মধ্যে কোন আকস্মিকতা নাই। তাদের ঐক্য, সংহতি, নিয়ম, শৃংখলা ইত্যাদি বিদ্যমান। নীহারিকা থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব, তাদের ঐক্য, সংহতি ইত্যাদি জীবনের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অংগ-প্রত্যংগের সুষম সম্পর্ক অন্তর্ব্যাপী উদ্দেশ্যমুখীনতার ইংগিত দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম সম্পর্কের ফলে সকল জীব তার নিয়ত পরি-বর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এই চেতনাময় সত্তার আত্ম প্রকাশ ও আত্ম উপলব্ধির ধারাবাহিকতারই এক জলন্ত নিদর্শন। জগতের বিভিন্ন বস্তু, উদ্ভিদ, জীব, মানুষের গঠন কৌশল, ক্রিয়া কলাপ ইত্যাদি মিলে একটি ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করে এক সার্বজনীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করে। জড় ও জীবদেহের চেয়ে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন জীবের মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। আত্মজ্ঞানই পরম চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

দার্শনিক বার্গস' তাঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে সত্যের কাছাকাছি এসে বলেন যে, প্রাণ-প্রবাহ জগতের পরম তত্ত্ব। এই আদি অন্তহীন প্রাণ-প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত, অজ্ঞাতপূর্ব ও সৃজনধর্মী, সৃষ্টি উন্মাদনাময় অন্ধপ্রবাহ এবং এই প্রবাহ হতেই জড় বস্তু, প্রাণ ও মনের ক্রমিক বিবর্তন ঘটে। কিন্তু সবরকম নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে শৃংখলাহীন প্রক্রিয়ায় পরিণত করে। তাই প্রাণ প্রবাহের উদ্দেশ্যহীন উন্মাদনা তার সৃজনবাদে ধারাবাহিকতা নষ্ট করেছে। বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কৌশল ও গঠন বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করলে বলতে হয় যে বিবর্তন এক অন্ধ আবেগময় প্রবাহের ফল নয়, কারণ তা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও শৃংখলা স্থাপন করতে পারে না, আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ হতে উচ্চতর আদর্শের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এমন কথা তাঁর সৃজনবাদে স্বীকার করা যায় না। আলেকজাণ্ডার, লয়েড, মর্গান প্রমুখ চিন্তাবিদ উন্মেষবাদ প্রচার করেন। আলেকজাণ্ডারের মতে, দেশ-কাল ও শুদ্ধগতি জগতের আদিম উপাদান এবং এই উপাদান হতে বিবর্ত-নের ফলে জড়বস্তু, প্রাণ, মন, ও মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তি বা দেবতার[১]

১. Space, Time and Deity.

উন্মেষ ঘটে।[১] নীচুস্তরের পদার্থের বিবর্তনের ফলে উঁচুস্তরের পদার্থের আবির্ভাব হয় একথা ঠিক কিন্তু দেশ-কাল অনন্ত ও আদি প্রবাহ বা প্রেরণা হতে পারে না। কারণ বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে মৌলিক পদার্থের উন্মেষ স্বীকার করলে প্রকৃতপক্ষে একাধিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। লয়েড মর্গানের মতে, বিবর্তন অপ্রচ্ছন্নের প্রকাশ নয় এবং তা নতুনের আবির্ভাব। একই আদিম উপাদান হতে জড় বস্তু, প্রাণ ও মনের আবির্ভাব হলেও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে নতুন গুণের উন্মেষ ঘটে। মর্গানের আদিম উপাদান একই সাথে জড়ীয় ও মানস উপাদান। এই উপাদান তেজশক্তি বা 'নিসাস'। এই শক্তি ক্রিয়াশীল, মন বা আল্লাহ্‌। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ই তেজশক্তি যার কর্মক্ষমতা নতুনের আবির্ভাব ঘটায় এবং উন্মেষমূলক বিবর্তনের সমগ্র গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আলেকজাণ্ডার, লয়েড, মর্গান উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে তেজশক্তি মন ও আল্লাহ্‌র ধারণা, মূল্যবোধের ধারণা অনেকটা গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলা যায় কিন্তু গুহ্যগতি বা দেশ-কাল এবং জড় আদিম উপাদান হতে কেন প্রাণ এবং প্রাণ হতে মন ইত্যাদির উন্মেষ ঘটবে বা সর্বশেষে দেবতা বা আল্লাহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে তা অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে।

জালালউদ্দীন রুমী ও বার্গসঁর মতে, জাগতিক বিবর্তনের মূলে রয়েছে এক সৃজনশীল ও নিত্য পরিবর্তনশীল সচেতন সত্তা এবং এই সত্তাই জড়ের ভিতর অচেতন প্রাণ প্রবাহ, জীবের ভিতর সহজাত প্রবৃত্তি, মানুষের ভিতর আত্মসচেতন মন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, স্মৃতি ইত্যাদির উন্মেষ ঘটায়। মানুষের বুদ্ধিই মানুষের ব্যক্তিত্ব দান করে; স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি আহরণ করে, সংগতি অনুসারে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের সম্মুখে দৃশ্যমান জগৎ গড়ে তুলে। বুদ্ধি মানুষকে অজানার দিকে চালিত করে, আমি কে, কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি জিজ্ঞাসা মনে জাগায়। জীবন প্রবাহ বা জীবন বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠ সত্তা, কারণ জীবনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও আরো অনেক কিছু আছে। তাই সকল সময় জীবন বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ম অনুসারে চলে না, আর চলেনা বলেই সকল বৈজ্ঞানিক আলোচনা অনেক সময় এর-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। জীবন বুদ্ধিকে চলার পথের মশালস্বরূপ

ব্যবহার করে কিন্তু এই আলো যেখানে অকুলান হয় সেখানে জীবনপ্রবাহ আপনি আপনার পথ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। জীবনের বহুকাজ বুদ্ধির অগোচরে ঘটে। জীবন বুদ্ধির কাছে অজ্ঞেয় ও অনধিগম্য কিছু একটা, আর অনেক সময় জীবন রহস্য উদঘাটন করতে বুদ্ধিবৃত্তি অসমর্থ হয়। জীবন আমাদের শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সমষ্টি; বুদ্ধি জীবনের একটা শক্তি, বুদ্ধি জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে না বলেই জীবন রহস্য আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান বা দর্শন সম্পূর্ণরূপে ভেদ করতে সক্ষম হয় নি। সহজাত প্রবৃত্তি জীবনের আর একটি শক্তি এবং সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা দ্রুত কাজ করে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী তথা মুরগীর সদ্যস্ফুট ছানা এই সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে মায়ের কাছ থেকে শত্রুর আবির্ভাবের স্পষ্ট ইংগিত পেলে তৎক্ষণাৎ যা কিছু পায় তারই নীচে গিয়ে আত্মগোপন করে। সহজাত প্রবৃত্তির বলে জীব যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে যায়, কোন বিচার ক্ষমতা সেখানে থাকে না বললেই চলে। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তি সকল অবস্থায় আপন বিচার ক্ষমতা দ্বারা কার্য পদ্ধতি নির্ণয় করে, নতুন জ্ঞানলাভের জন্য সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও মানুষের ভিতর আরো একটি শক্তি বা ক্ষমতা আছে, আর এই শক্তির নাম অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি।[১] ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও মানুষ নিজ সত্তা, বুদ্ধির শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। কোন ব্যক্তি জীবিত আছে—এই অনুভূতি কোন বাহ্যিক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নয়, এটা আভ্যন্তরীণ অনুভব শক্তি দ্বারা সম্ভব হয়। আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক অনুভব শক্তি দ্বারা নিজের অস্তিত্ব ও চেতনা সম্বন্ধে জানা যায়। আমাদের নিজ সত্তা ও বুদ্ধির শক্তি সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি ব্যতীত আর অন্য কোন জ্ঞান নাই। আর সে কারণে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা ও স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক বার্গসঁ[২] স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে জীবন রহস্য উন্মোচনের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন। যদিও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে। জীবন রহস্য সম্বন্ধে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রমাণ এমনই অকাট্য যে এটাকে অস্বীকার করার উপায় নাই, অস্বীকার করলে জীবনকে

১. Mathnawi. I, 1461-1462, Mathnawi IV, 1296-1297.
২. Mathnawi, I, verse 52.

অস্বীকার করতে হয়। নৈতিক অনুশীলন দ্বারা এই অনুভব শক্তি এত উৎকর্ষ-লাভ করে যে এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে অন্যের মনোভাব ধারণা করা যায়, অজানা খবর জানা যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা বর্তমানরূপে দেখা যায়। আর এই কারণে ইবনুল আরাবী, জালালউদ্দীন রুমী ও আল-গাজ্জালী এই অতিন্দ্রীয় অনুভূতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইবনুল আরাবীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও বার্গসৈর স্বজ্ঞা বা বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা অনেকটা এক জাতীয় কিন্তু রুমী ও আল-গাজ্জালীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মনশ্চক্ষুর অনুভূতি বা প্রেম।[১] মানুষ হিসাবে আমরা দেশ-কালে সীমাবদ্ধ জীব, আমাদের বুদ্ধিজাত জ্ঞান সীমাবদ্ধ আর এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞান সংগ্রহ করি ও বাহ্য জগতকে জানি, কিন্তু তার উর্ধ্বে কোন সন্ধান করতে হলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

এখন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কি? এর ভিত্তি কি? কোথা হতে এ অনুভূতি আসে ও কিরূপে মনে ভেসে উঠে? এইসকল প্রশ্ন উঠে। আভ্যন্তরীণ বস্তু সম্পর্কে এইসকল প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর উপায় নাই।[২] এইসকল প্রশ্নের উত্তর দূরে থাক, বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে[৩] শুধু কি আছে, কি ঘটে সেই উত্তর দেয়, "কেন ঘটে" তা বলতে পারে না। এমন কি একটি পরমাণুর ভিতর যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে জীবন সূক্ষ্ম জড় পরমাণু হিসাবে ধরা পড়েছে, বৈজ্ঞানিক জীবনের অবস্থাগত ব্যাখ্যা দিয়েছে, কারণগত ব্যাখ্যা সেখানে নাই। জীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানও যখন সম্যক ব্যাখ্যা দিতে পারে না,[৪] অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড তাঁর মনোবিশ্লেষণীতে মনকে সচেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। অচেতন বিভাগে অপ্রচেতনার একটি স্তর আছে। অচেতন স্তরের নাম আত্মা বা ব্যক্তি। এই আত্মা বা ব্যক্তি পঞ্চইন্দ্রিয়—চক্ষু,

১. Mathnawi VI, verse 64.
২. Mathnawi III, verse 115.
৩. Mathnawi VI, verse 5.
৪. Mathnawi III, verse 30.

কর্ণ, হস্ত, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তু-জগতের জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং মনের অচেতন স্তর হতে উদিত ব্যক্তি, সমাজ ও বাহ্যিক জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কামনাগুলো মনে রাখে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কামনাগুলো অবচেতন মনে পাঠায়। অবচেতন মনের কামনাগুলো সজাগ অবস্থায় ব্যক্ত বা প্রকাশ হতে পারে না বলে স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। সজাগ মন অপ্রত্যাশিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কামনাগুলোকে অচেতন মনে রুদ্ধ করে রাখার ফলে মনের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব চলে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েডের উল্লেখিত অবচেতন স্তর যাবতীয় বিপ্লবী আবেগের প্রধান উৎস। যৌন 'প্রবৃত্তি' ব্যক্তিত্বের প্রবৃত্তি অবচেতনের স্তরের সহজাত প্রবৃত্তি। ফ্রয়েডের মতে যৌন প্রবৃত্তিই প্রধানতম প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে চায় কিন্তু অচেতন মন এটার বহিঃপ্রকাশ দমন করে। যৌন ক্ষুধা দমন করার ফলেই, তাঁর মতে, মানসিক ব্যধির উৎপত্তি হয়। অবচেতন স্তরে কি ঘটে ব্যক্তি তা জানে না। যখন কোন প্রবৃত্তি বাধা অতিক্রম করে সচেতন স্তরে আত্মপ্রকাশ করে তখন ব্যক্তির কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি 'যৌন প্রবৃত্তি'কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে তার মধ্যে মায়ের প্রতি শিশুর আকর্ষণ, মায়ের স্নেহ ও ভালবাসা, কর্ম-প্রেরণা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেন। যৌন প্রবৃত্তিই তাঁর মতে জীব জগতের কার্যের প্রধান নিয়ামক, জাতি বৃদ্ধির মূল প্রেরণা। তিনি পরে 'ধ্বংস প্রবৃত্তি' নামে আর একটি প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করে বিশ্ব-জগতে বংশ-বিস্তার ও ধ্বংসের লীলা খেলা ব্যাখ্যা করেন। মনোবিজ্ঞানী ইয়াং ফ্রয়েডের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, যৌন প্রবৃত্তির দমন অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যধির আপাত কারণ হলেও মূল কারণ নয়। উক্ত দমন যে কারণ হতে আসে তাই মানসিক ব্যধির মূল কারণ। ব্যক্তির পক্ষে সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা উক্ত দমনের কারণ। এইভাবে ব্যক্তির ক্ষমতা ও অক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ইয়াং প্রকারান্তে মনোবিজ্ঞানী এডলারের 'ক্ষমতা লাভ প্রবৃত্তিকে' স্বীকার করেন। ইয়াং মন অর্থে মনের সচেতন ও অচেতন দুইটি অংশকে বুঝেছেন। অচেতন অংশে ব্যক্তিগত অচেতনতা ও সমষ্টিগত অচেতনতা বর্তমান। অচেতন মন সচেতন মনের নিম্নে এবং অচেতন অংশেই ব্যক্তির বিস্মৃত কামনাগুলো আত্মগোপন করে থাকে। সমষ্টিগত স্মৃতি পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার বিস্মৃত সঞ্চয়, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর,

শিশু বা বাচ্চার মধ্যে সমষ্টিগত প্রবৃত্তি ভালভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর মতে স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়; যার ফলে অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন যে, স্বপ্নের মধ্যেও মন অনেক সময় খাঁটি সত্যের সন্ধান পায়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আভাষ পায়। তাছাড়া অন্তর্দর্শন দ্বারা অচেতন মনের অনেক রহস্য জানা যায়। পূর্ব-পুরুষদের চিন্তাধারা বংশানুক্রমে সন্তানের মনে স্থায়ীরূপ লাভ করে। যেমন ভৌতিক বিশ্বাস। আবার সন্তানের মনোবৃত্তিই বিকাশের পূর্ব হতে তা তার অচেতন-স্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন নারী হৃদয়ের মাতৃভাব; এই প্রকারের চিরন্তন জাতীয়রূপ বা আদর্শগুলো মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদিম উৎস। এগুলো শুধু জ্ঞানেরই উৎস নয়; বরং এগুলো জীবন পদ্ধতি অনেক পরিমাণে নির্ধারিত করে।

মানুষের মনের অচেতন স্তরকে আপাতঃ দৃষ্টিতে অচেতন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অচেতন নয়। এই অচেতন স্তরই সকল রহস্যের কেন্দ্রভূমি। অতীন্দ্রিয়বাদী সূফীরা অচেতন মনকে সচেতন করতে চান এবং এরই মধ্যে রহস্যের সন্ধান পান। আত্মা (নফস), হৃদয় (কাল্‌ব), 'ঐশী আত্মশক্তি' (রুহ) 'ঐশী চেতনাশক্তি' (সিরর), 'ঐশী রহস্যমূলক চেতনা শক্তি' (খফী), ও 'ঐশী পরম রহস্যমূলক চেতনা শক্তি (আখফা) ইত্যাদি অচেতন মনের অন্তর্গত এবং সচেতন মনের মূল আদর্শ। সচেতন মনের চেতনা আছে, কিন্তু অচেতন মনের চেতনা ঐশী প্রভাবে প্রভাবিত বলে অধিক শক্তিশালী। অচেতন মনকে সাধনার দ্বারা চেতন অবস্থায় উন্নীত করতে সক্ষম হলে কল্পনা শক্তি, অমূর্তকরণ শক্তি, অনুমান শক্তি, স্মৃতি শক্তি, সংপ্রত্যক্ষণ শক্তি ইত্যাদির আসল চেহারা প্রকাশ পায় এবং মানবাত্মা একই সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আধ্যাত্মিক দ্রব্যের প্রত্যয় উপলব্ধি করতে পারে। পঞ্চইন্দ্রিয় ও সচেতন মনের বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জড় বস্তুর স্তর হতে ধারণার জগতের বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। বুদ্ধির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে জড় জগতের প্রভাবমুক্ত হয়ে ধারণার জগতে উঠে মানবাত্মা অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থিত 'আয়ান' বা ধারণার মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য করে এবং তথাকথিত অচেতন স্তরের রহস্যের মধ্যে অবস্থিত 'নফস', 'কাল্‌ব', 'রুহ', 'সিরর', 'খফী' ও 'আখফার' মাধ্যমে মূল আদর্শের জ্ঞান লাভ করে। এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়

অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধির জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান।[১] আত্মার গতি উর্দ্ধদিকে এবং উর্দ্ধগতির জন্য আত্মা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়; 'নফস, 'কাল্‌ব' 'রূহ' 'সির্‌র' 'খফী' ও 'আখফা' নাম ধারণ করে। অন্তদৃষ্টির দ্বারা অজানা অচেতন স্তরের যতটুকু জ্ঞানের স্তরে বা এলাকায় আত্মা যায় সেই পরিমাণে মানুষ উর্দ্ধস্তরে উন্নীত হয়; ব্যক্তি চেতনা হতে বিশ্ব চেতনায় উত্তীর্ণ হয় এবং এইভাবে 'ব্যক্তি' ও 'ব্যক্তি পরিচয়' লাভ ঘটে। মানুষের জন্য 'দৈহিক পরিচয়' অপরিহার্য, কিন্তু দৈহিক পরিচয়ের চেয়ে 'আত্মিক-পরিচয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

মানুষের স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি অতি দুর্বোধ্য, দুরূহ জিনিস। যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হন তাঁদের মনশ্চক্ষু খুলে যায় এবং তাঁরা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে বর্তমানরূপে দেখতে পান। মনশ্চক্ষুই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি, পরম সত্তার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় দীপ্তি, জীবনের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি বা প্রেম। মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি যখন উন্নত হয়,[২] তখন মানুষের মনোজগৎ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং সেই আলোকে সে নিজ স্বরূপ, বিশ্ব ও স্রষ্টার মাঝে তার স্থান ইত্যাদি দেখতে পায়। সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত হয় এবং অনেক সময় হাল্লাজের মত 'আনাল হক' বা 'আমিই সত্য' উক্তি উচ্চারণ করে ও অখণ্ড একাত্মবোধ অনুভব করে। এখানে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ হয় ও এই পরিচয়ই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। যে ব্যক্তির মনশ্চক্ষু খুলেছে সে সকল মানুষ, প্রাণী, জীব ও জড় জগতের মধ্যে একই পরম সত্তার প্রকাশ অনুভব করে[৩] ধর্ম কর্ম, আইন, কোরান প্রভৃতি তখন তার প্রাণের সাথে এক নবো সমন্বিত হয়, বিশ্বের সকল মানুষের সে পরম আত্মীয় হয়। এই অবস্থায় আত্মা মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ, বড় ত্যাগ, সংযম ও আভ্যন্তরীণ বিকাশের

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, pp. 99, 105. Mathnawi, I, 1012, Mathnawi, IV, 3400., 1960, 1964, Mathnawi I, 1240.

২. "He who has an impressionless and clear breast becomes a mirror for the impressions of the Unseen." Quoted by Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid p. 100.

৩. "Whosoever has a door opened in his breast sees seen in every atom." quoted by Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 100.

প্রচেষ্টার ফল। তবে একটা কথা মনে রাখতে হয় যে সাধকের ত্যাগ, বিশ্বাস, সৎকর্ম, নির্ভরশীলতা, ঐকান্তিকতা ইত্যাদিতে যখন পরম করুণাময়, দয়াশীল ও দাতা আল্লাহ্‌র দয়া হয় ও তাঁর দয়া সাধকের উপর বর্ষিত হয়, তখনই তার সাধনার ফুল ফুটে—তার আগে নয়। মানুষের ভিতরের আকুলতা বা আকর্ষণই অসীমের সাড়া জাগায়. ইবনুল আরাবী, জালালউদ্দীন রুমী ও আল-গাজ্জালী একথা বহুবার বলেছেন। আকুলতা, প্রেম বা আকর্ষণের ফলে প্রাণ প্রবাহ বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উৎসের সাথে মিলিত হয়, অন্যকথায়, মানবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলন হয়। আত্মিক বিবর্তনের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়।[১]

---

১. Mathnawi III, 1936—1937, 1939—1940, 4658—4662, 4663, 4514—4516.

অষ্টম অধ্যায়

রুমীর দর্শনে প্রেমতত্ত্ব

প্রেমতত্ত্ব

জালালউদ্দীন রুমীর মসনবী কাব্যের মূল বিষয় ঐশী প্রেম, আর মসনবী ঐশী প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[১] রুমীর মতে, ঐশী প্রেম সকল ব্যাধির মহৌষধ। প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপাসক্তি হতে মুক্ত করে নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে। যার অস্তিত্ব প্রেমের দ্বারা নির্মল ও পবিত্র হয় তার জীবন সব রকম কলুষতা হতে মুক্ত হয়। এই প্রেমের বলে মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল। প্রেমের স্পর্শে পর্বত সচল হয়েছিল। প্রেম তুর পর্বতে জীবন সঞ্চার করেছিল এবং প্রেমোন্মত্ততা এনেছিল এবং হযরত মূসা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।[২] রুমী আরো স্পষ্টভাবে বলেন যে, আমার সত্তার উপর নীচ সকল দিক দিয়ে তাঁরই সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে গোপন রহস্য প্রকাশ করলে সমগ্র বিশ্ব ওলট পালট হয়ে যাবে।

ডক্টর খলিফা আবদুল হাকিম সাহেব সঠিকভাবেই বলেছেন যে, রুমীর মসনবী কাব্যের মধ্যে বর্ণিত প্রেম সকল যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উর্ধ্বে।[৩] এই প্রেম বর্ণনাতীত ও জীবনের গোপন রহস্য।'[৪] মসনবীর মর্মকথা প্রেম আর বিরহ। মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যের শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই এর মূল কথা। জীবন ও প্রেমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সংগীতের মাধ্যমে আংশিক প্রকাশ করা যায়।[৫] রুমী বলেন যে, বাঁশী যেমন বাঁশবন হতে বিযুক্ত হয়ে কাঁদে,[৬] মানবাত্মাও তেমনি আত্মার জগৎ হতে বিচ্যুত হয়ে জড়

১. (ক) Dr. Khalifa Abdul Hakim, The Mataphysics of Rumi, pp. 42-61.
(খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ : পারস্য প্রতিভা, ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫ পৃঃ, ২৮৩
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৪।
৩. The Metapysics of Rumi, Lahore, 1965, p. 43.
৪. Mathnawi, I. 7, 8,
৫. Quoted by Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 43,
৬. (i) মসনবী শরীফ, ১ম খণ্ড, ১-৫ (ii) শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইসহাক, বিশ্বপ্রেমিক রুমী চট্টগ্রাম, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪-১৫।

পরিবেশের মধ্য থেকে আত্মার জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাঁদে। গতিশীল জীবনের মূলে রয়েছে প্রেম, কারণ প্রেমই জীবনের রহস্য। প্রেমের জন্যই বাঁশীর বুকে সঙ্গীতের সুর উঠে। জীবন উৎসের মূলে পৌঁছানোর জন্য প্রেম বিচ্ছেদের হাহাকারে কাঁদে। প্রেম আকর্ষণে জীবন পরম সুন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। রুমীর প্রেমতত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন কল্পনা বিলাস নয়; জীবনের গভীরতম রহস্যের উদ্ঘাটন দ্বারা মানুষের ক্রমোন্নতির পথ চিহ্নিত করে দেওয়া প্রেমতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

প্রেম সংজ্ঞাতীত, ব্যাখ্যাতীত ও বর্ণনাতীত হওয়া সত্ত্বেও রুমীর প্রেমতত্ত্ব আলোচনার মধ্যে যে বিশেষ ধরনের প্রেম দর্শন ফুটে উঠেছে, সে বিষয়ই বর্তমানের আলোচ্য বিষয়। প্রেমতত্ত্বের মধ্যে রুমী যে দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্পূর্ণ নতুন নয়, এই প্রেমতত্ত্ব গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ও মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনার প্রেম-দর্শনের মধ্যে দেখা যায়। প্লেটোর প্রেমদর্শনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সকল খ্রীস্টান ও ইসলামী আধ্যাত্মবাদের উপর প্লেটোর প্রেম দর্শনের কমবেশী প্রভাব পড়েছে। প্লেটোর মতে, পরম সত্তা অতীন্দ্রিয় জগতের সত্তা, ধারণার উৎস পরম ধারণা এবং 'এরস' বা প্রেম বিশ্বের মূলনীতি। রুমীর দর্শনে এই প্রেমের প্রভাব পড়েছে। একথা বলা যায় না যে, তাঁর প্রেমতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্লেটোর দর্শন হতে নেওয়া হয়েছে। রুমীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই প্রেমতত্ত্ব তাঁর নিজস্ব মতবাদ আর একই কারণে তা যথেষ্ট সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবনে সিনা প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা দেন।[১] প্লেটোর মতো তিনি বলেন, প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম ও প্রকৃতির কার্যকরী শক্তি। প্রেম পরম সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ ও ব্যক্তিগত অমরতা অর্জনের শক্তি। রুমীর প্রেমতত্ত্বে প্লেটো ও ইবনে সিনার প্রেমতত্ত্বের প্রভাব অধিক।[২]

প্লেটোর মতে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর যথা—মানব, কীট-পতংগ, বৃক্ষ-লতা, ইট-পাথর ইত্যাদি প্রত্যেকেরই একটা করে সূক্ষ্ম আদর্শ বা ধারণা আধ্যাত্মিক জগতে আছে। প্রকৃতির বুকে যে বস্তুর জন্ম হয় বা প্রকাশ ঘটে, তা আধ্যাত্মিক

১. N. A. F. Meheren (ed). Fragment on Love, Leiden, 1894.
২. Mathnawi I. 112, 113.

বা ধারণার জগতে অবস্থিত মূল ধারণার জড়ের মাধ্যমে স্থূল প্রকাশ মাত্র। পৃথক পৃথক জীব বা বস্তুরই মূল আদর্শ ধারণায় সে আধ্যাত্মিক জগতে আছে তা নয় বরং প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক গুণের প্রত্যেক সমষ্টি ও আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন মূল আদর্শ ধারণা আধ্যাত্মিক জগতে বর্তমান। এইসকল মূল আদর্শ ধারণা প্রকৃত সত্তা। ধারণাগুলো আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত। সেগুলোর মূর্ত বা বহিঃপ্রকাশই প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু। সৌন্দর্য একটি গুণ। এই গুণও মূল আদর্শ ধারণা বা পরম সৌন্দর্যের প্রকাশ মাত্র। সৌন্দর্যের মূল আদর্শ ধারণা সকল সৌন্দর্য আধার, কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে এর আংশিক প্রকাশ ঘটে মাত্র। সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুতে সৌন্দর্যের যে বিকাশ বা প্রকাশ দেখা যায়, তা শাশ্বত ও চিরন্তন পরম সৌন্দর্যের মূর্ত প্রকাশ। প্লেটোর দর্শনে বৃহত্তর আদর্শ ধারণাগুলো ক্ষুদ্রতর ধারণাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। একটা ক্ষুদ্র ধারণার সাথে মিশে তার সর্ববৃহৎ ধারণাটিও বিরাজ করে। এইভাবে সর্ব বৃহৎ ধারণা পরম আদর্শ ধারণা বা আল্লাহ্ সর্ব প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধারণাকে বেষ্টন করে সকলকে একসূত্রে গেঁথে রাখে। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা পরম সত্তা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা।

প্লেটোর মতে, প্রেমই বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি বা বিশ্ব পরিচালনা শক্তি। ইবনে সিনার প্রেমতত্ত্বও প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের অনুরূপ। তাঁর মতে, প্রেমই বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি। প্রকৃতির মাঝে এক সার্বিক কার্যকরী শক্তি, প্রেম সৌন্দর্যের দিকে পরিচালনা শক্তি বা প্রেরণা। অন্তর্নিহিত শক্তি হিসাবে প্রেম ব্যক্তিগত অমরতা অর্জনে সাহায্য করে। মোটকথা, ইবনে সিনা প্লেটোর প্রেমতত্ত্বে বর্ণিত প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য আপন মতবাদের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন। একত্রীকরণ, মিলন, সাদৃশ্য-করণ, উন্নতিসাধন, পুনরুৎপাদন ইত্যাদি প্রেমেরই বিভিন্ন প্রকাশ। সকল বস্তু পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং যেবস্তু যত বেশী পরিমাণে সৌন্দর্যের অধিকারী হয় সে তত বেশী পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করে। ব্যক্তিগত অমরতা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

রুমীর মতবাদ প্লেটোর ও ইবনে সিনার মতবাদের অনুরূপ। প্রেম ও বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কার্যকারিতা শক্তি বিচার করে রুমী প্রেমের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন।[১]

১. Mathnawi IV, 1966—1967.

তাঁর মতে, বুদ্ধি কোন কার্যসম্পাদনের পূর্বে সে-কার্যের ভালমন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিচার করে দেখে। প্রেমের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির হিসাব নাই।[১] প্রেমিক লাভ-ক্ষতির বিচার না করে প্রেমাস্পদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই প্রেম পার্থিব প্রেম বা স্টোয়িকদের হিসাবী প্রেম হতে ভিন্ন প্রকৃতির। রুমীর মতে, প্রেমই পরম সৌন্দর্য এবং পরম সৌন্দর্যই প্রেম। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ পরম সৌন্দর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ সত্তা। পার্থিব জগতের সকলের সৌন্দর্য পরম সৌন্দর্য আংশিক প্রকাশ মাত্র। বাহ্যিক জগতের বস্তুর সৌন্দর্য সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য চিরন্তন ও অসীম। সূর্যের সাথে যেমন সূর্যালোকের সম্বন্ধ, আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের সাথে তেমনি জাগতিক বস্তুর সম্বন্ধ। পরম সৌন্দর্য হতে জাগতিক বস্তু সৌন্দর্য লাভ করে থাকে। পরম সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যের মূল উৎস। সূর্যালোকের অভাবে যেমন বিভিন্ন বস্তু অন্ধকারে আবৃত হয়, তেমনি ঐশী সৌন্দর্যের অভাবে বিশ্বের সকল বস্তু সৌন্দর্যহীন হয়। সুতরাং প্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বিষয়-বস্তুকে সীমিত না করে ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক জগতের পরম সৌন্দর্যের নিকটে পৌঁছায়ে দেয়। রুমীর মতে, রূপ-অরূপের দিকে যাত্রার পাথেয়। রূপ সাধনার শেষ কথা নয়। 'রূপের' ভিতর দিয়ে 'অরূপের' দিকে যাত্রাই জীবন। মানবাত্মার বিবর্তনের অন্য পথ নাই। বস্তুর সৌন্দর্যের সংশ্রব ত্যাগ না ও রূপের অনুশীলন নস্যাৎ করে দেওয়া নয়। জীবনের আসল কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া, অপূর্ণতা হতে পূর্ণতায় উন্নীত হওয়া। মানবের সমগ্র সত্তা পূর্ণতার সৌন্দর্য পানে পতংগের মতো আত্মহারা হয়ে ছুটে চলে। দৈহিক ও জাগতিক প্রেমও তুচ্ছ নয়, জাগতিক প্রেম ঐশী প্রেমের সোপান বা পাদ-পীঠ; কারণ তাঁর মতে, বিশ্বজগতের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি পরম সৌন্দর্য বা অরূপ রূপেরই প্রতিবিম্ব।[২] প্রেম জীবনকে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সকল সীমার ঊর্ধ্বে ওঠাতে সক্ষম। প্রেমের আবেগে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে উঠলে পরম সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তার ফলে পরম সৌন্দর্যের সাথে এক মহামিলন ঘটে এবং এক বিরাট মহত্ত্বের আদর্শ স্থাপিত হয়।

রুমীর মতে, সকল আত্মস্থকরণ সাদৃশ্যকরণ, আত্মপ্রসারণ, পরিবর্ধন,

১. Mathnawi VI, 1974.
২. Mathnawi, III, 552-554.

পুনরুৎপাদন, বংশবৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি প্রেমেরই বিভিন্ন প্রকাশ বা পরিস্ফুটন মাত্র।[১] প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে জীবন অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে সেইসকল স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে ক্রমোন্নতিশীল পথে ধাবিত হয়। যেহেতু প্রেমের সোপান সংখ্যাতীত, জীবন উন্নতি ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পর্যায়ও সংখ্যাতীত। প্রেম ব্যতীত আধ্যাত্মিক বিকাশের এইসকল সোপান অতিক্রম করা সম্ভব নয়, প্রেম ব্যতিরেকে বিশ্ব গতিহীন হয়ে পড়ে। এই প্রেম মূলতঃ পরম সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। পরম সুন্দরের প্রেমই পরম উৎসের প্রেম এবং এই প্রেম পরম উৎসের দিকে প্রত্যেকটি জীবনই ধাবিত হয় মিলনাকাঙ্ক্ষায়। প্রত্যেকটি জীবনের মধ্যে প্রেম আকর্ষণ শক্তি আছে। জীবনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা শক্তিই প্রেম; কারণ শক্তিই জীবনকে সৌন্দর্যের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের আধার পরম সত্তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয় ও মহামিলন ঘটায়।[২]

অন্যান্য সুফীদের মতো রুমী বিশ্বাস করেন যে, প্রেমই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। তাঁর মতে, সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ, বাসনা বা প্রেম। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ্ বলেন, আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার, নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম এবং নিজেকে প্রকাশের নিমিত্তে এই বিশ্ব সৃষ্টি করলাম।"

প্রেম আল্লাহ্‌র সত্তার নির্যাস, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ।[৩] পরম সত্তার নির্যাস বা সত্তাসাররূপে এই প্রেমের উদয় না হলে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হতো না। অনস্তিত্ব অবস্থা হতে অস্তিত্বশীল অবস্থায় কোন কিছুই আবির্ভাব হতো না। প্রেম দেশকাল হীন, কালে কালে প্রেম বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি ও প্রকৃতির মধ্যে কার্যকরী এক শক্তি।

বিশ্বের সকল 'জড়বস্তু' প্রাণ, জীবন বা আধ্যাত্মিক শক্তি হতে উৎপত্তি হয়। অন্যকথায়, জড় পদার্থ সজীব জড় পদার্থ বা আত্মা হতে উদ্ভূত, আত্মা জড় পদার্থ হতে উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক বস্তু এক বা একাধিক প্রাণের সমাবেশ এবং প্রত্যেক বস্তু বা অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রেম আকর্ষণ শক্তি আছে। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, দিকদর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন সুমেরুর দিকে

১. Mathnawi, V. 2012-2014
২. Mathnawi, V. 2012-2014.
৩. Mathnawi V. 2739.

মুখ করে থাকতে চায়, যেমন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের আগমনী বুকে সাগরের জলরাশি নিরূপিত সময়ে উথলে উঠে, তেমনি পরম আত্মা হতে আগত প্রাণ, জীবন বা আত্মা তার উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ ও মানব জগতের প্রকৃতিতে এমন একটি প্রেরণা নিহিত আছে যা প্রত্যেক বস্তু ও জীবনকে ঊর্ধ্বদিকে পরিচালিত করে পরম উৎসের নিকটে পৌছায়ে দিতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন তৃণের নবজাত অংকুরের মধ্যে এমন এক প্রেরণা আছে, যা তৃণকে অন্ধকার মাটির গহ্বর হতে আলোকের জগতে উন্নীত করে। জীবজগতের প্রকৃতিতে তেমন একটি প্রেরণা নিহিত আছে, জীবের আভ্যন্তরীণ জৈবশক্তি দেহ হতে দেহান্তরে গমন করে ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়। জীব সেই জৈবশক্তি বা প্রাণশক্তির আধার। মানুষও এই নিয়মের অধীন, মানুষ যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়ে নিজেকে পরম উৎসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জীবনব্যাপী আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষ অন্য প্রাণী হতে একটু ভিন্ন ধরনের। মানুষ শুধু জৈব শক্তির অভিব্যক্তি নয়, তার মধ্যে আত্মা নামক শক্তির প্রকাশ ঘটে; আত্মা পরমাত্মা হতে আগত আধ্যাত্মিক বস্তু বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের বিকাশ। জীবন যেমন অনন্তকাল ধরে অনন্ত যাত্রায় ছুটে চলেছে, আত্মাও তেমনি অনন্তকাল ধরে বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও অবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন আদর্শে পৌছাতে চায়। এক নতুন অবস্থায় নতুন আদর্শে পৌছানোর পর অর্থাৎ আদর্শ যখন বাস্তবে পরিণত হয়, তখন নতুনতর আদর্শে বা উন্নত প্রস্তাতিতে পৌছাতে চেষ্টা করে। আদর্শের দিকে এই যে প্রেরণা আগতকে ছাড়িয়ে অনাগতের সাথে ও ভিতর দিয়ে সাদৃশ্যকরণ ও আত্মাপ্রসারণের এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রুমীর মতে, তা কোন বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণী বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির বিশেষত্ব নয়। সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, অনন্ত গতিতে প্রবাহিত একই মহা প্রেরণা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুদূর লক্ষ্যে অবস্থিত পরম উৎসের পানে ছুটে চলেছে। রুমীর অধ্যাত্মবাদী দর্শনে এই প্রেরণারই অন্য নাম প্রেম। যে শক্তি দ্বারা জীবন প্রবাহের অগ্রগতি হয় আজীবন এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উন্নীত হয় সে শক্তি বা প্রেরণাই প্রেম।

এই প্রেমের অর্থ যে বুঝে সে সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে, তার আধ্যাত্মিক

জীবনের অনেক সমস্যা দূর হয়। এই প্রেম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখা যায়। সেজন্য বলা হয়, প্রেম-সাগরের জলে যখন ডুব দেওয়া যায় তখন প্রকৃত তত্ত্ব খুলে যায়। এই প্রেম মানব অন্তর আলোকিত করে সৃষ্টির সম্পর্কে দুর্বোধ্য রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে, মানব তখন ঐশী জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। প্রেমের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্লেটো ও রুমীর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যের ইংগিত দেয়। কিন্তু তাই বলে উভয়ের প্রেমতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে এক ধরনের নয়। দুইজন চিন্তাবিদের মাঝে অনেক বৈসাদৃশ্য ও অমিল আছে। ডঃ খলিফা আবদুল হাকিম সাহেব প্লেটো ও রুমীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করে সঠিকভাবে বলেছেন যে প্লেটো একজন প্রজ্ঞাবাদী বা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এবং তিনি প্রজ্ঞার পরম সৌন্দর্যকে জানতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর প্রেম ও স্পিনোজার প্রেম প্রায় একই ধরনের। তিনি মনে করেন যে, জালালউদ্দীন রুমী একজন অ-বুদ্ধিবাদী বা অপ্রজ্ঞাবাদী দার্শনিক।[১] রুমীকে একজন অপ্রজ্ঞাবাদী দার্শনিক না বলে একজন স্বজ্ঞাবাদী বা অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক বললে অধিক যুক্তিসঙ্গত হয়; কারণ তিনি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকে চলার পথের মশাল ও পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে প্রেমের মাধ্যমে পরম সৌন্দর্য হৃদয়ে অনুভব করেছেন। প্রেমের দ্বারা পরম জ্ঞানের জ্ঞানী হয়ে জ্ঞানখনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চিরসত্যের জ্ঞান অর্জন করে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রেমতত্ত্বের সাথে বার্গসঁর প্রেমতত্ত্বের অনেকটা মিল আছে। রুমী বলেন যে, বাঁশী মানবাত্মাকে মহত্ত্বের জন্য এবং দুর্লভ মিলনের জন্য প্রস্তুত করে, যে সুরে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সে সুর প্রেমিকের জন্য নয়, প্রেমিকের মঞ্জিল সেই বাহ্যিক সুরের ঊর্ধ্বে যে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষা তারই মধ্যে প্রেমোন্মাদনার পথই মহত্ত্বের পথ। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ এই পথে তার সাফল্যে উপনীত হতে পারে। বুদ্ধির পথ বিশ্লেষণের পথ, তা চরম উদ্দেশ্যে পৌঁছার সহায়তা করে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। প্রেম ও বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার পার্থক্য যে কতখানি, মসনবীতে হযরত মুসার পথ বিস্মৃত হয়ে ইসরাইলদের সামিরীপথ অনুসরণের কাহিনীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ হযরত মুসাকে তাঁর নিদর্শন দেখানোর জন্য সিনাই পাহাড়ে গমনের

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 48, Irrationalist.

নির্দেশ দেন এবং হযরত মুসা সেখানে গমন করে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির কাছে ইসরাইল সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করে ধাতুনির্মিত এক গোবৎসকে উপাস্য বলে গ্রহণ করে। নিরাকার আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে এক ধাতুনির্মিত গোবৎসকে উপাস্য বলে গ্রহণ করাকে প্রেম ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্যস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। রুমীর মতে, প্রেমোন্মাদনায় ইসরাইলদের হৃদয় তখন উন্মুক্ত হয়নি, সামিরীয়া ক্ষুদ্র বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তির পথে তারা অগ্রসর হয়ে বিভ্রান্ত হয়। একত্ববাদ ও তৌহিদের মর্মবাণী বোঝার জন্য বুদ্ধি বা বিশ্লেষণী জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ, এমনকি সময় সময় ভ্রান্তিকর, রুমী সেই অভিমত প্রকাশ করেন।

রুমী বলেন যে, প্রেমেরই পথ তো শুদ্ধদৃষ্টির পথ, আর সে পথেই মানবকে অগ্রসর হতে হয়। বিশ্লেষণী জ্ঞানের ক্ষেত্র হতে প্রেমিকের চিন্তা-সত্তা সূক্ষ্ম ও রহস্যের নিকটে পৌঁছানের শুদ্ধদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি প্লেটোর মতো বুদ্ধিবাদীদের কাছে অজ্ঞাত না থাকলেও মূলতঃ সে প্রেমের রহস্য সেখানে অজ্ঞাত। প্রেমই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা দিব্যজ্ঞানরূপে মানবকে পূর্ণতা দান করে। দিব্য জ্ঞানের জ্ঞানী পূর্ণজ্ঞানী। হযরত মুসা ও ফেরাউনের যাদুকরদের গল্পের মাধ্যমে রুমী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য দেখান। হযরত মুসা তাঁর লাঠির সাহায্যে যে অলৌকিক কার্যকলাপের অবতারণা করতে পারতেন তা দৃশ্যত যাদুকরদের ভোজবাজীর মতো। ফেরাউনের দৃষ্টিতে এই বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল সবকিছু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে সে কোনদিন উপরে উঠতে সক্ষম হয় নি। মুসা ও যাদুকরদের উদ্দেশ্যে ও তাদের জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও কদর্যতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ফেরাউন তা প্রত্যক্ষ করতে পারে নি। রুমী বলেন যে, ফেরাউনের মত অভিজ্ঞমণ্ডলী পরিবৃত প্রভাবশালী বাদশার পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক বস্তুর অনুশীলনে মুসার সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব হয় নি। নিম্নস্তরের বস্তু যথার্থ হতে উচ্চস্তরে আরোহণের মহত্তর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ হয়। রুমীর মতে, প্রেম বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মানবাত্মার বা উর্ধ্বতর চেতনার অনুভূতির আলোড়ন জাগায়, যার ফলে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অগভীর অনুভূতি দ্বারা মানব অন্তরের

পিপাসা মিটে না। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি বা মুখের ভাষা প্রেমের স্বরূপ বুঝতে পারে না তবে প্রেমের স্পর্শে আত্মা, বুদ্ধি, চক্ষু সহস্রগুণ উন্নত হয়। বিচার-বুদ্ধি, স্থান-কাল ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে প্রেমের মধ্যে মানুষ যে মুক্তি লাভ করে, তেমন মুক্তি উচ্চতর জীবনের কাম্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরমাত্মার গুণে গুণান্বিত হয়। জড়জগৎ হতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, মানব উন্নতির চরম সীমা অর্থাৎ পূর্ণমানবত্বে পেঁছাতে পারে। সীমার মধ্যে অবস্থান করেও দেশ-কালের সকল বাধাকে অতিক্রম করে প্রেমের মধ্যে মানুষ মুক্তি লাভ করে। সকল ক্ষুদ্রত্ব, লাভ-ক্ষতির তুচ্ছ হিসাব-নিকাশ ও সকল রকমের বাধা-বিপত্তির গণ্ডীকে অস্বীকার করে প্রেমের মধ্যে মানুষ এক অগাধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এই ব্যক্তিত্ব বা ক্ষমতা যেন মুক্ত মানবাত্মারই অসম্পূর্ণ প্রতীক। রুমী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা প্রেমের মধ্যে মুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করে তাকে সর্বক্ষণের অভিজ্ঞতারূপে পেতে চান। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আবরণ দূর করে বুদ্ধিজ্ঞানের বাধা অতিক্রম করে প্রেমের মাঝে মানুষরূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে জানতে পারে তখন ইন্দ্রিয়জাত, অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের সামগ্রী মানুষের কাছে তার তুচ্ছতা পাল্টিয়ে অর্থময় হয়ে ওঠে এবং গোটা মানব সত্তার বিকাশের সহায়ক হয়।[১] মানুষের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছেন। ফুল যেমন কুঁড়ি হতে পুষ্পরাগে বিকশিত হয়ে নিজেকে সম্পন্ন করে, মানুষকেও তেমনি প্রেমের দ্বারা নিজেকে বিকশিত হতে হয়।

তিনি বলেন যে, জীবনই জীবনের লক্ষ্যস্থান, বিকাশের আনন্দেই আত্ম-বিকশিত হয়ে উঠে। প্রেম আত্মার রহস্য এবং আত্মার রহস্য ও ব্যক্তিরই অন্তর্নিহিত সত্তার ঐশ্বর্য। সত্যের পরিচয় লাভের জন্য প্রেম এক উপলব্ধি শক্তির সৃষ্টি করে এবং এই শক্তি বা ক্ষমতায় তাকে মহত্ত্ব মানবত্ব, দেবত্ব ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করে। বাঁশীর কাহিনী দিয়ে মসনবী কাব্য শুরু করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে: বাঁশী যেমন বাঁশবন হতে বিযুক্ত হয়ে কাঁদে মানবাত্মাও ঠিক আত্মার জগত হতে বিচ্যুত হয়ে জড় পরিবেশের মধ্যে কাঁদছে।

১. Mathnawi : I, 1982—1984 ; III 4723 ; VI, 63 ; III 4725—47·27.

অনেকে ক্রন্দনকে অজানা কোন পার্থিব কারণের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু ভাগ্যবান ব্যক্তি ক্রন্দনকে মানবাত্মার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুঃখবোধ বলে জানে, প্রাণের সম্যক অর্থ উপলব্ধি করে। সে বুঝে যে, প্রেম-বিরহের ইতিহাসই গায়কের গানে, কবির কবিতায়, শিল্পীর চিত্রে, অশ্রুকথায়, বিশ্বের সর্বত্র আকুলি-বিকুলি হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অশান্ত মানবাত্মার এই বিরহবোধ যার মধ্যে জাগে সে প্রেমিক, প্রেমতত্ত্ব বুঝে ; প্রভু-ভৃত্যের ভেদরেখা তার কাছে মুছে যায়। অনন্ত জীবনের মহারহস্য তার কাছে প্রকাশ হয়। ভৃত্য প্রেমিক-রূপ পায়, প্রেমাষ্পদের সাথে মিলন ঘটে। মানব ক্ষুদ্র দেহধারী জীব, আর পরম সত্তা আধ্যাত্মিক দেহধারী অসীম জীব। প্রেম এই দুই দেহের মিলন ঘটায় এবং রুমীর প্রেমতত্ত্বের মূল বক্তব্য এই। তাঁর প্রেমতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীবনকে ব্যাখ্যা করা, জীবনের উন্নতি তথা ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির মাধ্যমে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উন্নীত হয়ে পরম উৎসের সাথে মিলনের প্রচেষ্টা বর্ণনা করা। তাঁর মতে, জীবন যেন একটি ক্ষুদ্র দেহ। প্রেমনীতি যেন মানবের ক্ষুদ্র দেহকে পরিবর্তন করে সর্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক দেহের মত করে গড়ে তুলে এবং দুই দেহের মিলন ঘটায়।[১] জীবন বিভিন্ন স্তরের মৃত্যুর মাধ্যমে উচ্চস্তরের জীবনে প্রবেশ করে, জীবন বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুবরণ করে এবং নতুন জীবনের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। অজৈবিক জড় অবস্থা হতে জীবন মৃত্যুর মাধ্যমে প্রেমের প্রেরণায় জৈবিক জীবন লাভ করে। তারপর উদ্ভিদ জীবন লাভ করে যুগের পর যুগ সে অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। সাদৃশ্যহীন পূর্বেকার অজৈব অবস্থার কথা সবই বিস্মৃত হয় তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদ জগৎ হতে চলে আসার সময় কেবলমাত্র বৃক্ষলতার প্রতি একটি মানসিক আকর্ষণ ছাড়া উদ্ভিদ জগতের কোন কথা তার মনে থাকে না। যেমন শিশু তার মাতৃস্তনের প্রতি আকর্ষণের কারণ না জেনেও মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি অনুরূপভাবে জীবন উপরের স্তরের প্রতি আকর্ষণের কারণ না জেনেও মৃত্যুর মাধ্যমে উপরের স্তরে উন্নীত হতে চায়। মহান আল্লাহ্ জীবনকে পশু জীবন হতে মানব জীবনে উন্নীত করেন এবং এইভাবে মানুষ প্রকৃতির এক স্তর হতে অন্য স্তরে এগিয়ে আসে। এইভাবে সে শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞান

১. Mathnawi, I, 1533, Mathnawi, V, 3853—3856.

অর্জন করে এবং আজকের শক্তিমান মানুষে পরিণত হয়। মানবাত্মা তার প্রথম বিবর্তনের কথা ভুলে গিয়েছে এবং সে পরিবর্তনের সমগ্র পথই 'মরে বাঁচ' এই নীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি জীবনাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ব্যাখ্যা প্রেমের সাহায্যে সম্ভব করেছেন।

বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে অজৈব জগৎ হতে মানব জগতের যে ব্যাখ্যা রুমী দিয়েছেন তা কেন হয় তার উত্তর তাঁর দর্শনে কার্যকারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করা যায় না। তিনি যান্ত্রিকবাদের কার্যকারণ নিয়মের ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পরমাত্মা জীবনের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেন; যেমন লৌহ অগ্নি উত্তাপে অগ্নিতে পরিণত হয়, খাদ্য জীবনে রূপান্তরিত হয় এবং চেতনা ঐশী চেতনার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে কিভাবে এমন হয় তা ব্যাখ্যা করা না গেলেও তেমন যে হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না। রুমী আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন যে, শক্তি বা প্রবাহ বা নীতি জীবনকে বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে অজৈবিক জড়বস্তু হতে চেতনাসম্পন্ন মানব স্তর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়, জীবনকে মানব স্তর হতে সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক জীব আল্লাহুর কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম। এই শক্তি বা নীতি আত্মস্থকরণ ও সাদৃশ্যকরণের নীতি যা জীবনকে অজৈবিক স্তর হতে জৈবিক স্তরে, জৈবিক স্তর হতে উদ্ভিদ জগতে, উদ্ভিত জগৎ হতে প্রাণী জগতে এবং প্রাণী জগৎ হতে মানবকুলে উন্নীত করে এবং সেখান হতে ফেরেস্তাদের জগতে এবং সর্বশেষে নিয়ে যায় পরম উৎস আল্লাহুর নিকটে। আর এটাই রুমীর প্রেমতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই মহামিলন বর্ণনার জন্যই তিনি প্রেমতত্ত্বের অবতারণা করেছেন।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে দর্শন ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে চায়। বুদ্ধি আংশিক ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে পারে, কিন্তু জ্ঞাত ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের দ্বৈততা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করতে পারে না। রুমী বলেন যে, মিলন বা ঐক্য সাধনের নীতি হিসাবে প্রেমের স্থান বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রভেদ দেখায় ও বিভেদ সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রেম বিপরীতধর্মী বিভিন্ন বস্তুর একত্রে মিলন ঘটায় ও সমসাময়িক বস্তুরূপে রূপান্তরিত করে মহামিলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, রুমীর প্রেম

দর্শনের সাথে কান্টের পরবর্তীকালের ভাববাদী দর্শনের মধ্যে অবস্থিত স্বজ্ঞাবাদী দর্শনের যথেষ্ট মিল আছে। তিনি এবং ফিকটে পরমাত্মা সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন এবং শেলিং বা বার্গস'র স্বজ্ঞার মতো তিনি প্রেমকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শেলিং ও বার্গস'র মতে, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞান দান করতে পারে না। স্বজ্ঞাই তাত্ত্বিক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভর-যোগ্য উৎস। রুমীর প্রেম ও শেলিং এবং বার্গস'র স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কার্যকারিতার দিক হতে এক ও অভিন্ন।[১]

রুমীর মতে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যত সার্বিকই হোক না কেন এবং যত মানব কল্যাণের সমর্থকই হোক না কেন, এরমধ্যে জ্ঞানশক্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। বুদ্ধি সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার সময় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখে।[২] বুদ্ধির নিকট যা বিপরীত এমনকি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, প্রেমের মাঝে তা একে অন্যের পরিপূরকরূপে অবস্থান করে। জ্ঞানের নিম্নস্তরে অর্থাৎ সত্যের আপেক্ষিক প্রকাশকে দুই বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও উচ্চস্তরে এক ও অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়।[৩] মানবাত্মাও মহত্তম সম্ভাবনার আধার।

যে বিপুল শক্তি ও সৌন্দর্য, যে আলোক ও ঊর্ধ্বগতি তার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে বুদ্ধি তার সন্ধান রাখে না। প্রেম মানুষের মধ্যে আত্মহারা ভাব, মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলীর চরম উৎকর্ষ সাধন, মানুষের সমগ্র সত্তার পরম সৌন্দর্যের পূর্ণতম প্রকাশ করে। প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ ও মহামিলন ইত্যাদি বুদ্ধি বুঝতে পারে না। বাহ্যিক জগৎ ও ধারণার জগতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিমূলক জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রেম বা স্বজ্ঞাই জীবনের প্রকৃতস্বরূপ বুঝতে, জানতে পারে ও প্রকাশ করতে পারে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিভিন্ন প্রকার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও আনন্দে ভরা, সেগুলো উপভোগ ও উপলব্ধি করার জন্য মানুষের দেহে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ ও বিভিন্ন প্রকার মানসিক শক্তি দান করেছেন। এক অংগের কাজ অন্য অংগ দিয়ে বা এক শক্তির কাজ অন্য শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয় না। চোখ দিয়ে সৌন্দর্য, নাক দিয়ে গন্ধ, হাত দিয়ে কোমল বস্তুর স্পর্শ সুখ উপভোগ করা যায়। কল্পনা শক্তি

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 51.
২. Mathnawi VI, 2034.
৩. Mathnawi I, 1982—1984, III. 4723.

দিয়ে কল্পনা, মন দিয়ে অনুভব, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় এবং প্রেম দিয়ে মিলন সম্ভব হয়, মানুষের সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তিগুলো প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সমগ্র শক্তি সমন্বয়ের ফলে সকল বৈচিত্র্যের সমষ্টিগত জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

কোন একটি অংগ বা শক্তি পূর্ণ জ্ঞান দান করতে পারে না। পরম সত্যের বাহ্যিক প্রকাশই এই বিশ্ব, বিশ্বের জ্ঞান লাভ করার অর্থ আল্লাহ্‌র বিভিন্ন চিহ্নগুলোর জ্ঞান লাভ করা। সকল বৈচিত্র্য বা বহুত্বের মূল ঐক্য পরম সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় হৃদয়ের প্রেম দ্বারা। সুতরাং রুমীর মতে, প্রেম বা স্বজ্ঞা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তন্ময়তার মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে, পরম সত্তা সার্বিকরূপে হৃদয়ের মাঝে প্রতিভাত হয় এবং আত্মা স্পষ্ট ও পরিস্ফুটভাবে সমগ্র নিগূঢ় সত্তার জ্ঞানলাভ করে। মানবাত্মা তার আত্মিক উন্নতিকে জড় জগৎ ও চিন্তাজগতের সকল বৈচিত্র্য ও বহুত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক জগতে পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে। মানুষের বুদ্ধি জড়বাদী ও বস্তুবাদী। মানুষের আভ্যন্তরীণ ঐশী শক্তি মানুষের সত্তাসার এবং প্রেম বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যায়। শেষে বলা যায় তাঁর মতে প্রেমই সৃষ্টির আদি কারণ, বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি, গতিশক্তি, জ্ঞানের উৎস এবং পরমাত্মা ও মানবাত্মার মহামিলনের মূল মন্ত্র।

নবম অধ্যায়
রুমীর দর্শনে ইচ্ছার স্বাধীনতা

ইচ্ছার স্বাধীনতা[১]

দর্শনের ইতিহাস আলোচনাকালে দেখা যায় যে, মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগ হতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি না এই সমস্যাটি দার্শনিক, নীতিবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মনে বারবার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন চিন্তাবিদ এই সমস্যার বিভিন্ন প্রকার উত্তর দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণবাদ, কারণবাদ, নির্ধারণবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ, নিয়ামকবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদ নামে বহু মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। ইসলামী দর্শনেও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। জালালউদ্দীন রুমী বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মতবাদ হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে একটি সঠিক মতবাদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির বহু পূর্ব হতে খ্রীস্টান ধর্ম ও দর্শন, বিশেষ করে, গ্রীক দর্শনের মধ্যে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ও দর্শনে এ সমস্যার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডি বুয়ের[২] ও ম্যাকডোনাল্ড[৩]-এর মতো চিন্তাবিদগণ বলেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামে যে আলোচনা শুরু হয় তা খ্রীস্টান ধর্ম, দর্শন এবং গ্রীক দর্শন হতে নেওয়া হয়েছে। অন্যকথায় ইসলাম ধর্মের উপর গ্রীকদর্শন ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবের ফলে এই সমস্যার আলোচনা ইসলামে শুরু হয়। গোলজায়র[৪]-এর মতে, বাইজেন্টাইনের কিছুসংখ্যক খ্রীস্টান পণ্ডিত যখন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তখন ইসলাম ধর্মেও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। খ্রীস্টান পণ্ডিতদের কাছ থেকে এই বিষয়ের আলোচনা ইসলামে অনুপ্রবেশ করে।

---

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, The Metaphysics of Rumi, pp. 62-92.

২. Dr. T. J. De Boer : The History of Philosophy in Islam, London, 1961 tr. by E. R. Jones.

৩. D. B. Macdonald : Development of Muslim Theology, p. 130.

৪. Quoted by Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 63.

এইসকল সমালোচকদের সমালোচনা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কোরান ও হাদীসের মধ্যে মানুষের ইচ্ছার নিরূপণ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বহু উক্তি আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বেকার১-এর উক্তি অধিক সুচিন্তিত। তাঁর মতে, মানব ইচ্ছার স্বাধীনতার বীজ ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে, কোরান ও হাদীস হতেই এ মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মুসলমান ও খ্রীস্টান পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা এ মতবাদের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কোরান ও হাদীসে দুইরকম উক্তি দেখা যায়। একরকম উক্তি দ্বারা মানব মনের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার, অন্যরকম উক্তির দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে নিম্নরূপ কথা বলা যায়।

১। আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা, ভালমন্দ উভয়েরই। তিনি মানবাত্মার মাঝে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার ধারণার সৃষ্টি করেন এবং সে কিভাবে কার্য সম্পাদন করবে তা তিনি পূর্ব হতেই জ্ঞাত আছেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।

২। আল্লাহ্ সবকিছু ভাল, কল্যাণ ও সত্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মন্দ ও অকল্যাণের জন্য দায়ী নন।

৩। আল্লাহ্ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে আলো ও অন্ধকার এই দুইটির যেকোন একটিকে পছন্দ ও নির্বাচন করার শক্তি দান করেছেন।

৪। আল্লাহ্ যা খুশী তাই করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালনা করেন এবং যাকে ইচ্ছা অসৎ পথে পরিচালনা করেন।

৫। যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং সৎ, কল্যাণকর কাজ করে তিনি তাদেরকে সৎ পথ দেখান এবং পাপী ও অসৎ ব্যক্তিদের তিনি অসৎ পথ দেখান এবং শাস্তি দেন।

৬। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মানুষই তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তিনি তেমন ইচ্ছা করেন নাই।

৭। মানুষ যা ইচ্ছা করে তা নয়, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে থাকে।

১. Quated by. D. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 63. footnote 5.

৮। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে, তাই তার প্রাপ্য।

উপরোক্ত উক্তিগুলোর সত্যতা বিচারের জন্য কোরান হতে কিছু আয়াত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

১। সৃষ্টির পূর্ব হতে যা নির্ধারিত হয়ে আছে তা ব্যতীত জগৎ ও মানবাত্মার উপর কোন অনিষ্ট সংসাধিত হয় না বা দৈব-দুর্বিপাক নেমে আসে না। (৫৭ : ২২)

২। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ করতো না, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। (২ : ২৫৩)

৩। যদি আমরা (আল্লাহ্) ইচ্ছা করতাম তবে নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। (৩২ : ১৩)

৪। আল্লাহ্ যাকে আলোক দান না করেন তার জন্য কোন আলোক নাই।

৫। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ-প্রদর্শক নাই। এবং আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। (২৯: ৩৬)

৬। যদি আল্লাহ্ তোমার অনিষ্ট করেন, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা দূর করতে পারবে না এবং তিনি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করলে অন্য কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। (১০ : ১০৭)

৭। অদৃষ্টের ধন-দৌলত তাঁরই নিকটে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জ্ঞাত নয়। ভূপৃষ্ঠে বা সাগরে কি আছে তা তিনি জ্ঞাত আছেন। গাছের একটি পাতা, পৃথিবীর অন্ধকার, কোন শস্য বীজ বা কোন শুষ্ক বা সবুজ পদার্থ পতিত হয় না যা পরিষ্কারভাবে তাঁর দপ্তরে লিপিবদ্ধ না আছে। (৬ : ৫৯)

৮। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত আমরা (আল্লাহ্) আসমান জমিন ও তন্মধ্যস্থ সকল কিছু সৃষ্টি করি নাই। (৩৮ : ২৭)

৯। তাদের আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত, আল্লাহ্ যাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দেন। (২ : ১০)

১০। যারা বিশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাদেরকে পরিচালনা করেন না। (২ : ২৬৪)

১১। যারা অন্যায়কারী আল্লাহ্ তাদেরকে পরিচালনা করেন না। (২ : ২৫৮)

১২। আল্লাহ্ তাদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তি দেন। (৪ : ৪৬)

১৩। অংগীকার ভংগের জন্য আমরা (আল্লাহ্) তাদের শাস্তি দান করেছি এবং তাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত করে দিয়েছি। (৫ : ১৪)

১৪। যে সকল বিপদ আপদ তোমাদের উপর পতিত হয়, তার সকলই তোমাদের স্বহস্তে উপার্জিত। (৪ : ৩০)

১৫। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভার বহন করবে না এবং মানুষ যা চেষ্টা করে, তা ব্যতীত অন্য কিছুই সে পাবে না।

১৬। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির লোকেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেষ্টা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। (১৩ : ১১)

১৭। যদি আল্লাহ্ তেমন ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তাদেরকে সৎপথে আনতে পারতেন। (৬ : ৩৫)

১৮। যদি কেউ ভাল কাজ করে তবে তা তার নিজের মঙ্গলের জন্য করে, যদি কেউ মন্দ কাজ করে তবে সে নিজের অকল্যাণই করে। (১৭ : ৭)

১৯। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর এমন বোঝা চাপান না, যা সে বহন করতে অক্ষম। তার অর্জিত ভাল কাজের জন্য সে পুরস্কার পায় এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তিভোগ করে। (২ : ২৮৬)

২০। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বিনা হিসাবে জীবিকা প্রদান করেন। (২৪ : ৩৭)

২১। তোমার আত্মাই হিসাব দিবার জন্য যথেষ্ট। (১৭ : ১৪)

২২। কেউ অবগত নয় যে তার জন্য কি পুরস্কার লুকিয়ে আছে যা চক্ষুকে শান্তি দান করবে তারা যা করেছিল, এটা তারই পুরস্কার। (৩২ : ১৭)

২৩। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর অধীন। (৩ : ৩৩)।

মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কোরানে পরস্পর বিরোধী আরও বহু আয়াত আছে। একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই কোরানের যে কোন পাঠক এর সত্যতা পরীক্ষা করতে সক্ষম। তখন ভনক্রেমার, ডিবুয়ের ও ম্যাকডোনাল্ড-এর মতো সমালোচকদের সমালোচনার আংশিক অসত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। কোরানের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদগণ তাঁদের ইচ্ছামত বিকল্পগুলোর যে কোন একটি গ্রহণ করে মানব ইচ্ছা সম্পর্কে

নিয়ন্ত্রণবাদ, তকদীরবাদ, অদৃষ্টবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ গড়ে তুলেছেন। এ সকল মতবাদ সৃষ্টির জন্য বিদেশী ধর্ম ও দর্শনের প্রকাশের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। হযরত মুহাম্মদ এ বিষয়ে কোন তর্ক-বিতর্ক না করে বিশ্বাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থায় মুসলমানরা এ বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এর সমাধান দিতে চেষ্টা করেন নি এবং নবীও কোন স্পষ্ট সমাধান দিয়ে যান নি। কথিত আছে যে, একদিন একজন আরববাসী নবীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আল্লাহ্‌র শক্তিতে বিশ্বাস করে সে তার উটকে ছেড়ে দিতে পারে কিনা। নবী বলেছেন যে, প্রথম উটকে বাঁধতে হয়, পরে আল্লাহ্‌র শক্তিতে বিশ্বাস করতে হয়। নির্ধারণবাদ বা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা বলেন যে, যারা ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তারা অগ্নি-উপাসক।[১] নবী ও তাঁর সমকালীন অনুসারিগণ তকদীরবাদ ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করে ও মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাস করতেন। কিছুকাল পরে অদৃষ্টবাদীরা একেবারে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হয়ে পড়ে। খলীফা ওমর একবার একজন অদৃষ্টবাদীর নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করে বলেন, যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা আত্মসমর্পণ হয় না।[২] তাঁর মতে প্রথমে কর্মে লিপ্ত হতে হয় এবং পরে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

এক ব্যক্তি হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করেন, মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, না সে নিয়ন্ত্রণের অধীন? হযরত আলী প্রশ্নকারীকে তার এক পা উঠাতে আদেশ দেন। এক পা উঠায়ে ঐ ব্যক্তি এই আদেশ পালন করে। এরপর তাকে দুই পা এক সাথে উঠাতে বলা হয়। কিন্তু এটা অসম্ভব। তখন হযরত আলী বলেন যে, এক পা উঠানোর স্বাধীনতা আপনার আছে কিন্তু একই সাথে দুই পা উঠাতে পারেন না, এক পা উঠাতে পারেন। তেমনি একই সাথে আপনি স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন।[৩]

যারা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়তির অধীন বলে বিশ্বাস করেন তাদেরকে অদৃষ্টবাদী, তকদীরবাদী, নিয়তিবাদী জবরবাদী বা নিয়ন্ত্রণবাদী বলা হয়। জাহম-বিন সাফয়ান সর্বপ্রথম বলেন যে, মানুষের ইচ্ছার কোন

১. Al-Ghazzali's Ihya, Vol. IV, p. 77. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 67.
২. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 67.
৩. Ibid, p. 68.

স্বাধীন নাই, মানুষ আল্লাহ্‌র হাতের ক্রীড়নক মাত্র। সে সম্পূর্ণ অসহায় যন্ত্রস্বরূপ।[১] জাহম বিন সাফয়ান জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। জাবারীয়া সম্প্রদায় অদৃষ্টবাদী ছিল এবং সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করত। এই সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ পরম ক্ষমতাশীল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। এই মতবাদে মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্তব্যাকর্তব্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে মানুষের ভাল মন্দ উভয় প্রকার কর্মের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

অপরপক্ষে, যারা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করেন, তাঁদেরকে কাদেরিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। মাবাদ আল-জুহানী সর্বপ্রথম মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং তিনি কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।[২] কাদেরিয়া সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ওয়াসিল বিন আতা বলেন[৩] যে, মানুষের ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।[৪] এবং সেই কারণে মানুষ স্বীয় কর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা না থাকলে সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তি কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আল্লাহ্‌কে পাপ ও পুণ্য উভয়ের উৎস বলে স্বীকার করতে হয়। আল্লাহ্ পাপ কর্মের উৎস নয়। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং পরোক্ষভাবে তার একত্বকে অস্বীকার করে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথে সাথে পাপেরও চিরন্তনত্ব স্বীকৃত হয়। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই চিরন্তন নয়। পাপ কার্য যদি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত না হয় তবে আল্লাহ্ পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন না। শাস্তি দিলে তিনি একজন খামখেয়ালী, অত্যাচার, অন্যায়কারী, অসাধু বিচারক ও শাসনকর্তা বলে বিবেচিত হবেন। এটা অসম্ভব। অতএব আল্লাহ্‌র একত্ব ও ন্যায় বিচার স্বীকার করলে পাপ-পুণ্য মানুষেরই কর্মফল বলে স্বীকার করতে হয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানব-ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করতে

১. Dr. S. M. Nadvi, Muslim Thought and Its Source, p. 19.
২. W. M. Watt : Freewill and Predestination in Early Islam, London, 1948 p 48. Henri Masse: Islam, pp. 203-204, Newyork 1938, tr. by. Halide Edib.
৩. M. M. Sharif (ed), A History of Muslim Philosophy Vol. I, First edtion, pp. 199-202.
৪. S. M. Badar Uddin Avi of atalismt, Freewill and Acquistics, pp. 11-14.

হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে চিন্তার ক্ষেত্রে যে আলোড়ন দেখা যায় তা নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলীফাদের রাজত্বকালে মুতাজিলা দার্শনিকদের হাতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। মুতাজিলাদের যুক্তিবাদ ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর প্রাণচাঞ্চল্য এনে দেয় এবং শাস্ত্রাদেশ জর্জরিত ও আল্লাহ্র ভয়ে ভীত মুসলমানদের মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মুতাজিলাদের মতবাদ অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্র বিরোধী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরিপন্থী নয়। কোরানের মৌলিকত্ব রক্ষা করেই তাঁরা ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে মতবাদ পোষণ করেন।

খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আশারীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বসরার আবুল হাসান আল-আশারী ও তাঁর অনুসারিগণ অর্জন মতবাদের দ্বারা ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে এক অদ্ভুত মতবাদ প্রবর্তন করেন ও এক অভিনব তাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে তোলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে সবকিছু ঘটা সম্ভব, একথা প্রমাণের জন্যই তাঁরা কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রকৃতির একানুবর্তিতা নিয়ম অস্বীকার করেন। একদিকে জাবারিয়া সম্প্রদায় ও অন্যদিকে কাদেরিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের ইচ্ছা সম্পর্কীয় পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ মানুষের কার্যাবলী পূর্ব হতে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন এবং মানুষ সে-কার্য করা না করা সম্বন্ধে স্বাধীন। মানুষ নিজে তার কর্ম সাধন করতে পারে না, বিকল্পের মধ্য হতে পছন্দ অপছন্দের মাধ্যমে কৃতকর্মের ভাল-মন্দ গুণ অর্জন করতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে শক্তি ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[১] তারপর তিনি সৃষ্ট শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে তার মধ্যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেন। নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন উভয় দিক দিয়ে মানুষ কর্ম প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে না, কিন্তু কর্মের ভাল-মন্দ গুণ অর্জন করে। আসলে আল্লাহ প্রত্যেক কর্মের একটা সম্ভাবনা পূর্ব হতে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং সেই সম্ভাবনাকে কর্মের মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপ দান করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, আর সে কারণে সে দায়ী।

১. Principal Abdul Hai, Article Asharism in A History of Muslim Phylosophy, Vol. I, edited by, M. M. Sharif, p. 229. D. M. Macdonald : Development of Muslim Theology, p. 192.

আল্লাহ্ মানুষের মনে কর্মের ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং সেই কর্মের ফলাফলও তাঁরই হাতে, তা সত্ত্বেও মানুষকে কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই নির্ধারণ ক্ষমতার জন্য সে কর্মের ভাল অথবা মন্দ গুণ অর্জন করে এবং ফলাফলস্বরূপ পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করে। আশারীয়রা গুণ অর্জন মতবাদ দ্বারা পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছেন। এই মতবাদ দ্বাদশ শতকে মহা মনীষী ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী দার্শনিক ও সূফী আল-গাজ্জালীর হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

আল-গাজ্জালীর মতে, আল্লাহ্ একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা এবং তিনিই সকল কর্মের প্রথম ও শেষ কারণ, আদি উৎস।[১] সকল কর্ম তাঁর নিকট হতে উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির মধ্যে যে একানুবর্তিতা, ধারাবাহিকতা ও কার্যকারণ নিয়ম আছে তা পূর্ব হতে নির্ধারিত এবং এরমধ্যে সংঘটিত কার্যকারণ, আসল কার্যকারণ নয়। আল্লাহ একমাত্র কারণ। মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম তাঁর ইচ্ছার অধীন, তবুও মানুষ দায়ী হয় এজন্য যে, মানুষের মাধ্যমেই আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। মানুষ যেন একটি রঙ্গমঞ্চ, যার একমাত্র অভিনেতা স্বয়ং আল্লাহ্। মানুষ যে রঙ্গমঞ্চরূপে বিবেচিত হয় তা আল্লাহ্র ইচ্ছার ফল, এখানে মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই। নিয়ন্ত্রণবাদীদের মতো আল গাজ্জালী অতি স্পষ্ট ভাষায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন। মানুষ যে ইচ্ছা প্রকাশ করে বা কর্ম-সম্পাদন করে তা পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে করে। আল-গাজ্জালী পছন্দ শক্তি বা নির্ধারণী ক্ষমতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মানুষের মধ্যে যে কামনার সৃষ্টি হয় তা তার নিজের ইচ্ছা ছাড়া হয়। সে কামনা না করে পারে না এবং এই কামনা স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্যভাবে তার শক্তিকে সঠিক কার্যে পরিণত করে। সব কিছুই যেন একটি নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খল মাত্র।

মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কার্যগুলোকে আল-গাজ্জালী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—স্বাভাবিক, ঐচ্ছিক এবং নির্বাচনী বা নির্ধারণী। তিনি বলেন

১. Al-Ghazzali's Ihya. Chapter on Shukr, p. 77. Quoted by, Dr. Khalifa Abdul Hakim. p. 70, Syed Nawab Ali: Some Moral and Religious Teachings of Al-Ghazzali, Lahore, 1946, pp. 37-56.

যে, একজন মানুষ যখন পানির মধ্যে দাঁড়ায়, তখন সে পানির মধ্যে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নেয়। এই জায়গা করে নেওয়া একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। যখন সে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য করে তখন তার ইচ্ছা এই ক্রিয়ার মাঝে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং এই ক্রিয়াকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়। সে যখন হাত দিয়ে লিখে, তখন পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন উঠে এবং তাকে নির্বাচনী বা নির্ধারণী ক্রিয়া বলা হয়। আল-গাজ্জালীর মতে, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপে নিয়ন্ত্রণ বা কার্যকারণের স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। ফুসফুসের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা ও কোন বিপদ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চোখের পাতা বন্ধ করাকেও মানুষের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলা যায়। তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া অর্থাৎ মানুষের হাত দিয়ে লিখাকে আপাত-দৃষ্টিতে নির্বাচনী ক্রিয়া মনে হয়, কারণ মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো লিখতে পারে অথবা সে না লিখতেও পারে। তিনি বলেন, এই ক্রিয়াকে অজ্ঞতার ফলেই নির্বাচনী ক্রিয়া বলা হয়। পছন্দ বা নির্বাচনী ইচ্ছা স্বাধীন নয়, তা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানই বিভিন্ন বিকল্পগুলোর ভাল-মন্দ পরীক্ষা করে ইচ্ছাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। স্বয়ং ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাঝে অনিষ্টকারী কিছু দেখে চোখ বন্ধ করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করে কল্যাণকর ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জ্ঞানের অনেক সময় লাগে। ইচ্ছাকে তখন জ্ঞানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

আল-গাজ্জালী বলেন যে, প্রকৃতির মধ্যে ঘটিত ক্রিয়াগুলোর প্রকৃতির একানুবর্তিতা ও কার্যকারণ নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। এই একানুবর্তিতা বা সময়ানুবর্তিতা কার্যকারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়েছে এবং সেকারণে প্রকৃতির মধ্যে যেসব কারণ দেখা যায় তা আসল কারণ নয়, আল্লাহ্ একমাত্র অস্তিত্বশীল কারণ, তিনি সকল কার্যের পরম উৎস বা আদি কারণ। প্রকৃতির সকল ঘটনা, মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। আল্-গাজ্জালী বলেন যে, যদিও সকল কার্যের একমাত্র আদি কারণ আল্লাহ্ এবং তাঁরই ইচ্ছায় সমস্ত কিছু ঘটে তবুও মানুষ তার কর্মের জন্য

দায়ী। মানুষ এমন একটি বস্তু, আধার, ক্ষেত্র বা রংগমঞ্চ যার মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন এবং বাস্তবায়িত করেন। সকল কর্ম মানুষের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হয় বলে মানুষ দায়ী। মানুষ নিজের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীন কর্তা বা কারণ নয়, সে পূর্ব-নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কাজ করে। আল-গাজ্জালী পছন্দ শক্তি বা নির্ধারণী ক্ষমতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দান করে বলেন, মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, তা তার পছন্দ মত হয় না, আল্লাহ্‌র পূর্ব-নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে হয়। মানুষের স্বাধীনতার কোন স্থান নেই, সব কিছু নিয়তি অনুসারে ঘটে। মানুষ একটি ক্ষেত্র মাধ্যম বা রংগমঞ্চ এবং কার্য তারই মধ্যে বা মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বলে সে দায়ী হয়।

আল-গাজ্জালী বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে ঘটিত সকল কার্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মের অধীন, প্রকৃতির কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। আল্লাহ্ পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। মানুষের ইচ্ছা পূর্ব-নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন বা অনিয়ন্ত্রণ এই দুই পরস্পর বিরোধী নিয়মের অধীন। মানুষের ইচ্ছা নির্ধারিত স্বাধীন ইচ্ছা। মানুষ ইচ্ছা প্রকাশ করে, কর্ম সম্পাদন করে। পূর্ব-নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পূর্ব হতে যা নির্ধারিত হয়ে আছে, মানুষ তার মধ্য হতে বিকল্পের যে কোন একটিকে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে। আল-গাজ্জালীর ইচ্ছা সম্পর্কীয় এই মতবাদ আশারীয়দের অর্জন মতবাদের পূর্ণ বিকাশ। এই মতবাদ পূর্ব-নির্ধারণবাদী মতবাদ এবং এখানে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে। কারণ মানুষ একটি রংগমঞ্চ যার বক্তা একমাত্র আল্লাহ্ অর্থাৎ মানুষ কর্ম 'সম্পাদনের ক্ষেত্র, বা 'যন্ত্র' মাত্র।[১] মানুষের নৈতিক বোধ ও দায়িত্ব রক্ষার জন্য আল-গাজ্জালী ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে অর্জন ও নির্বাচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। কাদেরিয়া ও মুতাজিলাদের ইচ্ছার অনিয়ন্ত্রণ-বাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্য অতি স্পষ্ট। জাবারিয়া সম্প্রদায় কিছুসংখ্যক ধর্মতত্ত্ববিদ ও কিছুসংখ্যক সুফীর নিয়ন্ত্রণবাদের স্বপক্ষে উক্তি বোধগম্য। কিন্তু আল-গাজ্জালীর সমর্থনপুষ্ট আশারীয়দের অর্জন মতবাদ অধিক দুর্বোধ্য।

জালালউদ্দীন রুমীর ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈতবাদী সুফীদের মতো

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid. p. 71.

তিনি বলেন যে, সকল কার্যের নিয়ন্তা আল্লাহ্। কিন্তু তিনি মানুষকে কতক-গুলো কার্য সম্পাদনের এখতিয়ার বা নির্বাচনী শক্তি দিয়েছেন। যার সীমার ভিতর মানুষ পছন্দ মতো কাজ করতে পারে, যদিও কাজ করার শক্তি ও কাজের ক্ষেত্র আল্লাহ্র দান। তাঁর মতে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আল্লাহ্ তাকে স্বাধীনভাবে পছন্দ করার শক্তি দান করেছেন। এই পছন্দ শক্তি বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার সম্মান দান করেছে। প্রত্যেকটি কাজের ভাল-মন্দ মান নির্ণয় করা হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ও সেবারই ফল।[১] যা কিছু পারলৌকিক তা নিয়ন্ত্রণের অধীন, আধ্যাত্মিক জগতের সকল বস্তু ও জীবের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই। এই জগতে মানুষের স্বাধীন কাজের জন্যই তার উপর আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হয় অর্থাৎ আল্লাহ্র করুণা বা রহমত স্বাধীন প্রচেষ্টারই ফল।[২]

রুমী আল্লাহ্-সৃষ্ট সকল নেয়ামত, বস্তু ও পরিস্থিতিকে পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। জন্ম, মৃত্যু, বুদ্ধি, প্রকৃতির নিয়ম ইত্যাদি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। অপরিবর্তনীয় নিয়ম বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই বরং নিয়ম দ্বারা মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মতো নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবর্তনীয় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন, সে ক্ষেত্রে সে নিজের ইচ্ছামত সম্ভাবনাগুলোর যে কোনটি পছন্দ করতে পারে ও নিজ ভাগ্য গড়তে পারে। নবী ও অবিশ্বাসীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রুমী একথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। অবিশ্বাসীরা বলে যে, তারা এমনভাবে গঠিত যে কোন ধরনের নৈতিক প্রচারণা তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না[৩] যেমন মাটি পানি হয় না, পানি মধু হয় না।

নবী বলেন যে, কোন একটি বস্তু অন্যবস্তু হয় না, তবে মানুষের নৈতিক সত্তার পরিবর্তন হয়, নৈতিক ব্যাধি দূর হয় এবং তার পরিবর্তন সম্ভব। আল্লাহ্র নিয়মাবলী চিরন্তন, এর কোন পরিবর্তন নাই। তবে রুমীর মতে,

১. Mathnawi, III, 3287-3288.
২. Mathnawi, IV, 2912.
৩. Mathnawi, III, 2900-2902.

একক ব্যক্তি হিসাবে মানুষের ইচ্ছা পছন্দ বা নির্ধারণ পূর্ব হতে নিয়ন্ত্রিত নয়।[১] আল্লাহ্‌র নিয়মাবলীর রূপ চিরন্তন, কিন্তু তার বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। আল্লাহ্‌র নিয়মাবলী বা নিয়তি ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা ধর্মীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ধারণা। আল্লাহ্‌র আইন বা নিয়ম বা ভাগ্যলিপি বা তকদীরলিপির নিয়মের মূল কথা এই যে তা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির নিয়মও চিরন্তন। এই নিয়ম তত্ত্ববিদ্যার ভাষায় দেশ-কালের অতীত এবং ধর্মীয় ভাষায় পূর্ব-নির্ধারিত নিয়ম, ভাগ্য-লিপি, অদৃষ্টলিপি, তকদীরলিপি বা নিয়তিলিপি। স্বাধীনভাবে পূর্ণ চরিত্র গঠনের জন্য এক প্রকার চিরন্তন নৈতিক নিয়মের প্রয়োজন। তকদীরলিপিতে একেবারে এ কথা লিখা হয়েছে যে প্রতিটি কার্যের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়, সঠিক সিদ্ধান্ত সৎপথে পরিচালিত করে। সত্য ও মিথ্যা উভয়ই তকদীর নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু তকদীরলিপি বা ভাগ্যলিপি স্বেচ্ছাচারের পথে চলে না। ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি আছে, নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে ঘটে। 'সুরা' উত্তেজনা আনবেই, 'তেঁতুল টক হবেই, 'অগ্নির' দাহিকা শক্তি থাকবেই, 'বট বৃক্ষের বীজ' হতে বট বৃক্ষই হবে, অন্যকোন বৃক্ষ হবে না, এ কথা পূর্ব-নির্ধারিত। ভাগ্যলিপি বা তকদীরলিপির দাড়িপাল্লায় অর্থাৎ চিরন্তন নিয়মের মানদণ্ডে প্রত্যেকটি কার্যের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। মুতা-জিলাদের মত বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারযুক্ত নয়। তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসক নন। যে শাসকের কাছে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ একই সমান তাকে ন্যায়বিচারক বলা যায় না, সে স্বেচ্ছাচারী অবিচারক। আল্লাহ্‌ তেমন শাসক ও বিচারক নন।

চিরন্তন নিয়মের মধ্যে উল্লেখিত পরিবর্তনশীল কার্যগুলো অর্থাৎ 'যার কোন বিকল্প নাই' সেগুলো সম্পর্কে মানুষ চেষ্টা করে না, কারণ তা অবশ্যই ঘটে। যেমন—জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, প্রকৃতির নিয়ম, ইত্যাদির কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেসকল কার্যের বিকল্প আছে, মানুষ সেসব সম্ভাব্য বিকল্পগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে।[২] মানুষ বিবেচনা করে এবং বিবেচনা করে তার মধ্য

১. Mathnawi. 2904, 2912, 2916, 2963.
২. Mathnawi, V. 3131-3133.

হতে পছন্দমত যেকোন একটি বিকল্পকে নির্ধারণ করে কার্য সম্পন্ন করে। মানুষের এই চিন্তা ও বিবেচনা শক্তিই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রমাণ। নিয়ন্ত্রণবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ নয়, এটা স্বনিয়ন্ত্রণবাদ। "ঔচিত্য" ও "করতে পারা" এই দুইটি ধারণা পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট ধারণা। মানুষ যখন চিরন্তন নিয়মের অধীনে অবশ্যই ঘটবে[১] এমন কার্যের কথা ও সম্ভাব্য কার্যের কথা চিন্তা ও বিবেচনা করে তখন প্রথমটির ক্ষেত্রে মানুষের অসামর্থ্য এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সামর্থ্য প্রকাশ করে। অসম্ভাব্য বা পরিবর্তনহীন কার্যের পরিবর্তন করতে বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করে অন্যরূপ ঘটানোর চেষ্টা করে না, চেষ্টা করলেও কোন পরিবর্তন করতে পারে না। এক্ষেত্রে জাবারিয়া সম্প্রদায়ের মত রুমী বলেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, মানুষ নিয়ন্ত্রণের অধীন, স্বাতন্ত্র্যবাদ অপ্রযোজ্য। তাঁর মতে প্রতিটি জিনিসই বাইরের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত, একমাত্র মানুষই তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ চিন্তা ও বিবেচনা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তার চরিত্রের একমাত্র অন্তর্নিহিত শক্তি যদি বাইরের ডাকে সাড়া না দেয় তবে কোন জাগতিক বা স্বর্গীয় প্রভাবই তার কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।[২] অন্যকথায় তকদীরলিপিতে লিপিবদ্ধ ও তার মধ্যে অবস্থিত অন্তর্নিহিত শক্তিই মানুষকে ভাল-মন্দ পছন্দ করতে সাহায্য করে এবং সৎপথ দেখায়। মুতাজিলাদের মত তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষ তার কর্মের নিয়ন্তা না হলে সে তার কর্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, গুণ বা দোষ, পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না এবং আল্লাহ্ একজন অন্যায়কারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হন। কিন্তু তা অসম্ভব।

রুমী বলেন যে, সংগ্রাম ও স্বাধীন প্রচেষ্টা দ্বারা কোন কার্য করার অর্থ নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বোঝায় না। কারণ বাঁচতে হলে জীবন সংগ্রাম অবশ্যই অপরিহার্য।[৩] অদৃষ্টলিপিতে লিখিত সম্ভাব্য বিকল্পের পছন্দের ব্যাপারে অথবা পরিবর্তনশীল অদৃষ্টলিপিতে নিয়ম ও কার্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানুষের নিয়তি এবং এই সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত

১. Mathnawi V, 3145.
২. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 78
৩. ঐ

অব্যক্ত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো ব্যক্ত, স্পষ্ট ও বাস্তবায়িত হয়। তিনি জাবারীয়াদের মতো অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করলেও মুতাজিলাদের মতো বলেন যে, মানুষ তার অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। মসনবীতে সিংহ ও খরগোসের গল্পের মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মানুষের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে রুমীর চিন্তাধারা ফিকটের নৈতিক অদ্বৈতবাদের মূল বিষয়বস্তুর অনুরূপ এবং এ বিষয়ে রুমীকে তাঁর পূর্বসূরী বলা যায়।[১] ফিকটের মতে, অনআত্মা আত্মার উন্নতির পথে যে বাধার সৃষ্টি করে, তা আত্মার স্বভাবের ভিতরই আছে এবং উন্নতির পথে সকল বাধা অবিরাম জয় করে আত্মা বিকাশ লাভ করে। ফিকটের মতো রুমীও এই ধারণায় বিশ্বাস করেন। কোরানে বর্ণিত দৈব, দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য, অনিষ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। রুমী সেই অনিষ্ট, অকল্যাণ, মন্দ, বাধা, বিরোধ ইত্যাদি মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা শক্তিকে বাস্তবায়ন করার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিরোধ নীতিই উন্নতির সহায়ক।[২] বিরোধ নতুন মানসিক বৃত্তি ও শক্তির সৃষ্টি করে। এটাই মানুষের ভাগ্য এবং এই ভাগ্য বা নিয়তি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারী নীতি নয়, বরং তার উন্নতি ও বিকাশের সহায়ক।

রুমী বলেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা স্বগতরূপে কোন লক্ষ্য নয় বা কাম্যবস্তু নয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা সহায়ক মাত্র।[৩] উচ্চতর জীবনের নির্দেশ অনুসারে চলাই এই স্বাধীন ইচ্ছার চরম লক্ষ্য। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য জীবনের উচ্চ স্তরে স্বনিয়ন্ত্রণ। সর্বোচ্চ স্তরে স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় হয় এবং এটাকে স্বনিয়ন্ত্রণ বলা হয়। নিম্নস্তর হতে জীবন নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে উন্নতির পথে যাত্রা শুরু করে এবং আত্মিক উন্নতির মাত্রা অনুসারে মানুষ ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে নিজকে বিকশিত করে তোলে। কাজেই দেখা যায় যে নিয়ন্ত্রণ দুই প্রকার—বলপূর্বক বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন আভ্যন্তরীণ স্বনিয়ন্ত্রণ।[৪] জড়বাদী, যান্ত্রিকবাদী ও জাবারীয়াদের

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 78.
২. Mathnawi II, 2963-2964.
৩. Mathanawi V. 3105-3107.
৪. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 79.

মতো ঘোর অদৃষ্টবাদী প্রথম প্রকার নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাস করে, আশারীয়া সম্প্রদায়ের আল-আশারী ও শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিক আল-গাজ্জালী নিয়ন্ত্রণমূলক স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করেন। ইবনুল আরাবী ও রুমী স্বাধীন আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাস করেন। রুমীর মতে, স্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণ উচ্চতর জীবনে আদর্শের আলোকে জীবনকে উন্নত করার উপায় মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কোন ব্যক্তি, বস্তু বা নিয়ম দ্বারা কোন মানুষ একটি পথ নির্ধারণ করতে বাধ্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষ স্বাধীন নয় এবং তার স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের প্রেম সঞ্জাত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বনিয়ন্ত্রিত বাধ্য-বাধকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ। কিভাবে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণকে স্বনিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, তা প্রেম দ্বারা অনুধাবন করা যায়, আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় না।

'স্বাধীনতার খাতিরে স্বাধীনতার প্রয়োজন'—মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্য এমন নয়। রুমীর মতে ক্রীতদাসই মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে, প্রেমিক কখনও স্বাধীনতার জন্য চিন্তা করে না। প্রেমিকও প্রেমিকার নিকট আত্মসমর্পণ করে সন্তুষ্ট হয়। প্রেমিক উন্নত আত্মার প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে বলেই সে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী।[১] বাইরের কোন নির্দেশ মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে না। কেবল-মাত্র প্রেমই মানুষকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়ে দেয় এবং এরজন্য সে আল্লাহ্‌র প্রেমিক হতে চেষ্টা করে।

রুমীর দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নীতির সাথে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় নীতির উৎস 'কোরান'। কোরানের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে এবং নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হয়েছে—"যদি বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর," "নির্ভরশীল ব্যক্তিদের আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে দাও," "যারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্‌ই তাদের জন্য যথেষ্ট, 'যারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন," "তোমার জীবিকার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর এবং তাঁর সেবা কর।" অনুরূপভাবে হাদীসেও আল্লাহ্‌র

১. Mathnawi I, 1463-1474.

উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ বলেছেন, "যেমন বিশ্বাস করা প্রয়োজন, যদি তেমনভাবে কেউ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে ও নির্ভর করে, তবে আল্লাহ্ তাকে জীবিকা দান করেন।" "যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ্ তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন এবং এমন একটি উৎস হতে জীবিকা দান করেন যা তার নিকট অজ্ঞাত এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়, আল্লাহ্ তার এই আসক্তি বৃদ্ধি করেন।" নবী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় জীবন ও কৃচ্ছ্রতা সাধন পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন জীবিকা অর্জন করে তাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। ইসলাম ধর্ম কর্মের মাধ্যমে জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করতে নির্দেশ দেয়। বাধা-বিপত্তি জয় করে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই জীবনের ধর্ম। ইসলাম ধর্ম মানুষকে এই সংগ্রামী জীবন সাধনায় আহ্বান জানায়। সূফীদের মধ্যে অনেক সাধক নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন ও সংসার ত্যাগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। রুমী তাদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, সমাজ ও সংসারে ব্যস্ত কর্মময় সংগ্রামী জীবনই আসল জীবন।[১] এই জীবনের বাধা-বিপত্তি দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি তিনি বাস্তব বলে গ্রহণ করে তা জয় করতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে, সকল বাধার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে আত্মার অন্তর্নিহিত সীমাহীন অব্যক্ত সম্ভাবনা শক্তির বিকাশ সাধন করতে হয়। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁর মতে, সকল প্রকার বাধা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মসনবীর বহুস্থানে নির্ধারণবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধে অনেক উক্তি করেছেন। নিষ্ক্রিয়বাদী সূফীদের মতো তিনি বৈরাগ্যবাদ ও সংসার ত্যাগের স্বপক্ষে নবীর উক্তি ব্যাখ্যা করেন নাই—বরং তার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, যেখানে কোন শত্রু নাই, বিরোধ নাই, সেখানে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা অসম্ভব।[২] আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি আত্মার নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সেগুলো জয় করেই নৈতিক উন্নতি সম্ভব। আল্লাহ্ দান করতে আদেশ দিয়েছেন, উপার্জন

১. Mathnawi I, 912-914. 938, 947.
২. Mathnawi V, 575–582.

না করে আল্লাহ্‌র সে আদেশ পালন সম্ভব নয়। একইভাবে বলা যায়, মন্দ-অকল্যাণ ও বিরুদ্ধনীতি নৈতিক মূল্যবোধের জন্য অপরিহার্য।

সূফীদের মধ্যে জালালউদ্দীন রুমী মন্দ বা অকল্যাণ নীতি নৈতিক, জাগতিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাঁর মতে মন্দ, অমংগল বা অকল্যাণ যদিও অবভাসিক ও আপেক্ষিক তবুও বাস্তব। কোন জিনিসই মূলতঃ ভাল বা মন্দ নয়। বস্তুর মূল্য বস্তুর মধ্যে নিহিত নাই, তার মূল্য নির্ভর করে সেই বস্তুর প্রতি কোন ব্যক্তির দৃষ্টিভংগীর উপর। একই জিনিস কোন এক ব্যক্তির কাছে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাল এবং অপর ব্যক্তির কাছে সেই পরিস্থিতিতে অথবা ভিন্ন পরিস্থিতিতে মন্দ হতে পারে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা 'বিষ' অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা 'ঔষধ'।[১] এমন কি 'জ্ঞান' নিজে হতে ভাল বা মন্দ নয়, আত্মিক উন্নতির সেবায় জ্ঞান নিয়োগ করলে বন্ধুর মত কাজ করে, কিন্তু দৈহিক সুখ অর্জনের জন্য এর ব্যবহার করা হলে শত্রুর মত কাজ করে। কোন কার্য নয় বরং কার্যের অভিপ্রায় ভাল বা মন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রুমীর মতে পূর্ণ আশাবাদ সঠিক মতবাদ নয়, এ মতবাদ বিশ্বের ভাল ও সুন্দর বিষয়, বস্তু ও ধারণা গ্রহণ করে মন্দ, অমংগল ও কুৎসিতকে অস্বীকার করে। এ বিশ্ব ভাল-মন্দ বিষ, অমৃত, কল্যাণ-অকল্যাণ, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি ধারণার সমন্বয়ে গঠিত।[২] সৎ বা মহৎ গুণ মন্দ বা অসৎকে বর্জন করে ভাল ও সৎকে স্বাধীনভাবে পছন্দ করারই ফল এবং মিথ্যা হতে সত্যকে আলাদা করে বুঝতে পারার নামই জ্ঞান।[৩] অসৎ মন্দ, অমংগল, মিথ্যা, বাধা যদি না থাকে তবে সৎ, ভাল, মংগল, সত্য ও স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করা অসম্ভব। মূল্যবোধের চেতনা তার মূল্যায়ন ও বাস্তবতা উপলব্ধি মূল্যহীন বস্তু ও ধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাতাস বাধা সৃষ্টি করে বলেই পাখী আকাশে উড়তে পারে, বাতাসশূন্য স্থানে পাখীর উড়ার কথা চিন্তা করা অসম্ভব। জীবন উন্নতির পথে সকল প্রকার বাধাকে মন্দ বলা ভুল, বাধা অতিক্রম করে উন্নতমানের নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব এবং নিম্ন প্রকৃতিগুলো দমন করেই মানুষ সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়।[৪] ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ ও মংগল-অমংগলকে

১. Mathnawi I, 2597—2599. Mathnawi, IV, 65-66, Mathnawi IV, 68.
২. Mathnawi II, 2939-2942.
৩. Mathnawi, II, 2966-2967.
৪. Mathnawi II, 2963-2964.

আল্লাহ্ একই সাথে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে মানুষ যেন মন্দ ও বাধা অতিক্রম করার জন্য নিজের মধ্যে পরশ পাথর সৃষ্টি করতে পারে। মন্দ অমংগলের বিরুদ্ধে মানুষের কিছু বলা উচিত নয়, কারণ মন্দ ও অমংগলের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তাকে জয় করে মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হতে পারে।[১] মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীব পশু ও প্রাণীদের জন্য এবং তার চেয়ে উচ্চস্তরের জীব ফেরেস্তাদের জন্য ভাল-মন্দ, মংগল-অমংগল, পুরস্কার-শাস্তি কিছু নাই।

মানুষ দ্বৈত স্বভাবের জীব, তার জীবনে ভাল-মন্দ দুইই আছে, উর্ধ্বগতিতে জীবনের বিকাশ লাভ ও নিম্নগতিতে পতনের সম্ভাবনা আছে। মানুষ তার ইচ্ছামত কার্যে নিমজ্জিত হয়ে পশুর চেয়ে নিম্নমানের জীবন যাপন করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের মত ঐশীগুণে গুণান্বিত হয়ে উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারে।[২]

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটি মানুষের তকদীরলিপি বা অদৃষ্টলিপি বা নিয়তিলিপির সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই তকদীরলিপি সম্বন্ধে অস্পষ্ট জ্ঞানই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী মতবাদের উৎপত্তির জন্য দায়ী। তকদীর শব্দের অর্থ 'কোন কিছুর পরিমাণ' 'বিধান' ও সম্ভাবনা শক্তি'। 'তিনি সর্ব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর তকদীর (পরিমাণ) নির্দিষ্ট করেছেন' (কোরান : ২৫ : ২), 'আমি প্রত্যেক বস্তু তকদীর (পরিমাণ) অনুসারে সৃষ্টি করেছি' (কোরান : ৫৪ : ৫৯) ; আমি নির্দিষ্ট তকদীর (পরিমাণ) অনুসারে অবতীর্ণ করি' (কোরান ১৫ : ২১) ; সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে। এটা মহাশক্তিশালী ও পরম জ্ঞানীর তকদীর (বিধান) (কোরান ৩৬ : ৩৮)। মানুষকে জীবনশক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তার তকদীর (সম্ভাবনা শক্তি) নির্দিষ্ট করেছেন (কোরান ৮০: ১৮) ; তিনি সৃষ্টি করেছেন, পূর্ণতা দান করেছেন, তকদীর (বিধান ও সম্ভাবনা) দিয়েছেন এবং সৎপথে পরিচালনা করেছেন (কোরান ৮৭:২) ; উপরোক্ত ধারণা হতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সবকিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ, বিধান ও সম্ভাবনা অনুসারে ঘটে। কোন বস্তু সৃষ্টির পর তার পূর্ণতা তকদীর বা নির্দিষ্ট বিধান মতে সম্ভাবনা অনুসারে সঠিক পরিমাণে

১. Mathnawi, IV, 94. 100.
২. Mathnawi IV, 1497.

হয়, এই তকদীর আল্লাহ্ পূর্ব হতে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আছে। উদাহরণস্বরূপ, বটবৃক্ষের বীজের কথা ধরা যাক। বটবৃক্ষের বীজ অতি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষের সম্ভাবনাশক্তি আছে, এই বীজকে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে রাখতে হয়, যেমন মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদি। বীজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাশক্তি ও প্রাকৃতিক আলো-বাতাস ইত্যাদি নিয়ম বা বিধানের সমষ্টিগত নামই তকদীর। মানুষের ক্ষেত্রে একই কথা বলা যায়। মানুষ যদি আল্লাহ্র নিয়ম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তবে সে পূর্ণতা লাভের সম্ভাব্য ক্ষমতা লাভ করে এবং এই প্রদত্ত ক্ষমতার নাম তকদীর। মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু তবু সে তকদীর নিয়মের অধীন। আল্লাহ্র সৃষ্ট সকল বস্তু নিয়ম ও সম্ভাবনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) অপরিবর্তনশীল ও (খ) পরিবর্তনশীল। এই দুইটিকে ধর্মীয় ভাষায় 'তকদীর হাকিকী' ও 'তকদীর মালিকী' বলা হয়। কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় অবস্থা বা শক্তিকেই ঐ বস্তুর হাকিকী বলে। তকদীর হাকিকী অপরিবর্তনীয় সম্ভাবনা, এটা দর্শনের ভাষায় চিরন্তন ও স্থান-কালের ঊর্ধ্বে, মানুষ তার কোন পরিবর্তন করতে পারে না, এ ক্ষেত্রে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই। মানুষের জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি তকদীর হাকিকী বা অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন বা অন্তর্গত। রুমী এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্-প্রদত্ত যেসকল সম্ভাবনার পরিবর্তন হয় তারই নাম তকদীর মালিকী। মানুষ স্বীয় স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্ভাবনাগুলো পরিবর্তন করতে পারে। অন্যকথায়, তকদীর হাকিকীর ভিতর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু 'মালিকীর' ভিতর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বর্তমান আছে। প্রত্যেক ধর্মই নিয়তি বা তকদীর বিশ্বাস করে। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরান একদিকে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী এই মত পোষণ করে। অন্যদিকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে বলে যে আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ হয় না এবং মানুষের ভাগ্যলিপি বা তকদীরলিপিতে যা লিখিত আছে তা দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, সম্পূর্ণ অধীনও নয় অর্থাৎ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী সে নয়। প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা

বা শক্তি ও কর্মক্ষমতার পরিমাণ বা সম্ভাবনা অনুযায়ী মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী। যার যতটুকু বুদ্ধি বা জ্ঞান তার সেই পরিমাণ দায়িত্ব। পাগলের পাগলামী ও শিশুর অপরাধের জন্য উভয়ের কেউ দায়ী নয়। আর এক ঘটনা হতে বোঝা যায় যে আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধির মাত্রা বা সম্ভাবনা এবং উৎপত্তিও আবার সীমাবদ্ধ স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং পারিপার্শ্বিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে বাস্তবায়িত হয়। মানুষ তার অতীত ও ভবিষ্যৎ জানে না, স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পদৃষ্টি, স্বল্প-চিন্তাশক্তি, স্বল্প-ধীশক্তি ও স্বল্প-পরিণতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ও কতকগুলো নিয়ম অনুসারে জীবন-যাপন করে। এই নির্দিষ্ট মাত্রা পরিমাণ ও সম্ভাবনাই প্রত্যেক মানুষের তকদীর বা পরিণতি। এই তকদীর অনুযায়ী তার বিচার করা হবে ও তার কাজের জন্য তাকে দায়ী করা হবে। এই অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব শক্তি, পরিমাণ ও সম্ভাবনা অনুসারে নির্দিষ্ট স্বাধীন ও দায়িত্ব ভোগ করে। যদি সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে তবে সে কাদেরীয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মতো ভুল করে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে আপনার অনুরূপ সৃষ্টি করায় মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করেছে এবং পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী হয়। কাদেরীয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ, ইবনুল আরাবী, আল-গাজ্জালী, জালালউদ্দীন রুমীর মতো সুফী সাধকের সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং সেই কারণে সে স্বীয় কাজের জন্য দায়ী। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করলে এবং আল্লাহ্কে সকল কাজের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করলে সৎ কাজের পুরস্কার ও অসৎ কাজের শাস্তি কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আল্লাহ্কে একজন স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী শাসক ও বিচারক বলে স্বীকার করতে হয় কিন্তু এটা অসম্ভব। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আদৌ না থাকলে মানুষের মধ্যে প্রদত্ত শক্তি স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কোন কাজ করতে না পারলে, তাকে পাপ ও পুণ্যের জন্য দায়ী করা যায় না।

মানুষ সীমাবদ্ধ স্বাধীন শক্তির অধিকারী, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত অন্য কোন জড় বস্তুর মতো যান্ত্রিক নিয়মে সে চলে না, আল্লাহ্র হাতে সে ক্রীড়নক নয় এবং ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্টভাবে সে চলে না, সে জীব।

তকদীর হাকিকীর সূত্রে প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট। অন্যকথায়, প্রত্যেক মানুষই যেন, দার্শনিক লাইবনিজের এক একটি 'মনাড্' বা চিৎপরমাণু, যার স্বভাব যেমন তার কর্ম প্রচেষ্টাও তেমন। মানুষের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহ্র আদেশের দরকার করে না এবং প্রত্যেক ইচ্ছা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না যদিও আল্লাহ্ মানুষের কাজের পরোক্ষ কারণ; তবুও বলা যায় না যে, তিনি মানুষের সকল কাজের ক্ষমতার কর্তা। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী, কোন শক্তিই তাকে পরাভূত করতে পারে না, তিনি মানুষের ইচ্ছা-শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। কারণ মানুষ বড় দুর্বল, তার ইচ্ছাও অতি সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্র কোন ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে ইচ্ছা করলে তাঁর বিরুদ্ধ ইচ্ছা করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির নাই। তিনি কোন ব্যক্তিকে অসৎ পথে চালানোর ইচ্ছা করলে তার মনে প্রবল অসৎ প্রবৃত্তির সৃষ্টি করতে পারেন এবং সে তখন অবশ্যই অসৎ পথে চলে। আল্লাহ্ সম্পূর্ণ ক্ষমতাশীল, আল্লাহ্র শক্তি ব্যতীত মানুষের কাজ করা বা না করার কোন শক্তি নাই। আল্লাহ্ মানুষের ইচ্ছার সৃষ্টিকর্তা। মানুষের শক্তি ও ইচ্ছা উভয়ই সীমিত। আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে মানুষের ইচ্ছার সম্বন্ধ এই যে, মানুষ আল্লাহ্র প্রতিবিম্ব, আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধি। আল্লাহ্র গুণ অসীম ও অনন্ত কিন্তু মানুষের গুণ সসীম। মানুষের গুণ ও আল্লাহ্র গুণ তুলনা করলে মানুষের গুণ যেখানে দাঁড়ায়, মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহ্র ইচ্ছা তুলনা করলে সেখানে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ মানুষের ইচ্ছার সৃষ্টিকর্তা এবং এই পরম ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কোন কাজ করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী শাসক নন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাঁরই নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নিয়মের অধীন বলেই প্রকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক সত্য আবিষ্কার করতে পারেন। কার্যকারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের পুনরাবির্ভাব ইত্যাদি সঠিকভাবে বলতে পারেন। আল্লাহ্ যথেচ্ছাচারী শাসক হলে এমন ভবিষ্যৎ বাণী সম্ভব হতো না। প্রকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আছে, সকলই নিয়মের অধীন। আল্লাহ্র ক্ষমতা আল্লাহ্রই সৃষ্টি নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে মনোনয়ন বা পছন্দ বা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই পছন্দের

বাইরে তার দায়িত্ব নাই। মানুষের জন্ম-মৃত্যু বুদ্ধির পরিমাণ, প্রকৃতির বিধান ইত্যাদির উপর মানুষের স্বাধীনতা নাই এবং প্রত্যেক মানুষের জন্মের পূর্বেই সমস্ত বিষয় তকদীরলিপিতে বা নিয়তিলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তদনু-যায়ী এই বিশ্বে তার কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। প্রদত্ত জ্ঞান ও শক্তির ভিতর মানুষের স্বাধীনতা আছে এবং সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল পার্থক্য করার ক্ষমতা তার আছে এবং তারই ফলে মানুষ নিজের নিয়তিলিপি বা ভাগ্যলিপি বা নিজের বেহেস্ত ও দোজখ নিজেই প্রস্তুত করে। এই কার্যাবলীর ফলাফলের তালিকা পূর্ব হতেই আল্লাহ্র নিকট আছে। মানুষের প্রচেষ্টা ব্যতীত এই তালিকা অনুযায়ী সবকিছু বাস্তবায়িত হয় না অর্থাৎ এই তালিকা অনুযায়ী কার্য হয় না, বিনা প্রচেষ্টায় আবশ্যিক নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয় সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ তকদীর হাকিকীর তালিকা অনুযায়ী কার্য হয়। প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ সম্ভাব্য নিয়মগুলো কার্যকরী করতে পারে অর্থাৎ তকদীর মালিকীর তালিকা বাস্তবায়িত করে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্ বিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী। প্রতিটি বস্তু ও মানুষ কোন্ পথে চলবে, কি কাজ করবে, তা সেই বস্তু ও মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর জানা আছে। প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি মানুষের জীবন ইতিহাসের ভিতর সমস্ত কাজই তার জন্মের বহু পূর্বেই আল্লাহ্র জ্ঞানের ভিতর আছে। সারা জীবনের সম্ভাব্য ইতিহাস ও কার্যতালিকার নামই ভাগ্যলিপি, তকদীরলিপি বা নিয়তিলিপি। কোন ঘড়ি কিভাবে ও কত সময় কার্য করবে তা যেমন ঘড়ি নির্মাতার জানা আছে, সমগ্র সৃষ্টি ও মানুষ সমস্ত জীবনে কি কি কাজ করবে এবং কিভাবে করবে তা আল্লাহ্র জানা আছে, বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন সম্ভাবনা, বিভিন্ন পরিমাণ ও বিধান সকলই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে, এবং তাঁর জ্ঞান অনুসারেই তকদীরলিপি সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ অসীম ও অনন্ত। তিনি জ্ঞানময়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, গুপ্ত-ব্যক্ত, অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই তাঁর জ্ঞানের ভিতর। এর ফলে মানুষের নিয়তিলিপি তার কার্যের পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ যে অদৃষ্টলিপি মানুষ তার স্বাধীন কার্যের দ্বারা ভবিষ্যতে প্রস্তুত করবে, তা পূর্বেই ঐশী জ্ঞানের ভিতর আছে। মানুষের

ভাগ্যলিপি, নিয়তিলিপি বা তকদীরলিপি। জাবারিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, তকদীরলিপির আদেশ অনুযায়ী মানুষের কার্য হয়। জাবারিয়াদের এই মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, তকদীরলিপি অনুযায়ী মানুষের কার্য হয়, তার আদেশে নয়। মানুষ যা করতে পারে বা হতে পারে তারই সকল সম্ভাবনামূলক আল্লাহর পূর্ব-জ্ঞানই মানুষের তকদীরলিপি। মানুষের ক্ষেত্রে যা ঘটে না এবং মানুষ যা করতে বা হতে পারে না, তেমন কথা তকদীরলিপিতে লিখা নাই; মানুষ যা করতে পারে বা স্বাধীন প্রচেষ্টা দ্বারা যে অবস্থায় উন্নীত বা অবনীত হতে পারে সেই কার্যাবলীর তালিকা তকদীরলিপিতে আছে। তকদীর-লিপির আদেশে মানুষ কার্য করে না বা সে নিয়ম অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি হয়নি বরং মানুষ কি করতে পারে ও হতে পারে সে অনুযায়ী তকদীরলিপি লিখা হয়েছে।

তকদীরলিপি অনুযায়ী মানুষ তার কার্যের জন্য দায়ী হয় না, বেহেস্ত বা দোজখে যায় না বরং মানুষ স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টা দ্বারা কর্মসম্পাদনের ফলে বেহেস্ত বা দোজখে যেতে পারে, সে কথাই তকদীরলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। যা অদৃষ্টের লিখা আছে তার খণ্ডন নাই। এ কথার অর্থ এই যে, মানুষের অদৃষ্টে সকল রকম সম্ভাবনা বর্তমান, মানুষ এই সম্ভাবনার বাইরে কিছু করতে বা হতে পারে না। সকল সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় না। মানুষ যেগুলো বাস্তবায়িত করতে চায় সেগুলোই বাস্তবায়িত হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার ও স্পষ্ট করা যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কথা ধরা যাক। একটি প্রশ্নপত্রে দশ বা ততোধিক সমাধানের প্রশ্ন আছে। পরীক্ষার্থীকে যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা পরীক্ষার্থীর আছে এবং আছে বলেই প্রশ্ন করা হয়েছে। এখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া পরীক্ষার্থীর উপর নির্ভর করে। আবার প্রশ্নগুলোর মধ্য হতে যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন পরীক্ষার্থী পছন্দ বা মনোনয়ন করতে পারে এবং সেগুলোর উত্তর দিতে পারে। কিন্তু যে প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে নাই, পরীক্ষার্থীর তা মনোনয়ন বা পছন্দ করার স্বাধীনতা নাই। পরীক্ষার্থী বিকল্পের মধ্যে পছন্দ করতে পারে। মানুষের জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি অপরিবর্তনীয় ঘটনা, এগুলো অবশ্যই ঘটে, তার অন্যথা নাই। আবার অনেক বিকল্প আছে, যেখানে মানুষ ইচ্ছামত পছন্দ করতে পারে কিন্তু বিকল্পের বাইরে কিছু করতে পারে না। এই

বিকল্পগুলো বিভিন্ন প্রকারের সম্ভাবনা, এরমধ্যে পছন্দের উপর শেষ ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে। অদৃষ্টে যা লিখা আছে তার খণ্ডন নাই, তার অর্থ এই নয় যে পরম বিচারক আল্লাহ্ কারো জন্য তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এক পথ অবলম্বন করেন এবং কারো জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন। অর্থাৎ মানুষের কার্যে দিক লক্ষ্য না করেই তিনি কারো জন্য বেহেশত এবং কারো জন্য দোজখ ঠিক করে রেখেছেন। বেহেশত, দোজখ, ভাল-মন্দ, মংগল-অমংগল, কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি মানুষ সম্ভাবনামূলক বিকল্পের স্বাধীনভাবে পছন্দ করা ও কার্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে নিজেই সৃষ্টি করে। চিরন্তন ও পরিবর্তনহীন সম্ভাবনাগুলো যেমন মানুষের জীবনে অনিবার্যরূপে অবশ্য ঘটে তেমন পরিবর্তনশীল সম্ভাবনামূলক বিকল্পগুলো মানুষের নিজের পছন্দ ও ইচ্ছামত বাস্তবায়িত করে। অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত কিন্তু পরিবর্তনীয় নিয়মের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তকদীর হাকিকী বা নিয়তিলিপির অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসারে মানুষ যে ক্ষমতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রভুত্ব ইত্যাদির পরিমাণ পেয়েছে, সেই অনুসারে তার জন্ম ও মৃত্যু নির্বাচিত হয়েছে। মানুষ এই তকদীর হাকিকীলিপি অনুযায়ী নিজ স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সম্ভাব্য বিকল্পের পছন্দ বা মনোনয়নের মাধ্যমে তকদীর মালিকীর কার্য তালিকা প্রস্তুত করে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ তকদীর লিপির অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুযায়ী কার্য করে অর্থাৎ প্রদত্ত গুণের অনুপাতে সে কার্য করে। সুতরাং তকদীর হাকিকী অনুযায়ী মানুষ কার্য করে; কিন্তু মানুষ নিজের তকদীর মালিকী সূত্রে নিজের ভাগ্যলিপি নিজেই প্রস্তুত করে। এই উভয় তকদীরলিপি মানুষের সৃষ্টির বহু পূর্ব হতেই আল্লাহ্র জ্ঞান আছে, মানুষের কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ পূর্ব-জ্ঞানেই মানুষের তকদীরলিপি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর সে কারণে কোরানে বলা হয়েছে, "যে বিপদ-আপদ দুনিয়ায় বা তোমাদের উপর নেমে আসে, তা সমস্তই ঘটনা ঘটার পূর্বেই একটি দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে। এটা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সহজ।

যাকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না (কোরান ৩৯ : ৩৬)। এ কথার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট

করেন, কারণ অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন "যারা আল্লাহ্‌র বাণীতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্‌ তাদের পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি নির্ধারিত। পাপীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন না" (২ : ২৬ কোরান), অত্যাচারীদের তিনি পথভ্রষ্ট করেন (১৪ : ১৯ কোরান)। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধাচারী বা বিপরীতধর্মী নয় এবং তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসক নন। প্রকৃতির মধ্যে সবকিছু কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারে ঘটে। সৎ কার্যের ফলে 'পথপ্রাপ্ত হওয়া' এবং অসৎ কার্যের ফলে পথভ্রষ্ট হওয়া' বিধির বিধান। এইজন্য বলা হয় আল্লাহ্‌ পথ-প্রদর্শন করেন ও পথভ্রষ্ট করেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝান যায়। একজন মানুষের একটি কলম দিয়ে লিখা দেখে অন্য একজন মানুষ বলে যে, কলমই লিখে। অন্য একজন মানুষ এর উত্তরে বলে যে, কলম নয় বরং মানুষের হাতই লিখে। কারণ কলমটির কোন শক্তি নাই। এটা মানুষের হাত দ্বারা পরিচালিত হয়। তৃতীয় ব্যক্তি এর উত্তরে বলে যে, মানুষের হাতের কোন শক্তি নাই। অতএব হাত কখনও লিখতে পারেনা। মানুষের মন বা ইচ্ছা যদি হাতকে পরিচালনা করে তবে হাত ও কলম কখনও লিখতে পারেনা। সুতরাং মানুষের মন বা ইচ্ছাই লিখে। চতুর্থ ব্যক্তি এর উত্তরে বলে যে ইচ্ছা নয় বরং মানুষের জ্ঞানই সম্ভাব্য বিকল্প শব্দ সমষ্টির মধ্য হতে সঠিক শব্দ পছন্দ বা মনোনয়নের মধ্য দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানব ইচ্ছাকে লিখতে সাহায্য করে। চতুর্থ ব্যক্তির মতে মানুষের জ্ঞান নয় বরং মানুষের মন ও জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ মানব মন ও জ্ঞানকে তদনুরূপ পরিবর্তন করে, ইচ্ছার সৃষ্টি করে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের হাত কলম দিয়ে লিখে। এইজন্য পরোক্ষভাবে বলা যায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সকল কার্য সংশোধিত হয় এবং তিনি পথপ্রদর্শন করেন এবং পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীতও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ক্ষমতা ও সৃষ্টি বিধান অনুযায়ী মানুষের মনে জ্ঞান ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয় এবং তারই ফলে মানুষ হাত দিয়ে লিখে। মানুষের ভাগ্যে যা ঘটে তা তার কার্যের ফলাফল স্বরূপই বটে। এরমধ্যে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না। মানুষের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ শক্তি। যে ব্যক্তিকে যে পরিমাণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে তার সেই পরিমাণ জ্ঞান

বলে কার্য করার শক্তি আছে। এবং সেই জ্ঞান অনুপাতে তার ততটুকু দায়িত্ব আছে। জ্ঞানই মানুষের আত্ম উন্নতির সম্বল। আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার করে পরম জ্ঞানলাভ করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে জ্ঞানবলে কার্য করাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। জ্ঞানের বিকাশ বা উন্নতিতে মানুষের উন্নতি হয়, অবিকাশে মানুষের অধঃগতি হয়। জ্ঞানের প্রধান উপকরণ স্বাধীন চিন্তা বা মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ ঘড়ির কাঁটার মত যান্ত্রিক নিয়মে চলতে থাকে ও মানুষের অধঃপতন অনিবার্য হয়। যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য তা জাতির ক্ষেত্রেও সত্য। মানুষের স্বাধীন চিন্তা না থাকলে যেমন তার আত্মোন্নতি হয় না, স্বাধীন চিন্তা না থাকলে কোন জাতিও স্বাধীন হতে পারে না। সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবে জ্ঞানবলে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নিরূপণ করে। মানুষ যদি তার ভাগ্য সমবেত শক্তি দ্বারা প্রস্তুত না করে বা পরিবর্তন না করে তবে অধঃপতন অনিবার্য। এই কারণেই কোরানে বলা হয়েছে: 'আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সে-জাতি নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে। মানুষের নিজের ভাগ্য এবং জাতির ভাগ্য গঠনের জন্য স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞান অপরিহার্য।

ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মন্দ, অকল্যাণ, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, বাধা ইত্যাদি না থাকলে ভাল, কল্যাণ, সুখ, মঙ্গল, সৌভাগ্য ইত্যাদি অর্থহীন হতো, কারণ সেগুলো অবিরত জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা জয় করে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ মানবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে পরম প্রভু মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়। স্বাধীন চিন্তায় যে জ্ঞান জন্মে তা অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত হয়। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা যা পাওয়া যায় তা নিজস্ব ও অপরিহার্য। স্বাধীন জ্ঞান বিবর্জিত বিশ্বাস মানুষের বিবেককে পংগু করে রাখে, বুদ্ধিবৃত্তি খর্ব করে। তবে মনে রাখতে হবে যে মানুষের শক্তি যেমন সীমাবদ্ধ, ইচ্ছাও তেমন সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন, মানুষ ইচ্ছা করলেই সব কিছু করতে পারে না, আল্লাহ্র ইচ্ছাই একমাত্র কার্যকরী শক্তি। কিন্তু তবুও আল্লাহ্ মানুষকে মনোনয়ন বা পছন্দ করার ক্ষমতা দান করেছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার করা যায়। ধরা যাক, একটি গরুকে ঘাস

খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ একখানা দড়ি দিয়ে মাঠে একটি খুঁটার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। গরুটি খুঁটার চারপাশে স্বাধীনভাবে ঘুরে দড়ির দৈর্ঘ্য পরিমাণ জমি হতে ঘাস খেয়ে ক্ষুধা মিটাতে পারে, কিন্তু দড়ির সীমা অতিক্রম করতে পারে না। গরুটি যদি ঘাস না খেয়ে কেবলমাত্র শুয়ে থাকে তবে ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করবে। গরু নিজ ইচ্ছায় ঘাস খেতে পারে বা না খেতেও পারে। দীর্ঘ দড়ি দ্বারা আবদ্ধ গরুটি সীমাবদ্ধ স্থানে চলাফেরা করে ঘাস খেতে পারে, কিন্তু সীমার বাইরেগিয়ে চলাফেরা করার বা ঘাস খাওয়ার শক্তি গরুর নাই। মানুষের স্বাধীনতাও অনেকটা একই রকম। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন যাতে সে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সৎ-অসৎ ইত্যাদি বুঝতে পারে। ঐশী বিধান অনুসারে জীবনের আদর্শ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে ও নিজে পরম শান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত নয় কিংবা স্বাধীন নয়, মানুষের ইচ্ছা স্বনিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। আল্লাহ প্রদত্ত যে ক্ষমতা, বুদ্ধি জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা মানুষের আছে তার ভিতর তার স্বাধীনতাও আছে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার ভিতরই মানুষ নিজের ভাগ্য প্রস্তুত করে। দড়িতে বাঁধা গরুটির স্বাধীনতা অপেক্ষা মানুষের স্বাধীনতা অধিক নয়। দীর্ঘ দড়ির সীমিত পরিমাণ স্থানে চলাফেরা ও ঘাস খাওয়ার অধিকার যেমন গরুর আছে, সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা প্রদর্শনের অধিকারও মানুষের আছে। মানুষের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে, সে নিজেই নিজের ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জাবারীয়াদের নিয়ন্ত্রণবাদ এবং কাদেরীয় ও মুতাজিলাদের স্বাতন্ত্র্যবাদ দুইটি পরস্পর বিরোধী চরম মতবাদ। স্বনিয়ন্ত্রণবাদই মধ্যপন্থী মতবাদ এবং ইসলাম এই মতবাদই সমর্থন করে এবং জালালউদ্দীন রুমী সে-কথা সমর্থন করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকরী শক্তি ও পরোক্ষভাবে কর্মকর্তা এবং এইজন্যই বলতে হয় যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সকল কার্য পরিচালিত হয়। বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে আশারীয়দের অর্জনবাদ, আল-গাজ্জালীর নিয়ন্ত্রণমূলক অর্জনবাদ ও রুমীর সুনিয়ন্ত্রণমূলক স্বাতন্ত্র্যবাদ স্বীকার না করে উপায় নাই।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই

সমগ্র বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই উদ্দেশ্য প্রকৃতির এক নিয়ম হতেই বোঝা যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একই নিয়ম চালাচ্ছেন। এই বিশ্ব শৃঙ্খলার ভিতর এই শৃঙ্খলা বর্তমান। একই নিয়ম অনুসারে সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। সৃষ্টির একই নিয়ম হতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য আংশিকভাবে বোঝা যায়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব সৃষ্টি ও তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দানের উদ্দেশ্য আছে। যা দর্শন ও ধর্মালোচনা দ্বারা বোঝা যায় তা এই যে বাহ্যিক সমগ্র সৃষ্টি মানুষের সুখ-সম্ভোগের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং মানুষও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার দ্বারা প্রকৃতিকে অনেকাংশে নিজের আয়ত্তাধীনে নিয়ে এসেছে। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁরই প্রেম ও প্রীতি অর্জন করার জন্য মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের লক্ষ্য হবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে তাঁরই প্রেম ও প্রীতি অর্জন করতে নিয়োগ করা এবং তাঁরই জন্য সকল কার্য সম্পাদন করা। মানবাত্মা এটা দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জন করে। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভই মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের পূর্ণ উন্নতির সীমা স্রষ্টার সংযোগ ও সান্নিধ্যে বসবাস ও তাঁরই প্রেম ও প্রীতি অর্জন করে তৃপ্তি লাভ করা। আগুনের গতি যেমন ঊর্ধ্ব দিকে, আত্মার গতিও ঊর্ধ্বদিকে। আত্মা পরমাত্মা হতে আগত আধ্যাত্মিক বস্তু, পরমাত্মাতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আত্মা স্থির থাকতে পারে না। প্রত্যাবর্তন নৈতিক গুণ অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা মানুষ নৈতিক দোষ-গুণ অনুসন্ধান করে সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাল-মন্দ, বেহেশত-দোজখ পার্থক্য করে সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করে তৃপ্তি লাভ করে। নৈতিক গুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ শক্তিশালী হয়, পরম ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অনুরূপ শক্তিতে শক্তিশালী হয়, পরম শক্তিশালীর শক্তি হৃদয়ঙ্গম করে এবং শক্তির আধার হতে শক্তি অর্জন করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি লাভের সার্থকতা সাধন করে মনুষ্যত্বের চরম সীমায় পৌঁছায়। স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিকে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র জ্ঞানার্জনের, প্রেম প্রীতি অর্জন, প্রাকৃতিক রহস্যের জ্ঞানলাভের জন্য নিয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবাত্মার পূর্ণ উন্নতি

হয় না। মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে বলেই আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। এই ইচ্ছাশক্তির বলেই মানুষ পশুত্বকে বর্জন করে পরমাত্মার গুণে গুণান্বিত হতে পারে, পরম সুন্দরের অনুরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে, পরম জ্ঞানীর পরিচয় লাভ করতে পারে ও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চিরসত্যের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই সীমান্তে উপস্থিত হওয়া মানুষের পরম সৌভাগ্য, এটাই মানুষের বেহেশত। ইচ্ছার স্বাধীনতা পরমাত্মাতে পৌছানোর বা পরমাত্মার গুণে গুণান্বিত হওয়ার সরল পথ। স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় কার্য করে, মানুষের উদ্দেশ্য মহৎ হলে সে সকল কার্য ধর্মকার্যে রূপান্তরিত হয় এবং প্রেমময় আল্লাহ্ তখন তাকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসলে তখন আল্লাহ্ তার চোখ হয়, যা দিয়ে সে দেখে, জিহ্বা হয় যা দিয়ে সে কথা বলে, হাত হয় যা দিয়ে সে কাজ করে, পা হয় যা দিয়ে সে চলে। মোটকথা মানুষ তখন আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তির বলেই স্বাধীন ইচ্ছার পূর্ণ অধিকারী হয় এবং তখন সে আর স্বাধীন কি নিয়ন্ত্রণাধীন, এ প্রশ্ন করে না। মানুষের স্বনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি আত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করে ও আত্মাকে পরমাত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সর্বকার্য করতে প্রেরণা যোগায়।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার আল্লাহ্র দিকে ফিরে আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি, আত্মিক উন্নতির তাগিদেই অবলম্বন করতে হয়। বন্ধন হতে মুক্তি, জড় হতে আত্মা, অন্ধকার হতে আলো, শব্দ হতে গূঢ়ার্থে উন্নয়ন ও উত্তরণই রুমীর মসনবীর উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা আত্মশুদ্ধির উপায় নয়, কর্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সৎ পথে নিজেকে পরিচালনা দ্বারা মানুষকে তার উত্তম নিয়তির উপযুক্ত হতে হয়। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সাথে যখন প্রেম শক্তির যোগ হয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয়।

মানুষ সহ জড়জীব নির্বিশেষে, বিশ্বের সকল বস্তুর নিয়তিই তার অন্তর্নিহিত প্রবণতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু একমাত্র মানুষকেই স্রষ্টা তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। ফলে তাঁর নিয়তির সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হতে চরম পতন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। স্বাধীন কর্মের দ্বারা সে

যেমন ফেরেশতারও ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম, তেমনি পশুর অধম ভাগ্য লাভ করাও তারই কৃতকর্মের ফল। মানুষ তার নিয়তির সম্ভাবনাকে না জানা পর্যন্ত স্বীয় ইচ্ছার স্বাধীনতার সৎ-ব্যবহার করতে পূর্ণরূপে সক্ষম হয় না। মানব নিয়তির সম্ভাবনার সফলতা ও তার বিফলতা নির্ভর করে কর্মলব্ধ কোন মনোভাব নিয়ে প্রশ্নটির সমাধান করতে চাওয়া হয় তার উপর। প্রেম দ্বারা পরিচালিত কার্যের মধ্যে কার্যের স্বাধীনতা উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ প্রেমপাত্র দ্বারা আদিষ্ট হলেও প্রেমের চালক শক্তি মানুষেরই স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। প্রেমিকের আত্মহারা অবস্থা স্বাধীন সত্তারই বিবর্তিত হওয়ার মহৎ প্রয়াস। মানুষের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রত্যেক মানুষই নিজকে সৃষ্টি করার আনন্দ লাভ করতে চায়, এই আনন্দ জীবনের অমৃতফল। নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার স্থিতি আকাঙ্ক্ষার এই মুক্তিতেই আত্মগোপন করে আছে।

রুমী নিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের একটি সহজ সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌কে সকল কার্যের নিয়ন্তা বলে নির্দেশ করলেও স্বীকার করেছেন যে মানুষকে আল্লাহ্ কতকগুলো কার্যের সম্পাদন শক্তি (এখতিয়ার) দান করেও তার সীমার ভিতর মানুষ নিজের কর্মপন্থা নিজেই নির্ধারণ করে। এইসকল কার্যের কর্মফলের জন্য মানুষই দায়ী, এইসকল কার্য করা বা না করা তারই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যদিও কর্ম-সম্পাদন শক্তি ও কর্মক্ষেত্র আল্লাহ্‌ই মানুষকে প্রদান করেছেন।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হয় যে, উচ্চতর জীবন উন্নত হলে মানুষের নিকট নিয়ন্ত্রণ ও স্বাতন্ত্র্য এক হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র প্রেম লাভ করাই তার প্রধান কর্তব্য হয়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যখন পরম ইচ্ছাশক্তির উপর সমর্পিত হয় তখন কোন বিরোধ থাকে না। মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়েও স্বাধীন হয়।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, বিশ্বে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হোক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জীব হিসাবে মানুষ সে মহিমার সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর প্রশংসা গানে নিজেকে সিক্ত ও অভিসিক্ত করুক। বিশ্বের প্রতিটি জিনিসকে তাঁর ভালবাসার দান হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর প্রেমাসিক্ত অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করুক। বিশ্বের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, এমন কোন বস্তু নাই যা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে না। সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ম মেনে চলে। আল্লাহ্‌র

সার্বভৌমত্ব মেনে চলাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম, বিশ্বের নিয়ম আল্লাহ্‌র নিয়ম ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, এক হিসাবে সে অপরিসীম শক্তির আধার। সে শ্রেষ্ঠ সে আল্লাহ্‌র 'আমানত' বহনকারী জীব। আল্লাহ্ বলেন আমার 'আমানত' বহনের জন্য আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, সকলেই তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভীত হয়েছিল কিন্তু মানুষ তা বহন করেছে। আল্লাহ্‌র 'আমানত' বহনের দায়িত্ব ও গৌরব মানুষের আছে বলেই মানুষ স্বাধীন এবং প্রকৃতির মধ্যে অধিকতর শক্তিমান সত্তা জীব ও অন্যান্য সব কিছুর উপর মানুষ প্রভুত্ব করতে পারে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তির উপর ছেড়ে দিতে হয় এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে হয়। মানুষ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে যে কর্ম সম্পাদন করে তা তার অর্জিত ও স্বেচ্ছায় গৃহীত। সে তার কর্মের জন্য ফল পায়, সৎ কর্মের দ্বারা সে অমরত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন হতে অপরিবর্তন, রূপ হতে অপরূপ, নিত্য হতে অনিত্য, অসত্য হতে সত্য, অমঙ্গল হতে মঙ্গল সন্ধান করে বৃহৎ হতে বৃহত্তর, মহৎ হতে মহত্তর, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্র এক পরম সত্তার উপস্থিতি অনুধাবন করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে এবং মানব জীবন সার্থক করতে পারে।

মানুষের কর্ম যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাধিত হয়, তখন সে কর্ম আল্লাহ্‌র সাহায্যে সমাধা হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মনিয়োজিত ব্যক্তির সকল কর্ম তখন আল্লাহ্‌র কর্ম বলে গণ্য হয় এবং সেই ব্যক্তি তখন অন্তহীন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির আধার হয়। মানুষ অপরিসীম শান্তি ও আরাম লাভ করে, আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ের ও ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ পরিচালক হন। মানুষ সীমাবদ্ধ, জীবনের মেয়াদ সীমাবদ্ধ, শক্তি সীমাবদ্ধ। ভাল-মন্দ কর্মক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির অধিকারী সে। যে শক্তি তাকে দেওয়া হয়েছে, তার অধিক সে কিছু করতে পারে না, সে তার সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে সৎ উপদেশ, সৎ আলাপ, সৎ প্রবৃত্তি, সৎ স্বভাব, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবন যাপন করে অসীম ইচ্ছার শক্তির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

হতে পারে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয় বলে তার পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয়। ঐশী প্রেম হৃদয়ে না থাকলে শুধু ইচ্ছা দ্বারা কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

সিদ্ধান্তে এ কথা বলা যায় যে মানুষ ও তার ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। অর্জন শক্তির পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ্ মানুষকে বাধ্য করে না, এ বিষয়ে তিনি মানুষকে সীমাবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। এই শক্তির সদ্ব্যবহার করে পুণ্য অর্জন করতে পারে, আবার তার অপব্যবহার করে পাপ অর্জন করতে পারে। মানুষ পূর্ণ সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নয়, আবার তার ইচ্ছাশক্তিহীন অচল জড় পদার্থও নয়। ইচ্ছা ও কর্মশক্তি পরিচালনা করে মানুষ তার নিজের ভাগ্য গড়তে সক্ষম। মানুষের অবস্থা অনেকটা পুকুরে ছাড়ামাছ বা গলায় দড়ি বাঁধা গরুর মত। মাছ বা গরুর চলাফেরা করার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। সীমার বাইরে যাওয়ার অধিকার তাদের নাই। সীমানার মধ্যে নড়ে চড়ে খেলা করে, খাদ্য সংগ্রহ করে ও বিশ্রাম গ্রহণ করে নির্ধারিত পরিমাণমত বড় হতে পারে ও আনন্দলাভ করতে পারে। সীমার বাইরে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তারজন্য তারা দায়ী নয়। মানুষ ঠিক তেমনি। আল্লাহ্র সাহায্য কর্ম-প্রচেষ্টার সাথে সাথে লাভ হয়, কর্ম-অনুষ্ঠানের আগেই তা আসে না; যেমন জাবারীয়াদের ধারণা, আবার কর্ম-অনুষ্ঠানের পরেও তা আসে না; যেমন কাদেরীয়াদের বিশ্বাস। উভয় ধারণাই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। ঐশী সাহায্যের রূপ ও প্রকৃতি এক নয়। স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ভয়-ভক্তি, পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা দ্বারা সৎ-কর্মের জন্য সাহায্য প্রার্থনা আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন। মানুষ তখন স্বনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অর্থ স্পষ্ট করে বুঝতে সক্ষম হয়। বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই বলেই উল্লেখ করতে হয়। আল্লাহ্র মঙ্গলময়ত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্ম-সমর্পণ মানুষকে উন্নত করে হৃদয়ে প্রেমের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে, ইহার স্বাধীনতা আছে কি নাই এই সমস্যাজনিত অশান্ত মনকে শান্ত করে।

দশম অধ্যায়

রুমীর দর্শনে পূর্ণমানব

পূর্ণমানব (ইনসান-উল-কামেল)

অন্যান্য সকল শ্রেষ্ঠ সুফীদের মত জালালউদ্দীন রুমী বলেন যে, মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সংক্ষিপ্তসার। দৈহিক বিচারে মানুষ ক্ষুদ্র বিশ্ব, কিন্তু আত্মিক বিচারে সে সমগ্র বিশ্বজগতেরও অধিক তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে। বিশ্বজগতের মধ্যে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন আর মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন ও উপলব্ধি করেন। 'ইনসান-উল-কামেল' বা মানব একটি আদর্শ এবং এই আদর্শে পৌঁছানোর জন্য সমগ্র সৃষ্টি আপ্রাণ চেষ্টা করে। সমগ্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মানুষ সৃষ্টি, আর সে কারণে বলা হয় মানুষ সৃষ্টির আদি কারণ। যদিও পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব সর্বশেষে হয়েছে তবুও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের অধীন করেছেন। সময়ের বিচারে গাছই বীজের কারণ, কিন্তু মূলতঃ বীজই গাছের আদি কারণ।[১] মানবাত্মা মূলতঃ ঐশী সত্তা। এই পৃথিবীতে আসার পর আত্মা দেহ দ্বারা আবৃত ও সীমাবদ্ধ হয়েছে, সে পুনরায় পূর্ব-অবস্থায় ফিরে যেতে চায় এবং ফিরে যাওয়ার এই আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ অতি প্রবল।

সুফী দর্শনের মধ্যে মানবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি দেখা যায়। সুফীদের মতে মানুষ কিছুই না, আবার মানুষই সবকিছু। হাল্লাজ মনসুর ও বায়েজিদের মতো মানবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতায় বিশ্বাসী সুফীরা বিশেষ বিশেষ সময়ে বলেন যে, মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও তার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। তাঁদের মতে মানবাত্মার দুইটি রূপ আছে:[২] একরূপে সে অস্তিত্বহীন, অন্যরূপে সে অস্তিত্বশীল। তাঁরা যখন মানবাত্মাকে অস্তিত্বহীন অথবা অস্তিত্বশীল বলেন তখন তাঁরা আত্মার যে কোন একটি রূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দুইটি রূপকে ব্যাখ্যা করার জন্যে

১. Mathnawi IV, 521-524, Mathnawi. IV, 526., 530, 3766-3767, 809.
২. Mathnawi I, 1375.

সুফী পরিভাষায় 'নফস' ও 'রূহ' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'নফস' শব্দ দিয়ে সাধারণতঃ আত্মা বা জীব-আত্মা ও 'রূহ' শব্দ দিয়ে ঐশী আত্মাকে বোঝান হয়।[১] মানুষের মধ্যে এই 'নফস' ও 'রূহের' সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং মানুষ ঐ দুইটির সমন্বয়। কোরানে 'নফস' শব্দ দিয়ে আত্মার বিভিন্ন রূপ বা অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন 'নফস-ই আম্মারা'[২] বা মন্দ কাজে আকৃষ্ট আত্মা, 'নফস-ই লাওয়ামা'[৩] বা অনুতপ্ত আত্মা এবং 'নফস-ই মুত-মাইন্না'[৪] বা পরিতুষ্ট আত্মা। এই তিনটি শব্দ আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহৃত হয় আত্মার বিভিন্ন অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য। যখন কেবলমাত্র 'নফস' শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন আত্মাকে বোঝায়, যেমন 'তোমার আত্মাকে ধ্বংস করো না'। এমন কি নিম্নপর্যায়ে নেমে আসার পরও এই শব্দের সাথে কিছু শব্দ যোগ করে সর্বোচ্চ আত্মাকে বোঝানো হয়; যেমন 'নফস-ই কুল' বা সার্বিক আত্মা। 'নফস-ই কুল' বা সার্বিক আত্মার ধারণা সুফীবাদের মধ্যে নব্য প্লেটোবাদীদের ও স্টোয়িকদের কাছ থেকে এসেছে। এর সাথে অবশ্য আরো একটি শব্দ দেখা যায় যেমন 'আকল-ই কুল' বা সার্বিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। 'রূহ' শব্দের সাথে কোন শব্দ যোগ না করলে যে অর্থ প্রকাশ পায়, তা কোরানের মতে, ঐশী আত্মা বা মানবাত্মা।

সুফীবাদের পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুরু হওয়ার সময় হতে 'নফস' ও 'রূহ' এই শব্দ দুইটি সত্তাকে বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া সুফী-বাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞানে 'কালব' বা হৃদয় বা অন্তর, 'সির্‌র্' বা আভ্যন্তরীণ গুপ্ত চেতনারূপী আত্মা বা ঐশী চেতনা শক্তিসম্পন্ন আত্মা 'খফী' বা ঐশী রহস্যময় চেতনারূপী আত্মা' 'আখফা' বা ঐশী পরম রহস্য-ময়, চেতনারূপী গুপ্তআত্মা ব্যবহৃত হয়। এইগুলো একই আত্মার বিভক্ত অবস্থা মাত্র। অবশ্য ফারসী মরমী সাহিত্যে 'জান'[৫] শব্দ দিয়ে 'জীবন ও আত্মা বা ঐশী আত্মাকে বোঝানো হয়। তাছাড়া অনেক সময় সুফী-

১. Mathnawi II, 3311.
২. কোরান ১২ : ৫৩।
৩. কোরান ৭৫ : ২।
৪. কোরান ৭৯ : ২৭—২৮।
৫. Mathnawi I, 1598. Mathnawi II, 3253.

দর্শনে 'রূহ' শব্দ দিয়ে মানুষের সাধারণ গুণও বোঝানো হয়। যেমন 'রূহ-ই হাওয়ানী' বা পশু-আত্মা, জৈবিক আত্মা, জীবাত্মা, 'রূহ-ই আকলী' বা প্রজ্ঞাবান আত্মা এবং 'রূহ ই নবী' বা নবীর আত্মা।[১] গ্রীক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে শেষোক্ত শব্দ অর্থাৎ 'রূহ-ই নবী' বা নবীর আত্মা বলে কোন শব্দ দেখা যায় না। এ ব্যাপারে ইসলামী আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান গ্রীক মনোবিজ্ঞানের চেয়ে এক ধাপ উচ্চস্তরের মনোবিজ্ঞান বলে মনে হয়।

সুফীবাদের মধ্যে সাধারণতঃ 'নফস' ও 'রূহ' এই দুইটি শব্দ দিয়ে মানুষের অসৎ আত্মা ও সৎ আত্মাকে বোঝানো হয়। 'নফস' সকল মন্দ কাজের উৎস; যেমন 'রূহ' সকল সৎকার্যের উৎস। সুফীদের সাধারণ বিশ্বাস যে 'নফস' 'আলম-ই-খালক' বা সৃষ্ট জগতের বস্তু এবং রূহ আলম-ই আমর বা ঐশী জগত বা ইচ্ছা জগতের বস্তু। 'নফস' জীবাত্মা এবং 'রূহ' পরমাত্মা। মানুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংমিশ্রণ। সুফীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পরম সত্যের প্রতি অনুরাগ ও সৎনীতি অনুশীলনের ফলে অসৎ বা মন্দ আত্মা রূপান্তরিত হয়ে সৎ আত্মায় পরিণত হয়। অন্যকথায় 'মোজাহেদা' বা আত্মিক অনুশীলন, 'মোশাহেদা' বা অন্তরের মাঝে ঐশী সত্তার প্রত্যক্ষণে পৌঁছিয়ে দেয়, মানবাত্মা ক্ষণিকের জন্য ঐশী আত্মার গুণে গুণান্বিত হলে পরমাত্মা মানবাত্মায় প্রতিভাত হয় এবং মানবাত্মা ক্ষণিকের জন্য হলেও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এই বিশ্বাসই সুফীবাদের মধ্যে পূর্ণমানবের ধারণা সৃষ্টি করেছে। সুফীদের বিশ্বাস যে মানুষ ঐশী গুণে গুণান্বিত হলে সাময়িকভাবে পূর্ণতা লাভ করে এবং সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষকে পূর্ণ মানব, আদর্শ মানব বা 'ইনসান-উল-কামেল' বলে।[২] পূর্ণ-মানব বা আদর্শ মানবের ধারণা পরমাত্মা বা মানবাত্মা সম্পর্কে ধারণা করতে এবং বাস্তব জীবনে সে নিয়ম অনুসারে কাজ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। রাজনীতির দিক হতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ মতবাদ ইমাম মতবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইমামকে যেমন এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়, পূর্ণ মানবও তেমনি এখানে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাছাড়া সুফীদের 'কুতুব' বা সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী ব্যক্তি হিসাবে পূর্ণ মানবকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়।

---

১. Mathnawi II, 3258, Mathnawi IV, 1887.

২. Dr. R.A Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1967. pp. 77-142.

মানুষ মূলতঃ ঐশী সত্তার অধিকারী এবং তার মধ্যে ঐশী আত্মা প্রদান করা হয়েছে। মানবাত্মা মূলতঃ পরমাত্মার মত। যেহেতু এই জীবনে সাধনার দ্বারা মানবাত্মার মাঝে পরমাত্মার বা ঐশী আত্মার গুণ অর্জনের দ্বারা পরমাত্মার মত হওয়া সম্ভব, সেহেতু বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে বলা যায় যে মানবাত্মা পরমআত্মার মতই অসীম শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়। সুফীবাদের মধ্যে আদর্শ মানবের ধারণাই নবীকে বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি হিসাবে এবং ইমাম ও মাহদীকে পরমাত্মা হিসাবে গণ্য করার জন্য দায়ী। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বকে সুফীবাদের মধ্যে সত্য বলে স্বীকার করা হয় না, সেহেতু আদর্শ মানবের অস্তিত্বকে পরমাত্মার অস্তিত্ব বলে স্বীকার করতে হয়; কারণ আদর্শ মানব আত্মার সত্তা হতে সত্তাবান, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরই তাঁর ইচ্ছা নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌র দয়ার উপরে তাঁর কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, দেখাশোনা নির্ভর করে। সুফীবাদের আদর্শ মানবের ধারণা স্টোয়িকদের 'সাধু'র ধারণার অনুরূপ। যেমন সাধুর আত্মা পরমাত্মার প্রতীক, তার দেহ অমঙ্গলের প্রতীক, তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র সিংহাসন, তাঁর বুদ্ধি ভাগ্যলিপি লেখনী, তাঁর আত্মা 'লাওহে মাহ্‌ফুজ' বা ভাগ্যলিপি ও জ্ঞানের পরম উৎস। তাঁর সৎচিন্তা এবং অসৎচিন্তা ও সন্দেহ যথাক্রমে ফেরেস্তা, অসৎ আত্মা ও শয়তানের প্রতীক। এই বিশ্বতাত্ত্বিক মানব সকল কিছুর মূল আদর্শ। এই পূর্ণ মানবই ইহজগত ও পরজগতের একমাত্র পরিচালক, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কেউ নাই যার ভয়ে তিনি ভীত হতে পারেন অথবা যার নিকট হতে কোন সাহায্য পেতে পারেন। ইহকাল ও পরকাল এই আদর্শ মানবেরই প্রকাশমাত্র। হাল্লাজ ও বায়েজিদ-এর সময় হতে পূর্ণমানব সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা হয়। রুমীর আদর্শ মানব সম্পর্কে যে ধারণা তা হাল্লাজ ও বায়েজিদের আদর্শ মানবের ধারণার অনুরূপ। তিনি বলেন পূর্ণমানব আল্লাহ্‌র সত্তায় অস্তিত্ববান হয় বলে আল্লাহ্‌র মত সব কিছু জানতে পারেন এবং সব কাজ করতে পারেন। অবশ্য পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত নিজ আত্মার জ্ঞানলাভ; কারণ আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের 'কুঞ্জী' বা চাবিকাঠি। তিনি বলেন যে আমরা যদি আমাদের আসল প্রকৃতি জানতে পারি তবে আমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জানতে পারব।

পবিত্র কোরানে যীশুখ্রীস্টকে আল্লাহ্‌র-আত্মা (রুহ-আল্লাহ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একহার্টের মত রুমীও বলেন যে যীশুখ্রীস্টের আত্মা অন্যান্য জীবের মধ্যে বিশেষ করে মানবের মধ্যে পুনরাবির্ভাব ঘটে। তিনি বলেন যে প্রত্যেক আত্মাই যীশুখ্রীস্টের মত প্রাণদানকারী শক্তির অধিকারী, এক সময় আত্মাই ক্ষত স্বরূপ, অন্য সময় সেই আত্মাই ক্ষত নিরাময়ের ঔষধ। যদি আত্মা হতে আবরণ উন্মোচন করা হয় তবে প্রত্যেক আত্মাই বলবে 'আমি মেশা' বা যীশু খ্রীস্ট'।[১]

জালালউদ্দীন রুমীর মতে মানবের অন্তরের অন্তস্থল হতে যে ঐশী জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তা দিয়ে মানব সকল কিছুর অন্তর্নিহিত সত্যকে জানতে পারে। আর যে জ্ঞান আত্মা হতে উৎপত্তি হয় তার নাম সূফী পরিভাষায় "ইলম-ই-লাহুন্নী" বা দিব্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎস পঞ্চইন্দ্রিয়ের বাহিক অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি নয়। সে জ্ঞানের উৎস মানবাত্মা: অন্তরথায়, পরমাত্মা বা স্বয়ং আল্লাহ্।[২] সৃষ্টির পরে আল্লাহ্ আদমকে এই জ্ঞান দান করলেন এবং এই জ্ঞানের জন্যই ফেরেস্তাগণ আদমকে সেজদা করেছিলেন। এইজন্য বলা হয় যে পূর্ণমানব আল্লাহ্‌র আলোকেই সবকিছু দেখেন। প্রকৃতপক্ষে দিব্যজ্ঞানের জ্ঞানী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র স্বরূপ জানতে পারেন, অভিজ্ঞতাবাদী, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। ইলম-ই লাহুন্নীকে রুমী 'ইলম-ই-ইন্দি আল্লাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] তিনি বলেন যে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের একটি প্রজ্ঞাতীত ও অতীন্দ্রিয় উৎস আছে যা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাহায্যে উপলব্ধি করে জানা যায়, কোন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অথবা বুদ্ধির সাহায্যে নয়। তাঁর মতে বুদ্ধি দুই প্রকার: (১) অর্জিত বুদ্ধি, যা মানুষ লেখাপড়ার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে ও (২) আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধি। ঐশী বুদ্ধি আল্লাহ্‌র দান। পাপমুক্ত ও নির্মল আত্মা ঐশী বুদ্ধিকে আল্লাহ্‌র নিকট হতে দানস্বরূপ লাভ করেন এবং এর সাহায্যে ইহজগৎ ও পর-জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছুর প্রকৃত রহস্য জানতে পারেন। যে ব্যক্তির অন্তর্চক্ষুর পর্দা উন্মোচিত হয়েছে সে ব্যক্তি প্রতি-অণু-পরমাণুর মধ্যে

১. Mathnawi I, 1598-1599.
২. Mathnawi I, 1062.
৩. Mathnawi IV. 3400, Mathnawi I, 1246, Mathnawi IV, 1960, 1964.

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারেন। এই জ্ঞানলাভের উপায় আত্মারূপ দর্পণকে পাপরূপ কালিমা হতে পরিষ্কার রাখা। দর্পণ পরিষ্কার থাকলে তবেই ঐশী সত্তা দর্পণে প্রতিফলিত হয়।[১] এই প্রসংগে রুমী বলেন যে, সূফীর গ্রন্থ কালি, কলম ও অক্ষর দিয়ে লিখিত কোন গ্রন্থ নয়, তাঁর গ্রন্থ অলিখিত কাগজের মত বা বরফের মত সাদা।[২] এই গ্রন্থ পবিত্র ও নির্মল আত্মা। যার আত্মা নির্মল ও পবিত্র তিনিই অদৃশ্য সত্তা প্রতিফলনের দর্পণ হতে পারেন। মানুষের আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় সূফীরা 'নবুয়ত', 'ওয়ালিয়াত বা বেলায়েত', 'ওহী' 'প্রত্যাদেশ, 'ইলহাম' বা প্রেরণা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সূফীরা নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে যে মতবাদ বিশ্বাস করেন তা প্রচলিত মতবাদ হতে ভিন্ন ধরনের।[৩] ইসলামে হযরত মুহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করা হয় এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আবির্ভাব ঘটাবে না বলে বিশ্বাস করা হয়। হযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন করে শিক্ষক, ধর্ম সংস্কারক ও ব্যাখ্যাকারীর আবির্ভাব স্বীকার করা হয়, কিন্তু কোন নবীর আবির্ভাব কখন কল্পনা করা হয় না। নবীর কাছে জিব্রাইল ফেরেস্তা মারফত ওহী প্রেরিত হতো, এখন সে-ওহীর দরজা বন্ধ। সূফীরা হযরত মুহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট হতে ওহী চিরতরে বন্ধ হয়েছে এ কথা স্বীকার করেন না।[৪] প্রচলিত ইসলামী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সূফীরা হযরত মুহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করেন। এর সাথে তারা 'ওয়ালিয়াত' মতবাদ প্রবর্তন করে বলে যে হযরত মুহাম্মদের মাঝে দুইটি স্বরূপ আছে: একটি 'নবুয়তের' স্বরূপ এবং অপরটি বেলায়েত বা 'ওয়ালিয়াতের' স্বরূপ অর্থাৎ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ এবং সাধু হিসেবে হযরত মুহাম্মদ। অন্যকথায়, হযরত মুহাম্মদের নবুয়তের স্বরূপ অপেক্ষা ওয়ালিয়াতের স্বরূপ অধিক শ্রেষ্ঠ।[৫] নবুয়তের যেন দুইটি মুখ আছে—একটি

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim : Ibid, p. 99, Mathnawi I, 1246, 1248.
২. Mathnawi II, 159.
৩. Dr. Khalifa Abdul Hakim : Ibid, p. 100.
৪. Ibid, p. 100.
৫. Ibid. p. 101.

মুখ আল্লাহ্‌র দিকে, অন্য মুখটি বিশ্বের দিকে। অপরপক্ষে ওয়ালিয়াতের কেবল মাত্র একটি মুখ আছে এবং সে মুখটি আল্লাহ্‌র দিকে। সূফীদের মতে বিশ্বের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করা পূর্ণমানবের একমাত্র কাম্য। আর এই দিক দিয়ে বিচার করে তাঁরা বলেন যে 'নবুয়ত' অপেক্ষা 'ওয়ালিয়াত' শ্রেষ্ঠ।

শিয়া সম্প্রদায়ের মতে ওয়ালিয়াতের আধ্যাত্মিক ধারা ইমামের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে আবির্ভূত হয় এবং অনেক ইমাম নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য দ্বাদশ ইমামের তিরোধানের পরে ইমামের দরজাও বন্ধ হয়েছে বলে শিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে ইমামের মৃত্যু হয় নাই।[১] বিশ্বে আল্লাহ্‌র রাজত্ব স্থাপনের জন্য যে কোন সময়ে ইমামের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। এই ইমাম সম্পর্কীয় মতবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে আদর্শ মানবকে 'লগস' প্রজ্ঞা, বিশ্বতাত্ত্বিক শক্তি[২] 'বিশ্বে মূল শক্তি' মনে করা হয়েছে। সূফীদের মতে একজন ওলী বা সাধুর মধ্যে একজন নবীর সকল গুণই বর্তমান থাকে। ওলীর কাছে কেবলমাত্র জিব্রাইল মারফত কোন ওহী আসে না এবং তাঁকে কোন নতুন ধর্ম প্রচারের আদেশ দেওয়া হয় না। ওলী ব্যক্তিই সাধু বা আল্লাহ্‌র দোস্ত, নবীদের মত তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে সকল প্রকার দান লাভ করে থাকেন। ওলী ব্যক্তি যে "'কেরামত' বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেন তা আল্লাহ্‌র দান। এই অলৌকিক কার্য 'মোজেজা' নয় কারণ 'মোজেজা' প্রদর্শন শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কার্য করবার ক্ষমতা। এটা নবীগণের নিজস্ব চারিত্রিক শক্তির বৈশিষ্ট্য, যদিও এ শক্তি মূলতঃ আল্লাহ্‌রই দান। শরীয়তপন্থী মুসলমানদের নবী ও ওহী সম্পর্কীয় ধারণার সাথে বিরোধ না বাধে সে জন্য সূফীরা বলেন যে, হযরত মুহম্মদই শেষ নবী এবং নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য যে ওহীর প্রয়োজন তা চিরতরে বন্ধ হয়েছে, তবে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সূফীরা যেসব ওহী বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন তা ইলহাম বা অনুপ্রেরণা 'ওহী-ই-দিল' বা আত্মার অনুপ্রেরণা।[৩] কোরানে উল্লেখ

১. Ibid p. 101.
২. Ibid, p. 101.
৩. Ibid, p. 102.

আছে ওহী বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির নিকট এসেছে এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন (১) স্বর্গ ও মর্ত্য (৪ : ১১, ১২), (২) মৌমাছি (১৬ : ৬৮, ৬৯) ফেরেস্তাগণ (৮ : ১২), (৩) ধার্মিক ব্যক্তিগণ (৫ : ১১৬, ২৮ : ৭), (৪) হযরত মরিয়ম ও নবীগণ (১ : ৪৭) এবং হযরত দাউদ, হযরত মুসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহম্মদের (৪ : ৬৪ ; ৪২ : ১৫) কাছে আল্লাহ্‌র নিকট হতে ওহী এসেছে। কিন্তু প্রথম প্রকার ওহী আপাতদৃষ্টিতে জড় বস্তুর নিকট, দ্বিতীয় প্রকার ওহী মৌমাছির মত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর নিকট, তৃতীয় প্রকার ওহী ফেরেস্তাদের নিকট, চতুর্থ প্রকার ওহী ধার্মিক ব্যক্তিদের উপর, পঞ্চম প্রকার ওহী নবীদের উপর এবং ষষ্ঠ প্রকার ওহী নতুন আইন প্রচলনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ছয় প্রকার ওহী একই প্রকার অর্থ বহন করে না। সুফীরা মনে করেন যে নতুন আইন প্রচারের জন্য যে ওহী আসে তা পরোক্ষভাবে হযরত জিব্রাইল মারফত পাঠানো হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে এই ওহী বা উপদেশ বা অনুপ্রেরণা দান করা হয়।

শরীয়তপন্থী ও সুফীবাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক আল-গাজ্জালী হৃদয়ের অনুপ্রেরণাকে আধ্যাত্মিক ও ঐশী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উৎস হিসাবে গ্রহণ করে এই বিষয়ে অন্যান্য সুফীদের পথ সুগম করে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, নবুয়ত বিশ্বাস করার অর্থ এই স্বীকার করা যে, বুদ্ধির অতীতে মানব এমন একটি স্তর আছে, যেখানে পৌঁছিলে মানবের অন্তর্চক্ষুর পর্দা উন্মোচিত হয় এবং মানব আধ্যাত্মিক ও পরাতাত্ত্বিক বস্তু ও বিষয়ের আসল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে যা মানব বুদ্ধি কোন সময় কল্পনাও করতে পারে না। তিনি বলেন যে, সৃষ্টির সময়ে বিশ্ব জগতের জিনিস সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না। সৃষ্টির পরে সে স্পর্শানুভব, শ্রবণ, আস্বাদন, দর্শন, ইত্যাদি শক্তি লাভ করে এবং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত সকল বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ হওয়ার ফলে সে বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা লাভ করে এবং ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ সম্ভব, অসম্ভব, সত্য-মিথ্যা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়। এরপর সে জ্ঞান রাজ্য হতে স্বতন্ত্র এক রাজ্যে উপনীত হয়। জ্ঞান ও বুদ্ধি

বিবেচনার ক্ষেত্রে যেমন পঞ্চইন্দ্রিয় অসহায় ও দুর্বল, স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক জগতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য মানব বুদ্ধিও তেমনি অর্থহীন অসহায়, দুর্বল ও অকেজো হয়, আর আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের এই অবস্থার নাম তাঁর মতে, নবুয়ত। তাঁর মতে নবুয়তের পারিভাষিক পরিচয় এইভাবে দিতে হয় যে, নবুয়ত ঐ শক্তির নাম যা দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের এমন সব বস্তুর ও সত্তার জ্ঞান লাভ হয় যা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সম্ভব হয় না। নবুয়ত স্বীকার অর্থ বুদ্ধিমূলক জ্ঞানের উর্ধ্বে অবস্থিত মানবাত্মার একটি অবস্থাকে স্বীকার করা। এই অবস্থার উন্নতি হলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনের চোখ বা অন্তর্দৃষ্টির পর্দা উন্মোচিত হয় এবং সে আধ্যাত্মিক স্বরূপ উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ করে।

আল-গাজ্জালী এই বিষয় আলোচনার সময় মুসলিম মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মানব মনের এক উচ্চতর চেতনা বা নবী চেতনার কথা উল্লেখ করেন যা পাশ্চাত্য দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত। মুসলিম ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানে এই নবী সুলভ চেতনা একটি নতুন মতবাদ। তিনি মানব মনের চেতনার বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের উপরের স্তরে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ অবস্থায় বুদ্ধির কার্যকলাপ অদ্ভুত ও অসম্ভব বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়ের কাছে যা অসম্ভব, বুদ্ধির কাছে তা সম্ভব। সেই মত বুদ্ধির অতীতে মানব জ্ঞানের আর একটি স্তর আছে যাকে আধ্যাত্মিক চেতনা বলা যায়। এই চেতনা পরাতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধি হতে অধিক শ্রেষ্ঠতর। তাঁর মতে এই আধ্যাত্মিক চেতনা মানব মনে সহজাত অবস্থায় বিদ্যমান। মানব চেতনা যেমন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অধিকারী তেমনি আধ্যাত্মিক চেতনারও অধিকারী কিন্তু আত্মা পাপরূপ কালিমায় অপরিষ্কার হওয়ার ফলে এই চেতনা সকলের কাছে সব সময় ভালভাবে প্রকাশ পায় না। ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা এই আধ্যাত্মিক চেতনার উপর হতে পর্দা উন্মোচন করে দর্পণের মত নির্মল করে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরম সত্তার প্রতিফলন গ্রহণ ও তাঁর নিকট হতে অনুপ্রেরণা লাভ করা হয়। তিনি ওহী ও অনুপ্রেরণার মধ্যে পার্থক্য করে বলেন যে, ওহী জিব্রাঈল

মারফত নবীর উপর অবতীর্ণ হয় আর, ধার্মিক ব্যক্তি নিজ অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফলে যখন আত্মা ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন মানবাত্মা ঐশী আলোকে অন্তরের অন্তস্থল হতে বাণী লাভ করেন। আর যে জ্ঞান অন্তরের অন্তস্থল হতে উৎপত্তি হয় তাকে 'ইলহাম' বা দিব্যজ্ঞান বলে। নবীদের ওহী লাভের যে শক্তি, তাঁর মতে, তা প্রত্যেক মানবের মধ্যে সহজাত শক্তি হিসাবে বর্তমান আছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ স্তরে এই সহজাত শক্তি বা আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। তাঁর মতে মানুষের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধিমূলক জ্ঞান ও অনুভব শক্তির উর্ধ্বে একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে আধ্যাত্মিক বস্তুর পরিচয় জানার ও স্বরূপ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে। এটাই নবুয়তের প্রাথমিক স্তর।

এই বিশেষ শক্তি অস্বীকারকারীদের ভালভাবে বোঝানোর জন্য আল গাজ্জালী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এক বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তাঁর ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু 'মনের এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধাশক্তি ইত্যাদি বিশ্লেষণগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে তারতম্য অনুসারে প্রদান করা হয়েছে। একজন লোক যথেষ্ট জ্ঞানবান আর একজন তার চেয়ে অধিক জ্ঞানবান এবং অপর এক তৃতীয় ব্যক্তি উপরোক্ত দুইজনের চেয়ে আরো অধিক জ্ঞানী। এইভাবে সর্বোচ্চ জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বারা যখন তার জ্ঞানের অনুরূপ কোন কার্যের বিকাশ হতে দেখা যায়, তখন সাধারণ মানব এমন কি এখানে উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট তা মানবজ্ঞান ও মানব-ক্ষমতার উর্ধ্বে বলে মনে হয়। সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রমুখ ব্যক্তিরা এই উল্লেখিত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তার এই গুণাবলী জন্মগতভাবে লাভ করে। এই জাতীয় গুণাবলী বা শক্তির মধ্যে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আরো এক প্রকার শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তি কারো মধ্যে অল্প, কারো মধ্যে অধিক, আবার কারো মধ্যে ওর চেয়েও অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই শক্তি কারো মধ্যে বর্ধিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে তখন শিক্ষা ও সাধনা ছাড়াই প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারে ও তার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে

কোন প্রকাশ্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত সহজাত শক্তির প্রভাবেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সকল প্রকারতত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞানলাভ করেন। এই শক্তির নামই 'নবুয়ত' এবং এই জ্ঞানের উৎসকেই 'ওহী' বা 'ইলহাম' বলা হয়। আল-গাজ্জালী ওহী ও অনুপ্রেরণা বা ইলহামের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। জালালউদ্দীন রুমীর ওহী ও অনুপ্রেরণা সম্পর্কীয় মতবাদ আল-গাজ্জালীর মতবাদের অনুরূপ; কিন্তু অধিক যুক্তিসংগত।[১] তিনি আল-গাজ্জালীর 'নবীসুলভ আত্মা' বা ওহী সম্পর্কীয় গ্রহণক্ষম আত্মা' সম্পর্কীয় মতবাদ গ্রহণ করে বলেন যে, এই আত্মা বুদ্ধিময় বা 'প্রজ্ঞাময় আত্মা' হতে উচ্চ মানের।[২] এই আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের পরম সত্তা[৩] ও অন্যান্য সত্তাগুলোর গূঢ় রহস্য জানতে ও বুঝতে পারে। বুদ্ধিময় বা প্রজ্ঞাময় আত্মার নিকট আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা সম্পর্কীয় কথাবার্তা অনেকটা হেঁয়ালী বলে মনে হয়, কারণ বুদ্ধি পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝতে সক্ষম হয় না। আল-গাজ্জালীর মত রুমী বলেন যে, এই 'নবীসুলভ' আত্মার' আধ্যাত্মিক রহস্য অন্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির সাহায্যে বর্ণনা করা যায় না। তাঁর মতে আল্লাহ্র নিকট হতে যে ওহী বা অনুপ্রেরণা আসে তা জ্যোতির্বিদ্যা বা স্বপ্নের মত নয়। গোঁড়া শরীয়তপন্থীদের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্য সুফীরা অনুপ্রেরণাকে আত্মার অনুপ্রেরণা বা 'ওহী-ই-দিল' বা 'ইলম-ই-সিনা বলেন। আত্মা কখনো ভুল করে না কারণ আত্মা বা হৃদয় আল্লাহ্র প্রকৃত আসন ও পরম অদৃশ্য সত্তার প্রতিফলিত হওয়ার একমাত্র দর্শন। এখানে সব কিছু আল্লাহ্র আলো জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং মানবাত্মা তা প্রত্যক্ষ করে। এখানে ভ্রান্তির কোন স্থান নাই, সুযোগ নাই।

রুমী অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে হৃদয়ের অনুপ্রেরণা বা 'ওহী-ই-দিল' পদটি সুফীদের আমদানী। যদিও তাঁরা ভিন্নপদ ব্যবহার করেছেন কিন্তু ওহী ও হৃদয়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে কোন মূল পার্থক্য নাই। এই দুইটির মধ্যে কেবলমাত্র একটি পার্থক্য এই যে নবীগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা জিব্রাঈল

১. Ibid, p. 104.
২. Mathnawi II, 3258.
৩. Mathnawi, IV, 1852-1855.

মারফত ওহী লাভ করেন। আর ধার্মিক ব্যক্তি বা সাধু ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করেন।[১] প্রকৃতপক্ষে রুমীর মতে হৃদয়ের মাঝে বাহির থেকে কিছুই আসে না, কারণ জিব্রাইল বা পবিত্র আত্মার কার্য মানবাত্মারই বিশেষ এক ধরনের কার্য মাত্র।[২] তিনি বলেন যে অনুপ্রেরণা বা ওহীর মূল উৎস মানবের চিরন্তন আত্মা, এই আত্মাই, বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ হতে দেখলে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি বলেন যে, যখন মৌমাছি মৌচাক তৈরী করার জন্য, কাক মৃত দেহকে কবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী বা অনুপ্রেরণা লাভ করে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে নিশ্চয় সে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাঁর মতে সকল শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা হতে জন্মলাভ করে[৩] যদিও পরে মানব তার সাথে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও সাধারণ বুদ্ধি যোগ করে তা অনেক উন্নত ভাবে গড়ে তুলে। যদি কোন ব্যক্তি মানবাত্মার অসীম সুপ্ত সম্ভাবনা ও ঐশী মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন তবে তিনি নবুয়তকে কেবলমাত্র অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করতে পারেন না।[৪] নবুয়তের দ্বার সকল মানুষের কাছে খোলা আছে। তাঁর এই ধরনের কথাবার্তা হতে বোঝা যায় যে তাঁর মতে নবুয়তের ধারা এখনও শেষ হয় নি। তিনি মনে করেন যে একজন সাধু ব্যক্তির জন্য কেবল মাত্র ওয়ালিয়াতের দরজাই খোলা নাই, একটি জাতিকে পরিচালনা করার জন্য নবুয়তের দরজাও খোলা আছে। অর্থাৎ একজন সাধু ব্যক্তি একই সাথে 'ওলী ও নবী হতে পারেন। 'একটি জাতির নবী হওয়ার জন্য সৎকার্যের মাধ্যমে চেষ্টা কর'[৫] রুমীর এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জালালউদ্দীন রুমীর অতিন্দ্রিয়বাদের মধ্যে পূর্ণমানব ও আদর্শ মানব সম্পর্কে যে সকল আশ্রয়বাক্য প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হতে এই সিদ্ধান্তে যুক্তিসংগতভাবে পৌছানো যায়। আর এই বিষয়ে তিনি অন্যান্য সূফীদের মত কথা ঘুরে ফিরে না বলে অতি সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে

১. Mathnawi III, 1298-1301, 1304.
২. Mathnawi I, 1717-1718.
৩. Mathnawi I, 1461—1862. Mathnawi IV, 1294. 1296—1297., 1301.
৪. Dr Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 107.
৫. Mathnawi V, 469.

মানুষ সৎকার্যের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির সাহায্যে একজন সাধু বা ওলী হতে পারেন, এমন কি একটি জাতিকে সৎপথে পরিচালনার জন্য একজন নবীও হতে পারেন। শরীয়তের আইনের দিক হতে এটা ধর্ম বিরুদ্ধ হলেও যে আশ্রয় বাক্যের উপর ভিত্তি করে পূর্ণমানব বা আদর্শ মানবের ধারণা গড়ে উঠেছে তা দিয়ে বিচার করলে তাঁকে একজন সংগতিপূর্ণ অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক বলা যায়। অতি সহজ, স্পষ্ট ও জোরালো উক্তির জন্য তিনি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। হাল্লাজের সময় হতে সূফীরা মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন এবং সূফীদের কাছে এই অভিন্নতা ঘোষণা করা নতুন কিছু নয়। হাল্লাজের দর্শনে 'আনাল হক' বা 'আমিই' পরম সত্য' বা আমিই আল্লাহ' এই কথা আছে কিন্তু রুমীর দর্শনে' আনাল নবী' বা 'আমিই নবী' 'আনা নবী' বা আমি একজন নবী' এই কথার সুর শোনা যায়।[১] সূফীবাদের মধ্যে নবী সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি অভিনব ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কারণ একজন ফারসী কবি বলেছেন যে আল্লাহ্ সম্পর্কে যা খুশী বলতে পারো কিন্তু নবী হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে কথা বলার সময় খুব সংযত হয়ো ও সাবধানতা অবলম্বন করো। এমনকি, বায়েজীদও মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার তুলনা করে বলেছেন যে, মানবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন কিন্তু মানবাত্মার সাথে নবীর তুলনা করার সময় উল্লেখ করেছেন যে, মানবের তথা ওলী ব্যক্তির সাথে নবীর তুলনা হয় না, ওলী ব্যক্তির পর্যায় যেখানে শেষ হয়[২] নবীর স্তর সেখানে শুরু হয়। ওলী ব্যক্তির উন্নতির একটি সীমা আছে কিন্তু নবীর কোন সীমা নাই। দীর্ঘ দিনের আত্মিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণের পর বায়েজীদ উপরোক্ত উক্তি করেন এবং বায়েজীদের উক্তি শরীয়তপন্থী মুসলমান ও সূফীরা অতি সমাদরের সাথে গ্রহণ করেন। সূফীবাদের ইতিহাসে লৌকিক সংগতি রক্ষা করতে গিয়ে ইবনুল আরাবী পরোক্ষভাবে এবং জালালউদ্দীন রুমী প্রত্যক্ষভাবে একজন ওলী ও একজন নবীকে অভিন্ন ভাবে দেখেছেন এবং ওলীকে নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। রুমীর মতে একজন মানুষ আত্মিক সাধনার উন্নতি দ্বারা যেমন একজন ওলী বা সাধু হতে পারেন তেমনি একটি জাতিকে পরিচালনার জন্য নবীও হতে পারেন।

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim : Ibid. p. 108.

২. শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার : তাযকেরাতুল আওলীয়া, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ : আলহাজ্ব মোঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৪ ; পৃ. ১৭১।

তাঁর এই উক্তি সাধারণ বিশ্বাসী মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছে এবং তাঁরা এই মতবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নাই। যুক্তির দিক হতে বিচার করলে রুমীকে একজন সংগতিপূর্ণ সূফী দার্শনিক বলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। সূফীবাদ ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে 'ওয়ালিয়াত'ও নবুয়ত-এর সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সমস্যা। সাধারণ মুসলমানেরা যে কথাই চিন্তা করেন না কেন এবং একজন ওলী ও একজন নবীকে যত ভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন না কেন, রুমীর মতে তা একই ব্যক্তির আত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর মাত্র। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক মানুষ সাধনার দ্বারা এই বেলায়েত বা 'ওয়ালিয়াত' ও 'নবুয়ত'-এর স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম।

সংক্ষেপে আদর্শ মানুষ সম্পর্কে রুমীর মতামত নিম্নরূপ।[১] একজন আদর্শ মানুষ তাঁর অতীন্দ্রিয়, চিরন্তন ও অমর সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং আত্মিক উন্নতির দ্বারা ঐশী সত্তার গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজে অমর ও ও চিরন্তন হন। মানবাত্মা যে ঐশী সত্তা তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তি জীবনে এই অবস্থায় পেঁাছাতে পারেন।[২] আদর্শ মানুষই সাধন জীবনের চরম লক্ষ্য ও উন্নতির শেষ স্তর। যে ব্যক্তি পূর্ণ মানবত্ব লাভ করেন, তিনি ঐশী গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরেই তা করেন। পূর্ণ মানবত্ব লাভের পর তার নিজের বলে কিছু থাকে না, তার দেখা, শোনা, বলা, চলা ইত্যাদি আল্লাহ্‌র দ্বারা সম্ভব হয়। আল্লাহ্ যখন কোন মানুষকে ভালবাসেন তখন তিনি তাঁর চক্ষু হন যা দিয়ে তিনি দেখেন, তাঁর কান হন যা দিয়ে তিনি শ্রবণ করেন, তার জিহবা হন যা দিয়ে তিনি কথা বলেন, তার হাত হন যা দিয়ে তিনি কোন কাজ করেন এবং তাঁর পা হন যা দিয়ে তিনি চলাফেরা করেন। মোটকথা, ঐশী গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরই একজন মানুষ পূর্ণ মানবত্ব লাভ করেন, আর পূর্ণ মানবত্ব লাভের পর তাঁকে একজন ওলী বা নবী যা বলা হোক না কেন তাতে তাঁর এসে যায় না।[৩] আদর্শ মানব আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি, তাঁর ও আল্লাহ্‌র মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তি সহযোগ স্থাপনের জন্য নাই; এমন কি কোন

১. Dr. R. A. Nicholson (ed) Diwan i Shams Tabriz, Ode—VIII.
২. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid. p. 110.
৩. Ibid, p. 110.

নবী বা ফেরেস্তাও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নাই। তিনি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হতে সকল কিছু জেনে শুনে নিতে পারেন। মানবগণ সাধনার দ্বারা এই অবস্থায় উন্নীত হলে নিজেদেরকে 'এক' ও 'বহু' উভয় রূপে দেখতে পান, পার্থিব জগতে তাঁরা 'বহু' কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে 'এক'। আধ্যাত্মিক জগতে বহুত্বের কোন স্থান নাই। আলোদানকারী প্রদীপের সংখ্যা অসংখ্য ও বহু হওয়া সত্ত্বেও আলো মূলতঃ এক ও অভিন্ন। আদর্শ মানব অনেক অলৌকিক কার্য করতে পারেন। অবশ্য তাঁর অর্থ এই নয় যে তিনি প্রকৃতির কার্যকারণ নিয়ম ভংগ করে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কোন কিছু করেন। আসল কথা এই যে তিনি যে সকল অলৌকিক কার্য সমাধা করেন তা সাধারণ লোকের কাছে অলৌকিক মনে হয়, বাস্তবে তা অলৌকিক নয়। সাধারণ মানুষের আত্মিক উন্নতি হলে তারা বুঝতে পারেন যে আপাতদৃষ্টিতে যা অলৌকিক বলে মনে হয়, বাস্তবে তা অলৌকিক নয়।[১] আদর্শ মানব প্রেমের মাঝে আপন ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছার সাথে মিশিয়ে দিয়ে বলতে পারেন যে তিনি সত্তাবান ও অসত্তাবান বা অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন উভয়ই। মানব ইচ্ছা বা মানব সত্তাকে পরম ইচ্ছা বা পরম সত্তার মাঝে 'ফানা' বা আত্মবিলোপন বা বিলুপ্তি সাধনের অর্থ নির্বাচন বা ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস সাধন নয়, 'ফানার' অর্থ আত্মিক পরিবর্তন সাধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন, ঐশী গুণ অর্জন। আল্লাহ্‌র সত্তার মাঝে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সব কাজ সমাধা করা, যেহেতু আদর্শ মানবের নিজের বলে কিছু নাই, যেহেতু পরম সত্তাই তার মধ্য দিয়া কথা বলেন, কাজ করেন ও দেখেন।[২] তিনি সকল অন্যায়, অবিচার, অসৎ কর্ম, অসৎ চিন্তা, অসৎ আলাপ ইত্যাদি হতে বিরত থাকেন এবং সৎ আলাপ, সৎ চিন্তা, সৎকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি কখনো ভুল করেন না কারণ তিনি সব কিছু আল্লাহ্‌র আলোকে দেখেন। মানবাত্মা ও পরম সত্তার অভিন্নতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি যথার্থ, কেননা তাঁর যুক্তির মাঝে তাঁর নিজস্ব কিছু নাই, বরং আল্লাহ্‌ই তাঁর মাধ্যমে সেসব কথা বলে থাকেন। পূর্ণমানব 'ফানা' অতিক্রম করে 'বাকায়' পৌঁছাতে সক্ষম, আর 'বাকা' অবস্থায় পূর্ণমানবের নিজস্ব কিছু নাই, যা আছে সবকিছু

---

১. Mathnawi I,844, 846.

২. Mathnawi, IV, 2121-2122.

আল্লাহ্‌র। অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত শব্দ আপেক্ষিক শব্দ। জীবনের এক স্তরের কার্যকলাপ তার নিম্নস্তর হতে লক্ষ্য করলে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত অস্বাভাবিক মনে হয়। নিম্নস্তর হতে উপরের সমান স্তরে উন্নীত হলে সেই কার্যকলাপ অতি স্বাভাবিক বোধ হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার কাছে যা অলৌকিক ও অস্বাভাবিক বুদ্ধির কাছে তা স্বাভাবিক এবং বুদ্ধির কাছে যা অলৌকিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা প্রজ্ঞার কাছে তা অতি স্বাভাবিক। মানুষের কার্যকলাপ পশুর নিকট অলৌকিক, আবার পূর্ণমানবের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের কাছে অলৌকিক। 'লগস' বা প্রজ্ঞা অথবা সার্বিক প্রজ্ঞা এক ও অভিন্ন, কারণ আদর্শ-মানবই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তা পরিচালনা করেন। আর এই হিসাবে তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালন কর্তা।

আদর্শ মানব সৃষ্টির 'আদি কারণ, যদিও সময়ের বিচারে তিনিই সর্বশেষে বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন।[১] বিশ্ব সৃষ্টির বহু পূর্ব হতে তিনি ধারণা হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন। কোরানে উল্লেখিত হযরত আদম আদর্শ-মানব। এই আদর্শ মানবের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশে ফেরেস্তাগণ সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবনুল আরাবীর মতে হযরত মুহাম্মদ পূর্ণমানব। তিনি বলেন যে শেষ নবীর মধ্যেই মানবত্বের চরম প্রকাশ ঘটে, আল্লাহ্ নিজেকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন ও উপলব্ধি করেন। হযরত আদম হতে মানবত্বের শুরু হয় এবং হযরত মুহাম্মদের পূর্ণতা লাভ করে। ইবনুল আরাবীর মত রুমীও বলেন যে, আদর্শ-মানবই সার্বিক প্রজ্ঞা এবং সার্বিক প্রজ্ঞা হিসাবে বিশ্ব আত্মা। এই আদর্শ-মানবের বাহিরে কোন সত্তা নাই, যা আছে তা তাঁর মাঝেই বর্তমান আছে। আদর্শ মানব ক্ষুদ্র বিশ্ব এবং তাঁর আত্মাই বিশ্বআত্মা। আদর্শ-মানব কেবলমাত্র সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান নয়, প্রত্যেক যুগে কোন না কোন ব্যক্তি এই মানবত্ব অর্জন করেন। কেবলমাত্র সাধনার দ্বারাই আদর্শ মানবত্ব অর্জন করা যায় না, এর জন্য নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আত্মিক শুদ্ধি-সাধন একান্ত প্রয়োজন। আদর্শ-মানব জীবিত অবস্থায় যেন মৃত, তিনি যেন, 'জ্যান্ত মরা'। তিনি আমার মাঝে বাস করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর মাঝে। মানবাত্মা ও পরমাত্মার এই মিলন কোন উপমা দ্বারা বোঝা যায় না বা কোন ভাষ্য

১. Mathnawi IV, 398-402, 405.

দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'অবতার' 'মিলন এক হয়ে যাওয়া' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের গোপন রহস্যের কোন প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না ; যিনি আল্লাহ্‌র সত্তায় সত্তাবান হন এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় জীবিত থাকেন ও বাস করেন, তিনিই প্রকৃত মিলন সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানের দাবীদার। আদর্শ-মানব আল্লাহ্‌র সত্তায় সত্তাবান হন, আল্লাহ্‌র সত্তার মাঝে চিরজীবিত থাকেন এবং আল্লাহ্ তাঁর মাঝে আত্মারূপে বাস করেন। পূর্ণমানবই প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই সৃষ্টির মূল কারণ। মানব সাধনার দ্বারা, নৈতিক উন্নতির দ্বারা 'ঐশীগুণে গুণান্বিত' হয়ে আদর্শ-মানবত্ব লাভ করতে পারেন, আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও রুমীর মতে এ কথা সম্ভব। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যতই বড় জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতাই হোক না কেন, বংশগত ঐতিহ্য, ক্ষমতাগত চিন্তাধারা ও পরিবেশের গুণাগুণ যতই উন্নত মানের হোক না কেন, তাঁর যতই পরহেয-গারী, ধৈর্যশীলতা ও কৃতজ্ঞতা থাকুক না কেন, মানুষে মানুষে সাম্য যত প্রকার করা হোক না কেন, একজন মানুষ আর একজন মানুষের সাথে জ্ঞান-বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে সমান নয়, তাকে নবী ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পূর্ণ সমান বলা কখনো সম্ভব নয়, এ সম্পর্কে জালালউদ্দীন রুমী যত কথাই বলেন না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। মানব জ্ঞানের উন্নতির সীমা আছে, সে নিজে সসীম, কখনো বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মার সমান নয়, তা সে যত বড় আদর্শের মানুষই হোক না কেন। তবে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রুমীর উক্তি সত্য।

সূফীবাদ এক প্রকার আধ্যাত্মিক বিদ্যা, এরমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে তা বড় অপূর্ব, রহস্যপূর্ণ ও আশ্চর্য ধরনের। ওহী ও ইলহামকে আল্লাহ্‌র দান বলে স্বীকার করলে দার্শনিক যুক্তিতর্কের বাইরে নিয়ে আসলে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করা যায় যে মানবাত্মা উন্নতির ফলে আদর্শ-মানব ও উন্নতির চরম পর্যায়ে পরমাত্মার মত হতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

সুফীর দর্শনে আল্লাহ্

আল্লাহ্

(সুফী মতবাদের মূলতত্ত্ব আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব, এই তত্ত্বের বীজ কোরানে নিহিত। অধিকাংশ সুফী কোরানের উক্তিকে তাঁদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে কোরানের উক্তির দুই অর্থ আছে, ব্যক্ত অর্থ এবং গুপ্ত অর্থ। ব্যক্ত বা আক্ষরিক অর্থ সাধারণের জন্য এবং গুপ্ত অর্থ বেলায়েত লাভকারী বা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী বা সুফীদের জন্য। সুফীরা এই গুপ্ত অর্থের নির্দেশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র একত্ব ও সর্বনায়কত্বের ধারণা কোরানে প্রচুর। কোরানের মধ্যে সুফীদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বধরেশ্বরবাদী মতবাদের বীজ নিহিত। সুফীতত্ত্বে আল্লাহ্ অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময়, সর্বশক্তিময়, এই গুণগুলোই আল্লাহ্‌র একমাত্র স্বরূপ নয়, তাঁর বিশ্বরূপ আনন্দময়, প্রেমময়। আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে সুতরাং আনন্দস্বরূপ আল্লাহ্ প্রকৃত পক্ষে প্রেমস্বরূপ, প্রেমস্বরূপতাই তাঁর মূলস্বরূপ এবং আল্লাহ্‌র প্রেম স্বরূপই সুফীদের কাছে প্রকটিত।)

অধিকাংশ সুফীর মতে আল্লাহ্ বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী, বিশ্বলীন ও বিশ্ববহির্ভূত সত্তা উভয়ই। আল্লাহ্ সত্তাময়, বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্‌র সত্তার কোন ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ এবং সমগ্র আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ। এই মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। সুফী মতবাদ ঠিক অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নয় এবং নিকলসন ঠিকই বলেছেন যে, সুফীবাদ সর্বেশ্বরবাদই হবে এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।[১] আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগতে এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র সত্তার মাঝে ধারণারূপে অবস্থিত, সমগ্র জগৎ আল্লাহ্‌ময় বটে কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগৎ নয়। একদিকে যেমন আল্লাহ্ জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তা, অন্যদিকে তেমন জগতের অতিবর্তী সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ জগতের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত সত্তাও বটে।

১. Dr. R. A. Nicholson : Idea of Personality in Sufism.

অন্তর্ব্যাপী সত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে সুফী মতবাদকে অন্য কোন উপযুক্ত অর্থ প্রকাশকারী শব্দের অভাবে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। ইবনুল আরাবীর ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ দর্শনে অদ্বৈতবাদী মতবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অতিবর্তী খোদাবাদের অনেক চিহ্ন বর্তমান। রুমীর মতবাদ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নয়, সর্বেশ্বরবাদ বা খোদাবাদ। তাঁর দর্শনে আল্লাহ্‌ অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী উভয় প্রকার সত্তারূপে বর্তমান। তাঁর সুফীবাদের মধ্যে ধর্ম ও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে এবং একজন সুফী আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আল্লাহ্‌ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরম সত্তা। সুফীবাদ সাধারণ অর্থে সর্বেশ্বরবাদ নয়। ইবনুল আরাবীর অদ্বৈতবাদ স্পষ্ট ব্যক্তিত্বহীন সত্তাবাদ ধর্মীয় মানুষের মনে এক সময় সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। জালালউদ্দীন রুমী সে সন্দেহ দূর করার জন্য সুফীবাদের পরম সত্তা ধারণার সাথে এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরম প্রেমিক সত্তার অস্তিত্ব যোগ করে সুফীবাদকে তিনি আল-গাজ্জালীর মতো কোরানের ভিত্তির উপর সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রুমীর মতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে লীন, না সৃষ্টির বহির্ভূত, কি এই দুইটির মধ্যাবস্থা এই সব কিছুই নয়। এইসব বিষয়ে বিচার-বুদ্ধি ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। এইসব দিয়ে আল্লাহ্‌র পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না, জ্ঞানের পথ ত্যাগ করে প্রেমের পথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ-মিলন বা উপলব্ধির মধ্যে আল্লাহ্‌কে পরম ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রেম সত্তারূপে দেখা যায়। আল্লাহ্‌ পরম পুরুষ বা পরম ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তা, তবে ব্যক্তিত্ব বলতে খ্রীস্টধর্ম ও দর্শনে যা বোঝায় রুমী সে অর্থে ব্যক্তিত্ব শব্দ গ্রহণ করেন নি। রুমীর আল্লাহ্‌তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে ব্যক্তিত্ব বলতে তিনি কি বুঝেছেন তা জানা দরকার। ব্যক্তিত্ব শব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] 'ব্যক্তিত্ব' বলতে এক অর্থে বিশ্বের সত্তার অধিক কোন একটি ব্যক্তিসত্তাকে বোঝায়, স্বাধীনভাবে একে অন্যের সাথে মনোগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম এমন একাধিক মানুষের অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন মানবীয় গুণে গুণান্বিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একাধিক সত্তার অস্তিত্ব বোঝায় যারা পরস্পরের সাথে একটা মনোগত ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম। এখন একথা স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ অতিবর্তী আল্লাহ্‌র কোন ব্যক্তিত্ব থাকতে

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 125.

পারে না কারণ তিনি সকল সম্পর্কের অতীত, আবার সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী আল্লাহ্র কোন ব্যক্তিত্বের গুণাবলী আরোপ করা যায় না।[১]

আল্লাহ্ বা পরম সত্তা যদি সম্পূর্ণ অতিবর্তী সত্তা হয় অর্থাৎ বিশ্বের অতীত হয় তবে সে সত্তা বেদান্তের পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, প্লটিনাসের অনির্বচনীয় সত্তা, হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত সত্তা হয়, সে-সত্তায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না।[২] প্লেটোর দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা বা মংগলের ধারণা এবং এরিস্টটলের দর্শনের সকল আকারের শুদ্ধ 'আকারকে' ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলা যায় না এবং তাদের সাথে ব্যক্তিত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। পুনরায়, যে সত্তা জগতের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত তাকেও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা বলা যায় না, কারণ তা হবে নৈর্ব্যক্তিক ও অসীম কিছু একটা।[৩] সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা খোদাই সব, সবই খোদা, খোদা ও জগৎ এক ও অভিন্ন, খোদা নিরপেক্ষ বিশ্বের অস্তিত্ব নাই। সর্বেশ্বরবাদীরা ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়ে বহুত্বকে অস্বীকার করেন, সেই সর্বব্যাপী সত্তায় কোন ব্যক্তিত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়।[৪] তাই স্পিনোজার পরম দ্রব্য কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ নয়। যদি সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষের সন্ধান করে তবে সোপেন-হাওয়ারের মত বলা যায় যে সর্বেশ্বর-বাদ নাস্তিকবাদেরই নামান্তর। এরমধ্যে আল্লাহ্র সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা হতে হয় এবং মানুষ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে বলে স্বীকার করা হয়, তবে সে পরম সত্তাকে হয় সম্পূর্ণরূপে মানুষের মতো হতে হয়, না হয় কমপক্ষে মানুষের মতো কতকগুলো গুণ তাঁর অবশ্যই থাকতে হয়। পরম সত্তা যদি সম্পূর্ণরূপে মানুষের মতো হয় তবে সে মানুষ খোদা বা খোদা মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। সর্বব্যাপী খোদার সাথে মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে সর্বেশ্বরবাদ অনেক সুষ্ঠু মতবাদ, অতিবর্তী খোদার সাথে কোন সম্পর্কই সম্ভব নয়, আর যার সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তাকে নিয়ে মানুষের মন সন্তুষ্ট হয় না।

১. Ibid, p, 125.
২. Ibid p. 126.
৩. Ibid. p, 126.
৪. C. C. G. Webb, God and Personality, Gifford Lectures, 1918–1919, London, p. 46.

তাই সর্বেশ্বরবাদ সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু মতবাদ নয়, একমাত্র খোদাবাদই প্রকৃত ধর্মীয় মতবাদ এবং এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্‌র সত্তায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায়, তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরম পুরুষ বলে মনে করা যায়, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়; কারণ তিনি যেমন অতিবর্তী তেমনি অন্তর্ব্যাপী সত্তা। তবে মনে রাখতে হয় যে, খোদবাদ খ্রীস্টধর্মে ত্রিত্ববাদ, পুরাতন পারস্য ধর্মে দ্বিত্ববাদ, হিন্দু ধর্মে বহুত্ববাদ বা দেবতাবাদ এবং ইসলাম ধর্মে একত্ববাদ বা তৌহিদবাদ রূপ নিয়েছে। খ্রীস্টধর্ম মূলতঃ একক সত্তায় বিশ্বাস করে।[১] পরবর্তীকালে যীশুখ্রীস্টের অনুসারীগণ একক সত্তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে 'পিতা ঈশ্বর', 'পুত্র ঈশ্বর' ও 'পবিত্র আত্মা 'ঈশ্বরের' এই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেন। এক ঈশ্বর হতে তিন ঈশ্বর, আবার তিন ঈশ্বর একত্রে একজন সম্পূর্ণ ঈশ্বর, এইটা খ্রীস্টধর্মের মূল কথা।[২] 'যীশুখ্রীস্ট একজন ঈশ্বর'—এই ত্রিত্ববাদ হতে উৎপত্তি হয়েছে। হিন্দু ধর্ম মূলতঃ এক পরম ঈশ্বরে বিশ্বাসী। হিন্দুগণ ব্যক্তিত্ব বা পুরুষ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা 'এক মেবাদ্বিতীয়ম' উচ্চারণ করেও সমস্ত সৃষ্টিতে দেবত্ব আরোপ করে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভুলে বহু দেবদেবীরূপী ঈশ্বর ও অবতাররূপী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরের সত্তায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাঁদের সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন।[৩] প্রাচীন পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দা-বেস্তা' ও 'দাসাতির' এই ধর্ম জোরোয়াস্তার কর্তৃক স্থাপিত ও প্রচারিত। এই ধর্মে 'আহুরা মাজদা' পরম ঈশ্বর।[৪] প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিশ্বাস করেন যে, 'আহুরা মাজদা' মঙ্গলের ঈশ্বর আর অমঙ্গলের ঈশ্বর 'আহরিমান'। এইভাবে দুই ঈশ্বরকে আরাধ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আহুরা মাজদা' জগৎটাকে সৎ সুন্দর ও কল্যাণকর রূপে সাজাতে চান কিন্তু আহরিমান সর্বদা অকল্যাণ, অমঙ্গল ইত্যাদি সৃষ্টি করে বিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত বাধিয়ে রাখতে চায়

১. তখন যীশু তাহাকে কহিলেন দূর, হও শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" বাইবেল ধর্মপুস্তক, নূতন নিয়ম, মথি. ৪. ১০. পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃঃ ৪, নূতন নিয়ম।
২. C. C. G. Webb, God and Personality, p. 46.
৩. (I) Dr. S. C. Chatterjee and Dr. D. M. Datta. An Introduction to Indian Philosophy. University of Calcutta. 1968, p. 351.
(II) শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড. ভারতবর্ষ. হাওড়া, ১৩১৬ পৃঃ ১১৮।
৪. (I) T. Rezwi: Parsis: A People of the Book, 1928. Calcutta, p. 5.
(II) Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. III, pp. 646-647.

এবং এই দুই শক্তির বিরোধের ফলে জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। দুই বিরোধ শক্তি বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে জগতের ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তাছাড়া দুই শক্তির অবিরত সংঘাত বা দ্বন্দ্ব একক শক্তির নির্দেশ করে। খ্রীস্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, হিন্দু ধর্ম, পুরাতন পার্সীধর্ম একত্ববাদ প্রচার করে এবং বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে।

মনে রাখতে হয় যে, ধর্মীয় চেতনার সর্বোচ্চ পরিণতি একত্ববাদ এবং ইসলাম ধর্মই নিখুঁত একত্বের পরিচয় দেয়। খ্রীস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের মধ্যেই যে কেবলমাত্র 'ব্যক্তি' বা পুরুষ শব্দের মূল ধারণা নিহিত আছে এমন নয়, কোরানের মধ্যেও 'শখছ' শব্দ দিয়ে একই প্রকার ধারণার কথা বলা হয়েছে। "আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ঈর্ষাপরায়ণ কোন ব্যক্তি নাই।"১ তাছাড়া ইসলামের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণ অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতার কথা বলা হয়। একদিকে আল্লাহ্ সর্বব্যাপী এবং মানুষ তার সাথে সৎকর্ম, প্রার্থনা, ত্যাগ ও সচ্চরিত্র গঠনের মাধ্যমে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম, আবার অন্যদিকে আল্লাহ্ বিশ্বের বহু ঊর্ধ্বে, তাঁর সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয় এবং তাঁর সাথে তুলনা করার মতো কিছুই নাই। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ের বিরোধের মতোই এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বিরোধের ভিত্তি আল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোরানের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন আয়াত। কোরানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী সত্তা, বিশ্ব হতে বহুদূরে অবস্থান করেও মানুষের সাথে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, সমগ্র বিশ্ব তাঁরই শক্তির প্রকাশ। এমন কোন স্থান বা সত্তা নাই যার মধ্যে তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটে নাই। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন সমগ্র প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান, সেইরূপ সৃষ্টির ভিতর স্রষ্টাও বর্তমান। নির্জীব পদার্থ ও সজীব জন্তুর মধ্যে এক আকর্ষণ লক্ষিত হয়, সকল আকর্ষণের মূলীভূত কারণ আল্লাহ্। ইথার, বিদ্যুৎ, মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সবই মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। তিনি অন্তর্নিহিত শক্তি, সৃষ্টি ও বাহ্যজগৎ তাঁরই বহির্বিকাশ। মানুষের জীবন, বুদ্ধি-জ্ঞান তাঁরই দান। বিশ্বের সর্বদেশে তাঁর

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid. p. 127, quoted from the Quran.

অবস্থান। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, 'যে দিকে মুখ ফিরাও সেইদিকে আল্লাহ্‌র মুখ' (২ : ১৫)। 'আমি তার কণ্ঠশিরা হতেও নিকটতর' (৫০ : ১৬)। অতিবর্তী ধারণা অনুসারে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌ সপ্ত আকাশের উপর একখানা বিরাট সিংহাসনে বসে থেকে তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিরাট রাজত্ব চালান। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন স্থানে আবদ্ধ নন, কোন সময়ের মুখাপেক্ষী নন, তিনি দেশ-কালের অতীত, দেশ-কালের সৃষ্টিকর্তা তিনি। আল্লাহ্‌ বহু দূরে সপ্ত আকাশের উপর অবস্থান করেন যে, তাঁর সাথে মানুষ ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না—এই ধারণা ভুল। কোরান বলে "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে আছেন (৯ : ৪০), যেখানে থাক সেখানেই তিনি তোমাদের সাথে আছেন (৫৭ : ৪)। আল্লাহ্‌ কেবলমাত্র বিশ্বের অতিবর্তী সত্তাই নয় বরং তিনি আমাদের অতি নিকটবর্তী সত্তাও বটে। কোরানে উল্লেখ আছে, 'তিনিই এক ও অদ্বিতীয় অভাবহীন আল্লাহ্‌ যার উপর সকল কিছু নির্ভরশীল, তার পুত্র নাই এবং তার পিতাও নাই এবং কেউ তার সমকক্ষ নয় (১১২ : ১—৫)।

কোরানের এই আয়াতগুলো ইসলামী খোদাবাদী ধারণার নির্যাসস্বরূপ। এই মতবাদ অবতারবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বি-ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করে একত্ববাদ বা তৌহিদবাদ প্রতিষ্ঠা করে। "বিশ্বপ্রভু তাঁর সাথে অংশী স্থাপন কোন মতেই ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া অন্যান্য পাপের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপন করে সে নিশ্চয় মহাপাপ কার্যে লিপ্ত।" (৪ : ৪৮), "দুই উপাস্য গ্রহণ করো না, নিশ্চয় তিনি একমাত্র উপাস্য।" (১৬ : ৫১), "তাদের ভিতর আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য ঈশ্বর থাকলে তারা নিশ্চয় বিবাদ-বিসংবাদ করতো। সুতরাং শক্তির অধিকারী আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে তোমরা যা বর্ণনা কর, তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।" (২১ : ২২), ইহুদীগণ বলেন, "ওজায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র।" খ্রীস্টানগণ বলেন—যীশু আল্লাহ্‌র পুত্র। এই কথা তাঁরা মুখে বলেন। যারা পূর্ববর্তী তাদের কথানুসারেই তারা চলেন। তাঁরা যা বলেন তার জন্য আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করবেন। তাঁরা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে তাদের পণ্ডিত ও সাধকগণকে এবং মরিয়মের পুত্র যীশুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে উপাসনা করার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয় নাই।

তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তাঁরা যা বলেন, তা হতে তিনি পবিত্র" (৯ : ৩০—৩১)

দেবতাবাদ, অবতারবাদ বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বি-ঈশ্বরবাদ, দ্বিত্ববাদ ইত্যাদি ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে কোরান বলে যে, সমগ্র বিশ্ব ও মানুষ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা, তাছাড়া তিনিই স্রষ্টা, পরিচালনকর্তা ও ধ্বংস কর্তা। ইসলাম ধর্মের খোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদে সন্তুষ্ট থাকে না। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের মতো আল্লাহ্‌র বহু গুণ আছে, তবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। আল্লাহ্ গুণে অদ্বিতীয়, আল্লাহর তুল্য পূর্ণ গুণের অধিকারী কেউ নাই। আল্লাহ্ মানুষের প্রাণরগ হতেও নিকটতর, তবে এই নিকটবর্তিতা কোন দেশগত, স্থানগত নিকটবর্তিতা নয়। যারা তাঁকে ভালবাসেন তিনি তাঁদের ভালবাসেন এবং তাদের আকুল আবেদনে সাড়া দেন। আর একটি উপমার সাহায্যে একথা বুঝানো হয়েছে। "আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো, তাঁর আলোর সাদৃশ্য যেন একটি বাতিদান যার মধ্যে একটি বাতি বা প্রদীপ রয়েছে, প্রদীপটি যেন একটি কাঁচের মধ্যে, কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রদীপটি জৈতুন গাছের তৈলের দ্বারা প্রজ্বলিত যা পূর্বের ও নয়, পশ্চিমেরও নয়, তৈল সর্বদা আলো দান করে যদিও এতে কোন অগ্নি স্পর্শ করে না—আলোর উপর আলো—যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তাঁর আলোর দিকে পরিচালিত করেন, আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী' (২৪ : ৩৫)।[১] ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মের সাথে কোরানের বর্ণিত আল্লাহ্‌র ধারণার অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও এর নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সুফীবাদের মধ্যে কিভাবে এই ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা বোঝার আগেই আমাদের অবশ্যই সে বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হয়। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ : আল্লাহ্ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি শূন্য হতে নিজ ইচ্ছায় 'কুন' বা 'হও' শব্দ দিয়ে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি একজন মহাশিল্পী। বিশ্বজগৎ তাঁরই মহাপরিকল্পনার ফল। তিনি জড় পদার্থ ও সকল আকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে তিনি জগৎ ও ফেরেস্তাদের সৃষ্টি

১. Al-Ghazzali's Mishkat al-Anwar. English trans. by W. H. T. Gairdner, Lahore.

করেছেন। সৃষ্টির সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন প্রদর্শন করে। তিনি জীবনের অফুরন্ত উৎস, সকল কিছুই তাঁর সত্তা হতে উৎপত্তি হয়, তাঁর সত্তার উপরেই নির্ভর করে বেঁচে থাকে। সব কিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী। একমাত্র আল্লাহ্ স্বয়ম্ভু, চিরন্তন, অনিবার্য সত্তা, অন্যান্য সবকিছুই সৃষ্ট ও সম্ভাব্য সত্তা। তিনিই বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী সত্তা। যদিও সবকিছুর আশ্রয়স্থল, তবুও তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্বের কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারে না এবং তাঁর সত্তা দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত নয়। তিনি বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী সত্তা, সবকিছুর মধ্যেই তাঁর সত্তা অবস্থিত। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে তাঁর সত্তা উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়, মানবাত্মা তাঁর আত্মা হতে আগত সত্তা। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুই ধ্বংসশীল। সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার গুণের বিকাশ, কিন্তু তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট তিনি অধিক গুণরূপে প্রকাশিত হন এবং প্রত্যক্ষভাবে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং পরোক্ষভাবে অন্যদের পরিচালিত করেন। আল্লাহ্‌র কোন অবতার নাই, তিনি কোন মানব আকার ধারণ করেন না এবং যে কোন মানুষই উন্নতির যত উচ্চ শিখরেই উন্নীত হোক না কেন, তাঁর মতো হতে পারে না। মানুষ যে জ্ঞান লাভ করতে বা শক্তি অর্জন করতে পারে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তি তাঁর চেয়ে বহুগুণে বেশী। যে শক্তির আধার হতে সৃষ্টজীব শক্তি অর্জন করে, যে বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করে সেই আধাররূপী সর্বশক্তিশালী পরম সত্তা সেসব হতে অসীমরূপে অসীম। তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদের কার্য প্রত্যক্ষণ করেন, তাদের কথা শ্রবণ করেন, তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং তাদের সাথে ব্যক্তিগত এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি মানুষের বিচার করেন, পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের শাস্তি প্রদান করেন। তিনি ন্যায় ও সৎবিচারক, তিনি তাঁর অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসারে সবকিছু করে থাকেন। আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো, তিনি সর্বজ্ঞানী, সৃষ্টির কোনকিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়, চর্ম-চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই ব্যক্ত।

অতি সংক্ষেপে আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্পর্কে কোরানের মতবাদ এই যে, তিনি

নিরাকারের আকার, অচিন্তনীয় বস্তুর কল্পনা, ধারণাতীত সত্তার ধারণা। এই বর্ণনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেকোন বিশেষ এক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে দেবতাবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বিঈশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদ ছাড়াও আল্লাহ সম্পর্কে যেকোন প্রকার মতবাদের উৎপত্তি হতে পারে। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় গুণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় মানবীয় গুণ আছে। এমন কি অনেক সময় একথাও স্বীকার করতে হয় যে, তিনি মানুষের মতো দেহবিশিষ্ট জীব ; আবার অব্যক্তিক বা অতিবর্তী গুণের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করলে প্লটিনাসের অনির্বচনীয় একক সত্তা, বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্ম অথবা হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত সত্তার ধারণার উৎপত্তি হয় বা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদী ধারণার সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা বা কল্পনা করা যায় না। জগৎ ও জীবের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক অন্তর্ব্যাপী, আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী সত্তা এই ধরনের কোরানের উক্তির উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করলে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ, মানব গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরবাদী বা নর ঈশ্বরবাদী ধারণা অথবা যেকোন প্রকার ঈশ্বরবাদী বা খোদাবাদী মতবাদের উৎপত্তি সম্ভব। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মতবাদ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁর সাথে তুলনা করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মতবাদ শাস্ত্রপন্থীদের মতবাদ বলে স্বীকার করা যায়। আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্বন্ধে কোরানের বিভিন্ন আয়াতের উপর বিচ্ছিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ না করে সমষ্টিগতভাবে বিচার করলে আল্লাহ্‌কে বিশ্বজগৎ ও জীবের অন্তর্ব্যাপী উভয় প্রকার সত্তারূপে পাওয়া যায়, তিনি বিশ্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করলেও মানুষ তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্পর্কে খুব বেশী চিন্তা করেন নি। এক হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ্‌র স্বরূপ নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নিগূঢ় সত্তাসার অনুসন্ধান করো না।[১] বরং তাঁর গুণ ও দান সম্পর্কে চিন্তা কর। মানুষের মন এতে সন্তুষ্ট হয়নি, মানুষ বাহ্যিক দৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানলাভের পর চুপ করে বসে থাকেনি বরং পর্দার অন্তরালে বিশ্বের আদি যে সত্তা আছে তাঁর স্বরূপ

১. Mathnawi IV, 3700.

অনুসন্ধান করেছে। গ্রীক দার্শনিক, খ্রীস্টান নষ্টিকবাদ বা জ্ঞানবাদ ও নব্য প্লেটোবাদের জ্ঞান লাভের পর মুসলিম চিন্তাবিদদের আল্লাহ্ সম্পর্কীয় ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন হয় এবং মুসলিম চিন্তাবিদরা বিদেশী ভাব-ধারাকে কোরানের আয়াতের উপর সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্‌র স্বরূপের জ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন। ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের ধারণার সাথে কোরানে বর্ণিত আল্লাহ্‌র স্বরূপের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কোরান আল্লাহ্‌র একত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এই একত্ব কোন বুদ্ধিসঞ্জাত অমূর্ত একত্ব নয়। এই একত্ব গুণে বহুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুতাজিলা চিন্তাবিদরা মনে করেন যে এই একত্ব গুণের বহুত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং সে কারণে আল্লাহ্‌র সত্তার বাইরে সকল গুণ তারা অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে আল্লাহ্‌র গুণ যদি আল্লাহ্‌র সত্তার বাইরে স্বতন্ত্র কোন গুণ হয় তবে চিরন্তন সত্তাসারের মতো গুণও চিরন্তন হয় এবং সত্তা ও গুণ মিলে একত্বের পরিবর্তে বহুত্বকে নির্দেশ করে, আবার যদি সেগুলো সত্তার ভিতরের জিনিস হয় তবে তা সত্তার সাথে অভিন্ন হয়, এটা একক সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্‌র সত্তাসার চিরন্তন। সত্তার বাইরে যদি কিছু থাকে তবে তা চিরন্তন। সত্তার বাইরে আল্লাহ্‌র গুণ আছে বলে স্বীকার করলে এক চিরন্তন সত্তার সাথে আরো বহু চিরন্তন গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আর বহু চিরন্তনের স্বীকৃতির অর্থ একত্ব অস্বীকৃতি। অতএব আল্লাহ্‌র সত্তার একত্বের পাশে গুণের বহুত্ব স্বীকার করা যায় না। গুণকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্‌র অমূর্ত একত্ববাদ স্বীকার করা।

এই ধারণা প্লটিনাসের অনির্বচনীয় একক সত্তা, স্পিনোজার অনির্বচনীয় দ্রব্য ও বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণার অনুরূপ ধারণা। প্লেটোর বুদ্ধিবাদী প্রাণহীন দর্শনের মঙ্গলময়রূপী সর্বোচ্চ ধারণা ঈশ্বর যেমন প্রেমিক প্লটিনাসের অশান্ত চঞ্চল মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি, মুতাজিলাদের বুদ্ধিবাদী দর্শনের গুণহীন অমূর্ত আল্লাহ্‌র ধারণাও তেমনি শাস্ত্রপন্থী মুসলমানদের, বিশেষ করে, আশারী চিন্তাবিদদের মনে তৃপ্তি দান করতে সক্ষম হয় নি। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে আশারীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা আল-আশারী মুতাজিলা চিন্তাবিদদের

বুদ্ধিবাদী দর্শনের গুণহীন আল্লাহ্‌র ধারণার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করে বলেন যে আল্লাহ্‌র গুণ আছে। একদিক দিয়ে গুণগুলো আল্লাহ্‌র সত্তাসারের ভিতরে এবং অন্যদিক দিয়ে সত্তাসারের বাইরে। আল্লাহ্‌র একজন পরম অনিবার্য সত্তা এবং একাধিক গুণের অধিকারী। তিনি আরো বলেন যে যদিও আল্লাহ কোন দেহধারী জীব নয় তবু তাঁর সন্দর্শন সম্ভব। আশারীদের এই মতবাদ সাধারণ মুসলমানদের আল্লাহ সম্পর্কীয় ধারণার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ হওয়ায় মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে আংশিক স্বীকৃতি লাভ করে। রুমীর আগে অনেক মুসলিম দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও সূফী আল্লাহ্‌র স্বরূপের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। একেবারে মানব গুণারোপ মতবাদ হতে শুরু করে প্লটিনাসের অনির্বচনীয় একত্ববাদ পর্যন্ত সকল প্রকার সম্ভাব্য মতবাদের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। মুতাজিলাদের মতে একদল দার্শনিক সত্তার বাইরে আল্লাহ্‌র গুণাবলী হয় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন, না হয় সত্তা ও গুণ অভিন্ন বলে অথবা সত্তার মধ্যে মাত্র একটি গুণ আছে বলে স্বীকার করেন। আবার আশারীয়দের মতো একদল চিন্তাবিদ আল্লাহ্‌র গুণের সংখ্যা ছয় বা সাত বলে উল্লেখ করে এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। ইবনুল আরাবীর মতো চিন্তাবিদ অদ্বৈতবাদী প্রচার করে আল্লাহ ও বিশ্ব অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেন। ইবনে তাইমিয়া, আহমদ বিন হাম্বলের মতো চিন্তাবিদরা আল্লাহ্‌কে সকল মানব গুণে গুণান্বিত করে আল্লাহ্‌কে মানুষরূপে চিহ্নিত করেছেন। বায়েজিদ বুস্তামী ও হাল্লাজ মনসুরের মতো সূফীরা এক বিশেষ অর্থে মানুষকে আল্লাহ বানিয়েছেন। আবার অন্য একদল আল্লাহকে মানুষ বানিয়েছেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র স্বরূপের বিশেষ এক একটি দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে মতবাদটি আতিশয্যদোষে দুষ্ট হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অসত্য মতবাদে পরিণত হয়েছে। এইসব শাস্ত্রীয়, দার্শনিক ও সূফীতাত্ত্বিক মতবাদগুলোর তথা-'নাকল', 'আকল', 'কাশফ' বা শাস্ত্রীয় মতবাদ বা 'প্রামাণ্য মতবাদ', 'বুদ্ধি' ও 'ব্যক্তিগত সংজ্ঞা' বা 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতির' একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা করেছিল যা দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষই সন্তুষ্ট হতে পারে।[১]

১. D.B. Macdonald: Moslem Theology. London, 1903, p. 12.

জালালউদ্দীন রুমী তাঁর আল্লাহ্‌র স্বরূপ ব্যাখ্যার মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেন যা ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও সূফীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে আর সমন্বয় সাধন তাঁর ব্যাখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

রুমী বলেছেন যে আল্লাহ্‌র স্বরূপের যৌক্তিক জ্ঞান অসম্ভব। দুইটা পরস্পর বিপরীতধর্মী ধারণার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সে ধারণার জ্ঞান লাভ সম্ভব, অন্ধকারের সাথে আলোর তুলনা করে আলো এবং ব্যথার সাথে আনন্দের তুলনা করে আনন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহ্‌ সকল কিছুর সমষ্টি, তাঁর অস্তিত্বের বাইরে কিছু নাই, তাঁর সাথে তুলনা করার মত কিছু নাই, সুতরাং তার বিপরীতের সাথে তুলনা করে তাঁর জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়, "কে তাঁর কর্মের বর্ণনা দিতে পারে যাঁর সমতুল্য কেউ নাই"[১]; গুপ্ত বস্তু বিপরীতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়, যেহেতু আল্লাহ্‌র বিপরীত কিছু নাই, সুতরাং তিনি গুপ্ত ও অপ্রকাশ্য, আপনি বিপরীতের সাহায্যে আলোকে জানেন, বিপরীত তাঁর বিপরীতকে প্রকাশ করে"[২]; "আল্লাহ্‌র আলোকের বিপরীত কোন কিছু নাই যা দিয়ে আল্লাহ্‌কে প্রকাশ করতে পারে"[৩] এই সব উক্তির সাহায্যে রুমী অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যৌক্তিক জ্ঞান অসম্ভব। তাঁর মতে যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে তিনি আল্লাহ্‌র নিগূঢ় সত্তাসারের জ্ঞান লাভ করেছেন, তবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারেন। চিন্তা সৃষ্টজীব মানুষের বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টজীব কখনো স্রষ্টা হয় না, চিন্তা দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানা যায় না, প্রেমিক তার নিজের আলোকে কল্পনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবিকে ভালবাসেন। যদি কোন ষাড় বা গাভী আল্লাহ সম্পর্কে প্রতিচ্ছবি আঁকতো তবে তা ষাড় বা গাভীর ছবি হতো। রুমী বলেন যদি পশুরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাদশাহকে জানতে পারতো তবে ষাড় ও গাধা আল্লাহকে তাদের মতো দেখতে পেত।[৪] প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন বস্তু বা পদার্থের সাথে যুক্ত এবং প্রত্যেকেই মনে করে যে সে বস্তুই আল্লাহ্‌র প্রতিরূপ। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌কে আকারের মাধ্যমে জানতে চান

১. Mathnawi I. 3 11.
২. Mathnawi I, 1133.
৩. Mathnawi, I. 1134.
৪. (ক) Mathnawi II, 65.

তবে তিনি নিজের আকারের আলোকেই তা জেনে থাকেন অর্থাৎ নিজ আকৃতি আল্লাহ্য় আরোপ করে আল্লাহ্কে জানেন। রুমীর ভাষায়, কোন প্রেমিক যদি আল্লাহ্‌র সত্তাসারের ধারণা করেন তবে সে ধারণা আল্লাহর নাম ও গুণের ধারণা, নিগূঢ় সত্তাসারের ধারণা নয়। নিগূঢ় সত্তাসার ধারণার অতীত, ধারণা গুণ ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ সৃষ্ট নন, তিনি স্বয়ম্ভু। "প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি আল্লাহ্র ছায়ামাত্র, আল্লাহ্ স্বয়ং সূর্য, সূর্যকে বাধা দিবার মত শক্তি ছায়ার নাই"।[১] "যে সত্তা কোন ব্যক্তির চিন্তার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা আল্লাহ্‌র নিগূঢ় সত্তাসার নয়।"[২] "মানুষ যেসব বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে তা পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল, আল্লাহ ধ্বংসশীল বস্তু নয়, অতএব, আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করতে পারে না।" "আপনি যে সকল বস্তু চিন্তা করতে পারেন তা পরিবর্তন হয় ও নিঃশেষ হয়, যা চিন্তার মাঝে আসে না তাই আল্লাহ।[৩] "আল্লাহ অতিবর্তী অথবা অন্তর্ব্যাপী কোন সত্তা নয়, এমন কি এই দুইটির মধ্যবর্তী কোন সত্তাও নয়। তাঁর সত্তাসার সম্পর্কে "কেমন" এবং "কেন" প্রশ্ন অবান্তর। কোন চিন্তাই তাঁকে ধারণা করতে পারে না, কারণ তাঁর সত্তা কার্যকারণ সম্পর্কের আওতাভুক্ত নয়"।[৪] আল্লাহ্ বিশ্বে ও মানবের সাথে যুক্ত নয় কিংবা বিচ্ছিন্ন নয়, পূর্ণ পরম সত্তা সকল গুণ, ব্যাখ্যা ও কার্যকারণ নিয়মের অতীত'।[৫]

তিনি কোন কার্যকারণ সম্পর্কের সাথে যুক্ত নন। মানুষের দুঃখে আল্লাহ্র হৃদয় বিগলিত হয় না বা তাঁর ব্যথায় তিনি দুঃখ পান না। একথা সত্য যে তিনি প্রেমময় ও দয়ালু কিন্তু তাঁর দয়া মানুষের দয়ার মতো নয়, মানুষের দয়ার প্রকৃতি দুঃখ ছাড়া কিছু নয়। কেবলমাত্র অসংজ্ঞায়িত দয়ার আংশিক ফল সম্পর্কে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। দয়ার প্রকৃতিও ধারণাতীত। সুতরাং আল্লাহ্র নিগূঢ় সত্তাসারে আমরা যে পূর্ণতা আরোপ করি তা পূর্ণতার ফলাফল এবং তা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানি। যদি তাকে জীবনের সমুদ্র অথবা সমুদ্রের জীবন বলা হয়, তবুও এ উপমা দিয়ে তাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। একথা বলা যায় যে, আল্লাহ্ এমন এক সত্তাসার

১. Mathnawi IV, 2111.
২. Mathnawi IV- 3701.
৩. Mathnawi II, 3107.
৪. c.f Mathnawi III, 3631—3636.

যা হতে সবকিছু উৎপত্তি হয়েছে, তিনি প্রত্যেকটি জীবনের উৎস। আল্লাহ্কে কেবলমাত্র উৎস বলে স্বীকার করে দর্শন রচনা করা হলে রুমীর দর্শন বেদান্তের নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম বা প্লটিনাসের অনির্বচনীয় এককের বা এক প্রকার বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় শূন্যতাবাদী দর্শনের মতো দর্শন হতো। রুমী এই নেতিবাচক ধর্মতত্ত্বের সাথে সদর্থক ধর্মীয় ধারণা সংযোগ করে এমন একটি ধর্মীয় মতবাদ গঠন করেন যার মধ্যে বর্ণিত আল্লাহ্র সাথে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম। এখন দেখা যাক তিনি কিভাবে এ কার্য সমাধা করেছেন।

প্রত্যেক শাস্ত্রপন্থী বা ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও সূফী অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত আল্লাহ্র সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। একজন দার্শনিক আল্লাহ্র স্বরূপের যে সংজ্ঞা দেন, একজন ধর্মতত্ত্ববিদ বা তেমন কোন সমালোচক তা খণ্ডন করেন এবং তৃতীয় একজন উভয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা উপেক্ষা করেন।[১] প্রত্যেক চিন্তাবিদই তাঁর নিকট পৌঁছানো যায় এমন পথের বর্ণনা দেন যা হতে মনে হয় যেন তিনি সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন এবং পূর্ণতা অর্জন করে জীবন সার্থক করেছেন। আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের সংজ্ঞা, তাঁর কাছে পৌঁছানোর পথের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, তার মধ্যে সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেছে এবং বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলেই তা ঘটেছে। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জ্ঞান লাভের জন্য অভিজ্ঞতার উপর, বুদ্ধিবাদী দার্শনিক বুদ্ধির উপর এবং সজ্ঞাবাদী দার্শনিক সজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাদের মতবাদকে আতিশয্য দোষে দুষ্ট করে ফেলেন, তাদের মতবাদ একেবারে সম্পূর্ণ সত্য নয় বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় বরং সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণমাত্র। আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান রুমী অন্ধকারে অবস্থিত একটি হাতী সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানের মাত্রার সাথে তুলনা করে একটি উদাহরণ দেন।[২] উদাহরণটি অতি চমৎকার। কয়েকজন ভারতবাসী একটি হাতীকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। নিয়ে আসার পূর্বে উক্ত ভারতবাসীরা হাতী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। জন্তুটিকে অন্ধকার ঘরে রেখে অন্য কয়েকজন ব্যক্তি জন্তুটির বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করে জন্তু সম্পর্কে

১. Mathnawi II, 2923-2924, 2926-2928, 2942,

২. Mathnawi III, 1259 "হাতীটি একটি অন্ধকার ঘরে ছিল, কিছুসংখ্যক হিন্দু এটাকে প্রদর্শনীর জন্য এনেছিল।"

পূর্ণ জ্ঞান লাভের দাবী করে। তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি হাতীর অংশবিশেষ অর্থাৎ হাতীর লেজ, পা, শুড়, দেহ ইত্যাদির যে কোন একটি স্পর্শ করে প্রত্যেকে হাতী দেখেছে ও হাতী সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই হাতীর আংশিক জ্ঞানলাভ করেছে। হাতীর পা স্পর্শকারী ব্যক্তির নিকট হাতী একটি স্তম্ভ স্বরূপ, লেজ বা শুড় স্পর্শকারীর কাছে হাতী একটি লোহার পাইপের মতো, পৃষ্ঠে আরোহণকারীর কাছে হাতী যেন একখানি পালংকের মতো। প্রত্যেকের হাতে একটি করে প্রদীপ থাকলে তাদের মতভেদ দূর হতো।[১] বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও সূফীদের জ্ঞান হাতী দর্শনকারীদের জ্ঞানের মতো। হাতী সম্পর্কে জ্ঞানলাভকারী ব্যক্তিদের মতো তাঁরা আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের দাবী করেন। বস্তুতঃ হাতী সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ, আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ, তাঁরা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানলাভ করেন।

রুমী আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানলাভের কথা যে উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন তা অতি চমৎকার। মানুষ যত ঐশীগুণে গুণান্বিত হোক না কেন বা পূর্ণতা অর্জন করে আল্লাহ্‌র সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হোকনা কেন, মানুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে না। রুমী যে উপমা দিয়েছেন তা মিথ্যা নয়। তার মধ্যে আংশিক সত্য আছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। কোন ব্যক্তিই নিরাকার সত্তাকে আকারহীন বস্তুর মধ্যে দেখতে সক্ষম নয়, কোন না কোন আকারের মাধ্যমেই পরম নিরাকার সত্তাকে কল্পনা করা হয়। যারা সেইসব আকারের উর্ধ্বে উঠে অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, যারা উর্ধ্বে উঠতে পারে তারা জ্ঞানলাভ করে উর্ধ্বগতিতে পরম উৎসের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম। কাল্পনিক আকার সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে ও তার উর্ধ্বে উঠে পরম সত্তাকে দেখার মধ্যেই আত্মিক উন্নতির সোপান নিহিত এবং এই ভাবেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। রুমী অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদদের চেয়ে অধিক পরিমাণে রূপক ও উপমা দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে ইমাম আল-গাজ্জালীর দেওয়া

১. Mathnawi III, 1268.

উপমা উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁর মতো অনুরূপতা ও উপমার পার্থক্য বজায় রেখেছেন। রুমী বলেন যে, দৃশ্যমান জগতে আল্লাহ্‌র বা ঐশী সত্তার অনুরূপ কিছু নাই, তবুও মানুষ উপমা দেয়। ব্যাখ্যার জন্য উপমা অতি প্রয়োজনীয়। যখন আল্লাহ্‌কে আলোর সাথে অথবা বেহেস্তকে বাগানের সাথে তুলনা করা হয়, তখন তা অনুরূপ বোঝায় না, তা উপমামাত্র। আল্লাহ্ গুণহীন অমূর্ত সত্তা নন এবং গতিশীল জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় জগতের নিষ্ক্রিয় সত্তা নন। রুমীর মতে, তিনি নতুন সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকেন। সমগ্র বিশ্বজগতের মহাপরিচালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কখনো অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকেন না। তিনি গতি ও ক্রিয়া পছন্দ করেন, আর সে কারণে বলা হয়েছে যে, নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে নিষ্ফল প্রচেষ্টা অনেক ভাল। অনেকে সূফীবাদকে নিষ্ক্রিয়বাদ বলে উপেক্ষা করেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূফীবাদ সক্রিয়বাদেরই অঙ্গরূপ মাত্র। আল্লাহ্ অসীম গুণ, শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী, তিনি অফুরন্ত প্রেমের পরম ভাণ্ডার। তাই তাঁর গুণ, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। প্রেমের দ্বারা হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

রুমী বলেন যে, আল্লাহ্ নির্গুণ অমূর্ত সত্তা নন বা তাঁর মধ্যে মানবতাকে বিলিয়ে দেওয়ার অর্থ সাগরের মাঝে এক বিন্দু পানির মত ব্যক্তিত্বহীন হয়ে হারিয়ে যাওয়া নয়। "ঐশী গুণে গুণান্বিত হও" তিনি এই মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। সক্রিয় জীবন যাপনের মাধ্যমে সৎ গুণ অর্জন করে আত্মিক উন্নতির চরম পর্যায়ে পূর্ণ মানবত্বের স্তরে পৌঁছে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন করে পরম ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে মানব জীবন সার্থক করাই তাঁর দর্শনের মূল কথা। তাঁর আল্লাহ্ সম্পর্কীয় মতবাদ বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বি ঈশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদ নয়, এটা একটা একেশ্বরবাদী মতবাদ। এই একেশ্বরবাদী মতবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ, ইবনুল আরাবীর অদ্বৈতবাদ, পারমেনিডেসের সত্তাবাদ, মুতাজিলাদের নির্গুণ একত্ববাদ, প্লেটোর বৌদ্ধিক ধারণাবাদ, প্লটিনাসের অনির্বচনীয় একত্ববাদ, মার্টিনিউর অনির্বচনীয় একত্ববাদ, হেগেলের পরমেশ্বরবাদ, ব্রাডলির পরব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ, সোহরাবর্দী মকতুল-এর আলোকরূপী পরম সত্তাবাদ নয়, কোরানের উপর ভিত্তি করে

ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সমন্বয় সাধন করে এমন এক মতবাদ গড়ে তুলেছেন যাকে উৎকর্ষ সাধিত ইসলামী 'ওয়াহদাতুশ শহুদ মতবাদ' খোদাবাদ বা তৌহিদবাদ বলা যায়। এ মতবাদের পক্ষে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ, প্রকৃতিবাদ, পরব্রহ্মবাদ ও আলোকবাদের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এখানে একজন ভক্ত বা প্রেমিক আধ্যাত্মিক জগতের অধীশ্বরের সাথে প্রার্থনা, ত্যাগ, সৎকর্ম ও সৎচরিত্র গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। সুতরাং রুমীর দর্শনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র ধারণা কোন ব্যক্তিত্বহীন সত্তার ধারণা নয় বরং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধ্যাত্মিক সত্তা।[১] তাঁর তৌহিদবাদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই মতবাদ বিশুদ্ধ একত্ববাদ। এখানে মানুষ তার স্বীয় ইচ্ছাকে সেই এক বিরাট ও মহান ব্যক্তির ইচ্ছায় নিমজ্জিত করতে পারে। আল্লাহ বিশ্বপ্রভু, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা সৌভাগ্য দান করেন। তিনিই রাত্রিকে দিন করেন এবং দিনকে রাত্রি করেন, মৃতকে জীবিত করেন এবং জীবিতকে মৃতে পরিণত করেন এবং যাকে ইচ্ছা জীবিকা দান করেন। তিনি সৃষ্টির সর্বদেশে বিরাজমান, সর্বজ্ঞান ও সর্বশক্তির আধার এবং সর্ব প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তি ও সম্পূর্ণ সত্তা। আল্লাহ নিরবয়ব ও নিরাকার। আমাদের স্থূল চক্ষুতে তাঁকে দেখার শক্তি নাই। বাহ্যিক দৃষ্টি দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ আলোর উপর নির্ভরশীল। তিনি অসীম, স্থান ও কালের অতীত। আমাদের আত্মা আল্লাহ্‌র সত্তা হতে আলোকরূপে আগত, এর গতি উপরের দিকে, এর সমগ্র কার্য আল্লাহ্‌র সাহচর্য লাভ। সৎকার্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মোচিত হলে আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব। নির্জীব পদার্থ, সজীব জন্তু ও অন্যান্য বস্তুর ভিতর আল্লাহ্ যেমন পরিব্যাপ্ত, মানবাত্মাতেও আল্লাহ্ ততোধিক পরিব্যাপ্ত ; আর সে কারণে আত্মা ঐশীগুণে গুণান্বিত হয়ে নিজেকে এমনভাবে উজ্জ্বল করতে পারে যে, সে তখন আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ ধারণ করে আল্লাহ্‌র সন্দর্শন লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ সর্ব সৌন্দর্য ও জ্ঞানের স্রষ্টা, তাঁর দর্শনজনিত সুখ, সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কারণ তিনিই চিরসুন্দর ও জ্ঞানময়। যে আত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে সেই প্রেমিক হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রেমিককে

১. Dr. R. A. Nicholson : The Idea of Pessonality in Sufism.

প্রেমের পথে উন্নীত করে দর্শনজনিত ও উপলব্ধিজনিত জ্ঞান দান করেন। তাই যে ব্যক্তি জীবন পথে চলার সময় ব্যক্তিস্বসম্পন্ন মহান আল্লাহ্‌কে উপাস্য বলে গ্রহণ করে, তাঁরই আদেশ ও নিষেধানুসারে চলে, ভালবাসা ও প্রেমের পথে অগ্রসর হয় ও সংকর্ম করে সে ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। প্রেমময়ের চিন্তায় সমগ্র মন ও প্রাণ নিমজ্জিত করে সে প্রেমময়ের সৃষ্টিকে বাহু প্রসারিত করে আলিংগন করে, সে বুঝে যে এই সকল তাঁরই সুন্দর প্রকাশ। এখন ওয়াহ্‌দাতুল শহুদ বা সর্বঈশ্বরবাদ বা খোদাবাদ আলোচনায় মন নিয়োগ করতে হয়, কারণ এই মতবাদ সূফীতত্ত্ব বিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দ্বাদশ অধ্যায়

'ওয়াহদাতুশ শহুদ' সর্বধরেশ্বরবাদ বা খোদাবাদ

জালালউদ্দীন রুমীর সূফীবাদ : ওয়াহদাতুশ-শহুদ[১] সর্বধরেশ্বরবাদ বা খোদাবাদ

সূফী দর্শন ও সাহিত্যের পাঠক মাত্রই এটা সম্ভাব্য লক্ষ্য করে থাকবেন যে অধিকাংশ লেখক সূফীবাদকে এবং বিশেষ করে জালালউদ্দীন রুমীর মতবাদকে "ওয়াহদাতুল ওজুদ" বা সর্বেশ্বরবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[২] একটু মনোযোগ সহকারে সূফী মতবাদগুলো অনুধাবন করলে এই ভ্রান্তি দূর হয় ও রুমীর মতবাদকে ওয়াহদাতুল শহুদ' বা সর্বধরেশ্বরবাদ বলে স্বীকার করতে হয়। সাধারণতঃ সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলতে পাশ্চাত্য দর্শনে যে যৌক্তিক অদ্বৈতবাদ বা বিশ্বতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদকে বোঝায় সূফী অদ্বৈতবাদ তা হতে ভিন্ন ধরনের। সূফীবাদের মধ্যে পরাতাত্ত্বিক ও নৈতিক ধারণাগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সূফীবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বললে তার বিশেষ একদিক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়। সূফীবাদ একটি ব্যাপক শব্দ। এই মতবাদ যৌক্তিক খোদাবাদ, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, সর্বধরেশ্বরবাদ ইত্যাদি মতবাদের সংমিশ্রণজাত সার্বিক মতবাদ। ইসলাম ধর্মে সূফীবাদকে শাস্ত্রপন্থী মতবাদ বা অন্য প্রকার পরাতাত্ত্বিক মতবাদ হতে আলাদা করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতবাদরূপে স্বীকার না করে আত্মিক উন্নতির সার্বিক পথ হিসাবে স্বীকার করা হয়। দর্শন শাস্ত্রে সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ভাল।

সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা 'সবই ঈশ্বর' আর ঈশ্বরই সব'। ঈশ্বর ও জগৎ এক। ঈশ্বর নিরপেক্ষ জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই আর জগতের বাইরে ঈশ্বরের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পার্সী ভাষায় এই মতবাদকে 'হামাউস্ত'

---

১. আবদুল মওদুদ : মুসলিম মনীষা পৃ : ১১৪, ১১৭।

২. (I) Syed Abdul Vahid : Iqbal, His Art and Thought, p. 96.

(II) আবদুল মওদুদ মুসলিম মনীষা, পৃ: ১১৯।

(III) Dr. Khalifa Abdul Hakim : The Metaphysics of Rumi. Fourth impression, 1965, p. 139.

বা 'সকলই তিনি' এবং আরবী ভাষায় ইবনুল আরাবীর দর্শনে ওয়াহদাতুল ওজুদ' সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় 'ওয়াহদাতুল ওজুদ'কে সত্তার ঐক্য বলা হয়। সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার ; কারণ উপরে বর্ণিত অর্থ এক আল্লাহ্ ও বিশ্ব সম্পর্কের সাথে যুক্ত। 'সকলই আল্লাহ্' এই উক্তি একটি সবিরোধী উক্তি। এই 'সকল' শব্দের অর্থ যদি 'এক সত্তা' অথবা 'পরম সত্তা' বলা যায় তবে তা অধিক যুক্তিসংগত হয় এবং পার্সী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত অর্থের চেয়ে আরবী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত অর্থ সঠিক বলে মনে হয়। পরম সত্তা সম্পর্কে সকল ব্যাখ্যাকে সর্বেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়, যদি তা সত্তার ঐক্যের প্রতি ইংগিত দেয়। সে সত্তার প্রকৃতি যেমন হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি নাস্তিকবাদকেও এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলা যায়। যেমন শোপেনহাওয়ার বলেছেন যে, সর্বেশ্বরবাদ নাস্তিকবাদেরই বৈশিষ্ট্য। ফিকটের নৈতিক অদ্বৈতবাদ, হেগেলের সর্বঈশ্বরেশ্বরবাদ, স্পিনোজার একক দ্রব্য মতবাদ ও এই ধরনের সকল অদ্বৈত-বাদী মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলা যায়। সুফীবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ বললে তা হতে এক পরম সত্তা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছুই বোঝা যায় না।

সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের বীজ কোরানে আছে কি ? সাধারণতঃ কোরান খোদাবাদী মতবাদ প্রচার করে। জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ ও সৃষ্ট জগৎ সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট বস্তু হতে সম্পূর্ণ আলাদা। জগতের কোন কিছু তাঁর সাথে তুলনা হয় না, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি এবং স্রষ্টা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমগ্র সৃষ্টি মায়া ছায়া বা অস্তিত্বহীন নয়, এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। আল্লাহ্ শূন্য বা অনস্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের সম্ভাব্য অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র অনিবার্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, আবার তাঁর ইচ্ছায় ধ্বংস হতে পারে, অনস্তিত্ব বা শূন্য অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। ধর্মীয় চেতনার ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, মানুষের মন এই ধরনের মৌলিক মতবাদের উপর বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থাকে না, অন্যরকম চিন্তা করতে চেষ্টা—করে। খোদাবাদের উৎকর্ষ সাধন ও গভীর বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা

যায় যে, খোদাবাদের মধ্যে এমন একটি ধারণা আস্তে আস্তে জন্ম লাভ করে যার ফলে মানুষ বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব ও বিশ্বের সমগ্র বস্তু বা সত্তা যদি আদৌ অস্তিত্বশীল হয় তবে তা আল্লাহ্‌র দ্বারা অস্তিত্বশীল এবং আল্লাহ্‌র মধ্যেই অস্তিত্বশীল হয় এবং অস্তিত্ব যদি বাস্তব হয় তবে তা ভিন্ন কিছু নয়। কোরানের খোদাবাদ আভ্যন্তরীণ যৌক্তিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য এই ধরনের অদ্বৈতবাদ-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে।[১] আর এর প্রমাণ কোরানের বিভিন্ন স্থানের উক্তি হতে পাওয়া যায়।

কোরানে বলা হয়েছে 'যে দিকে মুখ ফিরাও না কেন সেখানেই আল্লাহ্‌র উপস্থিতি আছে।' (২ : ১১৫) ; 'আমরা (আল্লাহ্) তাঁর (বান্দার) কণ্ঠশিরা হতেও নিকটবর্তী' (৫০ : ১৬) 'আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী স্থানে যাতায়াত করেন' (৮ : ২৪), 'যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন তা আপনি করেন নাই, আল্লাহ্ করেছেন' (৮ : ১৭) ; 'আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো (২৪ : ৩৫)। 'তিনি আদি, অন্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য' (৫৭ : ৩)। 'আমাদের প্রভু অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং আকুল আবেদনে সাড়া দেন' (১১ : ৬১) ; 'একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তাঁর সত্তা ছাড়া অস্তিত্বশীল সবকিছুই ধ্বংস হবে' (২৮ : ৮৮)। অন্যকথায় বলা যায় আল্লাহ্ প্রথমে যেন তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব হতে বহু দূরে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় জগতের সিংহাসনের উপর বসে থেকে বিশ্বকে রক্ষা করেন, বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং বিশ্বের নিকট হতে অনেক নিকটবর্তী হন, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণরগ হতেও অধিক নিকটবর্তী হন, মানুষের অনেক কার্যকে তার নিজের কার্য বলে মনে করেন, তারপর আসমান ও জমিনের জ্যোতি বা আলো হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং শেষে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী সত্তা হন।[২] যার জন্য বলা হয় যে, তিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তাঁর সত্তা ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই ধ্বংসশীল। এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ বলা হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, অবতারবাদ বা মানব গুণারোপী খোদাবাদ ছাড়া সকল প্রকার খোদাবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত এক সর্বব্যাপী আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আছে এবং তার মধ্যেই সব

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim, The Metaphysics of Rumi, Lahore, 1965 p. 140

২. জ্যোতি হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)-এর মেশকাতুল আনোয়ারের বঙ্গানুবাদ এস. এম. ইসহাক আলী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭২, রাজশাহী, পৃ-২।

কিছুই অন্তর্ভুক্ত আছে বলে উল্লেখ করে ততক্ষণ তা অদ্বৈতবাদী মতবাদ। এই প্রকার খোদাবাদকে সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ ও পূর্ণ অদ্বৈতবাদ হতে ভিন্ন করে দেখার জন্য সর্বধরেশ্বরবাদ বলা হয়। সর্বধরেশ্বরবাদ, অতি-বর্তী খোদাবাদ ও সর্বেশ্বর মধ্যবর্তী মতবাদ। আল্লাহ্‌র সাথে জীব ও জগতের সম্পর্কে প্রশ্ন ও মতবিরোধ থেকেই একেশ্বরবাদ বা খোদাবাদের তিনটি রূপের উৎপত্তি হয়েছে; অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ সর্বেশ্বরবাদ ও সর্বধরেশ্বরবাদ একেশ্বরবাদেরই তিনটি রূপ মাত্র। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে অনন্তকাল ধরে আল্লাহ্ একই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি মনে মনে একটি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ এই জগৎকে শূন্য হতে সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পর জগতের বাইরে অবস্থান করেন ও প্রয়োজন অনুসারে হস্তক্ষেপ করেন। আল্লাহ্‌ ও বিশ্বের দুই স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে কোন আন্তর সম্বন্ধ নাই। উভয়ের সম্পর্ক বাহ্য সম্পর্ক। সর্বেশ্বরবাদ এই জগতের এক ঐক্য, আধ্যাত্মিকতা, জগতের মধ্যে আল্লাহ্‌র ব্যাপ্তি এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র সর্ব ব্যাপকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্ ইজগতের অন্তর্যামী সত্তা আর আল্লাহ্‌র সাথে জগতের সম্পর্ক অন্তর্ব্যাপী। বস্তুতঃ সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা আল্লাহ্‌ই সব, সবই আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ ও বিশ্বজগৎ সমান, এক ও অভিন্ন, আল্লাহ্‌ নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ঐক্য ছাড়া বহুর অস্তিত্ব নাই। জড়, প্রাণ, মন, এক কথায় সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র অনন্ত সত্তায় বিধৃত। দার্শনিক স্পিনোজার ও ইবনুল আরাবীর মতবাদী 'সর্বেশ্বরবাদী' মতবাদ।

সর্বধরেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ। আল্লাহ্‌র সাথে জীব ও বিশ্বজগতের সম্পর্কের প্রশ্নে সর্বধরেশ্বরবাদ বলে যে, আল্লাহ্‌ জীব ও জগতের ভিতরে অবস্থিত এবং বাইরেও অবস্থিত। আল্লাহ অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয়ই। সর্বধরেশ্বরবাদের অনন্ত, অসীম ও প্রেমময় আল্লাহ্‌ সসীম ও শান্ত জীব জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেকে উপলব্ধি করেন। তিনি সব কিছুই ধারণ করে আছেন এবং সে কারণেই তিনি সর্বধরেশ্বরবাদ। সর্বধরেশ্বরবাদ এক ও বহু, ঐক্যের ও বিভেদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। জীব ও জগতের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সত্তা

বর্তমান। এই মতবাদ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা ও আল্লাহ্‌র সাথে জগতের অনিবার্য ও আংশিক সম্পর্ক স্বীকার করে। শেলিং-এর ছাত্র কাউসের ভাববাদী সর্বেশ্বর-বাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরম সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। জালাল উদ্দীন রুমী ও ক্রশউসের মতো অনিবার্য ও আংশিক সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। রুমী মানব দেহকে একটি দেহ ও বিশ্ব জগতকে একটি ঐশী দেহ বলে মনে করেন।

সূফীবাদের ইতিহাসের মধ্যে উপরোক্ত অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও সর্বধরেশ্বরবাদ এই তিনটি মতবাদ দেখা যায়। প্রাথমিক যুগের সূফীদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সূফী মত অনুসারে একজন মানুষ সকল প্রকার মন্দ, অসৎ ও পাপ কার্য হতে দূরে থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে নৈতিক পবিত্রতা অর্জন করে সংসার ত্যাগী বৈরাগ্য জীবন যাপন করতেন এবং অতিমাত্রায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতেন। প্রাথমিক যুগের মানুষ আল্লাহ্‌কে শাসক, বিচারক, শাস্তিদাতা দয়ালু ও ত্রাণকর্তা চিন্তা করতেন। তবে এ কথা স্বীকার্য যে এই ধারণার মধ্যেই নিহিত ছিল সর্বধরেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের বীজ। 'ঐক্যের' উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে 'বহুত্বের' অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে এবং বহুত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে 'ঐক্য' বহুত্বের অন্তর্নিহিত সত্তায় পরিণত হয়েছে এবং বহুত্ব বা বিশ্বের অতীতে 'ঐক্যের' অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য জগৎ বহুত্ব বা জাগতিক বৈচিত্র্যের উপর বেশী পরিমাণে জোর দেওয়ায় পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদী বা জড়বাদী দর্শনের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অনেক সময় স্বীকার করতে পারে নি। তেমনি আবার প্রাচ্যের দর্শনে আল্লাহ্‌র একত্বের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দানের ফলে ঐক্যের বাইরে বহু বা বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে বললেও চলে। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপই প্রাথমিক যুগের ইসলামী সূফীবাদের বৈশিষ্ট্য আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর গুরুত্ব আরোপের ফলেই ক্রমান্বয়ে সেখান হতে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের উৎপত্তি হয়। আল্লাহ্‌র অসীম ও সর্বব্যাপী শক্তির উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করায় এবং তার উপর নির্ভর করায় মানুষের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা, ক্রিয়া, নৈতিক পূর্ণতা অস্বীকৃত হয়েছে। মানুষের সকল কার্য ও ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ পরম উৎস।

প্রাথমিক যুগের সুফীবাদের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রথমে মানুষ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে সংসার ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। পরবর্তীকালে প্রেম ও জ্ঞান ভয়-ভীতির স্থান দখল করেছে। হাসান আল-বসরী, মালিক দিনার, ফয়জান আয়াজের শিক্ষার মধ্যে দেখা যায় যে, তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে সংসার ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছেন।[১] হযরত রাবেয়া বসরী আল্লাহ্‌কে প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রেমের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করতে চেয়েছেন।[২] এই প্রেম বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক প্রেম। বেহেশ্‌ত লাভের আশায় বা দোজখের আগুনের উত্তাপ হতে রক্ষা পাওয়ার আশায় তিনি আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন নি। আল্লাহ্‌ পরম প্রেমিক, তাঁকে পাওয়ার জন্যই তিনি তাঁকে ভালবেসেছেন। হাসান আল-বসরীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, শাস্তি-দাতা ও ত্রাণকর্তা হিসাবে কল্পিত হয়েছে কিন্তু হযরত রাবেয়ার কাছে আল্লাহ্ পরম প্রেমিক। এখানে আল্লাহ্‌ বিচারক বা শাস্তিদাতা নয়, বরং ধ্যানের কাম্যবস্তু প্রেমময় সত্তা। এই প্রেম প্রথমে কেবলমাত্র প্রেমিক ও প্রেমিকা, এই দুইজনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, পরে প্রেমিক প্রেমে আত্মহারা হয়ে একমাত্র প্রেমাস্পদ বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে অন্যান্য সব কিছুকে ছায়া, মায়া ও অলীক বলে মনে করে। একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। এই ধারণা হতে উৎপত্তি হয় সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ। হযরত রাবেয়ার প্রেমের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমিকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও বায়েজিদের প্রেমের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমিকা, উপাসক ও উপাস্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক ও অভিন্নরূপে দেখা যায়। বায়েজিদই প্রথম ফানাবাদ বা আত্মবিলোপ বা আত্মবিলুপ্তি সাধন মতবাদ প্রচার করেন এবং পরবর্তীকালের সুফীবাদের উপর ফানাবাদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। কথিত আছে আল্লাহ্‌ ও মানুষের অভিন্নতা সম্পর্কে বহু পূর্বে বায়েজিদ বলেছেন 'প্রকৃতপক্ষে আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন উপাস্য বা আল্লাহ্‌ নাই। অতএব আমার উপাসনা কর।'[৩] এমন কথা শেষ নবী হযরত মুহম্মদের পক্ষে বলা কঠিন, কিন্তু বায়েজিদ বলেছেন এবং পরবর্তীকালের সুফীরা এটা সমর্থন করেছেন,

১. ফরীদউদ্দীন আত্তার: তাযকেরাতুল আওলীয়া, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩২, ৩৬, ৮৭, অনুবাদ: আলহাজ মোঃ মোহাম্মদ শামসুল হক।

২. ফরীদউদ্দীন আত্তার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

৩. Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 143.

তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে উপাসক ও উপাস্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অভিন্নতা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেছেন। বায়েজিদ-এর মধ্যে তন্ময়তা ঐশী সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। তন্ময়তার স্থান সকল প্রকার নৈতিকতা, প্রার্থনা ও জ্ঞানের বহু ঊর্ধ্বে। শুধুমাত্র নির্ভরশীলতা বা 'তাওয়াক্কুল' তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। একজন সংসারত্যাগী সাধককে তিনি বলেছিলেন, "আপনার নির্ভরশীলতা দূরে রাখুন।" কোন একজনকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, "আমি সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করি, যে আল্লাহ্‌কে জানে কিন্তু তাঁর কাছে প্রার্থনা করে না এবং এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন আমি সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করি যে তাঁকে জানে এবং তাঁর উপাসনা করে।" আর এমন উক্তির অর্থ এই যে, যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত জ্ঞান লাভ জ্ঞাতা বা উপাসকের ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে দেওয়া। বেদান্তের "অহম্ আমি" (আমিই এক) অথবা তত্ত্বম অসি (তুমি সেই) মতবাদের মত তিনি বলেছেন "আমি আল্লাহ্‌র নিকট হতে আল্লাহ্‌র কাছে গেলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা আমার মধ্য হতে চিৎকার করে বললো, 'হে তুমিই আমি': এর অর্থ তিনি ফানা-ফিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র মাঝে তন্ময়তার স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। এই রকম উক্তি হতে লক্ষ্য করা যায় যে সহজ খোদাবাদী মতবাদ অতিক্রম করে মানবাত্মা আধ্যাত্মিক জগতে আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হয়ে মানবাত্মার ও পরমাত্মার অভিন্নতা ঘোষণা করে। "আমি আদি অন্তহীন অতল সমুদ্রের মতো।" কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আরশ', কুরছি বা আল্লাহ্‌র সিংহাসন কি? তিনি বললেন, "আমি।" লাওহ মাহফুজ, কালি-কলম ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি একই উত্তর দেন। একইভাবে তিনি সকল নবী ও ফেরেস্তাদের সাথে অভিন্নতার কথা প্রকাশ করেন। এই ধরনের প্রশ্নের এমন উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা আশ্চর্য হলে বায়েজিদ তার ব্যাখ্যা করে বললেন, "আল্লাহ্‌র মাঝে তন্ময় ব্যক্তি সব কিছুর মূল সত্য অর্জন করে পরম সত্যে পরিণত হন। যদি তিনি সেখানে না থাকেন তবে সেখানে কেবলমাত্র আল্লাহ্ সকল কিছু হিসাবে থাকেন এবং আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন।"

হযরত মুহম্মদের ইনতিকালের প্রায় তিন শতাব্দী পরে জ্ঞানমূলক আলোচনার দ্বারা সুফীবাদের উৎকর্ষ সাধন করা হয়। সসীম ও অসীম, মানবাত্মা ও

পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয় এবং উন্নত অবস্থায় মানবাত্মা ও অসীম সর্বশক্তিমান পরমাত্মার অভিন্নতা ঘোষণা করা হয়। আর পরবর্তী-কালের কিছুসংখ্যক সূফীদের উক্তিগুলো একটি মতবাদ রূপ দান করার ফলে একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নি। 'আল্লাহ সব কিছু'—এই মূল কথা। বিভিন্ন সূফীদের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সকলেই একটা সত্য স্বীকার করেছেন যে, "সত্তা যদি আদৌ বাস্তব হয় তবে তা আল্লাহ্‌র সত্তা বা স্বয়ং আল্লাহ্"। পরম বাস্তব সত্তা ও আল্লাহ এক ও অভিন্ন।" ইসলামে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য নাই। এই মূলমন্ত্রকে সূফীরা একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, "এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব নাই' এবং সূফী তার সাথে একথা যুক্ত করে বলেন যে, "সত্তার" মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া কার্যকরী কোন শক্তি নাই। সূফীদের মধ্যে একজন নাকি "আল্লাহু আকবর" (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) উক্তি উচ্চারণ করতে নিষেধ করেন, কারণ এ উক্তির মধ্যে একটির সাথে অন্যটির তুলনা করার ধারণা নিহিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে তুলনা করার মত কিছুই নাই।

ডক্টর আবদুল হাকিমের মতে পারস্যের মরমী কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অদ্বৈতবাদী বা একত্ববাদী ধারণা।[১] এর মধ্যে এক আল্লাহ্ বা অসীম সত্তাকে অস্তিত্বের সমুদ্র বলে মনে করা হয় যা হতে 'সমুদ্র প্রকৃতি' বা জল বুদবুদ কণার উৎপত্তি হয় ও পুনরায় সাগর জলে মিশে যায়। একমাত্র জলই বাস্তব, বুদ বুদ কণা ক্ষণস্থায়ী, সেগুলোর সত্তা বা অসত্তা একই সমান। যে সকল সূফীরা কেবলমাত্র এইরূপ পরব্রহ্মের পরম সত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁরা আল্লাহ্ ও মানুষের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। অনেক পারস্য কবি পরম সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিশ্বের বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে উপমার সাহায্যে মায়া ও অলীক বলেছেন। ফরিদ উদ্দীন আত্তারও সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে মানুষ ও বিশ্বের সাথে পরম সত্তার সকল প্রকার সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন। তিনি মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্বীকার করতে সক্ষম হন নি। তিনি বলেন, 'সীমাহীন সমুদ্রের জলও জল,

১. Dr. Khalifa Abdul Hakim ; Ibid, p. 145.

আবার পানেও সেই একই জল।' এই প্রকার মতবাদ অনুসারে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এসব যেন অস্তগামী পরিবর্তনশীল সূর্য আলোকচ্ছটার মত। আল্লাহ্ ও বিশ্ব বা ঐক্য ও বহুত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'আপনি যদি এক হাজার অবভাসিক বস্তু দেখেন তবুও বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে তা 'একটি মাত্র। এ যেন একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের মত, গণনার দিক দিয়ে 'বহু' কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এক'।

সকল সংখ্যা মূলতঃ 'এক' সংখ্যারই পুনরাবৃত্তি, দুই একের দুইবার পুনরাবৃত্তি, তিন তিনবার, তেমনিভাবে সকল বহুত্ব ঐক্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আল্লাহ্ বিশ্বদেহের আত্মা বা বিশ্বাত্মা, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে একই জীবন প্রবাহ শক্তি প্রবাহিত। ফরিদউদ্দীন আত্তারের মধ্যে 'আল্লাহ্ বিশ্বের আত্মা এবং বিশ্ব তাঁর দেহ, স্বর্গীয় আত্মা ও ফেরেস্তাগণ এই দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং সকল বেহেস্ত ও অন্যান্য সকল জৈবিক ও অজৈবিক অণু পরমাণু এই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এটাই মূল ঐক্য, অন্য সবকিছু মিথ্যা, মায়া ও অলীক মাত্র।

একটি আলোকবিন্দুর দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্টি একটি চক্র বা বৃত্ত আপাতঃ দৃষ্টিতে এই চক্র বা এই বৃত্তকে বাস্তব বলে মনে হয়। বস্তুতঃ আলোকবিন্দুই আসল, চক্র অবভাস মাত্র।

ঢেউ ও সমুদ্র বা ক্ষণস্থায়ী বুদ বুদ কণারূপ ব্যক্তি ও সত্তা ইত্যাদি উপমা অদ্বৈতবাদী দর্শনের উৎকৃষ্ট উপমা আর পারস্যের সূফী কবিতার মধ্যে এই ধরনের উপমা অতি পরিচিত উপমা। কবি মাগরেবী ও শাহাবী এমন উপমা ও ধারণা প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। কবি শাহাবী বলেন, 'বিশ্বজগৎ চিৎকার করে বলছে: 'তিনি ছাড়া কোন আল্লাহ্ নাই এবং ব্যক্তিরা চিন্তা করেছে তিনি বন্ধু না শত্রু। সমুদ্র নিজ তরঙ্গের সাথে মেতেছে এবং ভাসমান খড়কুটা মনে করছে যে সমুদ্র তার সাথে সংগ্রাম করছে।' এর অর্থ একক অস্তিত্বের সমুদ্র এই বিশ্ব মানুষের ভ্রান্ত মূল্যবোধ ও কল্পিত সংগ্রামের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন বা উদাসীন। সানাই ও ইস্পাহানি এই দুইজন অদ্বৈতবাদী বা সত্তার ঐক্যে বিশ্বাসী সূফী। তাঁদের দুইজনের পরেই ফরিদউদ্দীন আত্তারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জালালউদ্দীন রুমীও তার

রচনার মধ্যে সানাই ও আত্তারকে একসাথে উল্লেখ করে এবং নিজে একজন অদ্বৈতবাদী না হয়েও তাঁদের কাছে আপন ঋণের কথা ব্যক্ত করেছেন। রুমী বলেছেন, 'আত্তার আমার আত্মা, সানাই দুই চক্ষু। সানাই ও আত্তারের পরেই আমি এসেছি।[১] অন্যত্র তিনি বলছেন 'আত্তার প্রেমে সাতটি স্বরে ভ্রমণ করেছেন আমরা পথের একটি বাঁক অতিক্রম করতে পারিনি।''[২] মোটকথা সানাই ও আত্তার রুমীর পথ প্রদর্শক।[৩] তবে রুমীর স্বীকৃতি ও পরবর্তী কালের অন্যান্য সূফী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত হতে জানা যায় যে, রুমী সূফীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আত্তার বিশেষ অর্থে অদ্বৈতবাদী সূফী কবি ছিলেন এবং তাঁর কাসিদার মধ্যে বলেছেন যে প্রকৃতি পরম সত্তার প্রকাশ। এই দৃষ্টিকোণ হতে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্নতার কথা স্বীকার করে না সে একজন অবিশ্বাসী ও কাফের।

ডঃ খলিফা আবদুল হাকিম সাহেব আত্তারকে একজন অদ্বৈতবাদী ও নিষ্ক্রিয়তাবাদী সূফী হিসাবে উল্লেখ করে বলেন: ফরিদউদ্দীন আত্তার 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য সূফীদের জীবনী ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করার সময় অদ্বৈতবাদ ও নিষ্ক্রিয়তাবাদ-এর প্রতি মানসিক ঝোঁক দেখান''[৪] প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়তাবাদের কোন শিক্ষা আত্তারের মধ্যে নাই। 'আনাল হক' বা আমি পরম সত্য' হাল্লাজ মনসুরই প্রথম উচ্চারণ করেন এবং শাস্ত্রপন্থী মুসলমানদের দ্বারা শহীদ হন। শহীদের রক্তে বিধৌত এই 'আনাল হক' মতবাদ সূফীরা যত্নের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে বেদান্তের ''তত্ত্বম অসি' বা 'তুমি সেই' বা ''অহম ব্রহ্ম অসি 'বা' আমিই ব্রহ্ম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। হাল্লাজ মনসুরের পরে প্রায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সূফীই হাল্লাজের উক্তি ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। রুমী বলেছেন, ''যখন অত্যাচারী শাসকের হাতে ক্ষমতার কলম (শাসনদণ্ড ন্যস্ত) থাকে, তখন মনসুরের মত

১ ও ২. Quoted by Dr. Khalifa Abdul Hakim, Ibid, p. 149., শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৬৩।

৩. (I) ফরিদউদ্দীন আত্তার : তাযকেরাতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, অনুবাদ আলহাজ্ব মোঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৫।

(II) শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০ কলিকাতা, পৃঃ ৫১।

৪. The Metaphysics of Rumi, p. 150.

ব্যক্তিও শহীদ হন।"[১] 'আনাল হক' উক্তিটি ম্যাসিগণ 'কিতাব আল তাওয়া-সীন' গ্রন্থে 'আমি সৃজনশীল সত্য' অর্থে ব্যবহার করেছেন। মাহমুদ শাবিস্তারী তাঁর 'গুলসান-ই-রাজ' গ্রন্থে এই উক্তির অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমিই আল্লাহ্' কথাটি গুপ্ত রহস্যের পূর্ণ আবরণ মুক্ত একটি উক্তি, সেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন উক্তি করার মত আর কোন ব্যক্তি নাই। বিশ্বের সকল পরমাণু, যেগুলোকে টলটলায়মান বা দোদুল্যমান বা সুরামত্ত, অর্ধ-মাতাল সত্তা বলা যায়, সেগুলো এই উন্মত্ততার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও ঐক্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে নিজে অস্তিত্বশীল অবস্থায় থাকে। 'যখন একটি বৃক্ষ বলতে পারে 'আমি আল্লাহ্' তখন একটি উন্নত আত্মা বলতে পারবে না কেন? মুক্ত ব্যক্তি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে যে, 'সত্য কেবলমাত্র একটি'—আল্লাহ্‌র সামনে কোন দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কেবল মাত্র 'আমি' শব্দ আছে, আমরা, আপনারা ইত্যাদি শব্দের স্থান সেখানে নাই। 'আমি' 'আমরা' 'আপনি' 'তিনি' ইত্যাদি মিলে 'এক' হয়; কারণ ঐক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা চিরন্তন, অন্যান্য সব কিছু ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। পথ, পথিক ও ভ্রমণ সব কিছু মিলে এক হয়।

ফরিদউদ্দীন আত্তার 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য সূফীদের মতবাদ আলোচনা করেছেন এবং নিজের মতবাদ প্রকাশের সময় অদ্বৈতবাদের প্রতি কিছুটা সমর্থন জানিয়েছেন বলে মনে হয়। যা হোক পরবর্তী সূফীরা গ্রীক দর্শনের সত্তা ও অসত্তা সম্পর্কীয় মতবাদের প্রভাবে অসত্তার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সূফী দর্শনে 'পূর্ণ সত্তাবাদ' ও 'সত্তা ও অসত্তা' মিশ্রিত মতবাদের ধারণা দেখা যায়। আর এই ধারণা অনেকটা এরিস্টটলের 'আকার' ও 'জড়' মতবাদ বা প্লেটোর 'ধারণাবাদের' মত। এই মতবাদের মধ্যে স্রষ্টা সক্রিয় 'পূর্ণসত্তা' ও অসত্তা মিশ্রিত নিষ্ক্রিয় জড় যৌগিক সত্তার' মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করে। নিষ্ক্রিয় 'জড়' 'সক্রিয় আকার' ছাড়া শূন্য অর্থহীন বা কেবল সম্ভাবনা মাত্র। অতএব এই বিশ্বসত্তা ও অসত্তার আকার জড় পদার্থের মিশ্রণজাত বিশ্ব। সত্য,

১. Ibid, p 150, foot-note, quoted.

মংগল ও সুন্দর সত্তার গুণ, সেগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিশুদ্ধ সত্তার মধ্যে থাকে, বিশ্ব জগতের মধ্যে সেগুলো পরস্পর বিপরীত গুণের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। বিপরীত গুণাবলীর কেবলমাত্র নঞর্থক অস্তিত্ব আছে। আল্লাহ্ একমাত্র সত্তা এই মতবাদ ঠিক রেখে ও অদ্বৈতবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত সমালোচনা হতে তাঁদের মতবাদকে মুক্ত রেখে সূফীরা গ্রীক দর্শন হতে সত্তা সম্পর্কীয় ধারণা গ্রহণ করেন। ব্রাডলীর দর্শনের "বিভিন্ন মাত্রার সত্য ও বাস্তবের" মত সূফীরা বিভিন্ন বস্তুর আত্মিক উন্নতির বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে তাদের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা স্বীকার করেন। যে-বস্তু যে-পরিমাণে অসত্তার প্রভাব মুক্ত হয়ে অপূর্ণতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে সে-বস্তু ঠিক সেই পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া পরম সত্তা অসীম ও শান্ত জীব জগতের মধ্য দিয়ে নিজকে প্রকাশিত করেন। এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন। পরম সত্তার সাথে জগতের, 'ঐক্যের সাথে 'বহুর', অসীমের সাথে সসীমের, পূর্ণতার সাথে বিভিন্ন অপূর্ণতার এক অনিবার্য ও আংশিক সম্পর্ক আছে। বাহ্যিক জগতের বিভিন্ন বস্তু মিথ্যা নয়, এদের বিভিন্ন প্রকার বাস্তবতা আছে। পরম সত্তা পরম সত্য। আল্লাহ্ জ্যোতির আলোকে জগতের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। 'জগত সত্য' এই মতবাদকে 'ওয়াহদাতুশ্ শহুদ' মতবাদ বলা হয়। 'ওয়াহদাতুশ্ শহুদ' মতবাদ অনুসারে বিশ্ব ও আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এই মতবাদ 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা 'সত্তার ঐক্য' বা অদ্বৈতবাদের বিপরীত মতবাদ। 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' এই জগতের ঐক্য ও আধ্যাত্মিকতা, জগতের মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপকতার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে যে, অভিজ্ঞতার জগতে জীবন অলীক ও মায়ায় পরিণত হয়। এই মতবাদ মানুষের আত্ম-চেতনা, নৈতিক চেতনা, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য, আত্ম-নির্ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি অনেকাংশে অস্বীকার করে। সর্বেশ্বরবাদকে একমাত্র মতবাদ বলে স্বীকার করলে ধর্ম ও নৈতিকতা ইত্যাদি পরোক্ষভাবে অস্বীকার করতে হয় আর সে কারণে উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন যে, অদ্বৈতবাদ নৈতিকতাহীন মতবাদ।

অধিকাংশ সূফীরা 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদের বিপরীত মতবাদ 'ওয়াহ্-দাতুশ্ শহুদ' বা সর্বধরেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা পরম সত্তার অস্তিত্বের পার্শ্বে জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের

কথা স্বীকার করেন এবং এর সাথে অকল্যাণ, অমংগল বা অসৎ-এর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। অকল্যাণ ও অমঙ্গলের কোন সদর্থক বাস্তবতা নাই। আল্লাহ্ অমংগল সৃষ্টি করেন নাই এবং অমংগলের জন্য আল্লাহ্ দায়ী নন। অমংগলের নঞর্থক বাস্তবতা বা নঞর্থক অস্তিত্ব আছে। যেমন সুখের অভাবের নামই দুঃখ, তেমনি মংগলের অভাবই অমংগল, দুঃখ ও অন্ধকার যথাক্রমে আলো ও সুখের নঞর্থক বাস্তবতা। প্লটিনাসের দর্শনে নঞর্থক বাস্তবতা বা অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। আইনস্টাইন এই মতবাদ ব্যবহার করেন। তারপর এই মতবাদ ইসলামে অনুপ্রবেশ করে সূফীতত্ত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সূফীরা আল্লাহকে পূর্ণ বাস্তব সত্তা বা অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বকে সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। অমংগল-মংগলের অনুপস্থিতি বা সত্তার অনুপস্থিতি মাত্র।

ইবনুল আরাবীই প্রথম ও প্রধান দার্শনিক, যিনি ইসলাম ধর্মের সূফীবাদের মধ্যে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদকে সুন্দর দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গড়ে তুলেন। তাঁর যৌক্তিক অধ্যাত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে সম্পর্কে ইসলামী নীতির সংমিশ্রণের ফলে অনেক সমালোচকের পক্ষে তাঁর অদ্বৈতবাদ মন্তব্য করা অনেকখানি কঠিন হয়ে পড়েছে। অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে আল্লাহ বা পরম সত্তার ঐক্যকে স্বীকার করা হয় তা সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বহীন সত্তা ও অস্তিত্বহীন জগৎ। কিন্তু ইবনুল আরাবীর এমন উক্তিও আছে যা হতে মনে হয় যে, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। ইবনুল আরাবীর আল্লাহ্ সম্পর্কীয় মতবাদ নিয়েই নয় বরং অন্যান্য সূফীদের আল্লাহ্ সম্পর্কীয় ধারণা নিয়ে একই রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একমাত্র আল্লাহ্ সত্তাবান বা অস্তিত্বশীল সত্তা, অন্যান্য সব কিছু তাঁরই সত্তার উপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এক ও অভিন্ন মতবাদ। আর এর উপর ভিত্তি করেই যদি কেউ সূফীবাদকে সাধারণভাবে অদ্বৈতবাদ বলে তাতে কোন আপত্তি নাই। অদ্বৈত-বাদে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিমাত্র। সূফীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায় সূফীরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের ডাকে সাড়া দেন, তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, জীবিকা দান করেন, সম্মান দান করেন, সৎপথে পরিচালিত করে উন্নতির শিখরে

উঠতে সাহায্য করেন। অদ্বৈতবাদী দর্শনের ব্যক্তিত্বহীন আল্লাহ্‌র স্থান সুফী দর্শনে নাই। সুফীবাদকে সাধারণ অর্থে অদ্বৈতবাদ বলা ঠিক নয়। সর্বধরেশ্বরবাদ অর্থে ইসলামী অদ্বৈতবাদ বলা যায়। সুতরাং সুফীবাদকে অদ্বৈতবাদ বলার পূর্বে আমাদের বহু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সুফী যখন নিজেকে ঐশী গুণে গুণান্বিত করে, আত্মারূপ দর্পণ পরিষ্কার করে, ঐশী সত্তার ছবি দর্পণে প্রতি-ফলিত হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেন, আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ঐশী শাসন অনুসারে জীবন পরিচালিত করেন, নিজের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে উঠে অন্তরের মাঝে ঐশী সত্তার বাসের উপযুক্ত স্থান সৃষ্টি করেন, তখন এক প্রকার দ্বৈত অবস্থা থাকে, জীব ও স্রষ্টা, মানুষ ও আল্লাহ্, মানবাত্মা ও পরম আত্মার মধ্যে পার্থক্য থাকে যদিও এই দ্বৈত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা বা বর্ণনা করা যায় না। অনেকে এই অর্থেই রুমীর মতবাদকে সুফী অদ্বৈতবাদ বলেন। একজন সুফী 'মরার আগে মরে', মানবিক গুণকে বিশুদ্ধ করে ঐশী গুণের দ্বারা গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র মধ্যে বাস করেন। সুফী কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও নিজেকে শূন্য বা 'কিছু না' বলে উল্লেখ করেন। 'ফানা' বা তন্ময় অবস্থায় যখন সুফী বলেন যে, তিনি 'শূন্যত্বের শূন্য' তখন তাঁর ভাষার সঠিক অর্থ বুঝতে হয়। 'ফানা' বা আত্মবিলোপন বা 'আত্মবিলুপ্তি সাধন' বা তন্ময় অবস্থার পর 'বাকা' বা চিরন্তন জীবন লাভ হয়; সুফী অমরতা লাভ করেন। সুফী মরার আগে মরলে, 'মোরাকাবা' 'মোশাহেদা', 'শোগল', 'রাবেতা' ইত্যাদির মাধ্যমে ফানার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে 'বাকা' বা চিরন্তন জীবন লাভের পর্যায়ে উন্নীত হন. 'ফানা' অবস্থায় আল্লাহ্ ও আপন অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলেও 'বাকা' অবস্থায় এই স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেন। আর সে-কারণে দৃঢ়ভাবে এ কথা বলা যায় যে, রুমীর সুফীবাদ অদ্বৈতবাদ নয়, এটা বিশেষ ধরনের সর্বধরেশ্বরবাদ। তাছাড়া সুফীদের অভিনব সৃষ্টি নৈর্ব্যক্তিক অমরতা' মতবাদ আলোচনা করলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও পরিস্ফুটিত হয়। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হয় যে, সুফীবাদ কোন যৌক্তিক মতবাদ নয়, এ মতবাদ গভীর ও সুদৃঢ় নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐশী বিধানের অতি মাত্রায় অনুশীলন ও কার্যসম্পাদনের দ্বারা প্রাপ্ত সমগ্র জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ বস্তু দয়াল ও পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে অমূল্য সম্পদ।

ইবনুল আরাবীর মত কিছু সংখ্যক সূফী মানবাত্মা ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক মিলন বা একাত্মতা বর্ণনা করার সময় যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন, যৌক্তিক ধারা-বাহিকতা ও সংগতি রক্ষা করতে গিয়ে অদ্বৈত মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। সূফীর ধর্মীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে উপলব্ধি করলে সূফী অদ্বৈতবাদ বা সকল প্রকার যৌক্তিক বা বিশ্বতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। প্লেটোর যৌক্তিক রহস্যবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতীন্দ্রিয়বাদ হতে ভিন্ন যদিও প্লেটো তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদে সকল পরিদৃশ্যমান অবভাসিক জগতকে মায়ার জগৎ বলে উল্লেখ করেছেন। প্লেটো প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, প্রজ্ঞাকে পরম সত্তা বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা বুদ্ধি বা আত্মিক উন্নতির পথের প্রাথমিক সাহায্যকারী মশাল বা শক্তি হিসাবে স্বীকার করলেও পরম সত্তা বলে স্বীকার করেন নি। অধ্যাত্মবাদীদের মত প্লেটো বলেন যে, পরম সত্তা এক কিন্তু সে 'এক' ও প্রজ্ঞা অভিন্ন। সুতরাং প্লেটোর অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদকে যৌক্তিক একত্ববাদ বা প্রজ্ঞাবাদ বলা যায়। এই মতবাদ যৌক্তিক মতবাদ, ধর্মীয় মতবাদ নয়। জগৎ-ঈশ্বরবাদ অন্যান্য বিশ্ব আত্মাবাদ ইত্যাদি মতবাদকে যুক্তিসংগতভাবে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ বলা যায়, কিন্তু এ ধরনের অদ্বৈতবাদের সাথে সূফী ও অতীন্দ্রিয়বাদের অদ্বৈতবাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। জিয়ার্ডানো ব্রুনোর 'বিশ্বজীবনবাদ' ও সজীব প্রকৃতি-বাদকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। কিন্তু তেমন অদ্বৈতবাদের সাথে অতীন্দ্রিয়-বাদীদের বা সূফীদের মূল লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুর কোন মিল নাই। ঐ ধরনের অদ্বৈতবাদের মধ্যে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বের সার্বিক আত্মার কথা স্বীকার করলেও মানবাত্মার সকল স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক কালের বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা অদ্বৈত-বাদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর বুদ্ধিবাদী দর্শনের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী বা স্বজ্ঞাবাদী দর্শনের আংশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি যৌক্তিক প্রেমের মাধ্যমে অচেতন, ইচ্ছাহীন, লক্ষ্যহীন, ব্যক্তিত্বহীন, অনির্বচনীয় অনির্ধারিত, সর্বব্যাপী, পরম দ্রব্যকে জানতে চেয়েছেন। এটাই স্পিনোজার পরম দ্রব্যের স্বরূপ। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বের একটি গাণিতিক কাঠামো মাত্র। গাণিতিক নিয়মের

সার্বিকতা, এ কানুনবর্তিতা, অপরিবর্তনশীলতাই তাঁর ঈশ্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ঈশ্বরের কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। 'ন্যাচুরা ন্যাচুরানস' বা সৃজনধর্মী ঈশ্বর ও 'ন্যাচুরা ন্যাচুরাটা' বা সৃষ্ট জগৎ বা প্রকৃতি, জগতই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই জগৎ ইত্যাদি ধারণা দিয়ে তিনি 'এক' ও 'বহুর' উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার যে যৌক্তিক সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা দর্শনের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাঁর সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদের সাথে দার্শনিক একহার্ট বা জালালউদ্দীন রুমীর দার্শনিক মতবাদের তুলনা করলে রাত দিনের প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বললে পরবর্তী দুইজনের মত-বাদকে এবং বিশেষ করে রুমীর মতবাদকে 'ওয়াহদাতুল শহুদ' বা সর্বেশ্বরবাদ না বলে উপায় থাকে না। একই বস্তুর মধ্যে দুইটি বিপরীত ধারণা একই সময়ে উপস্থিত যুক্তিসংগত নয়। যুক্তিবিদ্যার মতে দুইটি পরস্পর বিপরীত ধারণা একই সাথে সত্য হতে পারে না কিন্তু ইসলাম এমন একটা ধর্ম এবং সূফীবাদ এমন একটি মতবাদ যার মধ্যে বর্ণিত আল্লাহ্ বা পরম সত্তা সকল যুক্তির উর্ধ্বে উঠে একই সাথে দুইটি পরস্পর বিরোধী ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন আল্লাহ্ আদি ও অন্ত, তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য। কোরানের এই ধরনের উক্তির উপর ভিত্তি করেই রুমী বলেন যে, আল্লাহ্ এক, তিনি ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অতীত, তিনিই সব কিছু আবার তিনি কিছুই না, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কোন স্থানে অবস্থান করেন না। তিনি প্রজ্ঞাময় কিন্তু প্রজ্ঞা তাঁর নাগাল পায় না, তিনি সকল আকৃতি দান করেন কিন্তু কোন আকার নাই, তিনি মানুষের প্রাণরগ হতেও নিকটবর্তী, কিন্তু সারা জীবন সন্ধান করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ জগৎ ও জীব, বিশেষ করে, মানুষের আত্মার অন্তর্নিহিত সত্তা কিন্তু জগতের কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনা করা যায় না। জগৎ ও আল্লাহ্, মানুষ ও আল্লাহ্কে সমান ও অভিন্ন মনে করলে এক ধরনের অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই যৌক্তিক বা বিশ্বতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদকে অতীন্দ্রিয় অদ্বৈতবাদ বা সূফী অদ্বৈতবাদের সাথে সংগতভাবে তুলনা করা যায় না। সূফী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন আল্লাহ্র অস্তিত্বে ও মানবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সুতরাং রুমীর সূফীবাদকে অদ্বৈতবাদ না বলে বিশেষ ধরনের সর্বেশ্বরবাদ বলাই অধিক যুক্তিসংগত।

গ্রন্থপঞ্জী

Abdul Hakim, K. : *The Metaphysics of Rumi*, fourth impression, 1965.
Islamic Ideology, Lahore 1965.

Ameer Ali, S. : *The Spirit of Islam*, Great Britain, 1961.

Arberry, A. J. : *Sufism*, London, 1969.
: *Mystical Poems of Rumi*, London, 1968.
: *Revelation and Reason in Islam*. Great Britain, 1965.
: *Classical Persian Literature*, George Allen
: & Unwin, 1958.
: *Oriental Essays* (edited), London, 1960.

Arnold, S. T. : *Legacy of Islam*, 1960.

A. M, Fairbairn : *Studies in the Philosophy of Religion and History*, London, 1876.

Afzal Iqbal : *Life and Works of Rumi*, Sh. Muhammad Ashraf.

Ayer, A. J. : *Philosophical Essays*. London, 1965.

A. Reza Arasteh : *Rumi the Persian*, Sh. Muhammad Asraf, Lahore. 1965.

Bergson Henri : *Creative Evolution*, London 1954. trans. by Dr. Arther Mitchell.

Burhan Amed Faruqi : *Mujaddid's Conception of Tawhid*, Lahore, 1970.

Burckhardt : *An Introduction to Sufi doctrine*, trans. by
: D. M. Matheson.

Browne, E. G. : *Literary History of Persia*, Vol. II, Cambridge, 1928, Vol. III Cambridge, 1950, Vol. IV. Cambridge, 1953.

Clement Huart : *A History of Arabic Literature*.

Fazlur Rahman : *Islam*, Oxford, 1964.

Gairdner, W. H. : *Al Ghazzali's Mishkat-ul-anwar* (The Niche

for lights) (Translation), Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1952.

Hasting : *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. II.

Husaini, S. A. Q. : *Ibn Al Arabi*, Sh. Muhammad Asraf, Lahore. First edition, Madras, June 5, 1931.

Hadland Davis, F. : *Rumi, the Persian Mystics*, Sh. Muhammad Asraf, Lahore (no date), First edition, London, 1907.

Hujveri : *Kashful Mahjub*, translated by R. A. Nicolson, London, 1911.

Hallaj : *In Encyclopaedia of Religion and Ethics*.

Ibnul Arabi : *Tarjuman al Ashwaq*, translated & edited by R. A. Nicholson, London, 1911.

: *Risalah fi Mana an-Nafs war-Ruh* (trans. by Palacios in Acts of the 14th Oriental Congress, Algiers, 1905.

: *Futuhat al Makkiyyah* (Passages translated and quoted by S. A. Q. Husaini ; A. M. A, Shustery ; A. E. Affifi).

: *Fusus al Hikam*. (Passages quoted and translated by A. M. A. Shustery, S. A. Q. Husaini, Khajz Khan, R. A. Nicholson)

Idries Shah : The Sufis, New York, 1964.

Iqbal S. M. : *Development of Metaphysics in Persia*, Lauzac & Co., London, 1908.

: *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Sh. Muhammad Asraf, Lahore, 1965.

John Caird *Spinoza*, London, MDCCCLXXXVIII

Khaja Khan, K. S. : *The Secret of Anal Haqq*, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1965.

Khaja Khan : *Wisdom of the Prophets* (Trans. of Ebnul Arabi's Fusus al-Hikam).

Kalabadi : *Kitab al Tarraf li Madhab Ahl al Tasawuf* (The Doctrine of the Sufis) trans. by A. J. Arberry. Cambridge University Press, Cambridge.

Muzaffar Uddin Nadivi, S. : *Muslim Thought and Its Source*, Sh. Muhammmad Asraf, Lahore, 1960.

Mir Valiuddin : *Quaranic Sufism*, Patna, 1959.

Macdonald, D. B. : *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, Lanore, 1960.

: *The Religious Attitude and life in Islam*, Sh. Munammad Asraf, Lahore, 1965.

Nicholson, R. A. : *The Mystics of Islam*, London, 1963.

: *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1967.

: *A Literary History of the Arab*, New York, 1907.

: *The Idea of Personality in Sufism*, London, 1964.

: *Rumi, Poet and Mystic*, London, 1950.

Rumi, Jalaluddin : *The Mathnavi*, trans. by R. A. Nicholson. Lazac & Co. Ltd., London, Book I & II, —1960, Book III & IV—1930, Book V & VI —1934.

: *Divan-i Shams Tabriz*, trans. by R. A. Nicholson.

: *Rubaiyat*, trans. by A. J. Arberry, London, 1949.

Rome Landu : *The Philosophy of Ibn Arabi*, George Allen & Unween, London, 1959.

Reza, A. : *Rumi the Persian, Rebirth in Creativity and Love*, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore.

Reuben Lavy : *Persian Literature*, Oxford University Press, London, 1955.

Sharif, M. M. (ed.) : *A History of Muslim Philosophy*, Vol. I & II, Harrassowitz, Wiesbaden, 1963.

: *Encyclopaedia of Islam*, Vol. I to IV, London, 1908—38.

Shustery, A. M. A. : *Outlines of Islamic Culture*, Second edition, 1954.

Syedur Rahman : *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, 3rd edition, 1963.

Stace, W. T. : *A Critical History of Greek Philosophy*, Newyork, 1967.

Titus Burckahart : *An Introduction to Sufi Dcctrine*, Sh. Muhammad Ashaf Lahore, 1968.

আবদুল মওদুদ : মুসলিম মনীষা, ঢাকা, ১৯৭০।

গোলাম রসুল, মোহাম্মদ : মওলানা জালালুদ্দীন রুমী, বগুড়া, ১৯৬৪।

বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ : পারস্য প্রতিভা, ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ ঢাকা ১৯৬৭।

: মানুষের ধর্ম।

ফরিদ উদ্দীন আত্তার : তাযকেরাতুল আওলীয়া (বংগানুবাদ), প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, আলহাজ্জ মোঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ঢাকা, ১৯৬৩।

ফজলুল করিম : মানব ধর্ম, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬২।

মনির উদ্দীন ইউসুফ : রুমীর মসনবী।

শ্রী হরেন্দ্র নাথ পাল : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রেসিডেন্সী-লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন : ইরানের কবি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৭৫।

শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইসহাক : বিশ্বপ্রেমিক রুমী : চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

a posteriori প্রত্যক্ষপর, অভিজ্ঞতা-লব্ধ
~~knowledge প্রত্যক্ষপর জ্ঞান
a priori প্রত্যক্ষপূর্ব, অভিজ্ঞতাপূর্ব, প্রাকসিদ্ধ
~~category প্রত্যক্ষপূর্ব আকার, প্রত্যক্ষপূর্ব জাতি
~~of knowledge জ্ঞানের প্রত্যক্ষপূর্ব আকার
~~condition প্রত্যক্ষপূর্ব শর্ত
~~form প্রত্যক্ষপূর্ব আকার
~~intuition প্রত্যক্ষপূর্ব স্বজ্ঞা
~~reason প্রত্যক্ষপূর্ব প্রজ্ঞা
a priorism প্রত্যক্ষপূর্বতা, প্রাক-সিদ্ধতা, প্রত্যক্ষপূর্বতাবাদ, প্রাক-সিদ্ধতাবাদ
ab (আঃ) পানি
'abd (আঃ) দাস, উপাসক
ability সামর্থ্য
~, Mental মানসিক সামর্থ্য
abiogenesis অপ্রাণজবাদ
abnormal অস্বভাবী, বিকৃত
absolute পরম, চরম, নিঃশর্ত, চূড়ান্ত
~agnosticism চরম অজ্ঞতাবাদ
~beauty পরম সৌন্দর্য, পরম সুন্দর
absolute being পরম সত্তা
~certainty পূর্ণ নিশ্চয়তা ; চূড়ান্ত নিশ্চয়তা
~cognition পরম বোধন, পূর্ণ জ্ঞান
~creation নিঃশর্ত সৃষ্টি
~ego পরমাত্মা
~existence পরম অস্তিত্ব
~experience পরম অভিজ্ঞতা, পূর্ণ অভিজ্ঞতা
~good পরম কল্যাণ, পূর্ণ কল্যাণ
~idea পরম ধারণা
~idealism পরম ভাববাদ
~identity পূর্ণ অভেদ
~mind পরম মন, বিশ্ব মন
~nothing শুদ্ধ অসত্তা
~nothingness পূর্ণ নাস্তিত্ব
~personality পরম ব্যক্তিত্ব
~power নিঃশর্ত ক্ষমতা, পরম শক্তি
~reality পরম বাস্তব সত্তা
~reason পরম প্রজ্ঞা, পরম যুক্তিবুদ্ধি
~space নিরপেক্ষ দেশ
~scepticism চরম সংশয়বাদ
~spirit পরমাত্মা
~substance পরম দ্রব্য
~thought পরম চিন্তা

absolute truth পরম সত্য, পরম সত্যতা
~value পরম মূল্য, পরম মান
absoluteness পরমত্ব
abstract অমূর্ত
~concept অমূর্ত ধারণা
~cosmology অমূর্ত বিশ্বতত্ত্ব
~idea অমূর্ত ধারণা, অমূর্ত ভাব
~matter অমূর্ত জড়
~monism অমূর্ত অদ্বৈতবাদ
~quality অমূর্ত গুণ
~reality অমূর্ত বাস্তব সত্তা
abstraction অমূর্তকরণ
abstractionism অমূর্তায়ন
absurd উদ্ভট
absurdity উদ্ভটতা
academicians একাডেমীয়গণ
accident } accidens } আপতিক গুণ, অবান্তর গুণ
accidentalism আপতনবাদ
acosmism মায়াবাদ, বিশ্বমিথ্যাবাদ
acquisition অর্জন
~, doctrine of অর্জনবাদ
acromatic গোপন শিক্ষা, মৌখিক শিক্ষা
action ক্রিয়া
~, cosmic জাগতিক ক্রিয়া
~, emotive আবেগাত্মক ক্রিয়া
action immoral অনৈতিক ক্রিয়া
~, moral নৈতিক ক্রিয়া
~, non-moral ন-নৈতিক ক্রিয়া
~, spontaneous স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া
~active সক্রিয়
~faculty সক্রিয় বৃত্তি
~intellect সক্রিয় বুদ্ধি
~reason সক্রিয় প্রজ্ঞা, সক্রিয় যুক্তিবৃত্তি
activism সক্রিয়তাবাদ, কর্মাদর্শবাদ
actual প্রকৃত, বাস্তব, যথার্থ
ad infinitum অশেষ পর্যন্ত, অনবস্থা দোষ
'adam-ul mahd (আঃ) শুদ্ধ অনস্তিত্ব
'adhab (আঃ) 'শাস্তি
~al hijab (আঃ) পর্দাজনিত শাস্তি
~al Jahl (আঃ) অজ্ঞতাজনিত শাস্তি
adaptation অভিযোজন
adjustment উপযোজন, সমন্বয় সাধন
adventitious idea বহিরাগত ধারণা
aesthetic কান্ত, সৌন্দর্যবিষয়ক
~attitude কান্ত মনোভাব
~emotion কান্ত আবেগ, সৌন্দর্য বিষয়ক আবেগ
~pleasure সৌন্দর্যবোধজাত আনন্দ, নান্দনিক আনন্দ
~sense সৌন্দর্যবোধ, কান্তিবোধ
~value সৌন্দর্যগত মূল্য, কান্তিক মূল্য
~virtue সৌন্দর্যগত সদগুণ, কান্ত গুণ

aesthetics সৌন্দর্যবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা
affirm হাঁ-সূচক উক্তি করা, অস্তি-বাচন করা
after-image উত্তর প্রতিরূপ
agathology নীতি বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র
agent নিমিত্ত, প্রতিনিধি
~intellect নিমিত্ত বুদ্ধি
agosnostic অজ্ঞেয়তাবাদ
agnosticism অজ্ঞেয়তাবাদ
ahadiyyat (আঃ) ঐক্য, ঐক্য অবস্থা, আদিম ঐক্য
ahadiyyat al majmū (আঃ) সমগ্রের ঐক্য
~~wahid একের ঐক্য
'alam (আঃ) জগৎ, বিশ্ব
~ul amar (আঃ) আজ্ঞার জগৎ, আদেশ জগৎ
~ul arwāh (আঃ) রূহ-এর জগৎ, আত্মার জগৎ
~ul dhikr (আঃ) ধ্যানের জগৎ, স্মরণের জগৎ
~ul ghayb (আঃ) অদৃশ্য জগৎ, রহস্য জগৎ
~ul jabarut (আঃ) শক্তির জগৎ
~ul halut (আঃ) সর্বোচ্চ ঐশী জগৎ
~ul khalq (আঃ) সৃষ্টির জগৎ
~ul lahut (আঃ) উচ্চ ঐশী জগৎ
~ul malakut (আঃ) ফেরেস্তাদের জগৎ
'alam ul mithāl (আঃ) প্রতিরূপের জগৎ, রূপক জগৎ
~ul nasut (আঃ) মানব জগৎ, পার্থিব জগৎ
alim (আঃ) বিদ্বান, পণ্ডিত
Allah (আঃ) আল্লাহ্‌
allegorical interpretation রূপক-ভিত্তিক ব্যাখ্যা, রূপকাত্মক ব্যাখ্যা
alternative বিকল্প
~cause বিকল্প কারণ
altruism পরার্থবাদ, পরহিতবাদ
altruistic পরার্থকেন্দ্রিক, পরহিতমূলক
~hedonism পরার্থিক সুখবাদ, সার্বজনীন সুখবাদ
ambiguity দ্ব্যর্থকতা, দ্ব্যর্থবোধকতা
ambiguous দ্ব্যর্থক দ্ব্যর্থবোধক
amoral ন-নৈতিক
amr (আঃ) আদেশ
analogical সদৃশ, সাদৃশ্যমূলক, সাদৃশ্যপূর্ণ
~argument সাদৃশ্যমূলক যুক্তি
analogy সাদৃশ্য অনুমান
angeleology দেবত্ব, দেবদূততত্ত্ব
angelomorphosis দেবাত্বারোপ
anima আত্মা, মন
anima mundi বিশ্বাত্মা
animal faith প্রাণীসুলভ বিশ্বাস, জৈবিক বিশ্বাস

animal mind — জীবমন, প্রাণীমন
~ soul — জীবাত্মা
animalitarianism — প্রাণীতত্ত্ববাদ, পশুবৈশিষ্ট্যবাদ
animism — সর্বপ্রাণবাদ
ankar al nakirat (আঃ) — সকল অনির্দিষ্টের অনির্দিষ্ট
annihilation — বিলুপ্তি, বিলীন, 'ফানা'
annihilationism — বিলুপ্তিসাধনবাদ, বিলীনবাদ, 'ফানাবাদ'
antecedent — পূর্বগ
anthropocentric — নরকেন্দ্রিক, মানবকেন্দ্রিক
anthropologist — নৃতত্ত্ববিদ
anthropomorphic — নরত্বারোপী
~ conception — নরত্বারোপী ধারণা
anthropomorphism — নরত্বারোপবাদ
anthropomorphist — নরত্বারোপবাদী
anti-intellectualism — প্রতিবুদ্ধিবাদ
anti-metaphysical — তত্ত্ববিদ্যাবিরোধী
antinomy } antinom } — উভবিরোধ
antithesis — প্রত্যুক্তি, প্রতিবন্ধ
aphorism — উপদেশ বাক্য, প্রবাদ
apodeictic knowledge — সুনিশ্চিত জ্ঞান
appearance — প্রতিভাস
apperception — সংপ্রত্যক্ষণ
appetitive soul — অতৃপ্ত আত্মা, প্রবৃত্তিশীল আত্মা
appreciative self — অনুধারক আত্মা
'aql (আঃ) — আক্কেল, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা
~al-awwal (আঃ) — প্রথম বুদ্ধি
~e fa'a'l (আঃ) — সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি
~e-hayulani (আঃ) — জড় বুদ্ধিবৃত্তি
~e-insani (আঃ) — মানবিক বুদ্ধি
~e-kul (আঃ) — বিশ্ববুদ্ধি, বিশ্ব আত্মা
archetypal idea — আদর্শ ধারণা
archetype — আদর্শ, মূল আদর্শ
~ idea — আদর্শ ধারণা
ardad (আঃ) — গুণ
argument — যুক্তি, তর্ক
arif (আঃ) — জ্ঞানী
'arsh (আঃ) — সিংহাসন
ascetic — সাধু ব্যক্তি, সন্ন্যাসী
~ rationalism — মরমী যুক্তিবাদ
asceticism — বৈরাগ্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ, মরমীবাদ
ashariyyah (আঃ) — আশারীয়, আশারীয় সম্প্রদায়
as leil 'alam (আঃ) — বিশ্বের উৎস
aspect — দিক, চেহারা, প্রতিভাস
~, human — মানবীয় দিক
~, logical — যৌক্তিক দিক
~, metaphysical — পরাতাত্ত্বিক দিক
~, mystical — আধ্যাত্মিক দিক, মরমী দিক

assimilation আত্তীকরণ, অঙ্গীভূত-করণ, সদৃশকরণ, উপমান
association অনুষঙ্গ, সমিতি
associationism অনুষঙ্গবাদ
atas (আঃ) অগ্নি, আগুন
atheism নাস্তিকবাদ, নিরীশ্বরবাদ
~, critical সবিচার নাস্তিকবাদ
~, dogmatic নির্বিচার নাস্তিকবাদ, গোড়া নাস্তিকবাদ
~, sceptical সংশয়বাদী নাস্তিকতা
atheist নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী
atom পরমাণু
atomism পরমাণুবাদ
attention মনোযোগ
attitude মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী
attribute গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য
~, causal কারণিক গুণ
~, differentiating বিভেদক গুণ
authority প্রাধিকার, প্রামাণিক গুণ
axiological মূল্যগত, মূল্যতাত্ত্বিক
~, idealism মূল্যতাত্ত্বিক ভাববাদ
axiology মূল্যবিদ্যা, মূল্যতত্ত্ব মানবিদ্যা
axiom স্বতঃসিদ্ধ
'ayan (আঃ) সত্তা, সত্তাসার, মূলসত্তা
~ al basirah (আঃ) দিব্যদৃষ্টি, স্বজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল সত্তার জ্ঞান
~al yakin (আঃ) মূল সত্তার প্রত্যক্ষ-জনিত বিশ্বাস বা জ্ঞান
'ayanath thabita (আঃ) 'আয়ান আস সাবিতা', মূল আদর্শ সত্তা, আদর্শ সত্তার ধারণা

B

bad (আঃ) বাতাস, বায়ু
baqa (আঃ) 'বাকা', স্থায়ী অবস্থা, স্থায়ী মিলন
barzakh (আঃ) বরজখ, মধ্যবর্তী অবস্থা, মাধ্যম
batin (আঃ) গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, গূঢ়
beatific vision দিব্যদর্শন, খোদা সন্দর্শন
beauty সৌন্দর্য, কান্তি
~, absolute পরম সুন্দর, পরম সৌন্দর্য
becoming ভবন, পরিবর্তন
~, doctrine of ভবনতত্ত্ব, পরিবর্তন তত্ত্ব
behaviour আচরণ, ব্যবহার
~, instinctive সহজাত আচরণ, উৎপ্রেরণাজাত আচরণ
being সত্তা
~, absolute পরম সত্তা
~, contingent সাপেক্ষ সত্তা
~, divine ঐশী সত্তা
~, first আদি সত্তা, মূল সত্তা
~, first necessary প্রথম অনিবার্য সত্তা

being, hierarchy of সত্তার পর্যায়ক্রম
~, infinite অসীম সত্তা
~, necessary অনিবার্য সত্তা
~, particular বিশেষ সত্তা
~, possible সম্ভাব্য সত্তা
~, pure শুদ্ধ সত্তা
~, self-caused স্বয়ম্ভু সত্তা
~, spiritual আধ্যাত্মিক সত্তা
~, supernatural অতিপ্রাকৃত সত্তা, অতীন্দ্রিয় সত্তা
~, ultimate পরম সত্তা
beinghood সত্তাত্ব, সত্তাবস্থা
belief বিশ্বাস
~, theory of বিশ্বাস তত্ত্ব
believer বিশ্বাসী
beloved প্রেয়সী, প্রেমিকা, দয়িত
benevolence পরহিতৈষণা, বদান্যতা
Bergsonianism বার্গসঁবাদ
berkelean বার্কেলীয়, বার্কেলীপন্থী
biogenesis প্রাণজবাদ, জীবযোনি মতবাদ
biological adaptation জৈবিক উপযোজন
~ evolution জৈবিক বিবর্তন
black stone কাল পাথর, 'হজরে আসওয়াদ'
body দেহ, শরীর; জড়পিণ্ড
body-cell দেহ-কোষ
brain মস্তিষ্ক
brain process মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া
bud (অঃ) দুরন্ত
buddhism বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ দর্শন

C

capital punishment মৃত্যুদণ্ড
cardinal মৌলিক, প্রধান
~ number মৌলিক সংখ্যা
~virtue প্রধান সৎগুণ
Cartesianism কার্টেজীয়বাদ কার্টেজীয় চিন্তা
cartegorical নিঃশর্ত, শর্তহীন
~ imperative শর্তহীন আদেশ, চূড়ান্ত নির্দেশ
categories of knowledge জ্ঞানের আকার
categories of understanding বোধের আকার, বোধশক্তির আকার
category জাতি, আকার
causa sui স্বয়ম্ভু, স্বয়ং কারণ
causal argument কারণিক যুক্তি, হেতুমূলক যুক্তি
~ determinism কারণিক নির্দিষ্টতা
~ law কারণিক নিয়ম, কার্যকারণ সূত্র
~principle কার্যকারণ নিয়ম
causality কার্যকারণ সম্বন্ধ,হেতু সম্বন্ধ
causation কার্যকারণ সম্বন্ধ, কার্যোৎপাদন

cause কারণ
~, absolute পরম কারণ, আদি কারণ, শর্তহীন কারণ
~, final উদ্দেশ্য কারণ
~, first প্রথম কারণ, আদি কারণ
~, formal আকারগত কারণ, রূপগত কারণ
~, material উপাদান কারণ
~, natural স্বাভাবিক কারণ, প্রাকৃতিক কারণ
~, necessary আবশ্যিক কারণ, অপরিহার্য কারণ
~, real বাস্তব কারণ
~, ultimate পরম কারণ, চরম কারণ
celestial স্বর্গীয়, নভোমণ্ডল
~ being স্বর্গীয় জীব, স্বর্গীয় সত্তা
~ sphere নভোমণ্ডল, স্বর্গলোক
~ world স্বর্গীয় জগৎ, স্বর্গলোক
certainty নিশ্চয়তা
chaos বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো অবস্থা
character চরিত্র, গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য
~, moral নৈতিক চরিত্র
Christian খ্রীস্টীয়, ইসায়ী
chromosome ক্রমোজম, বীর্য
circular চক্রক
~ argument চক্রক যুক্তি
~ definition চক্রক সংজ্ঞা
city of god ঐশী নগর

class শ্রেণী, সমাজ, জাতি
class-concept শ্রেণী-ধারণা
classical philosophy ক্লাসিক্যাল দর্শন
classicism ক্লাসিক্যালবাদ
classification শ্রেণীকরণ, শ্রেণীবিন্যাস
co-concious সহজ্ঞ
~ personality সহজ্ঞ ব্যক্তিত্ব
co-eternal সহচিরন্তন, সহনিত্য
~ attributes সহচিরন্তন গুণাবলী
~ being সহচিরন্তন সত্তা
co-existence সহাবস্থান
~, principle সহাবস্থান নীতি
cogitation জানা, অনুধ্যান, চিন্তন
cognition বোধন, জ্ঞান
cognitive faculty জ্ঞানবৃত্তি
~ value জ্ঞানিক মূল্য, জ্ঞানগত মূল্য
coherence theory সংগতিবাদ
coherent সুসংবদ্ধ, সংগত
common সাধারণ
common-sense সাধারণ জ্ঞান, কাণ্ড জ্ঞান
communion সংযোগ, মিলন
communism সাম্যবাদ, কমিউনিজম
community সম্প্রদায়, সমাজ
complete good পূর্ণ কল্যাণ, পূর্ণ মঙ্গল

compulsion বাধ্যবাধকতা, বাধ্যকরণ, জোরজবরদস্তি
conation কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মবৃত্তি
concept ধারণা, প্রত্যয়, সম্প্রত্যয়
conception ধারণা, প্রত্যয়
conceptual ভাবগত, ধারণাগত
~ knowledge ধারণাগত জ্ঞান
~ space ধারণাগত দেশ
~ time ধারণাগত কাল
conceptualism ধারণাবাদ, প্রত্যয়বাদ
conclusion সিদ্ধান্ত
conclusive evidence চূড়ান্ত সাক্ষ্য
~ reason চূড়ান্ত যুক্তি
concrete মূর্ত, বাস্তব, স্থূল
~ manifestation মূর্ত প্রকাশ
condensation স্থূলীকরণ, ঘনীকরণ,
~, principle of স্থূলীকরণ নীতি
condition শর্ত, অবস্থা
~, necessary অপরিহার্য শর্ত
conduct আচরণ
~, bad মন্দ আচরণ
~, good উত্তম আচরণ
~, moral নৈতিক আচরণ
conflict দ্বন্দ্ব, বিরোধ
~ of desires বাসনার দ্বন্দ্ব, কামনার দ্বন্দ্ব
Confucianism কনফিউসিয়াসবাদ

connotation জাত্যর্থ
connotative জাত্যর্থক
conscience বিবেক, বিবেকবুদ্ধি
conscious চেতন
consiousness চেতনা, চৈতন্য
~, moral নৈতিক চেতনা
consequence ফল, পরিণাম, ফলাফল
consequent অনুগ, অনুগামী
conservation of energy শক্তির অবিনশ্বরতা
conservatism রক্ষণশীলতা
consistency সংগতি, সামঞ্জস্য
consistent সংগত, সংগতিপূর্ণ
constituent element সংগঠক উপাদান
construction গঠন, সংগঠন
contemplation চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান
content আধেয়
contiguity নৈকট্য, সান্নিধ্য
~, law of নৈকট্য নিয়ম, সান্নিধ্য নিয়ম
contingent সাপেক্ষ, সম্ভাব্য, অনিয়ত
~ being অনিয়ত সত্তা, সাপেক্ষ সত্তা
~ truth সাপেক্ষ সত্য, সাপেক্ষ সত্যতা
continuity ধারাবাহিকতা, বিরামহীনতা
contradiction বিরুদ্ধতা

contradictory বিরুদ্ধ
contrary বিপরীত
conventional প্রথাগত, প্রচলিত
~ morality প্রথাগত নৈতিকতা
corporeal জড়ীয়, দেহধারী জড়
corporealism দেহবাদ, জড়বাদ
correlation সহসম্বন্ধ, পারস্পরিক সম্বন্ধ
correspondence অনুরূপতা, সাদৃশ্য
~ theory অনুরূপতাবাদ
cosmic জাগতিক, বিশ্বতাত্ত্বিক, বিশ্ব সম্বন্ধীয়
~ evolution বিশ্ব বিবর্তন
~ principle জাগতিক নীতি
cosmogony সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিক্রম
cosmological argument বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি, সৃষ্টিতাত্ত্বিক যুক্তি
cosmologist বিশ্বতাত্ত্বিক, বিশ্বতত্ত্ববিদ
cosmology বিশ্বতত্ত্ব
cosmos সুশৃঙ্খল জগৎ
creation সৃষ্টি
creative সৃজনমূলক, সৃজনশীল
~ evolution সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ
~ force সৃজনী শক্তি
~ imagination সৃজনশীল কল্পনা
~ impulse সৃজনশীল প্রেরণা
~ mind সৃজনশীল মন
~ power সৃজনী ক্ষমতা, সৃজনশীল শক্তি
creative will সৃজনশীলন ইচ্ছা, সৃজনধর্মী ইচ্ছা
creed ধর্মমত, নীতিমালা
critical বিচারমূলক, সবিচার
~ analysis বিচারমূলক বিশ্লেষণ
~ approach বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
criticism বিচারবাদ, সমালোচনা
criticial instance চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত
custom প্রথা, অভ্যাস
cycle চক্র
cynic 'সিনিক', বৈরাগী
cynicism সিনিকবাদ, সিনিকধর্মিতা, বৈরাগ্যবাদ
cyreanicism সিরিনবাদ, সুখবাদ, ভোগবাদ

D

daf '(আঃ) বিতাড়ন, বহিষ্কারকরণ
darvesh দরবেশ, সাধক, সুফী
~ order দরবেশ সম্প্রদায়, দরবেশী জীবন প্রণালী
Darwinism ডারুইনবাদ
datum উপাত্ত
day of judgment শেষ বিচারের দিন
~~ resurrection পুনরুত্থানের দিন
deduction অবরোহ
definite নির্দিষ্ট, সঠিক

definition সংজ্ঞা
degree মাত্রা, পরিমাণ, ক্রম, পর্যায়
deism অতীবর্তী খোদাবাদ
deity দেবতা, ঈশ্বর
~, anthropomorphic conception of দেবতার নরত্বারোপী ধারণা
demi-god অর্ধদেবতা, উপদেবতা
demiurge খুদে স্রষ্টিকর্তা, ঈশ্বরেতর স্রষ্টিকর্তা
demonstration প্রদর্শন, প্রতিপাদন, নির্দেশন
demonstrative প্রদর্শক, প্রদর্শনিক, নির্দেশক
denotation বাচ্যার্থ
dependent being নির্ভরশীল সত্তা, সাপেক্ষ সত্তা
~ substance নির্ভরশীল দ্রব্য
derivative meaning গৌণ অর্থ, অনুমিত অর্থ
descending order অবতরণ ক্রম
description বর্ণনা
designer পরিকল্পনাকর্তা
desire কামনা, বাসনা
destiny নিয়তি, অদৃষ্ট, ভাগ্য
determination নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ
determinism নির্ধারণবাদ, নিয়ন্ত্রণবাদ
detheism দ্বি-ঈশ্বরবাদ
development উৎকর্ষ সাধন, অগ্রগতি, উন্নয়ন
dhar (আঃ) কাল, সময়
dhat (আঃ) জাত, সত্তাসার
dhat-i-sadhiy(আঃ) বর্ণহীন সত্তাসার
dhawk (আঃ) স্বাদ, আস্বাদ
dhikr (আ) যিকির, স্মরণ করা
dialectic method দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
didd (আঃ) বিরুদ্ধতা
die to live মরে অমর হও
difference বিভেদ, প্রভেদ, পার্থক্য
differentia প্রভেদক, বিভেদক
differentiating attribute বিভেদ-সূচক গুণ
dilemma দ্বিকল্প, উভয়সঙ্কট, দ্বিকল্পানুমান
dimension আয়তন, পরিসর
din (আঃ) ধর্ম, মতবাদ, পথ
disbelief অবিশ্বাস
discursive cognition যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান
~ reason যুক্তিবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, মনন
disposition প্রবণতা
disproof অপ্রমাণ
distinct সুস্পষ্ট, পৃথক
divine ঐশী
~ attribute ঐশী গুণ
~ being ঐশী সত্তা
~ essence ঐশী সত্তাসার

divine justice ঐশী বিচার, ঐশী ন্যায়পরতা
~ knowledge ঐশী জ্ঞান
~ law ঐশী আইন
~love ঐশী প্রেম
doctrine মতবাদ
dogma অন্ধ বিশ্বাস, মতবাদের গোঁড়ামী
dogmatic বিচারবিযুক্ত, নির্বিচারী, গোঁড়ামীপূর্ণ
dogmatism নির্বিচারবাদ
doubt সংশয়, সন্দেহ
~, method of সংশয় পদ্ধতি
dream স্বপ্ন
~interpretation স্বপ্নব্যাখ্যা
~, prophetic প্রত্যাদেশমূলক স্বপ্ন
duration কাল, স্থিতিকাল
duty কর্তব্য
dynamic theory গতিবাদী মতবাদ
dynamism গতিবাদ

E

earth মাটি, পৃথিবী
eclectic সার-গ্রাহী, উদার মতাবলম্বী
eclecticism সারসংকলনবাদ, সারসংগ্রহবাদ
ecstasy তন্ময়তা, 'ফানা'
efficient cause নিমিত্ত কারণ
effulgence জ্যোতি, আলোক, দীপ্তি
ego অহম, আত্মা
egoc-entric আত্মমুখী, আত্মকেন্দ্রিক
egoism অহংবাদ
elan vital 'ইলান ভিটাল', প্রাণশক্তি, প্রাণপ্রবাহ
eleatic school এলীয় সম্প্রদায়
element উপাদান
elimination বর্জন, অপনয়ন
elucidation ব্যাখ্যান, বিশদীকরণ
emanate নির্গত হওয়া, নির্গমন করা, নিঃসৃত হওয়া, আগত
emanation নির্গমন
~, doctrine of নির্গমনবাদ
emerge উন্মেষিত হওয়া
emergence theory উন্মেষবাদ
emergent evolution উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ
emotion আবেগ
empirical অভিজ্ঞতামূলক, অভিজ্ঞতালব্ধ, আভিজ্ঞাতিক
~knowledge অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান
~reason অভিজ্ঞতাভিত্তিক যুক্তিবুদ্ধি, আভিজ্ঞাতিক যুক্তিবুদ্ধি
~self সংবেদনজাত আত্মা, আভিজ্ঞাত আত্মা, পার্থিব আত্মা
empiricism অভিজ্ঞতাবাদ
end লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

end, ultimate সর্বশেষ লক্ষ্য, চূড়ান্ত লক্ষ্য
energism শক্তিবাদ
energy শক্তি
enlightenment জ্ঞানালোক
entelechy প্রাণ
~, principle of প্রাণশক্তি
entity সত্তা, বস্তু, জিনিস
environment পরিবেশ
epicureanism এপিকিউরীয় মতবাদ
epiphany আবির্ভাব, প্রকাশ
epiphenomenalism উপবস্তুবাদ, দেহাত্মবাদ, উপ-অবভাসবাদ
epiphenomenon উপবস্তু
epistemological জ্ঞানতাত্ত্বিক
~dualism জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ
~monism জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানতাত্ত্বিক একতত্ত্ববাদ
~phenomenalism জ্ঞানতাত্ত্বিক অবভাসবাদ
epistemology জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞানবিদ্যা
eros প্রেম, কাম
erroneous argument ভ্রান্ত যুক্তি
error ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা
~,theory of মিথ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ
esoteric নিগূঢ়, মরমী
~intuition মরমী স্বজ্ঞা
~knowledge মরমী জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান
essence সারসত্তা, সত্তাসার
eternal চিরন্তন, অনিত্য, শাশ্বত
~attribute চিরন্তন গুণ
~being চিরন্তন সত্তা
~essence চিরন্তন সত্তাসার
~love শাশ্বত প্রেম
~mode শাশ্বত প্রত্যংশ, শাশ্বত প্রকার, চিরন্তন আকার-প্রকার
~now চির বর্তমান, শাশ্বত বর্তমান
~substance চিরন্তন দ্রব্য
~time অনন্তকাল
~truth চিরসত্য
~word চিরন্তন বাণী
ethical end নৈতিক লক্ষ্য
~formation নৈতিক আচার নিষ্ঠাবাদ
~judgment নৈতিক অবধারণ, নৈতিক বিচার
~justice নৈতিক ন্যায়বিচার
~monism নৈতিক অদ্বৈতবাদ
~nihilism নৈতিক শূন্যতাবাদ
~perfection নৈতিক পূর্ণতা
~regorism নৈতিক কৃচ্ছ্রবাদ
ethics নীতিশাস্ত্র, নীতিদর্শন
evaluate মূল্যায়ন করা
evaluation মূল্যায়ন
event ঘটনা
evidence প্রমাণ, সাক্ষ্য

evil অকল্যাণ, মন্দ, অশুভ
evolution বিবর্তন
existence অস্তিত্ব
existent অস্তিমান
exoteric প্রকাশ্য
experience অভিজ্ঞতা
external teleology অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ
extremism চরমবাদ
extremist চরমপন্থী
extrinsic value পরতঃমূল্য
extroverted personality বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব

F

fact ঘটনা, তথ্য, বাস্তবাবস্থা
faculty চিত্তবৃত্তি, শক্তি, মানসিক বৃত্তি
~, formitive গঠনাত্মক বৃত্তি
~, imaginative কল্পনাবৃত্তি
~of reasoning যুক্তিবৃত্তি
~of reproduction পুনরুৎপাদনবৃত্তি
~understanding বোধবৃত্তি
~, rational প্রজ্ঞাবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি
faith বিশ্বাস, ঈমান
fallacious argument ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি
fallacy অনুপপত্তি, যুক্তিদোষ, হেত্বাভাষ
family পরিবার
fana (আঃ) 'ফানা' আত্মলয়, বিলীন আত্মবিলুপ্তিসাধন
~, doctrine of ফানাবাদ, আত্ম-বিলুপ্তি সাধনবাদ
~fi allah (আঃ) আল্লাহ্‌তে বিলুপ্তি-সাধন
~fi fana (আঃ) বিলুপ্তিতে বিলুপ্তি সাধন
~fi al ma-'shuq (আঃ) দয়িতে আত্মবিলুপ্তি সাধন
fir Rasul (আঃ) রসূলে আত্মবিলুপ্তি সাধন
~fish shaikh (আঃ) মুরশীদে আত্মবিলুপ্তিসাধন
fani (আঃ) 'ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মৃতবৎ ব্যক্তি, আত্মঃস্মরা ব্যক্তি
faqir (আঃ) ফকীর, সাধক
faqr (আঃ) দারিদ্র
fatalism অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ
fayd al aqdas (আঃ) পবিত্র নির্গমন
fayd al ilahi (আঃ) ঐশী জ্যোতি
feeling অনুভূতি, মনোভাব
fikr (আঃ) 'ফিকির, চিন্তা, অনুধ্যান
~i-halal (আঃ) বৈধ চিন্তা
~i-haram (আঃ) অবৈধ চিন্তা
final cause উদ্দেশ্য কারণ
finite সসীম, সীমিত

fixed prototype নির্দিষ্ট আদর্শ, মূলতত্ত্ব
force বল
forgetfulness বিস্মৃতি
forgetting বিস্মরণ
form আকার, কাঠামো, রূপ
formal cause আকারগত কারণ, আকারিক কারণ
formless নিরাকার
formula সূত্র, নিয়ম
fortuitous variation আকস্মিক পরিবর্তন, আপতিক পরিবর্তন
four elements চার উপাদান
free স্বাধীন, মুক্ত, অবাধ
free creative agent স্বাধীন সৃজন-কর্তা
free thinker মুক্ত চিন্তাবিদ
free will স্বাধীন ইচ্ছা
freedom স্বাধীনতা
freedom of will ইচ্ছার স্বাধীনতা
function কার্য
fundamental মূল, মৌলিক
fusion একীভবন, মিলন
future life পরকাল

G

genera জাতি
general সাধারণ, সামান্য
generalisation সামান্যীকরণ, সাধারণীকরণ
generosity বদান্যতা
genesis উৎপত্তি, সৃষ্টি
genus জাতি
~, summum বৃহত্তম জাতি
geometrical method জ্যামিতিক পদ্ধতি
~progression জ্যামিতিক ক্রম
ghaib (আঃ) অদৃশ্য, 'গায়েব'
ghaib al ghaib (আঃ) অদৃশ্যের অদৃশ্য
gnosis জ্ঞান, রহস্যজ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান
gnostic জ্ঞানী, নস্টিক
goal লক্ষ্য
god আল্লাহ্, দেবতা, ঈশ্বর
~of evil অমঙ্গলের দেবতা
~of good মঙ্গলের দেবতা
~of love প্রেম-দেবতা
~of wisdom জ্ঞান দেবতা
golden mean স্বর্ণ মধ্যক
good ভাল, শুভ, কল্যাণ
goodsense সুবুদ্ধি
good will সদিচ্ছা
grace কৃপা
greatest good বৃহত্তম কল্যাণ
guide পরিচালক, পথ প্রদর্শক, মুরশীদ

H

habit অভ্যাস, স্বভাব

hadra (আ:) স্তর, অবস্থা

hadratal asma (আ:) নামের অবস্থা, নামের স্তর

~ ~arwah (আ:) আত্মার স্তর

~ ~hiss (আ:) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্তর

~ ~ilahiyya (আ:) আল্লাহ্‌র স্তর, আল্লাহ্‌ত্ব অবস্থা

~ ~mithal (আ:) প্রতীকী স্তর, প্রতিরূপের স্তর

~ ~nur al mahd (আ:) শুদ্ধ আলোকের স্তর

~ ~rahmaniyyah (আ:) দয়াল প্রভুর স্তর

~ ~zulmah al mahdah (আ:) শুদ্ধ অন্ধকারের স্তর

hakim (আ:) বিচারক

hal (আ:) অবস্থা, 'হাল'

hallucination মতিভ্রম, অমূল প্রত্যক্ষ

Hanafites হানাফী সম্প্রদায়

Hambilites হাম্বলী সম্প্রদায়

happenings ঘটনাবলী

happiness সুখ

haqiqat (আ:) সত্তা, বাস্তব সত্তা, প্রকৃত অবস্থা

haqiqat al haqaiq (আ:) বাস্তব সত্তাসমূহের বাস্তব সত্তা, সত্তাসমূহের সত্তা, সত্যসমূহের সত্য

haqiqat-I-muhammadi (আ:) মুহ-ম্মদের মূল সত্তা

haqq (আ:) সত্য, বাস্তব সত্য

~al mutakhayyal (আ:) কল্পিত ঈশ্বর

~al mukhlūq fil itiqād (আ:) বিশ্বাসে সৃষ্ট ঈশ্বর

~al mukhlūq bihi (আ:) আল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীল ক্রিয়া

~al mūtlaq (আ:) পরম বাস্তব সত্তা

~al yakin (আ:) উপলব্ধিজনিত পরম সত্তার নিশ্চিত জ্ঞান

harmony ঐক্য, মিল, শৃঙ্খলা

~of the spheres বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মিলন শৃঙ্খলা

~of the universe বিশ্বশৃঙ্খলা

Hashamites হাশেমী সম্প্রদায়

hayula (আ:) জড়বস্তু, জড় উপাদান, জড় পদার্থ

Hazmiyyah (আ:) ইবনে হাজমের অনুসারীগণ, হাজেমী সম্প্রদায়

hearing শ্রবণ, শ্রবণেন্দ্রিয়

heart হৃদয়, চিত্ত, অন্তঃকরণ, হৃদপিণ্ড

heathen পৌত্তলিক

heaven বেহেশত, স্বর্গ, নভোমণ্ডল, আকাশ

hedonic সুখগত, সুখজ, আনন্দময়

hedonism সুখবাদ

~, altruistic পরার্থবাদী সুখবাদ

~, egoistic আত্মসুখবাদ
~, ethical নৈতিক সুখবাদ
hedonism, psychological মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ
Hegelian absolute হেগেলীয় পরম সত্তা
Hegelianism হেগেলীয়বাদ
hellenic হেলেনীয়, গ্রীসীয়
heredity বংশগতি
heresy ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মত্যাগ
heretic ধর্মদ্রোহী, ধর্মত্যাগী, কাফের
heterogenous elements অসমজাতীয় উপাদান, বহুজাতীয় উপাদান
heteronomy of will ইচ্ছার অমিল
hierarchical স্তরবিন্যাস
hierachy স্তরবিন্যাস
~of beings সত্তাসমূহের স্তরবিন্যাস
~of intellect বুদ্ধির স্তরবিন্যাস
hidden reality গুপ্তসত্তা, অপ্রকাশ্য সত্তা
highest genus সর্বোচ্চ জাতি
~end of life জীবনের চরম লক্ষ্য
~good পরম কল্যাণ, পরম মূল
~virtue পরম সততা, পরম সদগুণ, পরম সাধুতা
hikma (আঃ) জ্ঞান
hikmat (আঃ) দর্শনশাস্ত্র, জ্ঞান
~al balighah (আঃ) পূর্ণজ্ঞান
~al ishraqiyyah (আঃ) ইশরাকী দর্শন
hikmat al ladunniyya (আঃ) স্বজ্ঞাজাত দর্শন
~al mashaiyyah (আঃ) পেরিপেটিটিক দর্শন
~i-ilahi (আঃ) আল্লাহ্‌ সম্পর্কীয় দর্শন
himmat (আঃ) শক্তি, ইচ্ছাশক্তি
homogeneous being সমজাতিক সত্তা, সমজাতীয় সত্তা
~elements সমজাতিক উপাদানসমূহ
honest সাধু, সৎ, সরল
honesty সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা
hijjut ul islam (আঃ) ইসলামের রক্ষক
~hulul (আঃ) অবতার
human being মানব, মানবজাতি
~destiny মানব অদৃষ্ট
~dignity মানব মর্যাদা
~kingdom মানব জগৎ
~knowledge মানব জ্ঞান
~love মানবীয় প্রেম
~nature মানব প্রকৃতি, মানব স্বভাব
~reason মানুষের বুদ্ধি, মানবিক বুদ্ধি,
soul মানবাত্মা
humanism মানবতাবাদ
humanitarian মানবহিতৈষী, বিশ্বপ্রেমিক

huwiyyah (আঃ) ঐশী সত্তা
hyle (গ্রী) জড়, জড়বস্তু
hylism জড়বাদ, বস্তুবাদ
hylon জড়, বস্তু
hylosis সজীব জড়
hylotheism জড় ঈশ্বরবাদ
hylozoism সজীব জড়বাদ
hypnosis সংবেশন
hypnotism সংবেশ, সংবেশন
hypocrisy চাতুরী, ভণ্ডতা
hypothesis প্রকল্প
hypothetical argument প্রাকল্পিক যুক্তি, শর্তসাপেক্ষ যুক্তি
~reasoning প্রাকল্পিক যুক্তি প্রক্রিয়া
~statement প্রাকল্পিক উক্তি
hysteria মূর্ছারোগ, 'হিস্টিরিয়া'

I

ibadat (আঃ) প্রার্থনা, নামায
ibtila (আঃ) বিচার, পরীক্ষা
idea ধারণা, ভাব
ideal আদর্শ, মানসিক, অধ্যাত্ম
ideal man আদর্শ মানব
ideal world আদর্শজগত, ভাবজগত
idealism ভাববাদ
identical অভিন্ন, অভেদাত্মক, সমার্থক
~meaning সমার্থক
identify সনাক্ত করা
identity অভিন্নতা, অভেদ, পরিচয়
~absolute পূর্ণ অভেদ
~, mystical মরমী অভেদ
~, personal ব্যক্তি পরিচয়
ideology আদর্শ
idolator প্রতিমাপূজক, পৌত্তলিক
idolatry প্রতিমা পূজা, পৌত্তলিকতা
idols ভ্রান্ত বিশ্বাস
ignorance অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা
ihdath (আঃ) উৎপত্তি
ijma (আঃ) ইজমা, ঐকমৎ, সম্মতি
ijtihad (আঃ) ইজতিহাদ, যুক্তি
Ilah (আঃ) ঈশ্বর, আল্লাহ্, উপাস্য
ilham (আঃ) অনুপ্রেরণা, ঐশী প্রেরণা
illogical অযৌক্তিক
illumination আলোক, জ্যোতিঃ
~, philosophy of আলোক দর্শন
illusion অধ্যাস
'ilm (আঃ) জ্ঞান
al asrar (আঃ) গুপ্তজ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান
~al ghayb (আঃ) অদৃশ্য সত্তার জ্ঞান
~al yakin (আঃ) সত্তার শ্রবণজাত জ্ঞান, সত্তার শ্রবণজাত বিশ্বাস
~i-ladunni (আঃ) স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান
~i-safina (আঃ) বুদ্ধিজাত জ্ঞান

'ilm i-sina (আঃ) স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান
image প্রতিরূপ
imagination কল্পনা
imaginative কল্পনাত্মক, কল্পনাপ্রসূত
imam (আঃ) ইমাম, নেতা
imāmocentricism ইমামকেন্দ্রিকতাবাদ
imamology ইমামবাদ, গুরুবাদ
iman (আঃ) ঈমান, বিশ্বাস
imkan (আঃ) সম্ভাব্য, অনিশ্চয়াত্মক, ক্ষণিক
immanence অন্তর্ব্যাপিতা, অন্তর্বর্তিতা, সর্বব্যাপিতা
immanent অন্তর্ব্যাপী, সর্বব্যাপী, অন্তর্বর্তী
immaterial অজড়
immediate তাৎক্ষণিক, অব্যবহিত
immoral অনৈতিক
immoralism অনৈতিকতাবাদ
immorality অনৈতিকতা
immortal অমর
~being অমর সত্তা
immortality অমরতা
~, collective সমষ্টিগত অমরতা
~, individual ব্যক্তিগত অমরতা
immutable অপরিবর্তনীয়
impartial নিরপেক্ষ
~spectator নিরপেক্ষ দর্শক
imperative আদেশ, নির্দেশ
imperfect অপূর্ণ
imperfection অপূর্ণতা
impersonal নৈর্ব্যক্তিক, অব্যক্তিক
~being নৈর্ব্যক্তিক সত্তা
~God নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর
impetus প্রেরণা, শক্তি
implication ব্যঞ্জনা
implicit গুপ্ত, অস্পষ্ট, নিগূঢ়
imply ব্যঞ্জনা করা, ইঙ্গিত করা
import তাৎপর্য
~, logical যৌক্তিক তাৎপর্য
impossibility অসম্ভাব্যতা
impression সতেজ সংবেদন, মুদ্রণ, ছাপ
impulse তাড়না, উত্তেজনা
~, moral নৈতিক তাড়না
~, vital প্রাণ প্রেরণা, প্রাণপ্রবাহ
inanimate নির্জীব
incarnation অবতার
~, doctrine of অবতারবাদ
incomplete অসম্পূর্ণ
inconceivable অভাবনীয়
~God অভাবনীয় ঈশ্বর
inconsistence অসংগত, অসমঞ্জস
inconsistency অসংগতি
indefinite অনির্দিষ্ট
independent স্বাধীন
~being স্বাধীন সত্তা

indeterminate অনির্ধারিণ
Indeterminism অনির্ধারিণবাদ
individual ব্যক্তি, স্বতন্ত্র সত্তা
individuality ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, এককত্ব
indivisibility অবিভাজ্যতা
induction আরোহ
inductive leap আরোহী উল্লম্ফন
~reasoning আরোহী যুক্তি প্রক্রিয়া
inert জড়ত্ব, নির্জীব, অসাড়
inference অনুমান
inferiority complex হীনমন্যতা
infidel পৌত্তলিক
infidelity পৌত্তলিকতা
infinite অসীম, অনন্ত, পূর্ণ, অশেষ
inherent meaning ভাবার্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ
innate সহজাত
~idea সহজাত ধারণা
inner perception অন্তর্দর্শন, আভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ
~response আভ্যন্তরীণ সাড়া
~sense অন্তরিন্দ্রিয়
inorganic অজৈব
~evolution অজৈব বিবর্তন
~matter অজৈব জড়
Insān ul kamil (আ:) পূর্ণ মানব, আদর্শ মানব

insān ul kabir (আ:) শ্রেষ্ঠ মানব
~~hayawani (আ:) পশু মানব
insight অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি
inspiration অনুপ্রেরণা
instinct প্রবৃত্তি, উৎপ্রেরণা
intellect বুদ্ধি, বোধশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি
~, active সক্রিয় বুদ্ধি, সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি
~, acquired অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি
~, agent চালক বুদ্ধিবৃত্তি
~, latent সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি
~, material জড় বুদ্ধিবৃত্তি
~, passive নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি
~, practical ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তি, বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তি
~, speculative চিন্তাশীল বুদ্ধিবৃত্তি
intellection জ্ঞান, বোধন
intellectual বুদ্ধিগত, বৌদ্ধিক, বুদ্ধিজীবী
~intuition বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা
intelligence বুদ্ধি, বোধশক্তি
intense তীব্র, প্রখর, গভীর
intention অভিপ্রায়
interaction theory ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মতবাদ
interactionism ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ
internal আভ্যন্তরীণ, আন্তরিক

interpretation ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান
intrinsic স্বগত, স্বতঃ, স্বনিহিত
~good স্বতঃ ভাল, স্বগত ভাল
~value স্বতঃ মূল্য
introspection অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
introvertion অন্তর্মুখীন
intuition স্বজ্ঞা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, দিব্যজ্ঞান
~, empirical অভিজ্ঞতিক স্বজ্ঞা
~, logical যৌক্তিক স্বজ্ঞা
~, moral নৈতিক স্বজ্ঞা
~, mystical মরমী স্বজ্ঞা
~, pure শুদ্ধ স্বজ্ঞা
~, rational বুদ্ধিজ স্বজ্ঞা
~, sense ইন্দ্রিয়জ স্বজ্ঞা
~, supra-mental অতি মানসিক স্বজ্ঞা
~, supra-sensible অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞা
intuitionism স্বজ্ঞাবাদ
intuitive knowledge স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান
iradah (আঃ) ইচ্ছা
irrationallism অপ্রমেয়বাদ, নির্বিচারবাদ, অবুদ্ধিবাদ
Ismāiliyyah (আঃ) ইসমাইলী সম্প্রদায়
ishq (আঃ) 'ইশক', প্রেম
Ishraqis ইশরাকী সম্প্রদায়
'itidāl (আঃ) সমতা
itlaq (আঃ) পরমত্ব
ittihad (আঃ) মিলন, একত্রীকরণ

J

jabar (আঃ) 'জবর', অদৃষ্ট, নির্দিষ্ট
Jabariyyah (আঃ) জাবারিয়া সম্প্রদায়
jadhb (আঃ) আকর্ষণ
jahannam (আঃ) দোজখ
jainism জৈন দর্শন
jam (আঃ) ঐক্য
jameyyah al ilāhiyyah (আঃ) ঐশী ঐক্য, আল্লাহ্র একত্ব
jannat (আঃ) বেহেশত, স্বর্গ
jawhar (আঃ) দ্রব্য
jawhar 'arid (আঃ) উন্মেষ দ্রব্য
jehova জেহোভা
jihat al jam (আঃ) ঐক্যের দিক
jihat al farq (আঃ) পার্থক্যের দিক, বিচ্ছেদের দিক
judaism ইহুদী ধর্ম, ইহুদীদর্শন
judge বিচারক
judgement অবধারণ, বিচার
justice ন্যায়পরতা, সুবিচার

K

kalam (আঃ) বাণী
~al dhati (আঃ) ঐশীবাণী
kalima (আঃ) প্রজ্ঞা, 'লগস'
~, doctrine of প্রজ্ঞাবাদ, 'লগস' মতবাদ

kasb (আঃ) অর্জন

~, doctrine অর্জনবাদ

khasf (আঃ) স্বজ্ঞা, অতীন্দ্রিয়, অনুভূতি

~doctrine of স্বজ্ঞাবাদ

halk (আঃ) মাটি, মৃত্তিকা

khalifa (আঃ) প্রতিনিধি, 'খলিফা

khalq (আঃ) সৃষ্টি

~al jadid (আঃ) সৃষ্টি প্রক্রিয়া

khayal (আঃ) খেয়াল, কল্পনা

khayr al mahd (আঃ) শুদ্ধ মঙ্গল, শুদ্ধ কল্যাণ

kinetic গতিশীল, প্রকাশমান

knower জ্ঞাতা

known জ্ঞেয়, জানা

knowledge জ্ঞান

~, theory of জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদ

kufr (আঃ) পৌত্তলিকতা

kun (আঃ) 'হও'

L

lahut (আঃ) ঐশী সত্তা

latent অব্যক্ত, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন

~content অব্যক্ত আধেয়

law নিয়ম, নীতি, আইন

law of association অনুষঙ্গ নিয়ম

~~contiguity সান্নিধ্য নিয়ম

low of continuity ধারাবাহিকতার নিয়ম

~~contradiction বিরোধ নিয়ম

~~gravitation মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম

~~identily অভেদ নিয়ম, তাদাত্ম্য নিয়ম

~~indiscernible অপৃথকীকরণ নিয়ম

~~nature, নৈসর্গিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম

~~negation ব্যতিরেকী নিয়ম

~~parsimony মিতব্যয়িতার নিয়ম

~~reason যুক্তির নিয়ম, প্রজ্ঞার নিয়ম

~~thought চিন্তনের নিয়ম মননের নিয়ম

~~, uniformity of nature প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার নিয়ম

~, universal সার্বিক নিয়ম

liberation, মুক্তি, মোক্ষলাভ

liberty স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য

libido 'লিবিডো', যৌন আকাঙ্ক্ষা, কামপ্রবণতা

life জীবন, প্রাণ

light আলোক, নুর, জ্যোতি

living being জীবন্ত সত্তা

logic যুক্তি, তর্কশাস্ত্র,

logical যৌক্তিক

~analysis যৌক্তিক বিশ্লেষণ

~basis যৌক্তিক ভিত্তি

~certainty যৌক্তিক নিশ্চয়তা

~construction যৌক্তিক গঠন

logical contradictio যৌক্তিক বিরোধ
~ positivism যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ
logos 'লগস, প্রজ্ঞা,
~doctrine of লগস মতবাদ, প্রজ্ঞাবাদ
love প্রেম

M

'ma'ānī (আঃ) অর্থ, শব্দার্থ
~tujassad ধারণার মূর্তকরণ
mabdā (আঃ) উৎস
mabdā-i-awwal প্রথম উৎস, পরম উৎস
macrocosm জগত, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
mafhūm kulli (আঃ) গৌণ ধারণা
magnitude আয়তন, পরিসর, পরিধি
major premise সাধ্যবাক্য, সাধ্য আশ্রয় বাক্য
major term সাধ্যপদ
manifest content ব্যক্ত আধেয়, ব্যক্তরূপ
manifest dream content ব্যক্ত স্বপ্ন, ব্যক্ত স্বপ্ন, প্রতীক
manifestation প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ
manjil (আঃ) মনজিল, স্থান, নির্দিষ্ট লক্ষ্য
maqam (আঃ) মোকাম, স্থান, অবস্থা
~al jam (আঃ) ঐক্যস্থান, ঐক্য বা একত্ব অবস্থা, ঐক্যের মোকাম
maqamat tushakh khas (আঃ) ধারণার রূপক ভিত্তিক ব্যাখ্যা, ধারণার প্রতীকী ব্যাখ্যা
marifat (আঃ) জ্ঞান
markaz ul dara (আঃ) চক্রের কেন্দ্রবিন্দু
masiyah (আঃ) পাপ, পাপকার্য
mask (আঃ) রক্ষণ, স্মৃতিতে রক্ষণ
material জড়, জড়ীয়, উপাদান
~cause উপাদান কারণ
materialism জড়বাদ, বস্তুবাদ
mawjud-i-awwal (আঃ) প্রথম অস্তিত্বশীল সত্তা
mazhar (আঃ) প্রকাশ, প্রকাশ্য অবস্থা
mean মধ্যম, মধ্যম পথ
means উপায়, পথ
meditation অনুধ্যান
meliorism আপেক্ষিক আশাবাদ
melioristic আশাব্যঞ্জক, আশাপ্রদ
memory স্মৃতি
~image স্মৃতি প্রতিরূপ
mental ability মানসিক সামর্থ্য
metaphorical রূপক, উপমাঘটিত
~language উপমাত্মক ভাষা
metaphysical পরাতাত্ত্বিক, তাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক, অতিপ্রাকৃত
~being পরাতাত্ত্বিক সত্তা

metaphysical evil অতিপ্রাকৃত অমঙ্গল, পরাতাত্ত্বিক অমঙ্গল
~love কামনাবর্জিত প্রেম, ঐশ্বরিক প্রেম
~reality পরাতাত্ত্বিক বাস্তব সত্তা
metaphysics তত্ত্ববিদ্যা, অধিবিদ্যা, পরাতত্ত্ববিদ্যা
method পদ্ধতি
microcosm অণু জগত, ক্ষুদ্রজগত
mind মন
mi'raj (আঃ) মিরাজ, স্বর্গারোহণ
mithal (আঃ) রূপক, প্রতীক, প্রতিরূপ
mizan (আঃ) দাড়িপাল্লা
mode প্রত্যংশ, প্রকার, আকার-প্রকার
mojaheda (আঃ) নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ধ্যান করা, 'মোজাহেদা
monad মনাড, চিৎপরমাণু
monadism মনাডবাদ
monism অদ্বৈতবাদ
monotheism একেশ্বরবাদ, খোদাবাদ, একত্ববাদ
morakaba (আঃ) একাগ্র চিন্তা, ধ্যান, 'মোরাকাবা'
moral নীতি, নৈতিক
marality সাধু, নৈতিকতা
motivation প্রেষণা, তাগিদ
motive উদ্দেশ্য
mover গতিসঞ্চালক, পরিচালক
~, prime আদি গতিসঞ্চালক
mufāriqat (আঃ) শুদ্ধ আত্মা
mujassim (আঃ) দেহাত্মবাদী
multiplicity বহুত্ব
munazzih (আঃ) অতীন্দ্রিয়বাদী, অতিবর্তীবাদী
mushāhada (আঃ) ধ্যান, অনুধ্যান, 'মোশাহেদা,' সাধনা
mutation পরিবর্তন, আকস্মিক পরিবর্তন
Mutazilites মুতাজিলা সম্প্রদায়
mystic মিস্টিক, মরমীবাদী, রহস্যবাদী, অধ্যাত্মবাদী
mysticism মরমীবাদ, রহস্যবাদ, অধ্যাত্মবাদ

N

Nabi (আঃ) নবী, প্রেরিত মহাপুরুষ
nafkh (আঃ) শ্বাস-বায়ু
nafs (আঃ) নফস, আত্মা
nafs-e-ammara (আঃ) অতৃপ্ত আত্মা, নিকৃষ্টতম আত্মা, প্রবৃত্তিশীল আত্মা
nafs-e-aniya (আঃ) চিত্তবৃত্তি
nafs-e-hayani (আঃ) পশু আত্মা, জীবাত্মা
nafs-e-insani (আঃ) মানবাত্মা
nafs-e-jamadati (আঃ) অচেতন পদার্থের আত্মা, জড়-আত্মা

nafs-e-kull (আঃ) সার্বিক আত্মা
nafs-e-lawaima (আঃ) দুঃখিত ও অনুতপ্ত আত্মা, আত্মার মধ্যম অবস্থা
nafs-e-malaki (আঃ) ফেরেস্তাসুলভ আত্মা
nafs-e-mutma'innah (আঃ) শান্ত আত্মা, তৃপ্ত আত্মা
nafs-e-natiqa (আঃ) মানবাত্মা
naim (আঃ) আনন্দ
naive realism নব্যবাস্তববাদ
nesut (আঃ) দৃশ্যমান, দৃশ্যমান জগত
natiq (আঃ) বক্তা
natura naturans সৃজনশীল সত্তা
natura naturata সৃষ্ট প্রকৃতি
natural প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, স্বাভাবিক
~selection প্রাকৃতিক নির্বাচন
naturalism প্রকৃতিবাদ
nature প্রকৃতি, স্বভাব, ধর্ম
necessary অনিবার্য, আবশ্যিক,
~being আবশ্যিক সত্তা
~existence আবশ্যিক অস্তিত্ব
negative নঞর্থক, অভাবাত্মক, উল্টো, বিপরীত
neo-idealism নব্যভাববাদ
neo-Platonism নব্যপ্লেটোবাদ
neo-realism নব্যবাস্তববাদ, নব্য-বস্তুবাদ
neo-scholasticism নব্যস্কলাস্টিকবাদ
neo-vitalism নবপ্রাণবাদ
neutral entity নিরপেক্ষ সত্তা
—monism নিরপেক্ষ এককত্ববাদ, নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদ
nihilism শূন্যতাবাদ
nihilist শূন্যতাবাদী
nisab (আঃ) সম্পর্ক, সম্বন্ধ
~al shakhsiyyah (আঃ) বিশেষ সম্পর্ক, বিশেষ সম্বন্ধ
~mutlaqa (আঃ) অমূর্ত সম্পর্ক
nisbah (আঃ) গুণ সম্পর্কিত
nishan (আঃ) চিহ্ন, প্রতীক
nishan-i-awwal (আঃ) প্রথম প্রতীক
nisus প্রেরণা, স্থির প্রেরণা
niza (আঃ) বিরোধ
nominal নামমাত্র, নামীয়
~definition নামমাত্র সংজ্ঞা
~essence নামীয় সত্তাসার
nominalism নামবাদ
~, extreme চরম নামবাদ
non-being অ-সত্তা
non-ego অনাত্মা
non-material অজড়
non-moral ন-নৈতিক
nonsense অর্থহীন, অসংগত
nonsensical অর্থহীন, ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত

non-voluntary action অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
norm আদর্শ
normal স্বাভাবিক
normative আদর্শনিষ্ঠ
~science আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান
not-being অ-সত্তা
notation সাংকেতিক চিহ্ন
notion 'নোশান', সম্প্রত্যয়, ধারণা
noumena অতীন্দ্রিয়
noumenal reality অতীন্দ্রিয় বাস্তব-সত্তা
~realm অতীন্দ্রিয় জগত
~self অতীন্দ্রিয় আত্মা
nous চেতন, আত্মা, মন
nubuwwat (আঃ) নবুয়ত
nur (আঃ) নুর, আলো, জ্যোতি
nur-i-muhammadi (আঃ) নূরে মুহম্মদী

O

object বস্তু, বিষয়, উদ্দেশ্য,
objective বস্তুনিষ্ঠ, বস্তুগত
~idealism বস্তুগত ভাববাদ
objectivism বস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ
obligation কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব
~, moral নৈতিক কর্তব্যবোধ
obligatory অবশ্য পালনীয়, বাধ্যতামূলক
obscure দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট
observation নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
observer দর্শক, প্রেক্ষক
Occam's razor ওখামের খুর, উভয় সংকট
occasion উপলক্ষ
occasionalism উপলক্ষবাদ
odeapus complex 'ওডিপাস এষণা
omitted conclusion অনুক্ত সিদ্ধান্ত
ontological তাত্ত্বিক, তত্ত্ব সম্বন্ধীয়
ontologism তাত্ত্বিক মতবাদ
ontology সত্তাতত্ত্ব, তত্ত্ববিজ্ঞান
optimism আশাবাদ
optimist আশাবাদী
order নিয়ম, আদেশ, শৃঙ্খলা, ক্রম
organic unity আঙ্গিক, ঐক্য, জৈবিক ঐক্য
organism জীবদেহ, জীবাঙ্গ
origin উৎস, উৎপত্তি, মূল
orthodox গোঁড়া, আস্তিক

P

pagan পৌত্তলিক, প্রতিমাপূজক
paganism পৌত্তলিকতাবাদ, প্যাগান মতবাদ
pan-objectivism বিষয়বাদ

panentheism সর্বধরখোদাবাদ, সর্বধরেশ্বরবাদ
panpsychism সর্বাত্মবাদ
pantheism সর্বেশ্বরবাদ, সর্বখোদা-বাদ, বিশ্বলীনবাদ, 'প্যানথেইজম', 'হামা-উস্তবাদ'
pantheist সর্বেশ্বরবাদী
pantheistic personalism বিশ্ব-ব্যক্তিত্ববাদ
~sufi সর্বেশ্বরবাদী সুফী
paradox কূটাভাস
parallelism সমান্তরবাদ, সহচরবাদ
paralogism যুক্তিদোষ
parity of reasoning তর্কসাম্য, যুক্তিসাম্য
parochialism ধর্মাঞ্চলবাদ
parsimony মিতব্যয়িতা
~, law of মিতব্যয়িতার নিয়ম
particle অণু, কণা
particular বিশেষ
~existence বিশেষ অস্তিত্ব
passion চিত্তক্ষোভ, প্রবল অনুরাগ, নিষ্ক্রিয়
passive নিষ্ক্রিয়
pattern নমুনা, নকশা
perceiver প্রত্যক্ষী, প্রত্যক্ষণকারী, দ্রষ্টা
perceptible প্রত্যক্ষ
perception প্রত্যক্ষণ, প্রত্যক্ষ
perfect পূর্ণ
~being পূর্ণ সত্তা
~man পূর্ণ মানব
perfection পূর্ণতা
perfectionism পরোৎকর্ষবাদ
personal identity ব্যক্তিক সনাক্তকরণ
~god ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর
personalism ব্যক্তিত্ববাদ
personality ব্যক্তিত্ব
perspective প্রেক্ষিত, দৃষ্টিকোণ
perspectivism প্রেক্ষিতবাদ
pessimism নৈরাশ্যবাদ, হতাশাবাদ
petiter percept স্বল্প প্রতীতি, স্বল্প প্রত্যক্ষণ
petitio principi চক্রক দোষ, হেত্বাভাস
phenomena অবভাস
phenomenal self অবভাসিক আত্মা
~world অবভাসিক জগত
phenomenalism অবভাসবাদ
phenomaenlogical personalism অবভাসিক ব্যক্তিত্ববাদ
philos (গ্রীক) অনুরাগী
philosophy দর্শনশাস্ত্র, দর্শন
physical পদার্থিক, দৈহিক
physicalism পদার্থিকতাবাদ

pineal gland	পিনিয়াল গ্রন্থি
plane	স্তর
plane of being	সত্তার স্তর
plant life	উদ্ভিদ জীবন
Platonic idea	প্লেটোনিক ধারণা
pleasure	সুখ
pluralism	বহুত্ববাদ
plurality	বহুত্ব
poetic description	কাব্যিক বর্ণনা
point	বিন্দু, বিষয়, দফা
polemic	বিচার-বিতর্কীয়
polytheism	বহু ঈশ্বরবাদ, দেবতাবাদ
positive science	বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
positivism	দৃষ্টবাদ, প্রত্যক্ষবাদ
possible	সম্ভাব্য
~existence	সম্ভাব্য অস্তিত্ব
postulate	স্বীকার্য সত্য
~of moral judgment	নৈতিক অবধারণের স্বীকার্য সত্য
potency	শক্তি, ক্ষমতা
potential	সুপ্ত, অব্যক্ত
~mutiplicity	অব্যক্ত বহুত্ব
practical	প্রয়োগিক, ব্যবহারিক
~reason	ব্যবহারিক বুদ্ধি
pragmatic	প্রয়োগিক, প্রয়োগবাদী
~ theory	প্রায়োগিক মতবাদ
pragmatism	প্রয়োগবাদ
predestination	অদৃষ্টবাদ
predetermination	পূর্বনির্ধারণবাদ
predicable	বিধেয়ক
predicament	শ্রেণী, বর্গ, সঙ্কটাবস্থা
predicate	বিধেয়
predication	বিধেয়করণ, গুণারোপ
pre-established harmony	পূর্ব-স্থাপিত সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলা
prejudice	কুসংস্কার
premise	আশ্রয় বাক্য
~, major	সাধ্য আশ্রয় বাক্য
~, minor	পক্ষ আশ্রয় বাক্য
presentative-representive process	উপস্থাপন-পুনরুপস্থাপন প্রক্রিয়া
preservation	সংরক্ষণ
preserved tablet	ভাগ্যলিপি, তকদীর লিপি, 'লওহে মাহফুজ'
preserver	রক্ষক
presumptive argument	পূর্বসিদ্ধান্ত সর্বগ যুক্তি, চক্রক যুক্তি
preventive theory of punishment	শাস্তির প্রতিরোধাত্মক মতবাদ
prima-facie	প্রথম দৃষ্টিতে, প্রথমতঃ
primal element	মূল উপাদান
prime matter	আদি জড়
prime mover	আদি চালক
principle	নীতি, মূলবস্তু, মূল উপাদান

probability সম্ভাবনা, সম্ভাব্যতা
prohibition নিষেধ, বাধা, প্রতিরোধ
projection প্রক্ষেপণ, প্রদর্শন, কৌশল
prophecy ভবিষ্যদ্বাণী
prophet নবী, প্রেরিত পুরুষ
prophetic consciousness নবী-চেতনা, নবী সুলভ চেতনা
~revelation নবী-সুলভ প্রত্যাদেশ
prophethood নবুয়ত
proposition প্রতিজ্ঞা, বাক্য
potocol sentence মূল বাক্য
protoplasm 'প্রোটোপ্লাজম,' প্রাণকোষ
prototype মূল আদর্শ
providence বিধি, নসীব
province পরিধি, পরিসর
pseudo-Socratic কপট সক্রেটিস
psyche আত্মা, মন, চিত্ত
psychological hedonismম নস্তাত্ত্বিক সুখবাদ
psychologism মনস্তত্ত্বীয় মতবাদ
psychology মনোবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান
punishment শাস্তি
~, theory of শাস্তি সম্পর্কীয় মতবাদ
pure শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র
~ good শুদ্ধ কল্যাণ
puritanism অতিনৈতিকতাবাদ
purity পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা
pythagorean element পীথাগোরীয় উপাদান
Pythagoreanism পীথাগোরীয় মতবাদ

Q

qabil (আঃ) নিষ্ক্রিয়
qadar (আঃ) ইচ্ছার স্বাধীনতা
qadrite school কাদেরীয় সম্প্রদায়
qalb (আঃ) অন্তঃকরণ, হৃদয়, 'কাল্ব'
qidam (আঃ) চিরন্তনতা, নিত্যতা
qiyas (আঃ) 'কিয়াস', সাদৃশ্য অনুমান
qualitative গুণগত, গুণবাচক
~monism গুণবাচক অদ্বৈতবাদ
~ utilitarianism গুণবাচক উপযোগবাদ
quality গুণ, 'সিফাত'
quantification পরিমাপন
quantifier পরিমাপক
quantity পরিমাণ, মাত্রা
quantum theory কুয়াণ্টাম মতবাদ
qudamā (আঃ) গ্রীকবাসী
question প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা
questionaire প্রশ্নমালা
quiddity বিশেষ গুণ
quietism নিষ্ক্রিয়বাদ
qutb (আঃ) কুতব
quwwat (আঃ) শক্তি, বৃত্তি

R

race কুল, বংশ

raciocination অবরোহণ

radical মৌলিক, চরম

~empiricism চরম অভিজ্ঞতাবাদ, মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ

radicalism চরমতাবাদ, সাম্যতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র

random যথেচ্ছা

rational প্রজ্ঞাবান, প্রমেয়, যুক্তিমূলক, যুক্তিসম্মত

~ principle প্রজ্ঞাবান নীতি

~ soul প্রজ্ঞাবান আত্মা

rati nalism বুদ্ধিবাদ

rationality বুদ্ধিবৃত্তি

reaction প্রতিক্রিয়া

real বাস্তব, সত্য

realisation বাস্তবায়ন, উপলব্ধি

realism বাস্তববাদ

~, critical সবিচারী বাস্তববাদ

~, naive সরল বাস্তববাদ

reality বাস্তব সত্তা, বাস্তব, সত্তা

~ of realities বাস্তব সত্তাসমূহের বাস্তব সত্তা, সত্তাসমূহের সত্তা

realm of nature প্রকৃতির জগত

~ ~ spirit আত্মার জগত

reason বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, হেতু, যুক্তি

reasoning যুক্তিবিন্যাস, বিচারশক্তি

rebult যুক্তি খণ্ডন করা

rebuttal যুক্তি খণ্ডন

reciprocal একান্তর, পাল্টাপাল্টি, পারস্পরিক

recollection অনুস্মরণ, অনুস্মৃতি

reconciliation সংগতি সাধন, সমন্বয় সাধন

redemption মুক্তি, মোক্ষলাভ

redundant বাহুল্য

~definition বাহুল্য সংজ্ঞা

refer নির্দেশ করা

reference নির্দেশক, সম্পর্ক নির্দেশক

referent সম্পর্ক বিধেয়

referential সাম্পর্কিক

reflection অন্তর্দর্শন, অনুচিন্তন

reflex প্রতিবর্ত

~ action প্রতিবর্ত ক্রিয়া

refutation খণ্ডন

regression বিগতি, পশ্চাদগমন

regressive বিগতিশীল, প্রতীপগামী

reinforcement শক্তি বৃদ্ধি, বল বৃদ্ধিকরণ

relation সম্পর্ক, সম্বন্ধ

religion ধর্ম

religious bigotry ধর্মীয় গোঁড়ামী

reminiscence পূর্বস্মৃতি

renaissance রেনেসাঁ, নবজাগরণ

repitition পুনরাবৃত্তি
representationism প্রতীকবাদ, প্রতিনিধিত্ববাদ
repressed desire অবদমিত কামনা
repression অবদমন
reproduction পুনরুৎপাদন
resemblance সাদৃশ্য
residue অবশিষ্ট
response উত্তর, প্রতিবর্ত ক্রিয়া
resurrection পুনরুত্থান
retention সংরক্ষণ
retina চক্ষুর পরদা
retroactive inhibition পশ্চাদমুখী-বাদ, পশ্চাদমুখী প্রতিবন্ধকতা
revelation প্রত্যাদেশ, ওহী
right ন্যায়সঙ্গত, সঠিক, ন্যায্য
rigorism কৃচ্ছ্রতাবাদ
rub (আঃ) প্রভু
rubibiyyah (আঃ) প্রভুত্ব
ruh (আঃ) রুহ, আত্মা
ruhul azam (আঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা
uhul quds (আঃ) পবিত্র আত্মা
ruwah (আঃ) বর্ণনাকারী
ruiya (আঃ) স্বপ্ন
ruyaal sadiqa (আঃ) সত্য স্বপ্ন

S

saint সাধু
sanction অনুশাসন, অনুমোদন
sanction, moral নৈতিক অনুমোদন
saturation অনুসিক্ততা
second cause মাধ্যমিক কারণ, দ্বিতীয় কারণ
secondacy quality গৌণ গুণ, উপগুণ
sect দল, সম্প্রদায়
secular ধর্মনিরপেক্ষ
secularism ধর্মনিরপেক্ষতা
selection নির্বাচন
~, natural প্রাকৃতিক নির্বাচন
self অহম, আত্মা
self-revelation স্বপ্রকাশ, আত্মপ্রকাশ
semantics অর্থবিজ্ঞান, বাগার্থ বিদ্যা
semetic সিমেটিক, শামীয়
sensa (pl) } সংবেদোপাত্ত
sensum }
sensation সংবেদন
sensationalism সংবেদনবাদ
sense অর্থ, ইন্দ্রিয় বোধ
sense-data (pl) } সংবেদোপাত্ত
sense-datum }
sense-experience ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা
sense-intuition ইন্দ্রিয়জ স্বজ্ঞা
sensibilia (pl) } সংবেদ্য
sensibile }
sensibility সংবেদনবৃত্তি, সংবেদন-প্রবণতা, সংবেদনশীলতা

sensibility, forms of সংবেদনবৃত্তির আকারসমূহ, সংবেদনগ্রহিতার আকারসমূহ
sensible সংবেদ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন
sensism ইন্দ্রিয়বাদ
sensorium স্নায়ুমণ্ডল, স্নায়ুকেন্দ্র
sentence বাক্য
sentiment ভাবাবেগ
sentimentalism ভাবাবেগবাদ
sequence অনুগামিতা, অনুক্রম
serial ধারাবাহিক, ক্রমিক
series সিরিজ ধারা
set সেট, দল
sex লিঙ্গ, যৌন, যৌন কামনা
sceptic সন্দেহবাদী, সংশয়বাদী
sceptical সংশয়াপন্ন
scepticism সংশয়বাদ, সন্দেহবাদ
schema স্কিমা, গঠন, আকার
schematism আকারবাদ, গঠনবাদ
schism দলভেদ
schismatic দলাদলিসূচক
scholastic theologian স্কলাসটিক ধর্মতত্ত্ববিদ
science বিজ্ঞান
scope পরিসর, পরিধি
shah way (আঃ) কামনা
shahid (আঃ) শহীদ
shriat শরীয়ত
shites শিয়া সম্প্রদায়
shirk (আঃ) বহুদেবতাবাদ, দেবতাবাদী পাপ
shifat (আঃ) সিফাত, গুণ
~ al tanjih (আঃ) অতিবর্তী গুণ
~ al tasbih (আঃ) অন্তর্ব্যাপী গুণ
sign চিহ্ন, সংকেত
significance তাৎপর্য
sirat (আঃ) পথ
sirr (আঃ) আধ্যাত্মিক আত্মা, সির্‌
sitten of people আদর্শ নৈতিক পরিবেশ
society সমাজ
solipsism 'সলিপসিজম', স্ব-সত্তাবাদ, অহমবাদ, স্বঅস্তিত্ববাদ
sophia (গ্রীক) জ্ঞান
sophism সোফীয়াবাদ, কুতর্কবাদ
sophist সোফিস্ট
sophistic কূটতর্কীয়
sorites সংক্ষিপ্ত আরোহী যুক্তিমালা
soul আত্মা
soul substance theory আত্ম-দ্রব্য মতবাদ, আত্ম-দ্রব্য তত্ত্ব
source উৎস
space দেশ, স্থান
specialism বিশেষত্ববাদ
species প্রজাতি

species of being — সত্তার প্রজাতি
speculative reason — অনুধ্যানী প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি
sperm — শুক্র, বীর্য, জৈববীজ
sphere — স্তর, মণ্ডল, গোলক
spirit — আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মা
spiritualism — অধ্যাত্মবাদ
spontaneous — স্বতঃসঞ্জাত
~ action — স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া
~ variation — স্বতঃসঞ্জাত পরিবর্তন
square of opposition — বিরোধ বর্গক্ষেত্র
standard — আদর্শ, মান
startle response — শিহরণ প্রতিক্রিয়া
state — অবস্থা, রাষ্ট্র
statement — উক্তি
station — স্থান, স্টেশন, 'মনজিল'
stimulus — উদ্দীপক, উত্তেজক
subject — বিষয়ী, উদ্দেশ্য, জ্ঞাতা, কর্তা
subjective — আত্মগত, বিষয়ীগত
~ idealism — আত্মগত ভাববাদ, বিষয়ীগত ভাববাদ
subjectivism — বিষয়ীবাদ
subjectivity — বিষয়ীগততা
subjumption — অন্তর্ভুক্তি
sublimation — শোভনীকরণ
subsect — উপদল
subsistence — বিদ্যমানতা
substance — দ্রব্য
substratum — আধার, গুণের আধার
succession — অনুগমন, পরম্পরা
~, law of — পরম্পরা নিয়ম
sufism — সূফীবাদ
suggestion — ইংগিত, নির্দেশ, উপদেশ
summum bonum — পরম মঙ্গল, পরম কল্যাণ
~ genus — বৃহত্তম জাতি
sunni (আঃ) — সুন্নী সম্প্রদায়
superman — অতিমানব
supermental — অতিমানসিক
supernatural — অতিপ্রাকৃত
supposition — প্রকল্প, ধরে নেওয়া
supermandane — দিব্য, স্বর্গীয়
supra-logical — অতিযৌক্তিক
supra-rational — প্রজ্ঞাতীত
~ ~ intuition — প্রজ্ঞাতীত সংজ্ঞা
supreme being — পরম সত্তা
surah (আঃ) — 'সুরত', আকার, গঠন
survival of the fittest — যোগ্যতমের উদ্বর্তন
syllable — পদাংশ
syllogism — ন্যায় অনুমান, সমানুমান
symbol — প্রতীক
symbolic — প্রতীকী
symbolism — প্রতীকবাদ
symmetrical — প্রতিসম

symmetry প্রতিসাম্য
sympathy সহানুভূতি, সমবেদনা
system পদ্ধতি, রীতি, ধারা, সংহতি
synonym প্রতিশব্দ
synonymous সমার্থক, একার্থক
synopsis সংক্ষিপ্তসার
syntax পদবিন্যাস
synthesis সমন্বয়

T

ta'ayyun al awwal (আ:) প্রথম প্রকাশ
'tabi (আ:) বিশ্বাসী
takwin (আ:) নিশ্চিত, নির্দিষ্ট
tanasukh (আ:) দেহান্তরবাদ পুনর্জন্মবাদ
tanfail (আ:) উত্তর
tanzih (আ:) অতিবর্তীতা
~ al tawhid (আ:) পরম অতিবর্তী একত্ব বা ঐক্য
taqdir (আ:) 'তকদীর', ভাগ্য
tariqat (আ:) 'তরীকত', পথ
tasawwuf (আ:) তাসাউফ, সুফীবাদ
tasbih (আ:) অন্তর্ব্যাপিতা
tautological চক্রভাষিক
tautology চক্রভাষ
tawhid (আ:) একত্ব, ঐক্য
tawil (আ:) ব্যাখ্যা

technical কৌশলী
teleological উদ্দেশ্যবাদী
~ argument উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি
~ evolution উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তন
teleology উদ্দেশ্যবাদ
temporal অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী
~ mode অনিয়ত প্রত্যংশ
temporalism কালিকবাদ, কালবাদ
tenet নীতি
tension অস্থিরতা
term পদ
theism খোদাবাদ, ঈশ্বরবাদ
theocracy ঈশ্বর রাজ্য, আল্লাহর রাজ্য
theoretical তাত্ত্বিক, উপপত্তিক
theory মতবাদ, তত্ত্ব
thought মনন, চিন্তন, চিন্তা
transcendent অতিক্রমী, অতিক্রান্ত
transcendental অতিবর্তী, অতীন্দ্রিয়
~ aspect অতিবর্তী দিক
transmigration অবস্থান্তর, স্থানান্তর গমন
transmutation পরিবর্তন, রূপান্তর
trinity ত্রিত্ব
~, doctrine of ত্রিত্ববাদ
true সত্য
trust আমানত
truth সত্য, সত্যতা
type 'টাইপ', আদর্শ, নমুনা, প্রতীক

U

ubbādul waqt (আঃ) কাল উপাসক
ubudiyyah (আঃ) দাসত্ব, সেবক
ultimate চরম, পরম, মূল, সর্বোচ্চ
~ cosmic reality পরম জাগতিক বাস্তব সত্তা
~ ego পরম আত্মা, পরম অহং
~ end পরম লক্ষ্য
~ good পরম কল্যাণ, পরম মঙ্গল
~ principle পরম নীতি, পরম উপাদান, মূল উপাদান
~ reality পরম বাস্তব সত্তা
~ standard পরম আদর্শ, পরম মানদণ্ড
~ staff পরম উপাদান
~ substance পরম দ্রব্য
~ unity পরম ঐক্য
~ value পরম মূল্য
ultrarational প্রজ্ঞাতীত, বুদ্ধির অতীত
~ faculty প্রজ্ঞাতীত বৃত্তি
~ truth প্রজ্ঞাতীত সত্য
ultra spiritualism অতি আধ্যাত্মিকতা, অতি অধ্যাত্মবাদ
uncaused অহেতুক, স্বয়ম্ভূ
uncertainty অনিশ্চয়তা
~, principle of অনিশ্চয়তা নিয়ম, অনিশ্চয়তা সূত্র

unconditional শর্তহীন, নিঃশর্ত
~ invariable antecedent শর্তহীন অপরিবর্তনীয় পূর্বগ
unconditioned being অশর্তায়িত সত্তা
unconscious অচেতন
~ mind অচেতন মন
~ level of consciousness চেতনার অচেতন স্তর
understanding বোধ, বোধশক্তি
undistributed অব্যাপ্ত
unification একত্রীকরণ, মিলন
uniform standard of morality সমরূপী নৈতিক আদর্শ
uniformity সমরূপতা, সমানুবর্তিতা
~ of nature প্রকৃতির সমানুবর্তিতা, প্রকৃতির একানুবর্তিতা
union ঐক্য, সংযোগ, মিলন
unit একক
unitarian একেশ্বরবাদী
unitarianism একেশ্বরবাদ
unity ঐক্য, একত্ব
~ of being সত্তার ঐক্য
~ of God আল্লাহ্‌র একত্ব
universal সার্বিক
universalism সার্বিক যুক্তিবাদ
universe জগত, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড
~ of desire কামনার জগত

universe of discourse আলোচনা বৃত্ত
univocal term একার্থক পদ
~ word একার্থক শব্দ
unknowable অজ্ঞেয়
unknowable, the পরম অজ্ঞেয়
~, theory of the অজ্ঞেয় তত্ত্ব
unmoved mover অবিচল চালক
unseen, the পরম অদৃষ্ট
utilitarianism উপযোগবাদ
utility উপযোগ, উপযোগিতা
utopia কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ কল্পরাষ্ট্র
utopianism কল্পরাষ্ট্রবাদ, কল্পনাপ্রিয়তা

V

vague অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট
vagueness অস্পষ্টতা, অনির্দিষ্টতা
valid বৈধ, অভ্রান্ত
validity বৈধতা
valuation মূল্যায়ন, মূল্যারোপ
value মূল্য, মান
variable অধ্রুবক
~ anticedent পূর্বগ অধ্রুবক
~consequent অনুগ অধ্রুবক
variation পরিবর্তন, বিভিন্নতা
~, continuous নিরন্তর পরিবর্তন
~, fortuitous আপতিক পরিবর্তন
vegetable mind উদ্ভিদ আত্মা
~ kingdom উদ্ভিদ জগত
vera causa বাস্তব কারণ
veracity সত্যবাদিতা
verbal মৌখিক, বাচনিক, শাব্দিক
verdict রায়, সিদ্ধান্ত, অভিমত
verifiability প্রতিপাদনযোগ্যতা, প্রমাণযোগ্যতা
~principle প্রতিপাদনযোগ্যতা সূত্র
verifiable প্রতিপাদনযোগ্য, প্রমাণযোগ্য
verification যাচাই, প্রতিপাদন, প্রমাণ
veritable সত্য
verity সত্যতা
vice অসদগুণ, অসাধুতা
vicious circle চক্রকদোষ, দুষ্টচক্র
view মতামত, দৃশ্য
virtue সদগুণ, সাধুতা
vision দৃষ্টি
vital force জীবন শক্তি
vital principle জীবনসত্তা
vitalism প্রাণবাদ
volition অভিলাস, অভিলসন, ইচ্ছা
voluntarism ক্রিয়াবাদ, ইচ্ছাবাদ
voluntary স্বতঃ প্রবৃত্ত, ইচ্ছাকৃত, ঐচ্ছিক
~action ঐচ্ছিক ক্রিয়া

W

wahadat (আঃ) ঐক্য (দ্বিতীয় পর্যায়) নূরে মুহম্মদী স্তর
wahdatul shuhud (আঃ) 'ওয়াহ-দাতুল শহুদ', দৃষ্টির ঐক্য, সর্বধরেশ্বরবাদ
wahdatul wujud (আঃ) 'ওয়াহ-দাতুল ওজুদ,' সর্বেশ্বরবাদ, সর্বখোদাবাদ, সত্তার ঐক্য
wahdiyyat (আঃ) ঐক্য (তৃতীয় পর্যায়) নূরে আদমের স্তর, মানবতার স্তর
wahi (আঃ) ওহী, প্রত্যাদেশ
wahm (আঃ) কল্পনা, 'ওহাম'
wali (আঃ) 'ওলী', সাধু ব্যক্তি
waliyyat (আঃ) সাধুতা, বেলায়েত লাভকারী অবস্থা
want অভাব, চাহিদা
wasi (আঃ) উত্তরাধিকারী
whatness কী-ত্ব, স্বরূপ
will ইচ্ছা, সংকল্প
~,freedom of ইচ্ছার স্বাধীনতা
~to believe বিশ্বাসের ইচ্ছা
~to egohood আমিত্বের ইচ্ছা
~to live বাঁচার ইচ্ছা
~to power শক্তিলাভের ইচ্ছা
wisdom বিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান
wish ইচ্ছা
word শব্দ
~, a-categorematic অ-পদযোগ্য শব্দ
~, a-categoric অ-পদযোগ্য শব্দ
~categorematic পদযোগ্য শব্দ
working hypothesis কাজ চালানো প্রকল্প
world জগত, বিশ্ব
~celestial নভোমণ্ডল
wrong অন্যায়, ভুল, অবৈধ, অসত্য
wujab (আঃ) প্রয়োজনীয়তা
wujud (আঃ) দেহ, জাগতিক সত্তা, অস্তিত্ব
wujud-i-awwal (আঃ) প্রথম অস্তিত্ব
wujud-i-bahat (আঃ) শুদ্ধ অস্তিত্ব

Y

yakin (আঃ) বিশ্বাস, জ্ঞান
yaga যোগদর্শন, যোগ

Z

zahirism জাহেরী মতবাদ
zaman (আঃ) কাল, সময়
zend-avesta জেন্দাবেস্তা
zoroastrianism জরথুস্ত্রবাদ
zuhur (আঃ) প্রকাশ